কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

বৈশাখ, ১৩১৭।

RADHA RANI.

BOCOOL SCENTED HAIR OIL.

Radha Rani is apure and sweet Becool scented hair oil. It Keeps every organ of the body cool by its regular use. It has a power in arresting the falling off of the Hair and imparting a Rich and Luxurious growth.

Phial As.-8.-Doz: Rs. 4-8.

রাধারাণী।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট বকুল গন্ধ কেশ তৈল।

রাধারাণীর গন্ধ অতুলনীয়। ইহা প্রত্যহ ব্যবহার করিলে শরীরের সমস্ত যন্ত্র সকল সুস্থ থাকে। ইহা ব্যবহারে চুলের গোড়া শক্ত হয় ও চুল পড়া নিবারিত হয় ও চুল বৃদ্ধি করিতে ইহার অসাধারণ ক্ষমতা। শিশি ।৷৹ ডজন ৪৷৷৹ টাকা।

শ্রীবিজয়বসন্ত ঘোষ, পারফিউমার।

৭৮।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং।

মনোহারী সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য উচিত মূল্যে সর্ব্বস্থানে সরবরাহ করা হয়। অর্ডার সহিত এক-চতুর্থাংশ মূল্য অগ্রিম দেয়। অর্ডার পাইলে মাল পাঠাই, কিছুমাত্র বিলম্ব করা হয় না। আবশ্যকীয় দ্রব্যের দর পত্র দ্বারা জানান হয়। মফঃস্বলবাসীর কিরূপ সুবিধা ও সুযোগ একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ব্যবসায়িগণকে স্বতন্ত্র কমিসন দেওয়া হয়।

হোলসেল এণ্ড রিটেল ডিলার্স।

[illegible] রাজার লেন, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা।

স্ত্রী পুরুষের রজঃ ও শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় দোষ ও তজ্জনিত ব্যাধিসমূহ নির্ম্মূল করণক্ষম এবং স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চারক। মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা এক টাকা মাত্র।

যিনি আমার নিম্নলিখিত ঠিকানায় আপনার নাম ধাম পাঠাইবেন, তাঁহাকে কলিকাতা পুলিশ কোর্টের মোকর্দ্দমা হইতে নির্ম্মুক্ত ও উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া পরিগণিত

কামশাস্ত্র

নামক একখানি উপযোগী পুস্তক বিনামূল্যে বিনা ডাকমাশুলে পাঠান যাইবে।

কবিরাজ শ্রীমনিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কিং এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

৮৩, হ্যারিসন রোড,

ব্রাঞ্চ—৪৫, ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের জন্য উপরোক্ত ঠিকানায় লিখুন।

মজুমদার এণ্ড কোং।

পেণ্টর্স ফটোগ্রাফার্স আর্টিষ্টস্ এণ্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

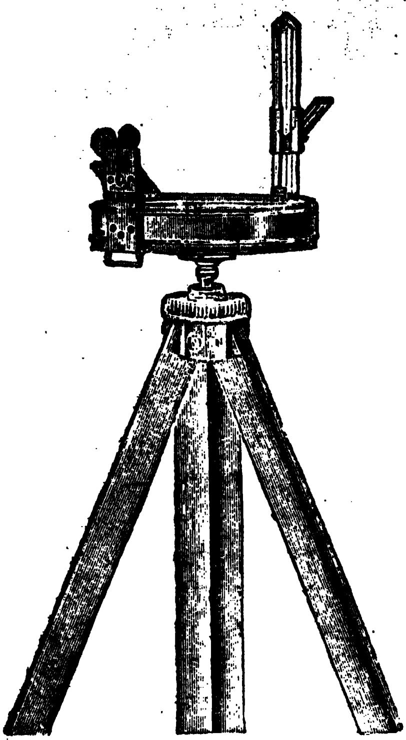
২২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

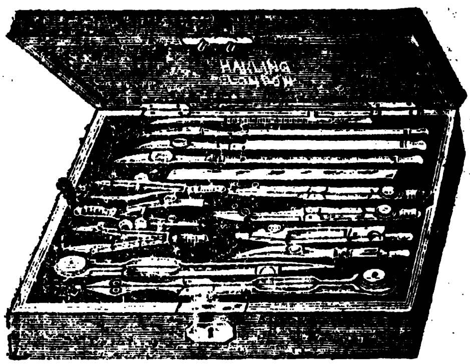
আমাদের কারখানায় থিয়েটারের ষ্টেজ সম্বন্ধীয় সকল প্রকার সিন্ ড্রপসিন্ প্রভৃতি এবং সকল প্রকার অয়েল পেণ্টিং প্রতিমূর্ত্তি সুচারুরূপে অল্পমূল্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ রাজা, জমিদার প্রভৃতি মহোদয়গণের বাড়ীর কার্য্যই আমাদের প্রমাণ। সিনের মূল্য তালিকার জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন। আর সকল প্রকার দেশী বোম্বাই ছবি ও ফটো বাঁধাই এবং বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ম্যানেজার,

শ্রীবরদাপ্রসন্ন মজুমদার।

জরিপ ও নক্সার যন্ত্র বিক্রয় ও মেরামত [illegible]।





প্রিজমেটিক কম্পাস ৮৩৲, ৯০৲, ৯৫৲, ১০০৲, ১১০৲ টাকা প্রত্যেকটী।

বাঙ্গলা সার্ভে কম্পাস ১২৲, ১৪৲, ১৮৲, ২৫৲, ৩০৲, ৪০৲

প্লেনটেবিল কমপ্লিট সেট কম্পাস সহিত ৩০৲, ৩৫৲ টাকা।

অপটিকেল স্কোয়ার ৭৲ টাকা প্রত্যেকটী।

গাণ্টারস চেন ৬৲ টাকা, পাঁচ কাঠা চেন ৩॥০ টাকা, দশ কাঠা চেন ৫॥০ টাকা।

পিতলের কাঠা বিঘা স্কেল ১॥০, ২৲ টাকা।

আইভরি কাঠা বিঘা স্কেল ৩৲ টাকা।

কাঁটা কম্পাস ১।০, ১॥০, ২৲, ২॥০, ৩৲, ৩॥০ টাকা প্রত্যেকটী।

চাঁদা ।০, ।৶০ আনা, রঙ্গের বাক্স ৸০ হইতে ৫৲, ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত।

ইনষ্ট্রুমেণ্ট বাক্স ২॥০, ৩৲, ৪৲, ৫৲, ৬৲, ৯৲, ১২৲ হইতে ৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত।

ট্রেসিং ক্লথ ১২৲, ১৮৲, ২৩৲ টাকা রোল।

ড্রইং পেপার ৵০ আনা হইতে ॥০ আনা সীট।

ইণ্ডিয়ান ইঙ্ক ।০ আনা হইতে ১॥০ টাকা প্রত্যেকটী।

রং গুলিবার প্লেট ।০, ॥০, ৸০, ১।০ আনা প্রত্যেকটী।

রবার ৵০, ৶০, ।৵০, ॥০ আনা প্রত্যেকটী।

আর আর নক্সার ও সারভে যন্ত্র পাওয়া যায়। মুল্যের তালিকা পত্র লিখিলে পাঠাইয়া থাকি।

জে, সুর এণ্ড কোং।

১০৪ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

REGISTERED No C. 192.

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



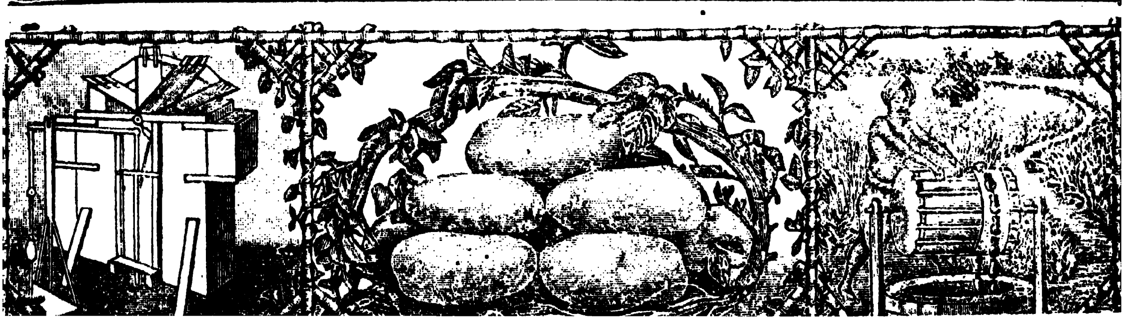
একাদশ খণ্ড,—১ম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

বৈশাখ, ১৩১৭।

কলিকাতা: ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
ই. স্পিরিটো দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

সূচী পত্র।

বৈশাখ, ১৩১৭ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ⁄৴০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

গবাদি পশুর খাদ্য—

গিনি ঘাস— পাউণ্ড ২৲

জোয়ার— „ ।০

বিয়ানা প্রভৃতি ঘাস „ ২৲

ফুলবীজ—(বপনের সময় মার্চ্চ মাস হইতে জুলাই) এমারান্থস, বালসাম, ক্যানা, কস্‌কস্ কোম্ব ক্লিটোরিয়া, কনভলভিউলস্, ডালিয়া, ধুতুরা, গিলার্ডিয়া পিক্টা, আইপোমিয়া, মিরাবিলিস্ জালাপা, মেরিগোল্ড, প্যাসিফ্লোরা, পর্টুলাকা, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ— প্রতি প্যাকেট ।০

অর্দ্ধ প্যাকেট ৵০

বাছাই করা ১০ রকমের প্যাকেট ১৶০

„ ২০ রকমের „ ২।০

কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ—তোলা ৵০;২॥০ তোলা ।০; পাউণ্ড বা অর্দ্ধ সের ২॥০ টাকা।

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয়।

এক বৎসরে দুর্ভেদ্য বেড়া হয়। ২॥০ তোলা বীজ এক লাইন করিয়া বসাইলে ৬৬ ফুট বেড়া হয়। বিশেষরূপ ঘন বেড়ার আবশ্যক হইলে দুই লাইন করিয়া বীজ বসান উচিত। বীজগুলি জুলি কাটিয়া ৯ ইঞ্চি অন্তর বসাইতে হয়। দুইটী জুলির মাঝে ৯ ইঞ্চি ব্যবধান থাকা আবশ্যক।

মেম্বর।

নূতন বর্ষারম্ভ হইতেই মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবার উপযুক্ত সময়। যাঁহারা এক্ষণে ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবেন বা আছেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত বীজগুলি পাইবেন।

সভারেণ মেম্বর হইলে—গ্রীষ্মকালে বপনোপযোগী

দেশী সব্জীবীজ ২৪ রকম ২।০

„ ফুলেরবীজ ২০ „ ২।০

শীতের বিলাতী সব্জীবীজ আমেরিকার টিনে মোড়াই করা ২৪ রকম ১ বাক্স ৫॥০

শীতের বিলাতী সটন কিম্বা ল্যাণ্ডে-থের ফুলের বীজ ১ বাক্স ৪॥০

শীতের দেশী সব্জীবীজ ২৪ রকম ২।০

ডাকমাশুল ইত্যাদি ১।০

—১৮৲

সাধারণ মেম্বর হইলে—

গ্রীষ্ম বর্ষাকালের বপনোপযোগী

দেশী সব্জীবীজ ২৪ রকম ২।০

„ ফুলের বীজ ১০ „ ১৶০

শীতকালের বপনোপযোগী আমেরিকার মোড়াই করা এক বাক্স ২৪ রকম বিলাতী সব্জী বীজ ৫॥০

বিলাতী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট ১॥০

দেশী সব্জী বীজ ১৮ রকম ১৶০

ডাকমাশুল ইত্যাদি ॥০

—১২৲

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মেম্বর আমাদিগের দ্বারা পরিচালিত বাঙ্গালা মাসিক পত্র "কৃষক" প্রতি মাসে এক কপি করিয়া পাইবেন এবং এসোসিয়েসন হইতে স্বতন্ত্র বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ৫৲ পর্য্যন্ত টাকায় ৴০ এবং ৫৲ অধিক হইলে শতকরা ১০৲ হিঃ কমিশন পাইবেন।

স্পেশ্যাল মেম্বর ঃ—কৃষকের গ্রাহকগণ এসোসিয়েসনের স্পেশ্যাল মেম্বর। তাঁহারাও বীজ গাছাদি খরিদ করিলে উচ্চহারে কমিশন পাইবেন।

সভারেণ মেম্বরকে বার্ষিক এক সভারেণ বা ১৫৲ টাকা, সাধারণ মেম্বরকে বার্ষিক ১০৲ ও স্পেশ্যাল মেম্বরগণকে কৃষকের বার্ষিক মূল্য ২৲ দিতে হয়।

গুয়ানো—ফল, ফুল, সব্জীর পক্ষে অদ্বিতীয় সার অতি অল্প মাত্রায় অধিক কাজ হয়।

ছোট টীন ॥০ আনা, বড় টীন ১৲ টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র। ব্যবহারের প্রণালী টীনসহ দেওয়া হয়।

চীনা বাদাম বা মাট বাদাম খুচরা ।০ পাউণ্ড, মণ ১০৲ টাকা। পাট বীজ খুচরা ।০ পাউণ্ড, মণ ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকা। ধঞ্চে (সবুজ সারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী) খুচরা ।০ পাউণ্ড, মণ ৮৲ টাকা। এই সকল বীজের দর ঠিক থাকে না সময় সময় কম বেশী হইয়া থাকে।

সার। হাড়ের গুঁড়া (ধানের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ) প্রতি মণ ৪৲ টাকা। রেড়ীর খৈল (আলু ও ইক্ষুর পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক) প্রতি মণ ৪৲ টাকা, দর সকল সময় সমান থাকে না। সোরা সার প্রতি মণ ৬৲ হইতে ১০৲ টাকা। প্যাকিং ও রেল মাশুল স্বতন্ত্র। অর্ডারের সঙ্গে টাকা পাঠান আবশ্যক রেল ষ্টেসন, ঠিকানা ও ডাকগাড়ী বা মাল গাড়ীতে মাল পাঠাইতে হইবে স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মেনেজার কে, এল ঘোষ এফ, আর, এচ, এস, (লণ্ডন)।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন,

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্রাট
সপ্তম এডোয়ার্ড।

ভারত সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড ফুস্ফুস্ প্রদাহ রোগে গত ৭ই মে (১৯১০) উনসত্তর বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এত শীঘ্র এমন হইবে কেহ ভাবে নাই। গত সপ্তাহের শুক্রবার সংবাদ আসিল, সম্রাট পীড়িত, পীড়া ফুস্ফুস্ প্রদাহ। সকলে সংশয় গণিল, কিন্তু আশা ছাড়ে নাই। অবশেষে সব ফুরাইল, মানুষের আশা সফল হইল না, বিধাতার, ইচ্ছাই পূর্ণ হইল।

ভারতের ন্যায় রাজভক্ত প্রজা কোথাও নাই; ভারতবাসী, বিশেষতঃ ভারতবাসী হিন্দু, রাজাকে দেবতাবোধে অন্তরের অন্তরে পূজা করে তাই ভারতবাসী প্রজাবৃন্দ শোকে মূহ্যমান।

ভারতবাসী কেন, তাঁহার বিরহে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার লোকান্তর সংবাদ পাইয়া মার্কিন যুক্ত রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আপাততঃ তাঁহার বার্লিন যাত্রা স্থগিত রাখিলেন। জর্ম্মান সম্রাট কৈশার আমোদ উৎসব বন্ধ করিয়া দিলেন।

রোমের পোপ গভীর দুঃখ জানাইতেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা, কানেডা, অষ্ট্রেলিয়া, আজ শোকাভিভূত। ইংলণ্ড ও আয়ারলণ্ডবাসীর আজ শোক সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে, সংবাদ পত্র স্তম্ভে তাঁহাদের দুঃখ প্রকাশের স্থান সঙ্কুলান হইতেছেনা।

এক রাজা যায়,অন্য রাজা হয়, সিংহাসন কখন খালি থাকে না। কিন্তু সকলের জন্য লোকে শোক করে না, সকলের জন্য হাহাকার ধ্বনি উঠে না। রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড নিশ্চয়ই তাঁহার স্বীয় আচার ব্যবহারে ও পালন গুণে সকলের হৃদয়ে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাই আজ হাহাকার ধ্বনি।

ভারত সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন ভারতের অধীশ্বরী ছিলেন তখন দয়া, দাক্ষিণ্য, উদারতা, নানা গুণে তিনি তাঁহার প্রজাবৃন্দকে মোহিত করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ সালে তাঁহার আন্তরিক সহৃদয়তা ব্যঞ্জক আশ্বাস বাণী অদ্যাপি দিগদিগন্তে ঘোষিত হইতেছে। সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই "ভারতবাসী আমার প্রজা, আমি তাহাদিগকে অধিকতর স্বাধীন ভাবে পালন করিলে আমার সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত উন্নতি ও মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী" এবম্প্রকার বাক্যে ভারতীয় প্রজাবর্গকে আশ্বাসিত করিতে অণুমাত্র বিলম্ব করেন নাই। অদ্যাপি তাঁহার মুখ নির্গত বাণী দিগন্তে প্রতিধ্বনি হইতেছে। আর কিছু কাল বাঁচিয়া থাকিলে বোধ হয় তাঁহার আশ্বাস বাক্য সফল হইত, তাহার শুভ সূচনাও দেখা গিয়াছিল। বিশেষতঃ এই কারণেও শোকটা ভারতবাসীর এত দারুণ বাজিয়াছে।

তথাপি আমাদের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই, তিনি উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র প্রিন্স-অব-ওয়েলস, পঞ্চম জর্জ্জ নাম লইয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে উপবেসন করিয়াছেন। ইনিই ভারতের নূতন সম্রাট হইলেন। ইনি ১৯০৬ সালের শেষে ভারত ভ্রমণান্তে ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, গিল্ডহলে বক্তৃতাকালে যাহা বলিয়াছিলেন অদ্যাপি আমরা তাহা ভুলি নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই, "ভারতবাসী যে রাজভক্ত তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। তাহাদের প্রতি অধিকতর সহানুভূতি ও সমবেদনা দেখাইলে আমরা অতিসহজে তাহাদের হৃদয় অধিকার করিতে পারিব।" যাঁহার অন্তরের এরূপ ধারণা তিনি প্রকৃতি রঞ্জনে সমর্থ হইবেন এরূপ আশা বৃথা আশা নহে। যিনি প্রকৃতি রঞ্জন করেন তিনিই রাজা এবং তিনি যত দূরেই অবস্থিত হউন ভারতবাসীর হৃদয়ের সন্নিহিত এবং তাঁহার প্রতি তাহাদের ভক্তি চিরদিনই অচলা।

রাজমহিষী মহারাণী আলেকজান্দ্রাকে পতিশোকে সান্ত্বনা দিবার আমাদের কি আছে, তবে তিনি আজ উপযুক্ত সম্রাট পুত্রের মাতা এই তাঁহার এক মাত্র সান্ত্বনা স্থল। ইঁহার বয়স ৬৬ ছেষট্টি বৎসর। নূতন সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের বয়স ৪৬ বৎসর। মহারাণী মেরী বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইলেন।

কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ খণ্ড। | বৈশাখ, ১৩১৭ সাল। | ১ম সংখ্যা।

ভারতে লাক্ষার চাষ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু এম, আর, এ, এস লিখিত

লাক নামক (coccus lacca) এক প্রকার কীট দ্বারা বৃক্ষত্বক আক্রান্ত হইলে এই পদার্থ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে সংস্কৃত ভাষায়—লাক্ষা, হিন্দিতে-লাখ বলে। বাঙ্গালায় ইহার নাম গালা।

কুসুম, পলাশ, কুল, পিপল, বকুল প্রভৃতি বৃক্ষের ছোট ছোট শাখা প্রশাখায় লাক্ষা কীট আসিয়া শাখা পল্লবের ছালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া বাসা করে। ঐ সকল ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া তাহা জলে সিদ্ধ করিলে লাক্ষা প্রস্তুত হয়। লাক্ষা কীট আক্রান্ত ছোট ডালগুলিকে stick-lac বা কাট-গালা বলা হয়। কাটগালা বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে রঞ্জন ৬৮, লাক্ষারস বা লাক্ষা রঙ ১০, মোম ৬, গ্লুটেন ৫.৫, অপরাপর বাজে পদার্থ ১০.৫ এই জিনিষ গুলি বিদ্যমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

বনে, জঙ্গলে ইতিপূর্ব্বে স্বভাবতঃ লাক্ষাকীট জন্মিত। অরণ্যবাসীরা কাট লাক্ষা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া সহর বাজারে বিক্রয় করিত, আজিও অনেকে এই কার্য্যে লিপ্ত আছে। সভ্য জগতে গালার ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িতেছে, সেই জন্য জঙ্গল হইতে লাক্ষাকীট সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বৃক্ষ বিশেষে তাহার রীতিমত চাষ করা হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ এবং জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাসে গাছে গালাকীট লাগান হয়। যে গাছে অগ্রহায়ণ মাসে গালাকীট লাগান হয় তাহা হইতে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে এবং যে গাছে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে কীট লাগান হয় তাহা-হইতে অগ্রহায়ণ মাসে কাট গালা সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। যেখানে আদৌ লাক্ষার চাষ নাই তথায় অগ্রহায়ণ মাসে কীট লাগানই ভাল; কারণ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়ে লাগাইলে প্রথম জোর বর্ষার জলে ভাসিয়া যাইতে পারে। যেখানে বর্ষা অত্যন্ত অধিক তথায় জ্যৈষ্ঠ মাসে লাক্ষার চাষ আরম্ভ না করাই ভাল ; সেই রূপ যেখানে অতি-শয় শীত হয় সেখানে অগ্রহায়ণে চাষ আরম্ভ করা উচিত নহে। দার্জিলিঙের মত স্থানে শীত এবং বর্ষা উভয়ই অধিক সুতরাং সেখানে লাক্ষার চাষের কোন ক্রমেই সুবিধা হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে বিলাসপুর, প্রতাপগড়, সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম, ছোটনাগপুর, ময়ূরভঞ্জ, উড়িষ্যা ও সারণ প্রভৃতি স্থানে লাক্ষা চাষের বিশেষ সুবিধা আছে। কখন কখন এক জাতীয় লাক্ষা কীট অতি গরমে মরিয়া

যায় তথায় অপর জাতীয় লাক্ষা কীট আনিয়া চাষ করা কর্ত্তব্য।

লাক্ষা কীটের চাষ করিতে হইলে গাছের ডালে অপর স্থান হইতে কীট আক্রান্ত ডাল আনিয়া বাঁধিয়া দিলেই হয়। এক ফুট একটা গালাকীট যুক্ত ডাল বাঁধিয়া দিলেই গাছের ১০।১২টা ছোট ডালে কীট লাগিয়া যাইবে। এক ফুট পরিমাণ কাট যুক্ত ডাল ৫০টীর দাম ১৲ টাকা হইতে ১৷৹ টাকা। কিন্তু সময় সময় অত্যন্ত শীত বা গ্রীষ্ম পড়িলে ঐ রূপ এক বোঝা গালাকাটির দাম ৫৲ টাকারও অধিক হয়।

নব পল্লবিত গাছে লাক্ষার কাঠি গুলি বাঁধিয়া দিবার ১৫ দিন পরে বৃক্ষ হইতে নামাইয়া লইয়া উহা হইতে গালা বাহির করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়, কিন্তু যদি তখন দেখা যায় যে তাহাতে আরও লাক্ষা কীট আছে তবে সে গুলি পুনরায় অন্য গাছে বাঁধিয়া দেওয়া চলে। যেন সমস্ত নূতন শাখা পল্লবে লাক্ষা কীট সমান ভাবে লাগে এ বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিলে এক একটা বৃক্ষ হইতে পূর্ণমাত্রায় লাক্ষা পাওয়া যাইবে না। যে গাছ গুলিতে লাক্ষার চাষ করিতে হইবে সেগুলি বিশেষ যত্নে রাখা দরকার। সে গাছে পীপীলিকা বা অন্য কীট থাকিলে লাক্ষা কীট মারিয়া ফেলিতে পারে। গাছ গুলি সতেজ রাখিবার জন্য তাহার তলদেশ চষিয়া খুঁড়িয়া ঠিক রাখিতে হয়। তলস্থ মৃত্তিকায় সার সংযোগে আদা, হলুদ প্রভৃতি যাহা ছায়ায় হয় সেই সকল খন্দের আবাদ করিলে গাছগুলিও সতেজ থাকে উপরন্তু একটা ফসলও পাওয়া যায়। যাহাতে লাক্ষা চাষ করিতে হইবে সে সকল গাছ মধ্যে মধ্যে ছাঁটিয়া দেওয়া আবশ্যক। জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছ ছাঁটিলে তাহাতে অগ্রহায়ণে লাক্ষার আবাদ চলিবে কিম্বা যদি ফাল্গুন মাসে গাছ ছাঁটা যায় তাহাতে জ্যৈষ্ঠ মাসে নব পল্লব বাহির হইলে তবে লাক্ষার আবাদ চলিবে।

লাক্ষা কীটের শত্রু। বনে আগুণ লাগিলে, অনাবৃষ্টি বশতঃ দারুণ গরমে বা তুষার পাতে লাক্ষা কীট মরিয়া যায়। ছোট বড় দুই প্রকার পীপীলিকাই লাক্ষা কীটের শত্রু। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কীটাদিও লাক্ষাকীট আক্রমণ করে।

উৎপন্ন লাক্ষার পরিমাণ। বৃক্ষের আয়তন অনুসারে এক একটী বৃক্ষ হইতে ১০ সের হইতে ১৴০ মণ পর্য্যন্ত লাক্ষা পাওয়া যায়।

বৃক্ষে কি প্রকারে লাক্ষা কীট প্রতিপালিত হয়, কি প্রকারে কাটগালা হইতে বীজ গালা ও চাঁচ গালা তৈয়ারি হয় এবং লাক্ষা বাণিজ্যে প্রসার কিরূপ এসম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ (হাজারিবাগ) মহাশয় প্রবাসীতে একটী সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন আমরা এস্থলে সেইটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ভারতের যে সকল ভূম্যংশ অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর এবং জঙ্গলে আবৃত, সেই সকল প্রদেশের কয়েকটি বৃক্ষে লাক্ষাকীট উৎপন্ন হয়। বহু প্রাচীনকাল হইতে লাক্ষার ব্যবহার আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। রাজবল্লভ আদি প্রাচীন বৈদ্য গ্রন্থে ইহার গুণ বর্ণিত আছে। পাণিনি ইহার ব্যুৎপত্তি সূত্রবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—রুদ্র ইহার পর্য্যায়ে লিখিয়াছেন "লাক্ষায়ং রক্ষণে রক্ষা"। "মহাত্তর" নামে মহারাষ্ট্র দেশে বহুকাল হইতে ইহার প্রসিদ্ধি।

পলাশ বৃক্ষেই লাক্ষা অধিক জন্মে। ঐ বৃক্ষের কচি কচি ডালে একপ্রকার রক্তবর্ণ অতি ক্ষুদ্র কীট আসিয়া বাস করে। ইহার পাশ্চাত্য নাম Tachardia Lacca; ইহা ছারপোকা জাতীয়

কীট। প্রথমতঃ উহাদের অন্যান্য অবয়ব কিছুই উদ্ভূত হয় না—কেবল একটি ছোট থলিয়া (bag) ও তাহার একপ্রান্তে একটি সরু সূচের ন্যায় শুঁড় এবং ঐ শুঁড়ের দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটি চক্ষু। ঐ পোকারা যখন প্রথমে আসিয়া একটা ডালে উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন ডালের ত্বক বিদ্ধ করিয়া ঐ সরু শুঁড়ের সাহায্যে আভ্যন্তরীণ রস শোষণ করিয়া ঐ থলিয়ারূপ উদর পূর্ত্তি করে। ক্রমে তাহাদের দুইটি শুঁড় (feelers) এবং ছয়টি ছোট ছোট পা দেখা দেয়। প্রত্যেক পোকার গাত্রের সকল স্থান হইতে একপ্রকার চট্‌চটে্ নাতি তরল পদার্থ নির্গত হইয়া শীঘ্রই শুখাইয়া শক্ত হইয়া যায়। তখন উহা দেখিতে একটি ক্ষুদ্র গুটিপোকার "কোয়ার" মত হয় এবং ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। এক এক স্থানে ঐ ক্ষুদ্র কীটগৃহ এত অধিক সংখ্যায় জন্মায় যে লক্ষ লক্ষ "কোয়া" একত্র হইয়া লেপিয়া যায়, এবং একটা চাপ্‌ড়ার মত দেখায়। ঐরূপ কৃষ্ণবর্ণ একখণ্ড চপ্‌ড়া ভাল করিয়া দেখিলে উহার মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখা যায়; প্রত্যেক ছিদ্র এক একটি পোকার বাসস্থান—তাহার জীবন্ত সমাধিমন্দির বা কবর।

লাক্ষাকীট দুই জাতীয়। পুরুষ কীটের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, এবং উহাদের অবয়ব স্ত্রী কীটের প্রায় দ্বিগুণ বৃহৎ। শেষাবস্থায় পুরুষকীটের দুইটি পক্ষ নির্গত হয় এবং মস্তকের নিম্নদেশে আরও দুটি চক্ষু উদ্ভূত হয়। তখন ঐ চতুশ্চক্ষু পুরুষ নিজ কারাগৃহ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। আহার কিম্বা বাসস্থানের চিন্তা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া তখন ইহারা স্ত্রীকীটের সন্ধানে ব্যস্ত থাকে। দৈবাৎ যদি দুইটি পূর্ণাবয়ব পুরুষ কীট সম্মুখীন হয়, তুমুল সংগ্রাম বাধে। অবশেষে দুইটিরই প্রাণনাশ হয়। এইরূপে অনেক পুরুষ-কীট বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহারা বাঁচিয়া থাকে, স্ত্রী কীটের গৃহভেদ করিয়া প্রবৃষ্ট হয় এবং গর্ভ সম্পাদন করে। একটি পুরুষ কীট ঐরূপে ক্রমান্বয়ে প্রায় পাঁচ সহস্র স্ত্রী কীটের গর্ভ উৎপাদন করিয়া মরিয়া যায়। পুরুষ কীটের জীবন সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় তিন মাস।

গর্ভিণী হইলে স্ত্রীকীটের অদ্ভুত রূপান্তর হয়। প্রথম অবস্থায় যে শুঁড় ডালে বিদ্ধ করিয়া রস শোষণ করে সেই শুঁড় একস্থানেই ঐরূপে নিবিষ্ট থাকে। ক্রমে একটু বড় ও শক্ত হয়। একবারও ডাল ছাড়িয়া শুঁড়টি উঠায় না। থলিয়ার ন্যায় যে উদর তাহা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে এবং চাকচিক্যশালী ও গোলাকার হইয়া একপ্রকার রক্তবর্ণ তরল পদার্থে পূর্ণ হইতে থাকে। ইহাই লাক্ষারস, অলক্তক বা আল্‌তা। প্রায় ২॥ মাস পরে গর্ভ পূর্ণ হয় এবং রস ও ডিম্বপূর্ণ জননী আরও একমাস ধরিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকে, দেহ ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে, এবং গর্ভসঞ্চারের পর সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে ডিম্বপূর্ণ অবস্থাতেই জননী মরিয়া যায়। মৃত উদরে ডিম্ব হইতে কীটাণু নির্গত হইয়া শুষ্ক উদরচর্ম্ম ভেদপূর্ব্বক বাহির হইয়া পড়ে, ও কচি ডালে গিয়া উপনিবিষ্ট হয়। ডিম্ব "ফুটিবার" পর উদরস্থ লাক্ষারস বিকৃত হইয়া যায়। সেইজন্য ফুটিবার অগ্রেই রস সংগ্রহ করা হয়। ইহাতে লাক্ষাকীটের সংখ্যা সুতরাং লাক্ষার উৎপত্তি হ্রাস হইয়া যায় বটে, কিন্তু অলক্তক উৎকৃষ্টবর্ণ এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর বৃক্ষ, যাহাতে কীট ভালরূপ জন্মায় না, সেই সকল বৃক্ষের লাক্ষাগৃহ ডিম্ব ফুটিবার অগ্রেই ভাঙ্গিয়া রস সংগ্রহ করা হইয়া থাকে।

সদ্যঃপ্রসূত লাক্ষাকীটগুলি দেখিতে ক্ষুদ্র

রক্তবিন্দুর ন্যায়, সমগ্র ডাল ছাইয়া পড়ে। একটী স্ত্রী কীট প্রায় লক্ষ ডিম্ব প্রসব করে। তাই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহার নাম "লাখ"। বৎসরে দুইবার লাক্ষাকীট উৎপন্ন হয়। প্রথম আষাঢ় মাসের প্রারম্ভে, এবং দ্বিতীয় পৌষ মাসের প্রারম্ভে। সুতরাং লাক্ষা সংগ্রহের উপযুক্ত সময় জ্যৈষ্ঠ মাসের (June) প্রথমে ও অগ্রহায়ণ মাসের (November) মাঝামাঝি। তখনও কীট জীবন্ত থাকে এবং ডিম্ব ফুটে না। তাই অলক্তক ভাল হয়।

লাক্ষা ভারতবর্ষের একচেটীয়া উপসত্ব। প্রধানতঃ ছোটনাগপুর, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের মৃজাপুরের জঙ্গলেই লাক্ষাকীট প্রচুর উৎপন্ন হয়। প্রায় সমস্ত প্রকাণ্ড বৃক্ষই লাক্ষার পক্ষে উপযোগী। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বৃক্ষগুলিতেই উহারা উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হয়। পলাশ, বদরি (কুল), অশ্বত্থ, বট, কপিত্থ, আম্র ও বিল্ব। নিম্ব প্রভৃতি তিক্ত অথবা উগ্ররস বিশিষ্ট বৃক্ষে লাক্ষা জন্মে না।

অরণ্য পার্শ্বে যে সকল গ্রাম থাকে তাহার অধিবাসী ইতর জাতীরা বৎসরে দুইবার লাক্ষা সংগ্রহ করে। উক্ত হইয়াছে যে কচি ডালেই লাক্ষাকীট প্রথমে আসিয়া বাস করে। লোকেরা ঐ কীট শুদ্ধ ডাল ভাঙ্গিয়া লয় এবং এক বিঘত লম্বা টুকরা করিয়া সহরে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসে। ঐ কাটিগুলিকে "কাট্ গালা" (Stick-lac) বলে। অল্প দামে কারিকরেরা ঐ কাট্গালা প্রচুর পরিমাণে খরিদ করিয়া লয়। পরে যখন সংগ্রহের সময় ফুরাইয়া যায় তখন ঐ কাষ্ঠগুলিকে গরম জলে ভিজাইয়া, কচ্লাইয়া, কাটিগুলি বাছিয়া ফেলিয়া দেয়। উপর্য্যুপরি পাঁচ ছয় বার ঐরূপ করিলে জলে লাক্ষারস গুলিয়া লালবর্ণ হয়, এবং ঐ কীটের গৃহ ও পঞ্জর এবং অল্পবিস্তর কাটির ক্ষুদ্র গুঁড়া মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ বীজগালা (Seed lac) নীচে পড়িয়া থাকে। মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লাক্ষারস পৃথক করা হয় এবং শুকাইয়া চাপড়া করিয়া উহাই লাক্ষারঙ (Lac dye) নামে বাজারে আসে। শাল প্রভৃতি পশমী কাপড় রক্তবর্ণ রঞ্জিত করিবার জন্য লাক্ষা রঙ বহু পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে চালান হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই রঙের রপ্তানি বহু পরিমাণে হইত। ম্যাঞ্চেষ্টার জার্ম্মেনী, অষ্ট্রীয়া, ও অন্যান্য ইয়ুরোপীয় দেশে ইহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বিগত কয়েক বৎসর হইতে অ্যানিলিন নামক পদার্থ হইতে নানাপ্রকার উত্তম রঙ প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং লাক্ষারসের রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে।

অপরদিকে লাক্ষার ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার দরও ক্রমাগত বাড়িতেছে। কেবল এক কলিকাতা হইতে তিন বৎসরের লাক্ষার রপ্তানি নিম্নে দেওয়া গেল:—

সাল।	লাক্ষার ওজন (মণ)।	দাম (টাকা)।
১৮৭৯	১,২৮,৭৭৬ ২	৪৫,০১,০৮০।
১৮৯৬	২,৮৫,৭০০·৮	১,৩৮,৫৫,৭৭০।
১৯০৬	৩,৭৯,৫৪১·৪	৩,১৪.৮২৪০৯।

ইহাতেই বুঝা যায় যে লাক্ষার দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছে। ১৮৭৯ সালে লাক্ষার দর ৩৫৲ টাকা মণ ছিল। সাত বৎসর পরেই (১৮৯৬ সালে) প্রায় ৫০৲ টাকা মণ, এবং আরও দশ বৎসর পরে (১৯০৯ সালে) ৮৪৲ টাকা মণ দাঁড়াইয়াছিল। গত বৎসর (১৯০৯ সালে) গালার রপ্তানি দর ২৷৷০ টাকা সের অথবা ১০০৲ টাকা মণ।

উপরোক্ত তালিকা শুদ্ধ বঙ্গদেশের উৎপন্ন লাক্ষার রপ্তানি। ১৯০৬ সালে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে ৩,৩১,৩৯,৭০৬৲ টাকার গালা বিদেশে চালান হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩,১৪,৮২,৪০৯৲ টাকা বঙ্গদেশের।

সভ্যজগতের প্রায় সকল কর্য্যেই আজকাল গালার প্রয়োজন। কাষ্ঠের আসবাব পালিশ করিবার জন্য প্রধানতঃ ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। সুরাসারের (alcohol) সহিত মিশ্রিত হইলে লাক্ষা দ্রবীভূত হইয়া যায়। ইহাই ফ্রেঞ্চ পলিস নামে বিখ্যাত। কাষ্ঠ, লৌহ ইত্যাদির গাত্রে লাগাইলে সুরাসার বাষ্পময় হইয়া নির্গত হইয়া যায়, এবং লাক্ষার একটি সূক্ষ্ম আবরণ ঐ স্থানে পড়িয়া থাকে। উহা মসৃণ, চিক্কণ এবং দেখিতেও সুন্দর। ইহার নিমিত্ত ন্যাপ্থা মিশ্রিত সুরাসার, মেথিলেটেড স্পিরিট নামে বাজারে বিক্রয় হয়। "মানবের পানীয় নহে" তাই নিকর ঐ সুরাসার অল্পমূল্যে পাওয়া যায়। উহাতে লাক্ষা মিশাইয়া আমাদের কারীকরেরা "পলিস্" তৈয়ারি করে।

ফ্রেঞ্চ পলিস ছাড়া লাক্ষার অন্যান্য বহুতর ব্যবহার আছে। বৈদ্যুতিক শ্রোত (Electric Current) লাক্ষার মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। এ নিমিত্ত উহাকে বৈদ্যুতিক শক্তির অপরিচালক (nonconductor of Electricity) বলে। সুতরাং টেলিগ্রাফ্, অ্যাকুমুলেটার (accumulator) প্রভৃতি বৈদ্যুতিক যন্ত্রে লাক্ষার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। ঘরে ঘরে যে তারের মধ্যে "কারেন্ট" আসিয়া Electic Light অথবা Fan (বিদ্যুতের আলোক বা পাখার) জন্য ব্যাবহৃত হয়, সেই তারের উপর লাক্ষার আবরণ থাকাপ্রযুক্ত হঠাৎ স্পৃষ্ট হইলেও ক্ষতি হয় না।

শীলমোহর করিবার একমত্র উপদান লাক্ষা। পাতগালা, ক্লোরাইন নামক বাষ্পের জলে সিক্ত করিলে উহা প্রায় বর্ণহীন হইয়া পড়ে উত্তাপ সাহায্যে গলাইয়া উহাতে সিন্দুর, হরিতাল প্রভৃতি দ্রব্য মিশাইলে, রক্ত পীত ইত্যাদি নানা বর্ণে পরিণত হয়। ঐ অবস্থায় বাতির ন্যায় সরু ও লম্বা ছাঁচে ঢালিয়া মোহরের গালা বা বাতিগালা নামে বাজারে বিক্রয় হয়। প্রায় সকল অফিসেই উহা আবশ্যক। বিশেষতঃ ডাকঘরে—জগতে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ মণ গালা সুদ্ধ পোষ্ট অফিসেই ব্যবহৃত হয়।

বীরভূম জেলার ইলেমবাজার নামক একটি গ্রাম আছে। সে স্থানে ঘর কএক কারিকর বাস করে। তাহাদের জাতিব্যবসায় গালার কাজ। গালার ফল, গালার চুড়ি, নানারূপ খেলনা ও সুন্দর সুন্দর গৃহ সাজাইবার সামগ্রী তাহারা পুরুষানুক্রমে প্রস্তুত করে। সোনালি রঙের গালার সুন্দর চেন্ দেখিলে খাঁটি সোনা ফেলিয়া আদার করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু হায়! এরূপ বিশিষ্ট কারিকরের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। "লক্ষীর পুত্র ভিক্ষা" মাগিতেছে।

৺ কাশীধামের কাষ্ঠের খেলনা, দাবার বল, ইত্যাদি লাক্ষার দ্বারা রঞ্জিত হয়। গ্রামোফোনের রেকর্ড প্রস্তুত করিবার প্রধান উপাদান লাক্ষা। সাহেবদের টুপি শক্ত করিবার প্রধান উপাদান লাক্ষা। লাক্ষা কিসে না লাগে?*

বলিতে হয়, এমন উপকারী ও লাভকর লাক্ষার সংগ্রহ ও প্রস্তুতের ভার বন্য ইতরজাতির উপর ন্যস্ত। ইহার রীতিমত চাষ হয় না—ইহার দিকে ভদ্রব্যবসায়ীর দৃষ্টি নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট আজ কএক বৎসর হইল ঐ বিষয় মনোযোগ করিতেছেন, উন্নতিও করিবেন। যেমন ভারতের

* লাক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লাক্ষা তৈল, চন্দনাদি তৈল, অঙ্গারক তৈল প্রভৃতি কবিরাজী তৈলের এক উপাদান লাক্ষা। যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে, উদুরি কিম্বা স্ফোটক হইলে তৎপ্রশমনার্থ লাক্ষা ব্যবহারের কথা শুনা যায় কেহ কেহ ক্ষতস্থানে লাক্ষা প্রস্তুত বার্ণিস ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন। লেখক

অপরাপর ব্যবসায় ক্রমশঃ বিদেশীয়েরা স্বায়ত্ব করিয়া লইয়াছেন, ইহাও তাঁহাদের হাতে পড়িবে। যাঁহাদের টাকা বাক্সয় অথবা ব্যাঙ্কে "পড়িতেছে," তাঁহারা অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক সাহায্যে লাক্ষার চাষ এবং সুমার্জ্জিত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উহার প্রস্তুত প্রণালীর পরিচালনার চিন্তাও করেন না! কি উপায়ে বৃক্ষের অল্পস্থানে অধিক পরিমাণে কীট জন্মাইতে পারে এবং লাক্ষা ও লাক্ষারস সংগ্রহের উপযুক্ত সময় ও প্রণালী, দেশ কাল ভেদে উহার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধন—এ সকল অতি অল্প আয়াসেই হইতে পারে। লাক্ষার বীজের আবশ্যক নাই, কেবল উপযুক্ত সময়ে লাক্ষা সংগ্রহ করিলেই সমগ্র ডিম্ব নষ্ট না করিয়া উহার দ্বারাই সুন্দর চাষ চলিতে পারে। যে যে কারণে লাক্ষাকীট বিনষ্ট হইতে পারে তাহার রীতিমত প্রতিকার করা, সারবান বৃক্ষে কীটের কৃত্রিম উপনিবেশ স্থাপিত করা, ইত্যাদি সামান্য দুই চারিটিবিষয় একটু লক্ষ্য করিলেই লাক্ষার উৎপত্তি সমধিক বৃদ্ধি হইতে পারে। ছোট নাগপুর, আসাম ইত্যাদি অঞ্চলে অনেক ভদ্র জমিদারের তালুকে এমন জঙ্গল বিস্তর আছে যাহাতে সুন্দর লাক্ষা জন্মাইতে পারা যায়। "উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহং উপেতি লক্ষ্মী :"।

লাক্ষার বাণিজ্যে গবর্ণমেণ্টের কিরূপ অভিমত তাহা নিম্নে উদ্ধৃত বিবরণী পড়িলে জ্ঞাত হইবে :—

"The position has to be faced that the cultivation of the product (lac) on scientific lines is not understood. But little advance has been made in the production of the substance since the days of Akbar, and the daily increasing demand for the product of which India is the chief producer, would seem to necessitate considerably more attention being paid to its collection than has been the case in the past, * * * * * money expended on this work will yield very large returns. [Extract from the official report of the Forest Department, Government of India 1908.]

ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর এখনও কি চক্ষু ফুটিবে না! একে একে আমাদের সকলইত গিয়াছে, এটাও যাইতে বসিয়াছে। এখনও উপায় আছে—কিছুকাল পরে আর থাকিবে না। "দৈব বলীয়ান্"! ১৯০৮ সালে ভারত গবর্ণমেণ্টের অরণ্য বিভাগের (Forest department) Mr. Stebbing লাক্ষার প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁহার পুস্তিকা দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে কতদূর ("attention") দৃষ্টি কিন্তু এখনও যদি আমরা উদাসীন থাকি তবে দোষ তাঁহাদের নয় আমাদেরই। তাঁহারা বলিতেছেন—তোমরা উন্নতি কর, উপায় উদ্ভাবন কর, টাকা লাগাও, উদ্যোগী হও অনেক লাভ হইবে। আমাদের নিশ্চেষ্টতা আর শোভা পায় না।"

লেখনী তত্ত্ব *

শ্রীদুর্গা চরণ মিত্র বি, এ লিখিত।

ভারতীয় লেখনীর ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে স্বতঃ আদীম লিখনের কথা উঠে। সে বহু বহু দিনের কথা। প্রাচীনেরা সাধারণতঃ তাল পত্রে কাঁটা সহযোগে দাগ করিয়া মনের কথা লিখিতেন। কেহ কেহ বা ঐ দাগের উপর মসী ঘসিয়া দিয়া অক্ষর বাহির করাইতেন। তালপত্র ব্যতীত কাগজেও লেখা চলিত এবং হিসাব নিকাশাদি অস্থায়ী সাময়িক লেখন জন্য কাষ্ঠ খণ্ডের উপর ধুলা ছড়াইয়া দিয়া যখন ধুলার একটি লেপ পড়িয়া যাইত তখন সাজারু কাঁটা দিয়া ঐ ধুলা ফলকে অঙ্কপাতাদি দ্বারা হিসাব নিকাশ করা হইত। তদ্ভিন্ন ভূর্জ্জপত্র ও মোটা কাপড়ের উপর লেখার প্রথাও প্রচলিত ছিল। এ ভারতবর্ষে অন্যান্য স্থানের খবর parchment ও papyrus বা চর্ম্মপত্রে লেখনের প্রথা প্রচলিত কখনও ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

তালপত্রে লেখার ব্যবস্থা দক্ষিন ভারতে সেদিন পর্য্যন্ত ছিল বলিলেও হয়। ভূর্জ্জপত্রের প্রচলন আর্য্যাবর্ত্তে খুব অধিক ছিল। মোগল বাদসাহ দিগের সময় হইতেই ভারতে কাগজ চলন আরম্ভ হয়।

আদিম কাগজ প্রথমতঃ চীনদেশে সম্ভবতঃ দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দ হইতে প্রচলিত হইয়াছিল। তারপর ঐ কাগজ প্রস্তুত প্রণালী ক্রমে চীন হইতে তুর্ক আরব ও পারস্য প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া যায়। ঐ সব দেশ হইতে মুসলমান গণ কর্ত্তৃক কাগজ ক্রমে ইউরোপে ও ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িয়াছে বুঝিতে হইবে। আকবর বাদসাহের সময় কাশ্মীরে ও তৎপরবর্ত্তী বাদসাহগণের ও মারহাট্টাগণের শাসনকালে পশ্চিম ভারতবর্ষে কাগজের বহুল প্রচার ঘটে; এবং ক্রমে সমগ্র ভারবর্ষে কাগজের ব্যবহার বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ম্মদেশে চীন হইতে কাগজ আমদানী হইয়া ব্যবহৃত হইতে থাকে।

'কাগজ' তত্ত্বের পর 'কলম' তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক; কারণ যে উপাদানের উপর লিখন কার্য্য চলিবে তাহার পরিবর্ত্তনে লেখনিরও পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। ভারতীয় লেখনী সাধারণতঃ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। (১) লোহার দাগিবার কাঁটা; (২) সাজারু কাঁটা; (৩) বাঁশ বা কঞ্চির কলম (৪) তাল জাতীয় বৃক্ষের ডালের মাজ হইতে উৎপন্ন কলম (৫) শর বা খাগ জাত কলম (৬) পক্ষীর পালক জাত কলম।

এতদ্ভিন্ন ভারতে যে সকল চানে আছে বিশেষতঃ কলিকাতা জৈন সমাজ তুলি সাহায্যে লেখন কার্য্য করিয়া থাকে।

প্রথম দুই জাতীয় লেখনী যথা লোহার কাঁটা ও সাজারু কাঁটা ইহারা বর্ত্তমান লেখনীর পূর্ব্ব পুরুষ। ইহাদের ডগা অবিভক্ত থাকিত ও নিজেরাও নিরেটত্ব গুণ বিনিষ্ট ছিল! লোহার কাঁটার নানা আকার দেখা যাইত। কোন কোনটার মাথায় লোহার সুপারিরমত একটা গোলা লাগান থাকিত। কোন কোনটার উপরভাগ লোহার ছুরীর মত চেপ্টা করা হইত তাহাতে তালপত্র কাটার কাজ চলিত। আবার কোন কোনটির

উপর ভাগ দুই দিকে চেপ্টা (বর্ত্তমান চিরুনীর মত) করা থাকিত।

এতদ্ভিন্ন একপ্রকার কাঁটা দেখা যাইত যাহার দুইটি শাখা (বর্ত্তমান কালের কম্পাসের মত) এবং এই জাতীয় কাঁটা সমান্তর রেখা টানিতে বা বৃত্ত আঁকিতে বিশেষ সাহায্য করিত। কোন কোন কাঁটার দুই দিকই ছুঁচল হইত এবং দুই দিক দিয়াই লেখা যাইতে পারিত।

এই সকল লোহার কাঁটা উড়িষ্যা মহলে ও মান্দ্রাজ দেশেই বিশেষ ব্যবহৃত হইতে দেখা যাইত।আজিও এই আদীম লেখনের নীতি কোন কোন প্রদেশে এক কালীন লোপ পায় নাই। কলিকাতা যাদুঘরে এই জাতীয় অনেক প্রকার কাঁটা রক্ষিত হইয়াছে।

সাজারুর কাঁটা সাজারুর গায়েই পাওয়া যায়। সাজারু মারিয়া ঐ কাঁটা সংগ্রহ হইয়া থাকে। সাজারু কাঁটা প্রধানতঃ ধুলি ফলকে অঙ্ক কশার জন্য ব্যবহৃত হইত (আজকাল যেমন শ্লেট পেন্সিল ব্যবহার হয় উহার ব্যবহারও তদ্রূপ।

বাঁশ হইতে সে সকল কলম পাওয়া যাইত তাহারা বংশজ, লোহার কাঁটার ন্যায় আদি কুলীন নহে। ঐ বংশজ কলম দ্বিবিধ। একপ্রকার বাখারি জাত ও দ্বিতীয় প্রকার বাঁশের শাখা—কঞ্চি জাত, ফাঁপা কঞ্চি হইতে প্রস্তুত হইত। এই দুই জাতীয় বংশজ কলমের অগ্রভাগ কাটিয়া বিভিন্ন করিয়া দেওয়া হইত তাহাতে কলমে, অক্ষরের স্থুল ও সুক্ষ্মত্বের বিকাশের সহায়তা জন্মিত। দেশী বংশজ কলমছাড়া আর এক প্রকার বৈদেশীক বংশজ কলম আমদানী হইত। দক্ষিণ ভারতবর্ষে ইহার প্রচলন। ইহা চৈনিক কলম বলিয়া অনেকের ধারণা। ইহার 'পাউ'(বা দুই গ্রন্থির মধ্যস্থ চোঙ অংশ) বড়ই লম্বা ও সোজা। ইহাতে আবার সাদাকালোর সংমিশ্রণে একটি নিরবচ্ছিন্ন দাগ কাটিয়া দেওয়া থাকিত। কোন কোন গুলির গায়ে মাঝে মাঝে গুলবাঘের মত ছাপকা তিলক করিয়া দিয়া শোভা বর্দ্ধন করা থাকিত। ইহা এখনও দক্ষিণ ভারতে আমদানী হইয়া থাকে। তবে বঙ্গদেশে বংশজ কলমের যেপ্রকার আদর বোধ হয় ভারতের কোন অংশে সেরূপ আদর নাই। বোধ হয় শর বা খাঁকজ লেখনী অনেকেই দেখিয়াছেন, বিশেষতঃ সরস্বতী পূজার সময় ঐ খাঁকজ কলম দোয়াতে দেওয়া পূজায় একটা অঙ্গ বিশেষ। শর, ঘাস জাতীয় এক প্রকার গাছ, মাঝ ফাঁপা অনেকটা কঞ্চির মত। খাঁক একটু কৃষ্ণাভ বা বেগুণী রঙের। ইহা পারস্যে অধিক পাওয়া যায় তথা হইতে ভারতবর্ষে অনীত হইয়াছে।

বাঙ্গলাদেশে সরের বা খাঁকের কলমের চলতি বড় বেশী আজকাল নাই। আসাম অঞ্চলে কিছু কিছু ব্যবহার আছে। মুসলমানেরা প্রধানতঃ এই জাতীয় কলমের পক্ষপাতী কেননা মসীলিপ্ত কর্কট পদ সঞ্চালন চিহ্ন বিনিন্দিত আরবী ও ফারসী লেখা ঐ জাতীয় কলমে বিশেষ সুলভে হইয়া থাকে।

এই বার পুচ্ছজ লেখনীর কথা। এই জাতীয় লেখনী প্রধানতঃ ময়ুর পুচ্ছজ। ইহাদের দুইটী রঙ; কপিল ও কৃষ্ণ। সাধারনতঃ কপিলরঙের পুচ্ছই দৃষ্ট হয় তবে কৃষ্ণবর্ণ পুচ্ছও দেখা যায়।

হংস পুচ্ছজ শ্বেত লেখনীর আদর বাঙ্গলায় ও আসামে অধিক। এগুলি ময়ুর পুচ্ছজ কলম হইতে অপেক্ষাকৃত কম হয় ও অল্পস্থায়ী। য়ুরোপী হাঁসের ডানা হইতেই এই পুচ্ছ সংগ্রহ হইয়া থাকে। এই পুচ্ছ প্রতি হংস হইতে দশটীর বেশী পাওয়া যায় না, যথা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাম ডানার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুচ্ছ। তৎপরে

ঐ ডানার প্রথমটি চতুর্থ ও পঞ্চমটী। তৎপরে দক্ষিণ ডানার দ্বিতীয় ও তৃতীয়টী তৎপরে সর্ব্বশেষ দক্ষিণ ডানার প্রথম, চতুর্থ, ও পঞ্চমটী। মোট এই দশটী পুচ্ছ। পুচ্ছগুলি সংগ্রহের পর উত্তপ্ত বালুকা সাহায্যে গরম করা হয় তৎপরে চাঁচিয়া ছুলিয়া লইলেই উত্তম পুচ্ছজ পেন তৈয়ার হইল।

হাঁস অপেক্ষা ময়ূরের ডানায় অধিক সংখ্যক পুচ্ছ থাকে। সচরাচর এক একটী ডানায় ৯টী ১০টী উত্তম কালো পুচ্ছ ও ৭।৮টী উত্তম কপিল পুচ্ছ থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে লেখন প্রণালীর যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আর সে দাগা কাঁটা, বংশজ, পুচ্ছজ কলমের দিন নাই। এখন নিব নানা ধাতু হইতে প্রস্তুত হইতেছে। এখন সত্যসত্যই সোণার দোত কলমের দিন হইয়া পড়িয়াছে। আর নিত্য কত ধাতু নির্ম্মিত নব নব ভাবের লেখনী না দেখা যাইতেছে। এখন একাধারে দোয়াত, কলম, পেন্সিল ও চিত্র আঁকিবার কম্পাস। এতদ্ভিন্ন লেখনের কলের তো (Type writer এর) ছড়াছড়ি, হয়ত ভবিষ্যতে ইচ্ছা শক্তিতেই লেখা হইবে, আর কাগজে কলম পিসিয়া বা কল ঠুকিয়া মরিতে হইবে না!!

সেকাল অপেক্ষা একালে পয়সা রোজগারের জন্য অনেক অধিক পরিশ্রম করিতে হয় সুতরাং উদ্যোগ আয়োজনও অনেক। এখন হাটে বাজারে চলিতে চলিতে লেখা পড়া করিতে হয়, ঘোড়ার গাড়ীতে রেলগাড়ীতে লিখিতে হয়। সেই জন্য উপায়ও হইয়াছে। ফাউণ্টেন পেনে একবার কালি দিলে অনেক দিন চলে। একটা পেন্সিলের মত কলম, পকেটে পকেটে ফেরে, কালি পড়ে না, সুন্দর লেখা হয়। অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা চিরদিনই হইয়া থাকে।

* (৭ পৃষ্ঠায় লেখনী তত্ত্ব) এগ্রিকালচারাল লেজার ১০৯৮ ০৭

বৈশাখ—১৩১৭।

নব বর্ষ।

বর্ত্তমান বৈশাখ মাসে কৃষক একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ হইলেও এখানে শিক্ষিত মধ্যবিৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষিচর্চ্চা অপেক্ষাকৃত অল্প। সুতরাং অন্যান্য দেশে "কৃষকের" ন্যায় পত্রিকার যত গ্রাহক হইত এতদ্দেশে সে পরিমাণ হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও একখানি বিশুদ্ধ কৃষি সম্বন্ধীয় পত্রিকা যে আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষার অবস্থায় দশ বৎসর কাটাইতে পারিয়াছে, তাহাও দেশীয় ব্যক্তিবর্গের কৃষি অনুরাগের পরিচায়ক। আমরা তজ্জন্য লেখক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহক বর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

কৃষক ভারতীয় কৃষি সমিতির মুখ পত্র। উক্ত সমিতির কার্য্য কলাপের সহিত ইহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। তজ্জন্য প্রথমেই আমরা সমিতির সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। অপরাপর বিষয়ে বিগত বৎসর সমিতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইলেও একটি বিষয়ে ইহা সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ

করিতেছি যে বিগত বৎসর পাথুরিয়াঘাটার দেশানুরাগী বিখ্যাত জমিদার, ভারতীয় কৃষি সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার ঘোষ পরলোক গমন করিয়াছেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার দীর্ঘ জীবনে দেশের যে অনেক উপকার হইত তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু

The world which credits what is done,
Is cold to all that might have been,

সুতরাং তাঁহার জীবনের অসম্পূর্ণ অধ্যায়ের আলোচনা করিয়া বিশেষ ফল নাই।

বিগত বর্ষে সমিতির পক্ষে আরও একটী দুঃখের কারণ ঘটিয়াছে এই যে, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উভয়কে কৃষি-বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইঁহারা বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগে সহকারী ডিরেক্টর ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে "কৃষকে" প্রবন্ধাদি লিখিয়া ও আমাদিগকে উপদেশ দান করিয়া সমিতির উন্নতি কল্পে বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

সমিতি সম্বন্ধীয় অপরাপর বিষয়ের মধ্যে পুস্তক প্রকাশ বিভাগের কার্য্যাদি বিশেষ রূপে উল্লেখ যোগ্য। যে সময় ভারতীয় কীটতত্ত্ববিৎ মিঃ ম্যাক্সওয়েল লিফ্রয়ের Indian Insect pests নামক পুস্তক প্রকাশিত হয় আমরা সে সময়ে তাহার সমালোচন উপলক্ষে বলিয়াছিলাম যে বাঙ্গলাতে এইরূপ একখানি পুস্তক একান্ত আবশ্যক। আমাদের পাঠকবর্গ শুনিয়া সুখী হইবেন যে মিঃ লিফ্রয়ের সহকারী শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র ঘোষ "ফসলের পোকা" নামক একটি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন এবং উহা সমিতির অফিস হইতে শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। পুস্তক খানিতে যথেষ্ট সংখ্যক চিত্রাদি আছে এবং উহা যে একটি অনেক দিনের অভাব মোচন করিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এস্থলে আরও উল্লেখ আবশ্যক যে "কৃষি রসায়ন" বিলাতী ও দেশীসব্জী চাষের নূতন সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে এবং শীঘ্রই এই দুই খানি অত্যাবশ্যকীয় পুস্তক প্রকাশিত হইবে।

বিগত বৎসর কৃষকে প্রধানতঃ যৌথ ঋণ দান সমিতি, গোপালন, পাট, পান, মৃত্তিকাতত্ত্ব, ফলচাষ, কীট তত্ত্ব, পক্ষী পালন ও মৎস্য চাষ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে আন্দোলন দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্তই প্রয়োজনীয়। এই সমুদয় আন্দোলন করিয়া যে কিছু ফল না হইয়াছে তাহা নহে। কারণ আমরা জানি যে কতিপয় ভদ্র ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিষয়সমূহের কোন কোনটিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু সাধারণের এই সকল বিষয় সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহ দেখিলে আমরা সুখী হইব। এতদ প্রসঙ্গে আমরা আরও জানাইতেছি যে বর্ত্তমান বৎসর হইতে আমাদিগের গ্রাহকগণের মধ্যে কেহ যদি কোন বিষয় বিশেষ সম্বন্ধে প্রবন্ধ কৃষকে প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই অভিমত সাদরে গৃহীত হইবে। কোন বিষয় প্রকাশ সম্বন্ধে এইরূপ যথেষ্ট সংখ্যক অনুরোধ পত্রিকা আসিলে আমরা উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিব। অবশ্য যে সমুদয় বিষয় সাধারণতঃ কৃষকে আলোচিত হয় তৎসমুদয় সম্বন্ধে কোন অনুরোধ পত্রিকা আবশ্যক হইবে না। যে সমুদয় সাধারণ আলোচনার ক্ষেত্রের বাহিরে সেই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

কৃষকে প্রতিমাসেই কতিপয় প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে। প্রশ্নকারীগণের প্রতি আমাদের অনুরোধ এই যে মৃত্তিকা, সার, উদ্ভিদ রোগ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্নের সহিত তাঁহারা যেন দুই সেট নমুনা পাঠাইয়া দেন। একটি সেট্ পরীক্ষার জন্য আবশ্যক হয় এবং অপর সেটটি সমিতির প্রস্তাবিত প্রদর্শনী গৃহে রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইবে।

ভারতীয় কৃষি সমিতি যে অনেক দিবস হইতে একটি প্রদর্শনী গৃহ স্থাপনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন তাহা বোধ হয় আমাদের অনেক পাঠকই অবগত আছেন। এই প্রদর্শনী গৃহে নানা স্থানের মৃত্তিকা, নানা দেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার সারও কৃষিযন্ত্র, নানা জাতীয় ছত্রক ও কীট দ্বারা আক্রান্ত উদ্ভিদ প্রভৃতি কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইবে। যাহাতে এই সঙ্কল্প সুচারু রূপে কার্য্যে পরিণত হয় আমরা তজ্জন্য আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহক বর্গকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করি। তাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত ইহা যে সম্পন্ন হইতে পারেনা তাহা বলাই বাহুল্য। এই প্রদর্শনী গৃহ ও একটি পুস্তকালয়ের জন্য স্বনাম ধন্য হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র ও বিখ্যাত ব্যবহারতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট সমিতি চিরদিন ঋণী।

সরকারী-কৃষিকার্য্য তালিকা।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৯০৯-১০ সালের জন্য নিম্নলিখিত জেলা সমূহে নিম্ন লিখিত কৃষিপরীক্ষা সমূহ অনুমোদিত হইয়াছে; ফসলে যে সার ব্যবহার করার জন্য বলা হইয়াছে সেই গুলি আমরা নিম্নে প্রকাশিত করিতেছি :—

১। বর্দ্ধমান বিভাগঃ—দাদখানি, বাদসা-ভোগ, মধ্যপ্রদেশ আউস, সমুদ্রবালি ও বাঁকচুর ধ্যান্যে গোবর সার ও হাড়ের গুঁড়া এবং সোরা; সারণ অরহরে ছাই; জৌনপুর ও স্থানীয় ভুট্টায় গোবর সার; বুড়ি কার্পাস; কাজলি ও খেড়ী ইক্ষুতে গোবর সার ও রেড়ীর খৈল; পাটনা ও নৈনিতাল আলুতে গোবর সার; সারণ জুয়ার, চিনাবাদামে গোবর সার, দেশওয়াল পাটে গোবর সার; সিংহল পেঁপে; মজঃফরনগর গোধুম, পাটনা ছোলাতে গোবর সার; রেড়ীর খৈল। বর্দ্ধমান বিভাগের বাঁকুড়া জেলায় বাঁকতুলসী, সমুদ্রবালি, দাদখানি, মধ্যপ্রদেশ আউস ও পেশওয়ারী স্বাতি ধান্যে গোবর সার; বুড়ি কার্পাস; চিনার বাদামে, সারণ অরহর ও সারণ জুয়ারে পলিমাটি,জৌনপুর ভুট্টায় গোবর সার, বরবটিতে গোবর সার, পাটনাই আলুতে গোবর সার ও সরিষারখৈল; ধঞ্চে।

২। প্রেসিডেন্সি বিভাগ খুলনা জেলায়ঃ—বিলাতীসব্জি, বুড়ী কার্পাস ও পাটনাই আলুতে গোবর সার; বোম্বাই ও দেশী পেঁয়াজে গোবর সার ও সরিষার খৈল; চিনার বাদাম। নদীয়া জেলায় কলায়ের সহিত পর্য্যায়ে হৈমন্তিক ধান্যের চাষ; রাসি বালাম, দুধ কলমা ও খুকরি আউস ধান্যের চাষ; গুঁড়ি কচু, আউসে বেগুন, বই

ও বাসর পাট চাষ। বিভাগীয় কৃষিসমিতির তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত পরীক্ষা গুলি সম্পাদন করার প্রস্তাব হইয়াছেঃ—হাড়ের গুঁড়া ও সোরার সাহায্যে মধ্যপ্রদেশ আউস, স্থানীয় আউস ও পাটনাই আমন ধান্যের গর্ত্ত প্রতি একটি চারা রোপণ করিয়া চাষ। পাটনাই আলুতে রেড়ীর খৈল। এতদ্ভিন্ন জৌনপুর ভুট্টা, চিনাবাদাম, মজঃফরপুর গোধূম, খাড়ি ইক্ষু ও শিমূল আলু চাষ।

পাটনা বিভাগঃ—পাটনা জেলায় অন্যান্য পরীক্ষাদির মধ্যে মধ্যপ্রদেশ আউস, বাদসাভোগ, কাঞ্চনচুর, কপিনশ্বর, সমুদ্রবালি, দাদখানি, সাপসন্দ বৈত্তরনী জাতীয় ধান্য; সাহাবাদ জেলায় মধ্যপ্রদেশ আউস, জাপানী কিংশু, দাদখানি, বাদসাভোগ, সমুদ্রবালি, বাঁকতুলসি; গয়া জেলায় আমন, আউস ও বাতাস; সারণ জেলায় মধ্যপ্রদেশ আউস, বাদসাভোগ, বালাম, মজঃফরপুরে বাঁশমতি, কেলে আউস, নাগরা, দাদখানি, বেনাফুলি, বাঁক তুলসি, অর্জ্জুনশাল ও মহারাজা জাতীয় ধান্য, দ্বারবঙ্গে মধ্যপ্রদেশ আউস, দাদখানি বালাম, ও সমুদ্রবালি জাতীয় ধান্য চাষ হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে।

ভাগলপুর বিভাগঃ—ভাগলপুর জেলায় মহারাজা, মধ্যপ্রদেশ আউস, দাদখানি ও হৈমন্তিক ধান্যের চাষই পরীক্ষা সমূহের মধ্যে অন্যতম। এতদ্ভিন্ন গোবর সারে ভুট্টা, সরিষা, অরহর, জোয়ার ও ইক্ষু প্রভৃতিও উৎপাদিত হইবে।

উড়িষ্যা বিভাগঃ—ধান্য সম্বন্ধীয় পরীক্ষার মধ্যে কটক জেলায় মধ্যপ্রদেশ আউস, দাদখানি বাদসাভোগ, খাসাগুঁড়ি, বেনেভোগ; বালেশ্বর জেলায় হৈমন্তিক ধান্য, আঙ্গুলে, বাদসাভোগ, দাদখানি, মধ্যপ্রদেশ আউস, পুরী জেলায় আউস জাতীয় ধান্য উৎপাদিত হইবে। ধান্য ব্যতিরেকে উড়িষ্যা বিভাগে নিম্ন লিখিত এক একটি ফসলও পরিক্ষীত হইবেঃ—চিনার বাদাম, ভুট্টা, পাট, ইক্ষু, পাটনা, নৈনিতাল, চেরাপুঞ্জি ও স্থানীয় আলু, রেড়ী, গোধূম, যব, রাঙ্গাআলু, দেশী মটর, ধারওয়ার ও বুড়ী কার্পাস, ফুলকপি, ছোলা, সোনা মুগ, উরিদ ও বরবটি।

ছোটনাগপুর বিভাগঃ—এই বিভাগের ছোটনাগপুর, হাজারিবাগ, পালামৌ, মানভুম ও রাঁচি জেলায় নিম্ন লিখিত ফসল সমূহ উৎপাদিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।—মধ্যপ্রদেশ আউস, দাদখানি, বাদসাভোগ ধান্য, ভুট্টা, পশুখাদ্য জোয়ার, সিমুল আলু; ইক্ষু; গবাদির জন্য শুষ্ক তৃণ, নৈনিতাল, পাটনা, শ্রীহট্ট জাতীয় আলু, চিনার বাদাম, বুড়ী কার্পাস, কলা, নারিকেল, খেজুর, আনারস, পেঁপে ও আম্র প্রভৃতি ফলের চাষ। যই, সরিষা, ইক্ষু, খেঁসারি, ফুল ও বাঁধাকপি পাটনাই পেঁয়াজ ও পাট।

মৎসের বয়স।—সুবিখ্যাত মৎস্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত প্রোফেসর হার্ডমান রয়েল ইনষ্টিটিউসনে বক্তৃতা করিবার সময় বলিয়াছেন যে মৎসের বয়স নির্ণয় করিতে হইলে আঁইসের উপর কতক গুলি রেখার দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায়। হাতের উপর রেখাও বয়স নির্ণয়ের অন্যতম উপায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হেরিঙ মৎস্যের আঁইসের উপর বার্ষির রেখা সমূহের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পঞ্জাব প্রদর্শনী।—পঞ্জাব প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষগণ গবর্ণমেণ্ট প্রদর্শনী গৃহ ক্রয় করিতে সম্মত আছেন কিনা জানিতে চাহিয়াছেন। লাহোরের ডিপুটি কমিসনার উক্ত বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়।—১৯১১ সালের বিশ্বেশ্বর মিত্র পদকের আলোচ্য বিষয়ঃ—'ভারতবর্ষে বানিজ্য ও শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ'। পদক প্রার্থী স্বয়ং যে বিষয় মনোনীত করিতে ইচ্ছা করেন সেই বিষয়ে বিশেষ রূপে লিখিতে পারেন। প্রবন্ধ সমূহ ১লা অক্টোবরের পূর্ব্বে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট পৌঁছান আবশ্যক।

তামাকের আমদানি।—নূতন শুল্ক আইন দ্বারা বিলাতী চুরুট তামাক প্রভৃতির উপর শুল্কের হার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অনেকে জানেন। ইহার ফল কিন্তু এখনও বিশেষ রূপে প্রকাশ পায় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মার্চ্চ মাসের হিসাব উল্লেখ করিতে পারা যায়। উক্ত মাসে ৬২ কোটি সিগারেট খালাস হইয়াছে এবং ৩৯২ কোটী সিগারেট গুদামে আছে। গুদাম জাত অনেক সিগারেট সম্ভবতঃ চীনে যাইবে। তথায় ঐ সমুদয় নগদ মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন তামাকের উপর শুল্কের ফলে যে সমুদয় কোম্পানির বিশেষ ক্ষতি হইতেছে তাঁহারা হয়ত তামাকের কুঠি খুলিতে পারেন।

রেলওয়ে কর্ম্মচারি।—১৯০৭ সালের শেষে ভারতবর্ষের সমুদয় রেলে মোট ৫১৬,৭৫৬ জন কর্ম্মচারি ছিলেন, তন্মধ্যে ৭১৮০ জন ইউরোপীয়, ৯৯৮০ জন ইউরেসিয়ান এবং ৪৯৯৫৯৪ জন ভারতবর্ষীয়, এই সম্বন্ধীয় একটি হিসাব দৃষ্টে বোধহয় যে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ সংখ্যক কর্ম্মচারী ছিল উক্ত সময় অন্তে তাহার তিনগুণ হইয়াছে। ১৮৮৩ সালে সকল জাতীয় কর্ম্মচারীর মোট সংখ্যা ছিল ১৮৫২৬১। তন্মধ্যে ৩৯৯৫ জন ইউরোপীয়, ৩০৭৯ ইউরেসিয়ান ও ১৭৭২৮৭ জন ভারতবর্ষীয়। সুতরাং রেলওয়ে সমূহে যে কেবল ক্ষতি হয় তাহা নহে। এতদ্দ্বারা কতকগুলি ব্যক্তির অন্ন সংস্থানও হইয়া থাকে।

মহাকালী পাঠশালা।—আমাদিগের শ্রদ্ধেয় পরলোকগত পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার ঘোষের বিধবা পত্নী শ্রীমতী চারু বালা দাসী মহাকালী পাঠশালার গৃহ নির্ম্মান তহবিলে ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই অর্থ দ্বারা পাঠশালার একটি ঘর তৈয়ারী হইবে ও তাহাতে দাতৃর নামাঙ্কিত একখণ্ড শিলালিপি থাকিবে। আজ কালকার দিনে সৎবিষয়ে এরূপ বদান্যতা কমই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা আশাকরি দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ শ্রীমতী চারু বালা দাসীর দৃষ্টান্ত অনুসরণে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

মার্কিন কৃষি।—মার্কিন যুক্ত রাজ্যের কৃষি বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী কয়েক সহস্র আম্র বীজ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। মার্কিন কৃষি বিভাগ ইতিপূর্ব্বে বহুসংখ্যক ভারতবর্ষীয় উৎকৃষ্ট আম্রের চারা ওয়েষ্টইণ্ডিজ ও ফ্লোরিডা দেশে বিতরণ করিয়াছেন। উক্ত আম্রের ফল দেখিয়া আজ কাল অনেকেই আম্র চাষের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা শুদ্ধ কলম লইয়াও সন্তুষ্ট নহেন। এক্ষণে সমধিক পরিমাণে বীজ হইতে চারা তৈয়ারী করিয়া ঐ চারা দ্বারা আম্রের আরও উন্নতি সাধন করিতে পারা যায় কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমাদের দেশে ফল চাষের উপর যেরূপ বীতশ্রদ্ধা দেখা যায় তাহাতে আমাদের ভয় হয় যে কালে আম্রের জন্য আমাদিগকে মার্কিনের মুখাপেক্ষী না হইতে হয়।

খাদ্য দ্রব্যের মহার্ঘতা।—সুপ্রসিদ্ধ রাজকীয় কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত অর্থ সচিব কর্ত্তৃক যে খাদ্য দ্রব্যের মহার্ঘতার কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। এই অনুসন্ধানে দত্ত মহাশয়ের অনেক দিবস কাটিয়া যাইবে প্রথমতঃ সাধারণ কারণ সম্বন্ধেই অনুসন্ধান চলিবে এবং অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য সমস্ত দেশকে কয়েকটি কেন্দ্রে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইবে। প্রত্যেক কেন্দ্রে যাহাতে সঠিক ও সবিশেষ খবর পাওয়া যায় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট ইতি মধ্যেই অনেক ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মান্দ্রাজে কৃষি পরীক্ষা।—মান্দ্রাজে অনেক ধান্য ক্ষেত্রে প্রতি গর্ত্তে একটা হিসাবে বীজধান রোপণ করিয়া পরীক্ষা করা হইতেছে; তিনিভেলী জেলায় লাঙ্গলদ্বারা জুলী কাটিয়া তাহাতে তুলা বীজ বপন করিয়া দেখা হইতেছে এবং চাষের কেন্দ্র সমূহে লোহার আখমাড়া কলের প্রচলন হইয়াছে।

যুক্ত প্রদেশে কৃষি।—মিরাট পরীক্ষা ক্ষেত্রে জৈ চাষের, আগ্রার সন্নিকটস্থ ক্ষেত্রে মজঃফরনগর গমের, বুন্দেলখণ্ডে জালান ক্ষেত্রে মাটাবাদাম চাষের এবং প্রতাপগড়ে উন্নত প্রণালীতে ইক্ষু চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে।

পঞ্জাবে কৃষি উন্নতি।—এখানে লায়ালপুর এবং হিসার এই দুই স্থানে দুইটী সমিতি আছে। প্রথমটি উপনিবেশিক গণের দ্বারা গঠিত। তাঁহাদের চেষ্টায় ভাল গম, ভাল এমেরিকান তুলা চাষ হইতেছে। ঘোড়ায় টানা লাঙ্গল, ক্ষেতের ফসল উঠাইবার যন্ত্র (Reapers) এবং শস্য বাছাই ঝাড়াই করিবার যন্ত্র, তাঁহাদের সাহায্যে এতদঞ্চলে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। লোকের দ্বারা হাতে করিতে গেলে যে পরিশ্রম হইত তদপেক্ষা অনেক কম পরিশ্রম, কম খরচে কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

হিসার সমিতি পশু পালনের সুবন্দোবস্তে নিযুক্ত আছেন। হিসার ষণ্ড বিখ্যাত। তথায় উষ্ট্রও প্রতিপালিত হয়। পশুবলও কৃষির প্রধান বল।

আসামও পূর্ব্ববঙ্গে কৃষির উন্নতি চেষ্টা।—এখানেও বঙ্গদেশের ন্যায় স্থানে স্থানে কৃষি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্দেশ অপেক্ষা তথাকার কৃষি সমিতি অনেকটা কার্য্যকরী বলিতে হইবে। উক্ত সমিতি তথায় কৃষি কার্য্যামোদী ব্যক্তিবর্গের সহিত সর্ব্বদাই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতাইতে

ব্যগ্র এবং সময়ে তাহাদিগকে বীজ ও যন্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করেন। তাঁহাদের চেষ্টায় পোকার উপদ্রব নিবারণের জন্য খাসিয়া পাহাড়ে এখন অনেকে আলুর জমিতে আরোক ছিটায়। সমতল ভূমিতে যে সকল ধান্য ক্ষেত্র আছে তাহার চাষীগণ ধানে হাড়ের গুঁড়া ও সোরা সার দিতেছে।

সেচন জলে ধান চাষ।—ছত্রিশগড় পরগণায় সেচন জলের সাহায্যে ধান কেবল বুনানি না করিয়া রোপণের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং যাহাতে আশু ও জলদি জাতীয় আমনের পর সেই জমিতেই অন্য ফসল উৎপন্ন করা যায় তাহার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

উল্টা পাখা লাঙ্গল।—দেশী লাঙ্গলে মাটী ঠিক উল্টায় না। কিন্তু বিলাতি উল্টা পাখা লাঙ্গলে মাটি উল্টাইবার কার্য্য ভাল হয়। র‍্যাংসোমস্-লাঙ্গল (Ransome's Turnwrest plough) খুব ভাল। মধ্যপ্রদেশ এবং বেরারে কাঁস নামক এক প্রকার ঘাস জন্মে। উক্ত লাঙ্গল সাহায্যে এই সকল ঘাসের জমি চষিবার চেষ্টা হইতেছে।

কুসুম বীজের খৈল।—মধ্য প্রদেশে ইক্ষু ক্ষেত্রে অন্য খৈলের পরিবর্ত্তে কুসুম বীজের খৈল (Safflower cake) ব্যবহার করা হইতেছে।

বোম্বাই কৃষি-সমিতি।—রাজ পুরুষগণের সাহায্যে এই সমিতির দিন দিন উন্নতি হইতেছে। এখানে মহারাষ্ট্র প্রদেশে ব্রোচ তুলা চাষ বেশ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ধারওয়ার ও এমেরিকান তুলা বীজ আনাইয়াও পরীক্ষা হইতেছে। এখানে শস্য গোলা স্থাপিত হইয়াছে। হলবাহী বলদাদিরও উন্নতি দেখা যাইতেছে এবং নূতন কৃষি যন্ত্রে, নূতন নূতন শস্য উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। বাঙ্গলা দেশেও প্রাদেশিক কৃষি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, তথায় ৬টী বিভাগীয় সমিতি ও প্রতি জেলায় এক একটি কৃষি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল সমিতি প্রায় অধিকাংশই সরকারী লোকের দ্বারা গঠিত। সভ্যগণের মধ্যে অনেকেই জমিদার এবং উকিল। সভায় প্রায়ই ইংরাজীতে, বাদানুবাদ এবং কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। পরীক্ষাদি কার্য্যের ফল অধিকাংশই স্ব স্ব ক্ষেত্র মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। ইহাতে সাধারণের কি উপকার দর্শিতে পারে!

পৃথিবীর শস্য সংবাদ।—শস্য ব্যবসায় সংবাদ (Corn Trade News) নামক পত্রিকায় বিগত ৫ই এপ্রিল (১৯১০) তারিখে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে;—

এমেরিকা যুক্তপ্রদেশে গমের ফসলে বৃষ্টি পাইয়াছে, কানসাসে পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি হয় নাই। তুষার পাত ও অন্য কারণে অনেক জমিতে গমের আবাদ হইয়া উঠে নাই। বিগত বর্ষে শতকরা ৯২·৮ অংশ ফসল জন্মিয়াছিল, বর্ত্তমান বর্ষে অনুমান ৮১·৩ অংশ মাত্র দাঁড়াইবে।

বাসন্তি গমের আবাদ অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছে, সুফসলও জন্মিবে। কানাডায় এবার মধুর বসন্ত, চাষ আবাদ ভাল চলিতেছে। অর্জেন্টিনায় এখনও ১৬,০০,০০০ মণ গম মজুত; বিগত বর্ষে এমন দিনে প্রায় ১৭৷৷০ লক্ষ মণ গম মজুত ছিল। অষ্ট্রেলিয়ায় গমের চালান কমিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে তৈলশস্য ও গম প্রচুর জন্মিয়াছে। ক্রেতা গণ চুপ চাপ বসিয়া আছেন। রসিয়ায় সুবৃষ্টি হইয়াছে। হৈমন্তিক ও বাসন্তি চাষের অনুকুল অবস্থা সুচিত হইতেছে। রোমানিয়ায়ও সুবৃষ্টি হইয়াছে চাষের অবস্থা ভাল।

তুরস্ক ও বুলগেরিয়ায় সুবৃষ্টি ও সুচাষ বসিয়াছে। অষ্ট্রীয়াহঙ্গেরিতে তুষারপাতের পর ভালরূপ বারিবর্ষণ হইয়াছে। ইটালিতে তুষার পতনের মাত্রা কিছু অধিক, তথাপি বিশেষ শস্যহানি হয় নাই। স্পেনে বৃষ্টি ও তুষার পাতের পর শস্যের অবস্থা এখন কতকটা ভাল দাঁড়াইয়াছে। ফ্রান্সে আবহাওয়া চাষের অনুকূল নহে, চারি দিকে শস্য নষ্ট সংবাদ আসিতেছে। জর্ম্মানিতে এবার শীতের প্রকোপ খুব বেশী, শস্যহানির আশঙ্কা হইতেছে। উত্তর আফ্রিকায় আরও বৃষ্টি হইয়াছে, চাষ আবাদ ভালরূপ হইতেছে।

ভারত অরণ্যে সেগুণ কাষ্ঠ।—আগে জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিবার একটা বাঁধাধরা নিয়ম ছিলনা সেই জন্য ভালমন্দ সকল রকমের কাঠই কাটা পড়িত এবং রপ্তানিও অধিকছিল। এখন তাহা হয় না, সেই জন্য রপ্তানি কমিয়াছে। কিন্তু দাম সিকি বাড়িয়া গিয়াছে। গত বর্ষে ৩০.২ লক্ষ টাকার সেগুণ কাট রপ্তানি হইয়াছে তৎপূর্ব্ব বর্ষে রপ্তানি কাঠের মূল্য ৬১.৩২ লক্ষ টাকা। প্রকৃত ভারতীয় সেগুণ এখন খুব কমই রপ্তানি হইতেছে। যাহা বিদেশী বাজারে ভারতীয় সেগুণ বলিয়া খ্যাত তাহা অধিকাংশ ব্রহ্মদেশের জঙ্গলের। গত বর্ষ হইতে রপ্তানি ৪০.২ লক্ষ টাকা কাঠের মধ্যে ব্রহ্মদেশের কাঠ ৩৮.৩৮ লক্ষ টাকার ছিল। ভারতের অরণ্যে যদৃচ্ছাক্রমে কাট কাটিতে না দেওয়ায় ভবিষ্যতে আয়ের মাত্রা বাড়িবে ব্যতীত কমিবে না।

পত্রাদি।

জামালপুর, ময়মনসিংহ।

গাব এক প্রকার গাছের ফল।—মাঝিরা জাল ও নৌকায় প্রথমে গাবের কস না দিয়া উহা জলে নামায় না এবং বৎসরে দুইবার করিয়া এইরূপ কস দেওয়া স্বভাব সিদ্ধ। এই গাব শতকরা ৵৹ আনা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু এই গাবের চাষে ব্যয় কিছুই নাই। শুধু বিক্রয় করিতে যাহা কিছু ব্যয় হয়। যাহার বাড়ীতে একটা গাব গাছ আছে গাব ধরিলে ও উচ্চদরে বিক্রয় করিতে পারিলে এক গাছেই ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই গাবের এক মাত্র শত্রু বেরী পোকা, পাটের গাছে যে প্রকার পোকা লাগে ঠিক সেই জাতীয় পোকায় মুকুলিত গাব গাছের সর্ব্বনাশ করে। নূতন পত্র সহ সমস্ত ফুল খাইয়া কৃষকের মহা অনিষ্ট করিয়া থাকে। আমাদের বাড়ীতেই পঁচিশটা গাবগাছ বর্ত্তমান। আশানুরূপ দর হইলে ও প্রচুর পরিমাণে গাব হইলে বৎসরে প্রায় ৩০০৲ টাকা আয় হইতে পারে। কিন্তু এই সর্ব্বনেশে পোকার উপদ্রবে গাব ধরানই অসম্ভব। এবার পোকায় গাব গাছের যে ক্ষতি করিয়াছে তাহাতে এবৎসর গাব যে দুর্ম্মূল্য হইবে তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের গ্রামেই বোধ হয় এক সহস্রের অধিক গাব গাছ আছে। বহুদূরবর্ত্তী স্থানের লোকেরা এখান হইতে গাব লইয়া যায়! যদি গাব গাছ এই শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষার কোন প্রতিকার সম্ভবপর হয় তবে জানাইলে কৃষকদের মহৎ উপকার হইবে বলিয়া আশা করি। ইতি—

শ্রীমোহাম্মদ আজম আলী।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

বঙ্গদেশের আবহাওয়া ও শস্যের অবস্থা। বৈশাখের প্রথমেই সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইয়াছে কেবল ছোট নাগপুরে আদৌ বর্ষণ হয় নাই, সাঁওতাল পরগণা ও বিহারে যৎসামান্য হইয়াছে। মেদিনীপুর নদীয়া যশোহর ও মুর্শীদাবাদে আরও বৃষ্টির আবশ্যক হইতেছে। ভাদুই ফসলের জন্য জমি চষা খোঁড়া হইতেছে। কোথাও কোথাও এখনও আখ বসান হইতেছে। বৃষ্টির অভাবে সাঁওতাল পরগণায় আখের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। হাওড়া, ২৪ পরগণা, ও খুলনার স্থানে স্থানে শীলাবৃষ্টি হইয়াছে তন্মধ্যে অঙ্গুলে অত্যধিক; ভাগলপুরে শীলা পাতে ফসল নষ্ট হইয়াছে। যশোহর, মুঙ্গের, পুর্ণিয়া ও বালেশ্বরে চাউলের দর কিছু কমিয়াছে কিন্তু অন্যত্র চড়িয়াছে।

যুক্ত প্রদেশে শস্যের অবস্থা। হিমালয়ের উপত্যকা প্রদেশ সমূহে সামান্য বারিপাত হইয়াছে। বাসন্তী ফসল ঝাড়া মাড়া চলিতেছে। আখ ও অন্যান্য ফসলে জল সেচন করিতে হইতেছে, ফসলের অবস্থা ভাল। শারদীয় শস্যের জন্য জমি তৈয়ারি করা হইতেছে। আফিম সংগ্রহ হইয়া গিয়াছে এবং ওজনাদি হইতেছে। কোথাও কোথাও পশুরোগের কথা শুনা গেলেও মোটের উপর গবাদি পশুর অবস্থা ভাল। তাহাদের জন্য খাদ্য জলের অভাব হয় নাই, খাদ্য শস্যের দাম অনেক স্থানে কমিয়াছে, কোথাও বাড়িয়াছে।

বঙ্গদেশে তৈলশস্য।—১৯০৯-১০ বর্ত্তমান বর্ষে তৈলশস্যের চাষের জমির পরিমাণ ১,৮১৬,৩০০ একর, বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ১,৫৫৭,৯০০ একর মাত্র। গমের ন্যায় তৈল শস্যের বুনানির সময় সুবৃষ্টি হওয়ায় অপেক্ষাকৃত অধিক জমিতে তৈল শস্যের আবাদ হইয়াছে। হুগলী, সারণ ও মুঙ্গেরে পোকার উপদ্রবে কিছু ক্ষতি হইয়াছে, বিহারে তৈল শস্যের অবস্থা খুব ভাল বলিতে হইবে, অন্যান্য স্থানে মোটের উপর মন্দ নহে।

পঞ্জাবে তৈল শস্য।—১৯১০ পঞ্জাবে ২০টী জেলায় তৈল শস্যের আবাদ হয়। এ বৎসর মোট আবাদী জমির পরিমাণ ১,১৬১,৯০০ একর, বিগত বর্ষ অপেক্ষা ২৭,১০০ একর অধিক।

বঙ্গদেশে গমের আবাদ।—১৯০৯-১০ অন্য বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর গম চাষের অবস্থা ভাল এবং অপেক্ষাকৃত অধিক জমিতে গম চাষ হইয়াছে। গম বুনানির সময় সুবৃষ্টি হওয়া গমের জমির পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ বলিতে হইবে। অনুমান এ বৎসর ১,৪১২,৭০০ একর পরিমাণ জমিতে গম চাষ হইয়াছে, বিগত বর্ষে ১,২৫৫,২০০ একর পরিমাণ জমিতে গমের আবাদ হইয়াছিল এবং অনুমান হয় ষোল আনা না হউক পনর আনা গমের ফসল পাওয়া যাইবে।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে হৈমন্তিক ধান্য।—১৯০৯-১০ এই বৎসরে হৈমন্তিক ধান্য চাষের পক্ষে আবহাওয়া বিশেষ রূপ অনুকূল ছিল এবং লক্ষ্মীপুর, শিবসাগর, মালদা এবং ঢাকা ও রাজসাহীর স্থানে স্থানে আশাতীত ধান জন্মিয়াছে; অনেক স্থলে ষোল আনার উপর ফসল জন্মিয়াছে। এ বৎসর ধান্য চাষের জমির পরিমাণ ১১,৭৭৫,৬০০ একর, বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ১১,০৪৮,৪০০ একর। একর প্রতি ১১৷৹ হন্দর ধান জন্মিয়াছে ধরিয়া লইলে ১২৩,০৫৫,০০ হন্দর ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে বিগত বর্ষ অপেক্ষা ৪৩ ভাগ অধিক ধান উৎপন্ন হইয়াছে।

তামাকের শুল্ক।—ভারতে আমদানী তামাকের উপর শুল্ক বসিয়াছে। তাহাতে নাকি ইতিমধ্যেই লণ্ডনের বড় একটা তামাকের কারখানায় ৬০১৭০ জন এবং লিভারপুলে একটা কারখানায় ৩০০ জন শ্রমজীবির চাকরি গিয়াছে। ইহাতে সহজে অনুমান হয় যে কত টাকার সিগারেট, তামাক এদেশে আসিত।

অহিফেনের মূল্য বৃদ্ধি।—বজেটে অহিফেনের মজুত বাক্সের যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তদপেক্ষা মূল্য অনেক চড়িয়াছে। যে অহিফেনের বাক্স ১৩০০ টাকায় বিকাইত তাহারই মূল্য প্রায় চারি হাজার টাকা হইয়াছে। এক মাসের বিক্রয়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট সাড়ে আটষটি লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন এক বৎসরে অনুমান আট কোটি টাকা লাভ হইবে। হিতবাদী—

"জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে লবণ করটা একেবারে উঠাইয়া দিতে পারা যায় না কি"?

তুলায় টান।—গত সন অপেক্ষা এবারে ৫০ লক্ষ মণ তুলা কম জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে মার্কিনের তুলা ইংলণ্ডে যাইত, এখন ইংলণ্ডের তুলা মার্কিনে যাইতেছে। কাজেই ভারতের তুলাও বিলাতে রপ্তানি হইতেছে। শুনা যাইতেছে তুলা অভাবে বোম্বাইয়ের প্রায় সমস্ত কলই সপ্তাহে দুই তিন দিন বন্ধ থাকিতেছে।

গো-মড়ক।—আজ প্রায় এক মাস যাবৎ সুনামগঞ্জ-জগন্নাথপুরে ভীষণ গো-মড়ক উপস্থিত হইয়াছে। জগন্নাথপুর এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে এপর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ ছয় শতের উপর ছোট বড় গরু মারা গিয়াছে। গরুই কৃষক দিগের একমাত্র সম্পত্তি। বিশেষতঃ এখন আমন জমিতে চাষ করিবার সময় উপস্থিত। এই সময় কৃষকগণকে গুরুতর পরিশ্রম স্বীকার ও রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় করিয়াও আগামী বৎসরের খাদ্যের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। লোকেল-বোর্ড হইতে বৃত্তি দিয়া স্থানে স্থানে ছাত্রগণকে পশু চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের সম্যক উপকার হইতেছে না বলিয়া বোধ হয়।

আজ কয়দিন যাবৎ এদিকে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইতেছে। রোরোধান্তের অবস্থা একরূপ ভালই দেখা যাইতেছে, কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে, জলে অনেক ধান্য নষ্ট হইয়া যাইবে। কারণ নদী-নালায় জল খুব বাড়িতেছে।

সার-সংগ্রহ।

ভারতে শণের চাষ।—আজমীর, মাড়বার ও কুর্গে শণের চাষ আদৌ হয় না। বঙ্গদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং বেরারে মেস্তাপাট (Hibisens Canabinus) ও শণ হেম্প (Crotolana Juncea) এই দুই প্রকার শণের চাষই হয়। মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম ও বঙ্গদেশে দেশী শণ ভিন্ন (Crotolana Juncea) কিছুই হয়না। এতদ্ব্যতীত যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোন্ শণের কি পরিমাণ চাষ হয় তাহার স্থিরতা নাই। পাবনা জেলায় আবার দুই রকম শণের চাষ হয়, বোরাণ ও ছোটনা। আঁস বা সুতার নিমিত্ত বোরাণ চাষ করে। ছোটনা বুনিয়া গাছ বাহির হইলে জমিতে লাঙ্গল মই পাড়িয়া চষিয়া অথবা গাছ শুকাইবার পূর্ব্বে কাটিয়া জমিতে ফেলিয়া রাখিলে

জমিতে সবুজ সার প্রয়োগের কার্য্য করে। পাবনা জেলার সেরাজগঞ্জ অঞ্চলেই প্রধাণতঃ শণ জন্মিয়া থাকে, তথায় প্রায় ৮০,০০০ বিঘা জমিতে শণের চাষ হয়; উৎপন্ন শণের পরিমাণ প্রায় ৫,০০০ টন।

জাপানে কৃষি উন্নতি।—জাপান গবর্ণমেণ্ট উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট। জাপানে প্রায় প্রতি পল্লিতে পল্লিতে কৃষি সমিতি আছে, সেই সমিতিই স্থানীয় চাষাবাদের সকল নিয়মাদি স্থির করেন। কৃষি কার্য্যের সুবিধার্থ কৃষিব্যাঙ্ক ও ঋণ দান সমিতিও অনেক স্থাপিত হইয়াছে। জাপান গবর্ণমেণ্ট জাপানী চাষীদিগকে স্থানীয় সমিতির মতানুসারে কার্য্য করিতে পরামর্শ দেন। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়া চাষীদের জমি অদল বদল করিয়া দেন। তাহাতে কোন চাষীর কোন একটা জমিতে নিজস্ব সত্ব থাকে না, সব জমিতে তাহার সমান যত্ন হয়। এই কারণে জমিতে বেড়া দেওয়া ও জমিতে চাষের কার্য্য তদারকের বড় আবশ্যক হয় না। কৃষি শিক্ষার জন্য তথায় বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তথায় উন্নত প্রণালীর কৃষিতত্ত্বের আলোচনা হয়। চাষীদের ও তাহাদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় আছে ও গ্রামে স্থানীয় কৃষিবিদ্যা ও পদ্ধতি আলোচনার জন্য বন্দোবস্ত আছে, সুতরাং জাপানীরা নির্ব্বিবাদে প্রচুর শস্যের সত্বাধিকারী হয়।

বিক্রয়ের জন্য হলুদ প্রস্তুত।—আমাদের দেশের অনেক চাষী এমন অলস স্বভাব যে হলুদ গুলি ক্ষেত হইতে তুলিয়া সিদ্ধ শুষ্ক করিয়া বাজারে পাঠাইবার জন্য কষ্ট স্বীকার করে না। ক্ষেত হইতে তুলিয়াই সস্তাদরে বেচিয়া ফেলে। সিদ্ধ শুষ্ক করিলে নিশ্চয় অধিক লাভ হয় এবং দূরবর্ত্তী বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয়ের সুবিধা হয়। অনেকে আবার কি প্রকারে বাজারের জন্য হলুদ তৈয়ারি করিতে হয় তাহা ভাল রূপ জানে না। অনেক জায়গায় ইক্ষুর সঙ্গেই হলুদ করা হয়। সেখানে হলুদ সিদ্ধ করিবার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিবার আবশ্যক হয় না। আখের রস জ্বাল দিবার কটাহে হলুদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে। আখ মাড়া হইয়া গেলে শুষ্ক ইক্ষু দণ্ড গুলি জ্বালানি কাঠের কাজ করে। হলুদ ক্ষেত হইতে তুলিয়া তাহার মধ্য মূল গুলি পুনরায় চাষের জন্য রাখিয়া দিতে হয়। অন্য মূল হইতে মাটি ও ছোট ছোট শিকড়াদি পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। তৎপরে জলপূর্ণ কটাহটী জ্বালে চড়াইয়া তাহার ভিতর আখের ও হলুদের পাতা ফেলিয়া দিয়া পরে হলুদগুলি দিয়া উপরে আবার আখ ও হলুদ পাতা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহার উপর গোময় লেপ দিয়া ধীর জ্বালে সিদ্ধ করিতে হয়। কটাহ প্রায় জলে পরিপূর্ণ থাকিবে। বাষ্প যাহাতে সহজে বাহির হইতে না পারে সেই জন্য এত পাতা ও গোময় আচ্ছাদন দিবার আবশ্যক। তিন চারি ঘণ্টা অল্প অল্প জ্বালে সিদ্ধ করিয়া পরে অল্পে অল্পে ঠাণ্ডা হইলে হলুদ গুলি কড়াই হইতে বাহির করিয়া উত্তম রূপে শুখাইয়া লইতে হইবে। শুখাইবার সময় শিশির কিম্বা বৃষ্টি পাইলে হলুদের রঙ খারাপ হইয়া যায়। এখনও কার্য্য শেষ হইল না। অতঃপর চটের উপর বা অসমতল পাথরের মেজেতে ঘষিলে তবে হলুদ গুলি দেখিতে পরিষ্কার হয় এবং রঙ পাকা হলুদের মত দাঁড়ায়। এত করিলে তবে সেই হলুদ বাজারে দরে বিক্রয় হয়। ২৪ পরগণার অনেক চাষী গোময় জলে হলুদ সিদ্ধ করিয়া থাকে সেটা কিন্তু যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

ধূমবিহীন কয়লা।

জগৎপিতা জগদীশ্বরের সৃষ্টি চাতুর্য্য অবলোকন করিলে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়রসে আপ্লুত হইতে হয়। এই সৃষ্টি বৈচিত্র প্রকৃতিস্থ হইয়া দর্শন করা সাধারণ মানবের কর্ম্ম নহে। উহাতে ভগবৎ কৃপার আবশ্যক হইয়া পড়ে। ত্বদীয় ঐশীশক্তির কৃপা-বারি সিঞ্চন ব্যতীত মানব মনুষ্য নামের অযোগ্য। বহু ধীশক্তিসম্পন্ন মানব যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হইতেছেন সত্য, পরন্তু তাঁহারা অনেকেই ভগবৎ চরণারবিন্দের আকর্ষণীশক্তির মাধুর্য্যে মোহিত হইয়াছেন, তন্নিবন্ধন ঐশী নির্দ্দিষ্ট সৃষ্ট পদার্থের সংযোগ বিয়োগ দ্বারা জগতবাসীর সুমহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করণে সমর্থ হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে সেই শক্তির কথঞ্চিৎ পরিমাণে নিয়োগ পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই শক্তি প্রাপ্ত হওয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য কর্ম্মের ফল বুঝিতে হইবে। অধুনা, বিজ্ঞান সাহায্যে বহু আশ্চর্য্য দ্রব্যের আবিষ্কার হইতেছে। অদ্য আমরা পাঠকগণের নিকট তন্মধ্যে একটি বিষয় সমুপস্থিত করিতেছি।

অভাব না হইলে কোন বিষয়ের প্রতিবিধান করিতে কেহ ইচ্ছা করেন না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিতে হইবে। ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রভৃতি বহুজনপদপূর্ণ প্রদেশ হইতে দৈনিক বহু সহস্র টন কয়লা বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হইতেছে। এই সকল প্রদেশ সমূহেও প্রত্যহ বহু কয়লা নিঃশেষিত হইতেছে। এতদিন ইহার দিকে লোকের ততটা লক্ষ্য ছিল না। অধুনা এই দিকে নজর পড়িয়াছে। তাঁহারা দেখিতেছেন, যে সমুদয় কয়লা ব্যয়িত হইতেছে তাহার আর পূরণ হইতেছে না—ক্রমশঃই কয়লা-গোষ্ঠী বা কয়লা খনি স্বল্প হইতে স্বল্পতর হইতেছে। এই বিষয় লইয়া বহুলোকের মস্তিষ্ক আলোড়ন বিলোড়ন হইতেছে কিন্তু কেহই ইহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অধুনা উলভারহামটন প্রদেশস্থ টমাস পার্কার বলিয়া এক ব্যক্তি ইহার প্রতিবিধানে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সমর্থ হইয়াছেন। এই বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের নাম পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। ইঁনি বিজ্ঞান সমাজে বিশেষ পরিচিত। ইঁনি তাড়িৎ আকর্ষণ প্রভাবে ফস্ফরাস (Phosphorus) নামক এক প্রকার পদার্থ বাহির করিয়াছেন। এই Phosphorus অন্য উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু তাড়িৎ সংযোগে কেহ বাহির করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ইহাদ্বারা প্রচুর পরিমাণে কয়লা বাঁচিয়া যায়। এইরূপ প্রক্রিয়ায় তত্রস্থলের দৈনিক বহু কয়লা প্রস্তুত হইতেছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত কয়লা সহজে এবং অত্যধিক তাপেও প্রজ্জ্বলিত হয়, কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্রও ধূম বহির্গত হয় না। এই কয়লা গৃহকর্ম্ম রন্ধনাদি কার্য্যে, কলকারখানায় এবং ফ্যাক্টারী প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইতে পারে। বর্ত্তমান যুগে ইংলণ্ডে প্রতি ৮১ মণ সাধারণ কয়লা দ্বারা কার্য্য করিতে ২৭ মণ কয়লা বৃথা নষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে পাঠকগণ বুঝুন, এই প্রকার আমাদের দেশেও যে ততোধিক কয়লা দৈনিক ফ্যাক্টরী প্রভৃতিতে নষ্ট হইতেছে তাহার কি কোন প্রতিবিধান করা হইতেছে? এই প্রকার অত্যধিক পরিমাণে বৃথা ব্যয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে ধূম্রবিহীন কোলাইটের বা কয়লার ব্যবহার নিতান্ত আবশ্যক। এই কয়লা দ্বারা কার্য্য করিলে বৃথা কয়লা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। পরে ইহার বিষয় বিশদ ভাবে বর্ণিত হইতেছে।

সাধারণ কয়লার ধূম্র অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, বিবিধ পীড়োৎপাদক এবং স্থান বিকৃতিকারক সন্দেহ নাই, অথচ অধিক পরিমাণে বৃথা নষ্ট করিতে হয় কিন্তু ধূমবিহীন কয়লা এই জাতীয় নহে। উপরোক্ত অসুবিধা ধূম বিহীন কয়লায় দূরীভূত করিয়া দেয়। কৃষ্ণবর্ণ ধূম্র বিনির্গত হইলে কার্ব্বন ডাই অক্সাইড্ না হইয়া প্রচুর পরিমাণে কার্ব্বন মনাক্সাইড্ বহির্গত হইতে থাকে। কয়লা দগ্ধ করিয়া মনাক্সাইড্ প্রস্তুত করিতে হইলে ৪·৪৫০ তাপের আবশ্যক হয় এবং ডাই অক্সাইড্ করিতে হইলে ১৪·৫৪০ তাপের আবশ্যক। প্রতি পাউণ্ড কার্ব্বন মনাক্সাইড্ প্রস্তুত করিতে ফারনেসে বা উনুনে ১০,০০০ তাপ নষ্ট হইয়া থাকে। ধূম্রবিহীন কয়লা বা কোলাইট্ প্রস্তুত করিতে হইলে ইহাকে সর্ব্ব প্রথমে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। যে পাত্রে ইহা বিশুদ্ধ করিতে হয় তাহার সঙ্গে লম্বা ভাবে বহু নলের সংযোগ রাখা আবশ্যক। যখন ইহা বিশুদ্ধ হইতে আরম্ভ হয় তখন ইহা ঈষৎ লোহিত বর্ণ ধারণ করে। এবম্প্রকারে কোলাইট ও কোক-কয়লার আকৃতির উল্লেখযোগ্য বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না পরন্তু উভয়েরই দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে গ্যাসের মত গন্ধ বহির্গত হয় এবং প্রথমটি অত্যধিক আলোকবিশিষ্ট দৃষ্ট হয় ও অধিক তাপ বিকীর্ণ করিতে আরম্ভ করে।

এই কয়লা প্রস্তুত প্রক্রিয়া অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—যে স্থানে বা কারখানায় এই কয়লা প্রস্তুত হয় তথায় দূরস্থান হইতে কল সাহায্যে কাঁচা কয়লা আসিতে থাকে এবং কলদ্বারা সেই সমুদায় এক নির্দ্দিষ্ট সুবৃহৎ লৌহ কটাহে পড়িতে থাকে এবং তথায় ২।৩ ঘণ্টায় বিশুদ্ধ হইয়া নিম্ন প্রদেশের লৌহ কুঠ্রীতে পতিত হইতে আরম্ভ করে। অন্য রাস্তা দিয়া ইহাকে কলের সাহায্যে উপরে উত্তোলন করা হয়। এই প্রকার কার্য্যাদি সম্পাদিত হইলে সেই সমুদয় বিশুদ্ধ কয়লা গরুর গাড়ী প্রভৃতি বহুবিধ যানে পূর্ণ হইতে থাকে। এই প্রকার কার্য্যকরণ মনুষ্য সাহায্য ব্যতীত কলদ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে অনেক পরিশ্রমের হস্ত হইতে লোকে বাঁচিয়া যায়। ওয়েডেন্‌সফিল্ড ও বারকিন নামক সহরদ্বয় হইতে এই ধূম্রবিহীন কয়লা সরবরাহ হইয়া থাকে।

এই ওয়েডেন্‌সফিল্ডের কয়লা প্রস্তুত স্থান ৪০ ফিট লম্বা ও ২০ ফিট প্রশস্ত। ২৪টি Retort (বা পৃষ্ঠ বক্র যন্ত্রবিশেষ) আছে। তাহাতে কয়লা গরম করা ও বিশুদ্ধ করা হয়। দৈনিক তিনলক্ষ ঘনবর্গফিট বাষ্প প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সমুদায় বাষ্প নল দ্বারা 'পাওয়ার হাউসে' লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় তাহা বিদ্যুতে পরিণত করা হয়। পূর্ব্বোক্ত কয়লা হইতে দৈনিক ১১০০ গ্যালন আলকাতরা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার সঙ্গে বহু কালরং বিশিষ্ট দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। অপরাপর আলকাতরাও ঐরূপ অবস্থায় থাকে সত্য, কিন্তু এই আল্‌কাতরায় অপর আলকাতরা হইতে দ্বিগুণ কৃষ্ণরং বিশিষ্ট দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। ইহাতে আরও কতিপয় দ্রব্য বিমিশ্রিত থাকে যথা মটর গাড়ী পরিচালক স্পিরিট, জ্বালানি তৈল, বিষ নাশক দ্রব্যাদি। অপর আলকাতরায় এই সমুদায় নাই। এই গুলি বাহির করিয়া লইলে য়্যামোনিয়া বাহির করা সহজ হইয়া পড়ে। অবশেষে লম্বমান নলাকৃতি বক্রযন্ত্রে দৈনিক প্রায় ৪০ টন বা ১০৮০ মণ কোলাইট প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোলাইট প্রস্তুত হইয়া গেলে বহুল পরিমাণে দাহ্য দ্রব্য পড়িয়া থাকে তন্মধ্যে শতকরা দ্বাদশভাগ বাষ্প মিশ্রিত বদ্ধ থাকে। ইহার মধ্যে

গন্ধক সদৃশ একপ্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহার কারখানা ৫৫০ ফিট দীর্ঘ ও ৬৫ ফিট প্রস্থ এবং বিবিধ যন্ত্রাদিতে সজ্জিত থাকে। দ্বাদশ সপ্তাহের মধ্যে এই রূপ বাড়ী প্রস্তুত হইতে পারে।

প্রতি ২৭ সাতাইশ মণ কয়লা ব্যয়াদি ভিন্ন ৯০৲ টাকায় পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রতি সপ্তাহে দুইটি করিয়া এই কয়লার বৃক্ষ প্রস্তুত হইতেছে। সাধারণ কয়লা অপেক্ষা ইহার তাপ যে অত্যন্ত অধিক, তাহা কার্য্য দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। আমাদের দেশে দৈনিক কয়লার যাদৃশী অপব্যবহার হইতেছে তাহাতে উপরোক্ত উপায়ে প্রস্তুত কয়লা ব্যবহার না করিলে দৈনন্দিন কয়লাক্ষয় জনিত অপব্যবহারের ফল স্বল্পকাল মধ্যে প্রাপ্ত হইতে হইবে। খনিজ কয়লার স্বল্পতা নিবন্ধন তদ্বারা স্বল্প পরিমাণ কয়লায় বহুকাল কার্য্য পরিচালিত হইতে পারে তদুপায় বিধান করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহাদের কয়লার ব্যবহার অধিক দৃষ্ট হয় তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় কয়লা প্রস্তুত করিলে অপরাপর বহু দ্রব্যও প্রাপ্ত হইতে পারেন এবং ব্যয়সংক্ষেপ হেতু সুবিধাও হইতে পারে।

ব্রহ্মপুরী, দশাশ্বমেধঘাট,
বাঙ্গালীটোলা,—বেনারস সহর।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

জ্যৈষ্ঠ মাস।

কৃষিক্ষেত্র।—এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউস ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুন গাছে ভাঁটি বাঁন্ধিয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়। শাঁকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

সব্জী বাগ।—এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জলদি ফসল হইতে ইতি মধ্যে ভুট্টা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স, পালা ঝিঙ্গা, পালা শসার বীজও এই মাসে বপন করা চলে। বর্ষাতি মূলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে। জলদি ফুল কপি খাইতে গেলে এই সময় হইতে পাটনাই ফুল কপি বপন করিয়া চারা তৈয়ার করিতে হইবে।

ফুল বাগিচা—এই সময় জিনিয়া, দোপাটী, গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়া মূল এই সময় বসাইতে বলেন, আমরা কিন্তু বলি যে আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূল গুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে, সেই জন্য বর্ষাতে বসাইলেই ভাল। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্ব কথিত ফুল বীজ ব্যতীত আমরাস্থাস, কক্ষকোম্ব, আইপোমিয়া রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মার্টিনিয়া প্রভৃতি ফুলবীজ বপনেরও এই সময়।

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাট নাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র কার্য্য। তবে কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের ধাপকলম করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কিন্তু ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। বাঁধা কপি ও ফুলকপি বীজ এখন বপন করা যায়।

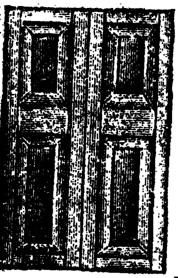
REGISTERED No. C. 192.

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

সুলভে সেগুণ কাষ্ঠের ফার্ণিচার ও ইমারতি গড়ন প্রভৃতি।



আমরা মৌলমিন্ হইতে উৎকৃষ্ট সেগুণ কাষ্ঠ আমদানী করিয়া মফঃস্বলের গ্রাহকবর্গকে সর্ব্বপ্রকার আলমারী, টেবিল, চেয়ার, পানিল, খড়খড়ি, সার্সী প্রভৃতি অর্ডার মত প্রস্তুত করাইয়া অতি সামান্য মুনফা রাখিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। করোগেট আয়রণ, ষ্টীল জয়েষ্ট, টী আয়রণ, বোল্টনাট, বেড়ার কাঁটাওয়ালা তার প্রভৃতি এবং ফার্ণিচার ও ইমারতি গড়নের জন্য কল, কব্জা, ছিটকিনি, বল্ট, পরকলা, রঙ্গ প্রভৃতি আমাদিগের নিকট উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট অফিসার, মিউনিসিপালিটী ও অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আমাদিগের ফার্ম্ম হইতে সর্ব্বদাই দ্রব্যাদি লইয়া থাকেন। ঠিক জিনিষ উচিত মূল্য, প্রতারিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

বিস্তারিত বিবরণসহ জিনিষের লিষ্ট পাঠাইলে দর দিয়া থাকি; পত্র লিখিলে আমাদিগের সচিত্র ইংরাজী ক্যাটালগ (মূল্য নিরূপণ তালিকা) বিনা মূল্যে পাঠাইয়া থাকি; পরীক্ষা প্রার্থনীয়।—

এ, টী, দে এণ্ড কোং।

১৬১।১৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং।

মনোহারী সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য উচিত মূল্যে সর্ব্বস্থানে সরবরাহ করা হয়। অর্ডার সহিত এক-চতুর্থাংশ মূল্য অগ্রিম দেয়। অর্ডার পাইলে মাল পাঠাই, কিছুমাত্র বিলম্ব করা হয় না। আবশ্যকীয় দ্রব্যের দর পত্র দ্বারা জানান হয়। মফঃস্বলবাসীর কিরূপ সুবিধা ও সুযোগ একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ব্যবসায়িগণকে স্বতন্ত্র কমিসন দেওয়া হয়।

হোলসেল এণ্ড রিটেল ডিলার্স।

১ নং রাজার লেন, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা।

স্ত্রী পুরুষের রজঃ ও শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় দোষ ও তজ্জনিত ব্যাধিসমূহ নির্ম্মূল করণক্ষম এবং স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চারক। মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা এক টাকা মাত্র।

যিনি আমার নিম্নলিখিত ঠিকানায় আপনার নাম ধাম পাঠাইবেন, তাঁহাকে কলিকাতা পুলিশ কোর্টের মোকর্দ্দমা হইতে নির্ম্মুক্ত ও উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া পরিগণিত

কামশাস্ত্র

নামক একখানি উপযোগী পুস্তক বিনামূল্যে বিনা ডাকমাশুলে পাঠান যাইবে।

কবিরাজ শ্রীমনিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কিং এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

৮৩, হ্যারিসন রোড,

ব্রাঞ্চ—৪৫, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের জন্য উপরোক্ত ঠিকানায় লিখুন।

মজুমদার এণ্ড কোং।

পেণ্টর্স ফটোগ্রাফার্স আর্টিষ্টস্ এণ্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

২২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আমাদের কারখানায় থিয়েটারের ষ্টেজ সম্বন্ধীয় সকল প্রকার সিন্ ড্রপসিন্ প্রভৃতি এবং সকল প্রকার অয়েল পেণ্টিং প্রতিমূর্ত্তি সুচারুরূপে অল্পমূল্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ রাজা, জমিদার প্রভৃতি মহোদয়-গণের বাড়ীর কার্য্যই আমাদের প্রমাণ। সিনের মূল্য তালিকার জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন। আর সকল প্রকার দেশী বোম্বাই ছবি ও ফটো বাঁধাই এবং বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

সুরমা

মর্ত্তের পারিজাত।

পুরাণের-আখ্যানেই সকলে শুনিয়াছেন, যে স্বর্গে—ইন্দ্রের নন্দনে, দেবভোগ্য পারিজাত আছে। সেই পারিজাত দেবরাজ ইন্দ্রের শচীরাণীর সোহাগের বিলাসভোগ। পারিজাতের রং কেমন, গন্ধ কেমন, আকার কেমন, তাহা কেহ জানেন না। তবে, পারিজাতের গন্ধটা যে খুব মনমাতান, তার আর কোন সন্দেহ নাই। আপনি যদি এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পারিজাতের স্বর্গীয় সৌরভ কতকটা ধারণায় আনিতে চান, তবে আমাদের মনোমদ সুগন্ধময় সুরমা ব্যবহার করুন। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি, অতুলনীয় সুগন্ধে আমাদের সুরমা মর্ত্তের পারিজাত। শুধু গন্ধে নহে, সুরমা—সর্ব্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ, অথচ সুলভ সুগন্ধি কেশতৈল।

মূল্যাদি। বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক-মাশুল ও প্যাকিং ।৵০ সাত আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। মাশুলাদি ৸৵০ তের আনা।

শুক্রবল্লভ-রসায়ন।

শুক্রই শরীরের সার জিনিষ। শুক্রক্ষয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না। শুক্রক্ষয়ে দেহ অবসন্ন, মন বিষণ্ণ, বর্ণের মলিনতা, ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, মস্তিষ্কের বলহানি, শরীরে দারুণ গ্লানি প্রভৃতি উৎকট উপদ্রব উপস্থিত হইয়া, মানুষকে জীবন্মৃত করিয়া ফেলে। এই রসায়ন ঔষধ শীঘ্র শীঘ্র শুক্রবৃদ্ধি করিয়া, সেই সমস্ত দোষ দূর করিয়া দেয়। এই জন্যই ইহার নাম শুক্রবল্লভ। এই শুক্রবল্লভ সেবনে শুক্রধাতু গাঢ় হয়, ইন্দ্রিয়ের ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা দূর হইয়া যায়, মনের স্ফূর্ত্তি ও দেহের কান্তি বৃদ্ধি পায়। এক মাত্রাতেই ইহার উপকার অনুভব করা যায়। এক শিশির মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র। মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর

পুষ্পসার।

বকুল।—আমাদের বকুলের সৌরভ টাট্‌কা বকুলফুলের মতই অটুট সুন্দর।



পারিজাত।—এ যেন সত্য সত্যই স্বর্গীয় সৌরভ!

বঙ্গমাতা।—বাঙ্গালীর "বঙ্গমাতা" সমস্ত বাঙ্গালার গৌরবস্বরূপ।

মিলন।—"মিলনের" সুবাস মিলনের মতই মনোরম!

রেণুকা।—আমাদের "রেণুকা" বিলাতী কাশ্মীরী-বোকে অপেক্ষা উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে।

কামিনী।—যামিনীর জ্যোৎস্না কামিনীর সৌরভে মধুরতর হইয়া উঠে।

চম্পক।—চাঁপার তীব্রতা কেমন উজ্জ্বল-মধুরে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জিনিস!

বেলা।—অবসন্ন গ্রীষ্মবেলায় 'বেলার' গন্ধ যেন স্বর্গসুখ আনিয়া দেয়।

হোয়াইট রোজ।—নামের অনুবাদ করিলেই ইহার গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই আমাদের "শেউতি গোলাপ"!

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ টাকা। মাঝারি ৸০ আনা। ছোট ॥০ আনা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸০ আনা ডাকমাশুল ৵০ আনা। অডিকলোন এক শিশি ॥০ আনা, মাশুলাদি ।৵০ আনা। আমাদের অটো-ডি-রোজ, অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া, অটো অব্ খস্‌খস, অতি উপাদেয় পদার্থ। এক শিশি ১৲ টাকা, ডজন ১০৲ টাকা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্টস্।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

গবাদি পশুর খাদ্য—

গিনি ঘাস—	পাউণ্ড	২৲
জোয়ার—	,,	।০
বিয়ানা প্রভৃতি ঘাস	,,	২৲

ফুলবীজ—(বপনের সময় মার্চ্চ মাস হইতে জুলাই) এমারান্থস্, বালসাম, ক্যানা, কস্‌কস্ কোম্ব ক্লিটোরিয়া, কনভলভিউলস্ ডালিয়া, ধুতরা, গিলার্ডিয়া পিক্টা, আইপোমিয়া, মিরাবিলিস্ জালাপা, মেরিগোল্ড, প্যাসিফ্লোরা, পর্টুলাকা, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ— প্রতি প্যাকেট ।০
অর্দ্ধ প্যাকেট ৵০

বাছাই করা ১০ রকমের	প্যাকেট	১৷৵০
,, ২০ রকমের	,,	২।০

কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ—তোলা ৵ ; ২॥০ তোলা ।০ ; পাউণ্ড বা অর্দ্ধ সের ২॥০ টাকা।

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয়।

এক বৎসরে দুর্ভেদ্য বেড়া হয়। ২॥০ তোলা বীজ এক লাইন করিয়া বসাইলে ৬৬ ফুট বেড়া হয়। বিশেষরূপ ঘন বেড়ার আবশ্যক হইলে দুই লাইন করিয়া বীজ বসান উচিত। বীজগুলি জুলি কাটিয়া ৯ ইঞ্চি অন্তর বসাইতে হয়। দুইটী জুলির মাঝে ৯ ইঞ্চি ব্যবধান থাকা আবশ্যক।

মেম্বর।

নূতন বর্ষারম্ভ হইতেই মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবার উপযুক্ত সময়। যাঁহারা এক্ষণে ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবেন বা আছেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত বীজগুলি পাইবেন।

সভারেণ মেম্বর হইলে—গ্রীষ্মকালে বপনোপযোগী

দেশী সব্জীবীজ	২৪ রকম	২।০
,, ফুলেরবীজ	২০ ,,	২।০
শীতের বিলাতী সব্জীবীজ আমেরিকার টিনে মোড়াই করা ২৪ রকম ১ বাক্স		৫॥০
শীতের বিলাতী সটন্ কিম্বা ল্যাণ্ডে-থের ফুলের বীজ ১ বাক্স		৪॥০
শীতের দেশী সব্জীবীজ	২৪ রকম	২।০
ডাকমাশুল ইত্যাদি		১।০
		—১৮৲

সাধারণ মেম্বর হইলে—

গ্রীষ্ম বর্ষাকালের বপনোপযোগী দেশী সব্জীবীজ	২৪ রকম	২।০
,, ফুলের বীজ	১০ ,,	১৷৵০
শীতকালের বপনোপযোগী আমেরিকার মোড়াই করা এক বাক্স ২৪ রকম বিলাতী সব্জী বীজ		৫॥০
বিলাতী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট		১॥০
দেশী সব্জী বীজ ১৮ রকম		১৷৵০
ডাকমাশুল ইত্যাদি		॥০
		—১২৲

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মেম্বর আমাদিগের দ্বারা পরিচালিত বাঙ্গালা মাসিক পত্র "কৃষক" প্রতি মাসে এক কপি করিয়া পাইবেন এবং এসোসিয়েসন হইতে স্বতন্ত্র বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ৫৲ পর্য্যন্ত টাকায় /০ এবং ৫৲ অধিক হইলে শতকরা ১০৲ হিঃ কমিশন পাইবেন।

স্পেশ্যাল মেম্বর ঃ—কৃষকের গ্রাহকগণ এসোসিয়েসনের স্পেশ্যাল মেম্বর। তাঁহারাও বীজ গাছাদি খরিদ করিলে উচ্চহারে কমিশন পাইবেন।

সভারেণ মেম্বরকে বার্ষিক এক সভারেণ বা ১৫৲ টাকা, সাধারণ মেম্বরকে বার্ষিক ১০৲ ও স্পেশ্যাল মেম্বরগণকে কৃষকের বার্ষিক মূল্য ২৲ দিতে হয়।

গুয়ানো—ফল, ফুল, সব্জীর পক্ষে অদ্বিতীয় সার অতি অল্প মাত্রায় অধিক কাজ হয়।

ছোট টীন ॥০ আনা, বড় টীন ১৲ টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র। ব্যবহারের প্রণালী টীনসহ দেওয়া হয়।

চীনা বাদাম বা মাট বাদাম খুচরা ।০ পাউণ্ড, মণ ১০৲ টাকা। পাট বীজ খুচরা ।০ পাউণ্ড, মণ ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকা। ধঞ্চে (সবুজ সারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী) খুচরা ।০ পাউণ্ড, মণ ৮৲ টাকা। এই সকল বীজের দর ঠিক থাকে না সময় সময় কম বেশী হইয়া থাকে।

সার। হাড়ের গুঁড়া (ধানের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ) প্রতি মণ ৪৲ টাকা। রেড়ীর খৈল (আলু ও ইক্ষুর পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক) প্রতি মণ ৪৲ টাকা, দর সকল সময় সমান থাকে না। সোরা সার প্রতি মণ ৬৲ হইতে ১০৲ টাকা। প্যাকিং ও রেল মাশুল স্বতন্ত্র। অর্ডারের সঙ্গে টাকা পাঠান আবশ্যক রেল ষ্টেসন, ঠিকানা ও ডাকগাড়ী বা মাল গাড়ীতে মাল পাঠাইতে হইবে স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মেনেজার কে, এল ঘোষ এফ, আর, এচ, এস, (লণ্ডন)।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন,

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

REGISTERED No C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

একাদশ খণ্ড,—২য় সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।



কলিকাতা: ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
ই. স্পিরিটো দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

সূচী পত্র।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের বপনোপযোগী সব্জী ও ফুল বীজ।

প্রতি প্যাকেট ৵০ আনা।

লাউ লম্বা ও গোল	আউন্স ৵০
সীম মিশ্রিত	,, ৵০
,, বরবটী	,, ৵০
,, লবিয়া	প্যাকেট ।০
,, মাখন	আউন্স ১৲
,, সুগার বীন	প্যাকেট ।০
টেপারি—প্যাকেট ।০	আউন্স ১৲
লঙ্কা—লম্বা বড়	প্যাকেট ।০
,, সিলেশ্চিয়াল খুব ফলে	,, ।০
,, ছোট চিলি	,, ।০
লঙ্কা—মিশ্রিত বিলাতি	প্যাকে ।০
,, ,, দেশী	,, ।০
শশা—এমারল্ড, লংগ্রীণ ইত্যাদি	
নানারকম মিশ্রিত তোলা ।০	আউন্স ।০
ফুলকপি—পা নাই আষাঢ়-শ্রাবণ	
মাসে বপন করিতে	প্যাকেট ।০
	তোলা ॥০
বেগুন—আউন্সে মুক্তকেশী	,, ।০
,, পৌষে মুক্তকেশী	,, ।০
ভুট্টা—নানারকম চৈত্র ও বৈশাখ	
মাসে রোপণ করিতে হয়	পাউণ্ড ৷০
করলা—বড়	আউন্স ।০
উচ্ছে—	,, ৵০
ঢেঁড়স—নানা জাতীয় দেশী	তোলা ৵০
,, এমেরিকান	,, ।০
চিচিঙ্গে—সাদা ও কাল	প্যাকেট ৵০
স্কোয়াস বা বিলাতি কদু	প্যাকেট ।০
চালকুমড়া—	আউন্স ।০
বর্ষাতী মূলা—	প্যাকেট ⁄০
	আউন্স ৵০
শাক—চাপা, লাল শাক, পদ্মনটে,	,, ৵০
,, ডেঙ্গো মিষ্ট লাল	,, ৵০
,, কাটোয়া সাদা	,, ।০

অর্দ্ধ প্যাকেট ⁄০ আনা।

,, পাট, পুই ইত্যাদি	প্যাকেট ⁄০
শাকালু—	পাউণ্ড ॥০
ঝিঙ্গা—পালা ও ভুঁই ও ধুঁদুল	প্যাকেট ৵০
	আউন্স ৵০

দেশী সব্জী বীজ—

প্যাক 'ক'	বাছাই		
	১৮ রকম		১৵০
,, 'খ'	২৪ রকম		২।০
,, 'গ'	৩০ রকম পরিমাণে অধিক		৪॥০

বপনের সময় মাঘ ও ফাল্গুন।

তরমুজ—ট্রায়াম্ফ—এক একটা ১ মণ পর্য্যন্ত হয়।	তোলা ॥০
তরমুজ—ট্রাভলার—খাইতে সুমিষ্ট. উৎকৃষ্ট জাতীয়।	,, ॥০
তরমুজ—দেশী—নানাজাতীয়	,, ।০
কাঁকুড়, কুটী, গুড়মী	,, ।০
খরমুজা (লক্ষৌ	প্যাকেট ৵০

প্রত্যেক সব্জী বীজের প্যাকেট ৵০, অর্দ্ধ প্যাকেট ⁄০

আয়কর বৃক্ষের বীজ—শিশু, সেগুণ, কৃষ্ণচূড়া, শিরিশ	প্যাকেট ।০ আনা
মেহগ্নী ইউকালিপটস্	,, ॥০ আনা

আদা, হলুদ, এরোরুট প্রভৃতি মূল্যের অধিক পরিমাণে আবশ্যক হইলে সুবিধা দরে পাওয়া যায়।

খুচরা—এরোরুট	পাউণ্ড ।০
আদা	পাউণ্ড ।০
হলুদ	,, ৵০

তুলা—সি আইল্যাণ্ড অপল্যাণ্ড জার্জয়ান প্রভৃতি এমেরিকার তুলা বীজ	পাউণ্ড ২৲ টাকা।
বুড়ি, ধারওয়ার ও সিন্ধ প্রভৃতি দেশী তুলা বীজ	পাউণ্ড ১৲ টাকা।
পেঁপে বীজ—বোম্বাই	প্যাকেট ।০
এমেরিকান	,, ।০

কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ খণ্ড। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭ সাল। | ২য় সংখ্যা।

তামাক চাষ ও শিল্প।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ দত্ত গুপ্ত লিখিত।

তামাকের পাতা হইতে তামাক, চুরুট, সিগারেট ও নস্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গালা দেশের কতিপয় স্থানে ও ভারতবর্ষের অপরাপর নানা ভাগে তামাকের চাষ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু কৃত্রিম কাঁচা সার ব্যবহারবিধি আমাদিগের কৃষকগণের নিকট অপরিজ্ঞাত থাকায় আবশ্যকানুযায়ী সুফল দর্শিতেছেনা। অতি উচ্চ ও বালুকাময় স্থান তামাক চাষের উপযুক্ত ভূমি নহে। সমতল ও কোমল ক্ষেত্রে অতি উত্তম তামাকের গাছ বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জলাভূমির আশ পাশ হইতে নানা জাতীয় লতা পাতা এবং জলমগ্ন উদ্ভিজ্জ পদার্থ, বন্য চারা ও তৃণ লতা পাতা সংগ্রহ করিয়া সমতল নিম্ন ভূমির উপর কিছুকাল ফেলিয়া রাখিলে, ঐ গুলি আপনা হইতে পচিয়া যাইয়া অতি উত্তম সার প্রস্তুত হইয়া ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে, এবং তাহার চাপে পচিয়া ও পচা রসের রাসয়নীক প্রক্রিয়ার প্রচণ্ড তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া নির্দ্দিষ্ট ভূমির আগাছা গুলি আপনা হইতে অতি সহজেই নির্ম্মূল হইয়া যায়। এই সারের সহিত গোময় মিশ্রিত করিতে পারিলে তামাক চাষে আরও অত্যধিক আশাপ্রদ ফল ফলিয়া থাকে।

কীট, কীটানু বীজ মাত্রেরই চিরশত্রু। ইহাদের অত্যাচার নিবৃত্তি করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিলে কৃষি মাত্রেরই ক্ষতি সম্ভাবনা। সেই নিমিত্ত কীট নিবারণের জন্য নানা প্রকার সাবধানতা ও উপায় অবলম্বন করিতে হয় এবং তন্মধ্যে নিয়মত প্রথাই প্রকৃষ্ট প্রথা বলিয়া অনেকের ধারণা ও বিশ্বাস।

তামাকের ক্বাথ ঠাণ্ডা হইবামাত্র পরক্ষণেই তাহার সহিত তুঁতে, টার্পিণ তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারাবশিষ্ট পাতা মধ্যে কলিচূণ প্রয়োগ করতঃ এই সমুদয় একত্র সংমিশ্রণ করিয়া কর্পূর কাষ্ঠের গুঁড়া মিশাইলে কীট নিবারণের উৎকৃষ্ট উপকরণ প্রস্তুত করা যায়। তৃণ লতার সার গুলি পচিয়া উঠিবার অনতি পরেই এই সংমিশ্রণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। জাপানে কোন কোন কৃষকগণ পোকা ও আগাছা নিবারণের জন্য এ প্রকার প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকে বটে, পরন্তু তথাকার অধিকাংশ কৃষিজীবিই মূত্রের সহিত এক চতুর্থাংশ ফুপোদক ও তুঁতে মিশ্রিত করিয়া, বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমির সমস্ত ভাগে ছিটাইয়া দেয়।

তামাকের পাতা জাতি বহুল। কিন্তু এত বিভিন্ন শ্রেণীতে ইহা বিভক্ত থাকা সত্বেও উদ্ভিদ-তত্ববিৎ ব্যক্তির পক্ষে ইহার জাতি নির্ণয় করা বিশেষ দুঃসাধ্য নহে। কিন্তু অপর জনসাধারণের তাহা ধারণা করিবারও ক্ষমতা নাই। জাপানে অবস্থান কালে, আমি কিছু কাল কেন্ কিচি অকুব নামক জনৈক বিশিষ্ট সম্রান্ত জাপের পরিবার মধ্যে বাস করিয়াছিলাম। এই ভদ্রলোক তথায় গভর্ণমেণ্ট তামাকের কারখানাতে কার্য্য করিতেন। ইনি একদিন আমাকে প্রায় চল্লিশ প্রকার তামাকের পাতা দেখাইয়াছিলেন।

তামাকের পাতাগুলির আকার, প্রকার এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম অংশের পার্থক্য ও ঐক্যতা এবং গুণ ও ব্যবস্থার তারতম্যতার সুক্ষ্ম তত্ব অনুধাবন করা আপামর সাধারণের পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার নহে। যদিও তামাক পাতা মাত্রই দেখিতে আকৃতিগত প্রায় একই প্রকার কিন্তু তাহাদের পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই, যদিও নিরন্তর পরীক্ষা প্রভাবে এবিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করা গিয়াছে যে, মৃত্তিকা কিম্বা জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে এই নানা জাতীয় তাম্রকুট পাতার উদ্ভিজ্জ ধর্ম্মের বড় বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় না বটে, তত্রাচ ইহার রাসয়নীক প্রক্রিয়া ও সংমিশ্রণের গুণে বিশেষ বৈলক্ষণ্যতা পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। কেবল মাত্র যে উদ্ভিদতত্ব গঠন কিম্বা স্থান বিশেষে বপন অথবা কৃষিকার্য্যে অনভিজ্ঞতা বশতঃই রাসয়নীক প্রক্রিয়া ও সংমিশ্রণের তারতম্য উপলব্ধ হয় তাহা নহে। কিন্তু তামাক পাতা হইতে তামাক, চুরুট ইত্যাদি প্রস্তত ও তাহা শুষ্ক ও পরিষ্কার করার সময়ই এ প্রকার বহুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। শুষ্ক পত্রের উপাদানে যে কত ভাগ জলীয় ক্ষার অংশ, কত ভাগ সুগন্ধি নির্য্যাস, কত ভাগ তিক্তরস ও হরিদ্রাভাবিশিষ্ট তৈল ও মেদযুক্ত পদার্থ এবং কত ভাগ গঁদ ও আটাযুক্তদ্রব্য এবং বৃক্ষের কাথ ও গ্যালিক এসিড ও কতভাগ লবণাক্ত চূণ, কাষ্ঠ আঁস ও শ্বেত মৃত্তিকা মিশ্রিত রহিয়াছে তাহার সমষ্টি নির্ণয় করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে; যেহেতু তামাকের চাষ কিম্বা চুরুট সিগারেট ইত্যাদি প্রস্তত প্রণালী আমার শিক্ষার বিষয় ছিলনা, তবে জাপানে কেন্‌কিচি অকুব মহাশয়ের সহিত একত্র অবস্থান করিয়া তাঁহার সাহায্যে ওশাকাস্থ গভর্ণমেণ্ট তামাকের কারখানা দেখিয়া ও তাঁহার প্রমুখাৎ এ বিষয়ে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ যুক্তি শুনিয়া এই কৃষি অনুধাবনে যৎকিঞ্চিৎ প্রয়াস পাইয়াছিলাম। তাই আজ এবিষয়ে দু' এক কথা লিখিতে সাহস করিতেছি। শ্রীযুত অম্বিকাচরণ ঘোষ মহাশয়ের এবিষয় আরও সুশৃঙ্খলারূপে ও বিষদ ভাবে লিখিবার যথেষ্ঠ ক্ষমতা রহিয়াছে। জাপান হইতে তিনি এবিষয়েই বিশেষ শিক্ষিত হইয়া আসিয়াছেন।

আমি ধারাবাহিক রূপে এবিষয় কোন রূপ বর্ণনা করিতে কিম্বা ইহার নিগুঢ় তত্ব আপামর জন সাধারণের নিকট ধরিতে অক্ষম, যেহেতু ইহা আমার শিক্ষার শাখার বহির্ভূত।

তামাকের চাষ ও তামাক পরিষ্কার পদ্ধতি ফলিত বিজ্ঞানের একটী দুর্ভেদ্য অঙ্গ। ইহার তুলনায় কৃষি সম্বন্ধীয় অপরাপর সমকক্ষ শাখা প্রশাখাগুলি এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রস্তুত প্রণালী অত্যন্ত সরল ও সহজসাধ্য। বিজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞান, যন্ত্রবিষয়ে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা এবং এতদ্ব্যতীত একাগ্রচিত্ততা প্রকৃষ্ট মূল্যবহুল তামাক কিম্বা নস্য প্রস্তুতের নিত্যোপদেশক। তাম্রকুট পরিষ্কার করিবার কালীন তামাক পাতার বাহ্যাংশের বিনাশ প্রাপ্তি হইয়া রাসায়নীক প্রক্রিয়া প্রভাবে আকৃতিগত পরিবর্ত্তন সংঘটন হয় বলিয়া এতদ্‌বিষয়ে বিশেষ ভাবে স্মরণরাখা আবশ্যক যে, কেবল মাত্র নিস্পন্দ নজর ও সতর্ক দৃষ্টি এবং লঘুহস্ত চালনাই পূর্ণ কৃতকার্য্যতার উন্নতি সোপান।

শুষ্ক, উচ্ছলন, বাছাই, ঘাটা ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করার পর তামাকপাতা আংশিক শৃঙ্খলাভাবে সাজাইবার কালীন কণামাত্র ভুল হইলেই সমগ্র শস্য সমূলে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

পাতাগুলি পরস্পর পৃথক করিয়া দেওয়া তাম্রকুট-প্রস্তুত-কারীর সর্ব্বপ্রথম কার্য্য। কিন্তু পাতাগুলি এ প্রকারে ছড়াইয়া দেওয়ার সময় উহা ছিঁড়িয়া ও ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক; সেই নিমিত্ত হস্ত যাহাতে সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে তদ্রূপ প্রথা অবলম্বন করা আবশ্যক। দশ ভাগ জলের সহিত এক ভাগ সমুদ্রের জল মিশ্রিত করিলে পাতা ও হস্ত সর্ব্বদা আর্দ্র ও পিচ্ছিল রাখিতে পারা যাইবে এবং ইহার নিমিত্ত কোন প্রকার ব্যয় বাহুল্যতার প্রয়োজন হইবেনা।

আর্দ্র করার প্রথা সম্পূর্ণ হইয়া গেলে পর পাতাগুলি এক একটা করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়, এবং প্রত্যেক পাতার ভিতরের শিরাংশ হস্তদ্বারা খুঁটিয়া তুলিয়া ফেলা হইয়া থাকে। এই প্রকারে পাতার পরস্পর দক্ষিণ ও বাম অর্দ্ধ বিভিন্ন হইয়া পৃথক পৃথক স্থানে স্তূপাকারে রক্ষিত হয়। পরে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও শক্ত পাতাগুলি বাছিয়া লইয়া সে গুলিকে কুচি কুচি করিয়া কাটা হয়; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টাংশ দ্বারা চুরুটের বাহ্যদেশ মণ্ডিত করিয়া, ছেঁড়া, ভাঙ্গা ও খারাপ পাতাগুলি, মধ্যস্থানে পুরিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। অতঃপর পাতার শিরাংশগুলি গুঁড়া করিয়া নস্য প্রস্তুত করে।

তামাকপাতা বাছাই করা এবং ইহার শিরভাগ হস্ত সাহায্যে খুঁটিয়া তুলিয়া ফেলা কার্য্যে স্ত্রী মজুরাণীগণ অত্যন্ত পারদর্শিনী। এ কার্য্যে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক ও বালিকা নিযুক্তা রহিয়াছে। কিন্তু, যদিচ দৃশ্যতঃ একার্য্য অত্যন্ত সরল ও সহজ দেখা যায়, পাতা বাঁচাইয়া শির তুলিয়া ফেলা অত্যন্ত সুকঠিন কাজ, কারণ পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিলেই উহার মূল্য একেবারে নামিয়া যায়।

চুরুটের মধ্যাংশ ও মোড়ক বা বাহ্যদেশ যত অধিক দোষশূন্য পাতা হইতে প্রস্তুত করা হয় চুরুটও তদ্রূপ ভাল হইয়া থাকে এবং সমান ভাবে জ্বলিতে থাকে। যত কম ছেঁড়া পাতা কাটিবার জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে চুরুটের আঁস তদধিক কোমল ও সুন্দর হয়। চুরুট প্রস্তুত করিবার কলের বিষয় একটুকু বর্ণনা করা বোধহয় এ স্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, কেননা ইহাতে বোধ হয় অনেকের না হউক কাহারও এবিষয়ে কিছু না কিছু ধারণা জন্মিতে পারে। এই কল অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ। ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি নানা স্থানে এই কল দ্বারাই বহুকাল হইতে এ'কাজ চলিয়া আসিতেছে। এই কলের একধারে একটী গভীর বারকোষ বা অর্দ্ধ বাক্সাকৃতি আধার রহিয়াছে, ইহার ভিতর তামাকের পাতা গুলি পূর্ণ করিয়া কল চালিত করিয়া দিলে পাতা গুলিকে "রোলার"

বা পেষণীর ভিতর টানিয়া অত্যন্ত জোরে চাপ দিয়া সমুদয় পাতাগুলিকে অত্যন্ত সুদৃঢ় করিয়া কাটিবার উপযুক্ত করা হইয়া থাকে। নিম্নভাগের "রোলার অর্থাৎ পেষণীর ব্যাস রেখার আয়তন অত্যন্ত বড়। এই রোলার কাষ্ঠ নির্ম্মিত এবং ইহা এ প্রকার সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে যে কাটিবার ছুরি ইহার ধারে আসিয়া বাধা প্রাপ্ত হইয়া থামিয়া যায়। উপরের রোলারগুলি ক্ষুদ্রায়তন এবং তাহা ধাতু নির্ম্মিত। এই রোলার দুটী বারকোষ হইতে চাপ দিয়া তামাক পাতা গুলিকে ছুরিরমুখে ফেলিয়া দেয় এবং ছুরির ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে সঙ্গে "রোলার" দুটীও একভাবে ঘুরিতে থাকে। ইহার এক ধারে "হুইল বা চাকা সংলগ্ন রহিয়াছে, এই চাকার নির্দ্ধারণমতে মসৃণ ও রুক্ষ তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রকার প্রকাণ্ড কল দ্বি অশ্ববল মাত্র শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইলে প্রতি ঘণ্টায় ১নং ২০০ পাউণ্ড, ২নং ৩০০ পাউণ্ড এবং ৩নং ৬০০ পাউণ্ড তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। তামাক এইপ্রকারে কর্ত্তিত হইয়া গেলে পর কলের ভিতর হইতে বাহির করিয়া একটী পাত্রে ঢালিয়া গ্যাসের শিখায় উত্তপ্ত করতঃ হস্তদ্বারা উত্তম রূপে নাড়িয়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়, পরে অত্যন্ত পাতলা হইয়া উঠিলে তামাক প্রস্তুত সম্পূর্ণ হইল বলিয়া জানিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)।

কৃষি প্রবাদ।

শ্রীরাজ নারায়ণ বিশ্বাস লিখিত

বৃষ্টি বিজ্ঞান।

বিগত বর্ষের চৈত্র সংখ্যা কৃষকে বৃষ্টি বিজ্ঞান আলোচনা কালে অনেক গুলি কৃষি প্রবাদ সন্নিবেশিত করিয়াছি এস্থলে বৃষ্টি জ্ঞান সম্বন্ধীয় আরও কতকগুলি প্রবাদের উল্লেখ করিতে চাই। কিন্তু তাহার পুর্ব্বে কৃষি পরাশর হইতে পৌষাদি মাসীয় বৃষ্টির লক্ষণ সমূহ সঙ্কলন করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি; কারণ আমাদের মত দেবমাতৃক দেশে বৃষ্টির লক্ষণ নির্ণয় অতীব প্রয়োজন, সুতারাং ত্রিকালজ্ঞ ঋষি হইতে সামান্য চাষীর ভুয়োদর্শনজনিত অভিজ্ঞতা একত্র সংগৃহিত হইলে ঐ সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞানলাভের সহায়তা হইবে ইহা আমার স্থির বিশ্বাস। এই জ্ঞানটুকু কাজে লাগাইতে পারিলে সুবৎসর হউক বা দুর্ব্বৎসর আসুক সুচাষীকে কোন কালে নিতান্ত বিপন্ন বা অভিভুত হইতে হইবে না। ভগবানের রাজ্যে ধ্বংশই এক মাত্র নিয়ম নহে, ধ্বংশের সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি হইতেছে, অজন্মার পর নিশ্চয় সুজন্মা হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল ব্যাপি অনাবৃষ্টির পর সুবৃষ্টি হইয়া থাকে, অতি বৃষ্টিতে সব ধ্বংশ হইলে পরে সুধারা বর্ষণে চতুর্গুণ শস্য উৎপন্ন হয়। যাহার জ্ঞানোদয় হইয়াছে তাহার লক্ষ্যস্থির হইয়াছে, সে আর স্রোতেভাসমান তৃণের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বিপন্ন হইয়া পড়ে না।—

পৌষ মাসীয় বৃষ্টির লক্ষণ।—পৌষ মাস সমস্ত বৎসরের সুচী স্বরূপ। পৌষ মাসের প্রত্যেক দিনের আবহাওয়ার ঠিক করিয়া রাখিলে সমস্ত বৎসরের জলহওয়ার কথা বলিয়া দিতে পারা যায়।

সার্দ্ধং দিনদ্বয়ং মানং কৃত্বা পৌষাদিনা বুধঃ।
গণয়েন্মাসিকীং বৃষ্টিমবৃষ্টিং বানিলক্রমাৎ॥
সৌম্যবারুণয়োর্ব্বৃষ্টিরবৃষ্টিঃ পূর্ব্বযাম্যয়োঃ।
নির্ব্বাতে বৃষ্টিহানিঃ স্যাৎ সঙ্কুলে সঙ্কুলং জলম্॥

পৌষমাসে প্রতি আড়াই দিনে পৌষাদি প্রত্যেক মাসের (যেমন—প্রথম আড়াই দিন পৌষ, দ্বিতীয় আড়াই দিন মাঘ ইত্যাদি ক্রম বার মাসের) লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। পৌষের যে সময়ে যে মাসের অধিকার, সেই সময়ে বৃষ্টি হইলে বর্ষের সেই মাসে বৃষ্টি হইবে। বায়ুর গতি অনুসারেও বৃষ্টি স্থির করা যায়। পৌষ মাসে উত্তর বা পশ্চিম দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইলে সুবৃষ্টি এবং পূর্ব্ব বা দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রবাহিত হইলে অল্প বৃষ্টি হয়। বায়ু উত্তমরূপ প্রবাহিত না হইলে বৃষ্টি হইবে না এবং গোলমেলে ভাবে প্রবাহিত হইলে বৃষ্টি হয় না।

একৈকং পঞ্চদণ্ডেন মাসস্য দিবসো মতঃ।
পূর্ব্বার্দ্ধে বাসরী বৃষ্টি রুত্তরার্দ্ধে চ নৈশিকী॥
দত্ত্বা দণ্ডে পাতকান্তু বাতস্যানুক্রমেণ চ।
বিজ্ঞেয়া মাসিকী বৃষ্টির্দৃষ্ট্বা বাতং দিবানিশম্॥

দিনের প্রত্যেক পাঁচদণ্ডে পৌষাদি মাসের এক এক মাস স্থির করিবে। যে পাঁচদণ্ডে যে মাসের অধিকার, সেই পাঁচদণ্ডের প্রথমার্দ্ধে বৃষ্টি হইলে সেই মাসের দিবাভাগে এবং শেষার্দ্ধে হইলে রাত্রিতে বৃষ্টি হইবে। পতাকাস্থাপন করিয়া বায়ুর গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মাসিক বৃষ্টি নির্ণয় করিবে॥

ধূলীভিরেব ধবলীকৃতনস্তরীক্ষং বিদ্যু-
চ্ছটাচ্ছুরিতবারুণদিগ্বিভাগম্।
পৌষে যদা ভবতি মাসি সিতে চ পক্ষে
তোয়েন তত্র সকলা প্লবতে ধরিত্রী॥

পৌষে মাসি যদা বৃষ্টিঃ কুজ্ঝটির্ব্বা যদা ভবেৎ
তদাদৌ সপ্তমে মাসি তাং তিথিং প্লাব্যতে মহী॥

পৌষে মাসি শুক্লপক্ষে আকাশ যদি ধুলিসমাচ্ছন্ন এবং পশ্চিম দিক্ বিদ্যুচ্ছটাদ্বারা ব্যাপ্ত হয়, তবে সমস্ত পৃথিবী জলে প্লাবিত হইবে। পৌষ মাসে যে তিথিতে বৃষ্টি বা কুজ্ঝটিকা হইবে, সেই হইতে সপ্তম মাসে সেই তিথিতে পৃথিবী জলপ্লাবিত হইবে।

"জ্যৈষ্ঠে শুকো আষাঢ়ে ধারা।
শস্যের ভার না সহে ধরা॥"

জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি না হইয়া আষাঢ় মাসে বর্ষা আরম্ভ হইলে, সে বৎসর প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে।

"বামুন বাদল বান।
দক্ষিণা পেলেই যান।

ব্রাহ্মণ, বাদল, বান দক্ষিণে পাইলেই যান, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দক্ষিণা পাইলেই গমন করেন এবং বাদল ও বান দক্ষিণ দিক হইতে বায়ু বহিলেই

ছাড়িয়া যায়। দক্ষিণ দিক হইতে বহিলে প্রায়ই বৃষ্টি হয় না। তজ্জন্য বাদলা ও বান থাকে না।

কৃষি পরাশের জ্যৈষ্ঠ মাসে নিম্নলিখিত রূপ বৃষ্টি লক্ষণ নির্ণিত আছে।

চিত্রাস্বাতিবিশাখাসু জ্যৈষ্ঠে মাসি নিরভ্রতা।
তাস্বেব শ্রাবণে মাসি যদি বর্ষতি, বর্ষতি॥

জ্যৈষ্ঠমাসে চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা নক্ষত্রে যদি আকাশ মেঘশূন্য হয় এবং শ্রাবণমাসে ঐ সকল তিথিতে যদি বৃষ্টি হয়, তবে সে বৎসর বর্ষা হইবে॥

"মাঘ মাসে বর্ষে দেবা।
রাজা ছেড়ে প্রজার সেবা॥"

মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলে. প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মে। সুতরাং প্রজা অর্থাৎ চাষী সুখী হয়।

"মিথুনে লট পট।
কর্কটে ছর কট॥
সিংহ চট্‌কা।
কন্যা কানে কান।
বিনা ব্যায়ে তুলা বার্ষ কোথা থোব ধান॥"

মিথুনে অর্থাৎ আষাঢ় মাসে আবাদোপযোগী সামান্য বৃষ্টি হইয়া আবাদ চলিলে, কর্কটে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া মাঠ প্লাবিত হইলে, সিংহে অর্থাৎ ভাদ্র মাসে অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া জমির জল শুষ্ক হইবার উপক্রম হইলে, কন্যা অর্থাৎ অশ্বিন মাসে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া ধানের জমি জল পূর্ণ হইলে এবং তুলা অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত না হইয়া বৃষ্টি হইলে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে। যদি কোন বৎসরএই রূপ ভাবে বর্ষা হয়। তাহা হইলে এত পরিমাণে ধান্য জন্মে যে কৃষক ধান্য রাখিবার স্থান কুলায় না।

মহামুনি পরাশর আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে কি রূপ বৃষ্টি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন দেখুন :—

আষাঢ়্যাং পৌর্ণমাস্যাং সুরপতিককুভং
বাতি বাতঃ,
সুবৃষ্টিঃ শস্যধ্বংসং প্রকুর্য্যাদ্দহনদিশি গতে
মন্দবৃষ্টির্যমেন।
নৈঋর্ত্যাং শস্যহানির্বরুণদিশি জলং বায়ুনা
বায়ুকোপঃ,
কৌবের্য্যাং শস্যপূর্ণাং প্রথয়তি নিয়তং
মেদিনীং শস্যমীশে॥

আষাঢ়ী-পূর্ণিমায় বায়ু পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইলে সুবৃষ্টি, অগ্নিকোণে প্রবাহিত হইলে শস্যনাশ, দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইলে অল্পবৃষ্টি, নৈঋর্ত কোণে প্রবাহিত হইলে শস্যহানি, পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইলে বৃষ্টি, বায়ুকোণে প্রবাহিত হইলে বায়ুর প্রবলতা এবং উত্তরদিকে ও ঈশানকোণে প্রবাহিত হইলে পৃথিবী শস্যপূর্ণা হয়। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে যদি বৃষ্টি হয়, তবে সে বৎসর সুবর্ষা হইয়া থাকে। ঐ তিথিতে যদি বৃষ্টি না হয়, তবে সে বৎসরে বৃষ্টির আশা নাই। আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে নির্ম্মল সূর্য্য উদিত হইয়া ক্রমশঃ খরতর কিরণ ও মণ্ডলাকার হইয়া অস্তগমনকালে যদি মেঘাবৃত হয়, তবে সেই হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত মেঘ গর্জ্জন করিতে থাকে অর্থাৎ বৃষ্টি হয়।

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে নবম্যাং যদি বর্ষতি।
বর্ষত্যেব তদা দেবস্তত্রাবৃষ্টৌ কুতো জলম্॥
শুক্লাষাঢ়ীনবম্যামুদয়গিরিতটীনির্ম্মলস্তং প্রয়াতে
স্বীয়ং কালং বিধত্তে,খরতরকিরণো
মণ্ডলাকারমুখ্যম্।
জামূতৈর্ব্বেষ্টিতোহ সৌ যদি ভবতি
রবির্গম্যমানেহস্তশৈলে
তাবৎপর্য্যন্তমেব প্রণদতি জলদো যাবদস্তং
তুলায়াঃ॥

"যদি বর্ষে অগানে।
রাজা যান মাগনে ॥
যদি বর্ষে পৌষে।
কড়ি হয় তুষে ॥"

যদি অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে কীটাদি কর্ত্তৃক ধান্য নষ্ট হয়, তজ্জন্য প্রজারা ভালরূপ ধান্য না পাওয়ায় রাজস্ব দিতে অক্ষম হয়। সুতরাং রাজাকে বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পৌষ মাসে বৃষ্টি হইলে ধান্য প্রায় ঝরিয়া যায়, তজ্জন্য ধান্যের মূল্য অত্যধিক হয়। সে সময়ে তুষেও কড়ি হয় অর্থাৎ তুষ বিক্রয় করিয়াও মূল্য পাওয়া যায়।

"জ্যৈষ্ঠে মারে, আষাঢ়ে ভরে।
কাটিয়া মাড়িয়া ঘর করে" ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসে অনাবৃষ্টি হইয়া. আষাঢ় মাসে জমি জল পূর্ণ হইয়া ধান্যের আবাদ চলিলে, সে বৎসর নিশ্চয়ই ধান্য জন্মে। সুতরাং কাটা মাড়ার কার্য্য চলে।

মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হইলে কত যে উপকার হয় তাহা আমরা "ধন্য রাজা পুণ্য দেশ যদি বর্ষে মাঘের শেষ" এই প্রবাদ বাক্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি। মহামুনি পরাশরও মাঘ মাসের বৃষ্টির অশেষ গুণ তাঁহার কৃষি সংগ্রহে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অগ্রহায়ণে বৃষ্টিতে ভাল কিংবা মন্দ তাহার বিচার তৎকৃত বৃষ্টি সংগ্রহে দেখিতে পাওয়া যায় না।

মাঘস্য সিতসপ্তম্যাং বৃষ্টির্ব্বা মেঘদর্শনম্।
তদা সংবৎসরো ধন্যঃ সর্ব্বশস্যফলপ্রদঃ ॥
সপ্তম্যাং স্বাতিযোগে.যদি পতিত জলং
মাঘপক্ষেহন্ধকারে
বায়ুর্ব্বা চণ্ডবেগঃ সজলজলধরো গর্জ্জিতো
বাসরে বা।
বিদ্যুন্মালাকুলং বা যদি ভবতি নভো
নষ্টচন্দ্রার্কতারম্
তাবদ্বর্ষন্তি মেঘাঃ প্লুতধরণিতলে
যাবদাকার্ত্তিকান্তম্ ॥
মাঘে বহুলসপ্তম্যাং তথৈব ফাল্গুনস্য চ।
চৈত্র-শুক্লতৃতীয়ায়াং বৈশাখে প্রথমেঽহ্ন ॥
এতাসু চণ্ডবাতো বা তড়িদ্বৃষ্টিরথাপি চ।
তদা স্যাৎ শোভনা প্রাবৃট্ ভবেৎ শস্যবতী
ক্ষিতিঃ ॥
ধনুর্ম্মকরকুম্ভেষু যদা বর্ষতি বাসবঃ।
তদাদিসপ্তমে মাসি বারি পূর্ণা ভবেন্মহী ॥

মাঘ মাসের শুক্লসপ্তমীতে যদি বৃষ্টি বা মেঘদর্শন হয়, তবে সে বৎসর সর্ব্বশস্যপূর্ণ এবং ধন্য হইয়া থাকে। মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে স্বাতী নক্ষত্রের যোগে যদি জল হয়, অথবা প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, কিংবা দিবাভাগে সজল মেঘ গর্জ্জন করে, অথবা আকাশ বিদ্যুৎ সমূহে ব্যাপ্ত এবং চন্দ্র নক্ষত্র অদৃষ্ট হয়, তবে সেই হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত সুচারুরূপে বৃষ্টি হইবে। মাঘ ফাল্গুনের শুক্ল পক্ষের সপ্তমীতে, চৈত্রের শুক্ল তৃতীয়ায়, বা বৈশাখের প্রথম দিবসে যদি ঝড় বা বিদ্যুৎ বৃষ্টি হয়, তবে সে বৎসর সুবর্ষা এবং পৃথিবী শস্যপূর্ণ হইবে। কিন্তু অগ্রহায়ণ, মাঘ বা ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হইলে, বৃষ্টির দিবস হইতে সপ্তম মাসে ধরিত্রী বারিপূর্ণ হইয়া থাকে এই পর্য্যন্ত বলিয়াই খান্ত হইয়াছেন।

জ্যৈষ্ঠ—১৩১৭।

ভারতের চাষী।

আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি যে ভারতীয় কৃষির উন্নতি বিধান করিতে হইলে ভারতীয় চাষী সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ পাতান আবশ্যক। চাষীদের কি অভাব তাহারাই অধিক বুঝে, তাহাদের কোথায় বেদনা তাহারাই অধিক জানে, বেদনার স্থান নির্ণয় না হইলে যথা তথা ঔষধ প্রয়োগ বৃথা।

ভারতের অধিকাংশ স্থলে মৃত্তিকা খুব উর্ব্বরা ও সহজেই আবাদ করিবার যোগ্য। এমন অনেক জায়গা আছে যথায় বৎসরে একবার নদীর জলে প্লাবিত হয় পরে সেই পলিপড়া জমিতে যে চাষ কর না কেন ষোল আনার উপর ফসল হইবে। গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধুনদ, মহানদী, দামোদর প্রভৃতি কত নদ নদী আছে যাহার উপকুলে বিস্তৃত শস্য ক্ষেত্র সমূহে অনায়াসে বা অল্পায়াসে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের নানা স্থানে শস্য-সম্পদেরত কথাই নাই। তথায় দেবানুগ্রহে বৃষ্টির জলে চাষীরা তুড়ি দিয়া কাজ সারিয়া লয়। এক বৎসর যদি দেবানুগ্রহে বঞ্চিত হয় পর বৎসর দ্বিগুণ ফসল পায়, মোটের উপর লোকসান হয় না। এ দেশে এত সহজে চাষ আবাদ হয় বলিয়া এ দেশের চাষীরা এত অলস স্বভাব। এই এখানেই এক স্থানের সহিত অন্য স্থানের তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, পূর্ব্ব ও নিম্নবঙ্গের জল প্লাবিত অধিকাংশ শস্যক্ষেত্রে এক ধান পাট ব্যতীত কিছুই হয় না, চাষীরা ক্ষেত্রে ধান পাট জন্মাইয়া লইয়া বাকী সময় আলস্যে কাটায় কিন্তু সাহাবাদ কিম্বা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অনেকানেক স্থানে চাষের জন্য পর্য্যাপ্ত জল মিলা ভার তথাপি সে দেশের চাষীরা বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া কুপাদি হইতে জল উঠাইয়া ক্ষেত্রে দেয় এবং এক ক্ষেত্র হইতে দুই, তিনটী বা ততোধিক ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করে। তথাপি অন্য দেশের সহিত তুলনায় তাহাদের চেষ্টা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। এমেরিকায় গমের চাষ হয়, এদেশেও হয়। এদেশে গমের ফলন বাড়িবে কি কমিবে সে দিকে অনেক চাষীরই লক্ষ্য নাই কিন্তু এমেরিকাবাসীরা চেষ্টা করিতেছে, যে গমগাছে দশটী শস্য হয় সেই গাছে কি প্রকারে এগারটী ফলান যায়।

অভাবই উন্নতির মূল। তাদৃশ অভাবছিল না বলিয়া ভারতীয় চাষী উন্নতিশীল না হইয়া অমনোযোগী। বঙ্গদেশে অনেক চাষী আছে যাহারা ক্রমাগত নূতন আবাদ খুঁজিয়া বেড়ায়। সহস্র সহস্র বিঘা জঙ্গল পড়িয়া আছে জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া আবাদ আরাম্ভ করিল, তিন, চারি, পাঁচবৎসর পর্য্যাপ্ত ফসল মিলিল আবার তথা হইতে কিছুদূরে আবার নূতন আবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। যখন নূতন নূতন জমি মিলিতেছে তখন কেন তাহারা পুরাতন জমির কারকিৎ মেরামত করিতে ও সার প্রভৃতি প্রদান করিয়া উর্ব্বরতা ঠিক রাখিবার জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিবে? কিন্তু এখন আর অমনোযোগে কাল কাটাইলে চলিবে না। যদিও আসামে, সুন্দর বনে, সিংভূম, মানভূম ও ময়ূরভঞ্জে বিস্তর জমি পতিত রহিয়াছে কিন্তু অধিক দিন আর তাহা পড়িয়া থাকিবে না। আমাদের দেশের অভাব শতগুণ সহস্র গুণ বাড়িয়া

গিয়াছে, খরচের মাত্রা যেমন বাড়িয়াছে আয়ের মাত্রাও তদ্রূপ বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। লোক সংখ্যাও বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, নূতন জমি যেমন বাড়িতেছে সেইরূপ আবার বৎসরের পর বৎসর ফসল উৎপাদন দ্বারা বহু বিস্তৃত ভূমি সকল নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। চারি, পাঁচ বিঘা জমি চাষ করিয়া অগ্রে যাহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত এখন আর তাহাতে একজনেরও কুলায় না। এখন চারি দিকেই অভাব, অন্নের অভাব অনুভূত হইতেছে। সুতরাং এখন অমনোযোগ বা আলস্যে কাল কাটাইলে চলিবে কেন!

গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য নানা প্রকার উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছেন, সুশিক্ষিত, কৃষিতত্ত্ববিদ্ নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু কৃষকদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে, তাহাদের কি অভাব জানিতে না পারিলে বা যে স্থানের কৃষকগণকে শিখাইতে যাইতেছেন সেখানকার কৃষি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে কোন আয়োজনে ফল হইবে না। সুন্দরবনের লোনা জমিতে যদি পাট চাষের বা বঙ্গদেশের যেখানে বারিপাত অধিক মাত্রায় হয় তথায় যদি তুলা চাষের আয়োজন করা হয় তাহা হইলে কি সে আয়োজন সফল হইবে, না এই রূপ উদ্যোগ, আয়োজনে এবং বৃথা অর্থব্যয়ে স্থানীয় চাষীদের প্রাণে স্বতঃই একটা অবিশ্বাসের ভাব জন্মিলে মূল উদ্দেশ্য—কৃষকগণের শিক্ষা সংকল্প—অনেকটা পিছাইয়া পড়িবে না? মধ্য প্রদেশে অনেক ব্রাহ্মণ চাষী সুবিস্তৃত ক্ষেত্র রচনা করিয়া তাহাতে অনেক মূলধন খাটাইতেছেন। তাঁহারা পরীক্ষার জন্য যে জমিতে কেবল এখন ধান জন্মান হয়, তাহাতে ধান ও তুলা বা ধান ও জোয়ার চাষ করিতে পারেন, বা চাষের জন্য উন্নত প্রণালীর লাঙ্গলাদি ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু যাহাদের জমি অতি সামান্য এবং যাহারা ঋণ করিয়া চাষ করিতেছে এমন ছোট চাষীর পক্ষে এরূপ পরীক্ষা সাজে না। এই মধ্য প্রদেশে এমন জঙ্গলী চাষী আছে যে তাহারা জমি কর্ষণের মূল্য বুঝে না বা জমিতে ভালরূপ চাষ দিতে জানে না, তাহাদের হালবাহী বলদের অবস্থা শোচনীয় এবং তাহারা গোময়াদি সার কি রূপে রক্ষা করিতে হয় জানে না, এরূপ চাষীদিগকে একটা জমি হইতে দুই বা ততোধিক ফসল উৎপন্ন করিতে বলা বা জমির ঘাস মারিবার জন্য র‍্যানসোমস্ উল্টা পাখা লাঙ্গল ব্যবহার করিতে বলা আর অরণ্যে রোদন উভয়ই সমান। বরং তাহাদের ধান কেবল বুনানি না করিয়া বীজ ধান রোপণ করিতে শিখান উচিত, যাহাতে হাল লাঙ্গলের সুব্যবস্থা হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। অনাবৃষ্টির সময় জল সেচিয়া ক্ষেতের ফসল রক্ষা করিতে শিখাইলে, সার নষ্ট না করিয়া জমিতে প্রদান করিতে শিখাইলে, তাহাদের অধিকতর উপকার করা হইবে। দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া ব্যবস্থা করাই আমাদের কর্ত্তব্য; নতুবা চেষ্টা, যত্ন ও অর্থব্যয় সকলই বৃথা।

আমাদের দোষে, আমাদের চাষীদের দোষে, ভারতের বর্ত্তমান কৃষির এইরূপ অবনত অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। চলিত কথায় বলে "কালি, কলম, মন লেখে তিন জন" তেমনি চাষের জন্য উত্তম বীজ, উর্ব্বরা ক্ষেত্র এবং উদ্যোগী কৃষাণের আবশ্যক। এই তিনটীরই অভাব, তাই ভারতের কৃষির এত দুর্দ্দশা। এদেশের অধিকাংশ চাষী ভাল বীজের কদর বুঝে না। অনেক সময় অন্যের নিকট হইতে যা তা বীজ সংগ্রহ করিয়া কোন প্রকারে চাষের কার্য্য সম্পন্ন করে। বীজ নির্ব্বাচন যে কি বা কি

প্রকারে বীজ নির্ব্বাচন করিতে হয় তাহা অনেকেই জানে না। বীজ নির্ব্বাচন মানে গাছ নির্ব্বাচন ধান বল, পাট বল, শসা, কুমড়া, বেগুণ প্রভৃতি সব্জী বল সারবান ক্ষেতে জন্মাইয়া সেই ক্ষেতের মধ্যে যে গাছটী সতেজে, সজোরে জন্মিবে তাহা বীজের জন্য রক্ষা করিতে হইবে এবং সংগৃহিত বীজ আবার বাছাই করিয়া লইতে হইবে। এক বৎসর বীজ নির্ব্বাচন করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে বৎসর বৎসর এই কার্য্য করিতে হইবে এবং ক্রমে নিকৃষ্ট জাতীয় বীজ হইতে উৎকৃষ্ট এবং বিশেষ জীবনীশক্তী সম্পন্ন বীজ উৎপন্ন হইবে। বীজ রক্ষার জন্য এতটা যত্ন সাধারণ চাষী একেবারেই করে না।

ভারতের চাষীদের সহিত যতই মিশিবে ততই দেখিতে পাইবে যে তাহারা তাহাদের ক্ষেতের উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য তাদৃশ সচেষ্ট নহে। তাহার কারণ একটি নহে অনেক গুলি, অধিকাংস্থানে জমিতে প্রজার কায়েমী সত্ব নাই; বঙ্গদেশে যদিও অনেক প্রজার কায়েমী সত্ব আছে কিন্তু ঐ সকল প্রজার জমি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে তাহারা তাহাদের জমি হইতে এমন কিছু পায় না যাহাতে জমিদারের খাজনা, কর্জ্জ টাকার সুদ, নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইয়া সে জমির উন্নতিকল্পে পয়সা ব্যয় করিবে। ভদ্রলোকের অনেকের বড় বড় নিজ চাষের জমি আছে কিন্তু লোক জনে তাঁহাদের জমি চাষ করে তাঁহারা জমির অবস্থা সচক্ষে দেখেন না বা চাষ তাঁহাদের উপজীবকিা নহে সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের জমির উন্নতি কল্পে যত্নবান হইবেন এ রূপ আশা করা যায় না। ভারতবর্ষে নীলকর, চা-কর ব্যতীত চাষ ব্যবসায়ী এমন কোন সম্প্রদায় আগে ছিল না। সকলেই নিজের মত কিছু কিছু চাষ আবাদ করিত, উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রয় করিয়া দিন পাত করিত কিন্তু দুই বা পাঁচ হাজার বিঘাজমি লইয়া বহু মূলধন সংগ্রহকরিয়া ব্যবসায়ের জন্য চাষে লিপ্ত আছে এমন দৃষ্টান্ত অতি বিরল ছিল। এখন ক্রমশঃ দুই একজনকে এই রূপ চাষব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে। কি জমিদার কি ব্যবসায়ী যিনিই চাষের ব্যাপারে লিপ্ত হউন না কেন, মাহিনা করা মজুর লইয়া চাষে লিপ্ত না হইয়া, যদি দেশের চাষীদিগকে সঙ্গে লন এবং তাহাদিগকে উদ্বৃত্ত ফসলের অংশ দেন তাহা হইলে জমিদারেরও কল্যাণ, চাষীদেরও কল্যাণ হয়। আমাদের দেশের কোন চাষী জমিতে সার দিতে জানে না, জমির পাট করিতে জানে না বা ভাল জমির আদর করে না এমন নহে বরং কেহ কেহ এই সকল বিষয় ভাল রূপই বুঝে কিন্তু তাহারা কি করিবে, হয় তাহাদের হাল গরু কিনিবার টাকা নাই না হয় তাহারা ইচ্ছাধীন প্রজা। তাহাদের উপযুক্ত পরিমাণ চিরস্থায়ী সত্বের জমি নাই, কিম্বা উন্নত প্রণালীতে চাষ করিবার জন্য নূতন নূতন কৃষিযন্ত্র, উত্তম সার, উত্তম বীজ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই, তাই তাদের এই দুর্গতি। রাজপুরুষগণ বা জমিদারের কর্ম্মচারী গণের তাহাদের বেদনায় সহানুভূতি নাই সেই জন্য তাহারাও তাঁহাদের খামখেয়ালী উপদেশে আস্থা স্থাপন করে না। এজন্য আমাদের কৃষকগণ কেবল দায়ীনহে আমরাও সম্পূর্ণ দায়ী।

আমাদের এই বাংলাদেশে এমন চাষী আছে যে তাহারা বিঘাতে ১৪০০ কপি জন্মাইতে পারে, প্রত্যেক কপিটা ৭।৮ সেরর কম হইবে না এবং খুব কম ৵ আনা মূল্যে বিক্রয় হইবে তারপর সেই খৈল দেওয়া ক্ষেতে মাঝে মাঝে কুমড়া বীজ বসাইবে এবং কপি উঠিয়া গেলে কুমড়া হইতে আরও ৭০৲ ৭৫৲ টাকা পাইবে। আমাদের দেশের চাষীতে বিঘায় ২৫ মণ সরিষায় খৈল দিতে জানে এবং

ভাল আলু বীজ নির্ব্বাচন করিয়া বিঘাতে ২০০।২৫০ মণ আলু ফলায় এবং তাহারা ক্ষেতে ৫০ মণ গোময় সার পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করে না বরং আমাপা গোময়াদি সার ছড়াইয়া এক বিঘা শসা চাষ করিয়া ৪ মাসের মধ্যে ১৫০৲ শত লাভকরে। অধিকাংশ সুচাষী নিশ্চয়ই সহজে প্রাপ্য এবং স্বভাবজ সারের সন্ধান জানে, পরিমাণ জানে, প্রয়োগের সময় জানে। তাহারা হয়তঃ রাসায়ণিক সারের তত সন্ধান রাখে না কিন্তু একবার সন্ধান জানিলে তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া লইতে তাহাদের কতক্ষণ লাগে কিন্তু তাহাদের আসল কথা শিখায় কে, কে তাহাদের মূলধন দেয়, কে তাহাদের ভাল জমি দেয়, কে তাহাদের অজন্মায় বৎসরে আহার যোগায়! তাহারা অতি দীন, অতি নিস্ব, তাহাদের পেটের ভাতের যোগাড় আগে করিলে তবেত তাহারা উদ্যোগী হইবে। তবেত তাহারা বড় বড় কথায় কান দিবে, তবেত তাহারা পাশ্চাত্য দেশের মত ভারতবর্ষেও অতি সহজে যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারিবে। ধনী সম্প্রদায় ও জমীদারগণ কৃষকের সহিত যোগ না দিলে ভারতের কৃষি চির দিনই এই অবস্থায় থাকিয়া যাইবে।

চা বাগানে কুলী।

মধ্য আফ্রিকায় এখনও দাস ব্যবসায় চলিতেছে। মধ্য আফ্রিকার ভিতর হইতে নিরীহ কুলিদিগকে কখনো লোভ,কখন ভয় প্রদর্শন করাইয়া উপনিবেশ কুলে আনিয়া তাহাদের দ্বারা কো কো প্রভৃতি চাষ সম্পন্ন করা হয়। অবশ্য প্রভুর সহিত তাহাদের এক সর্ত্ত থাকে, কিন্তু সেটা নামে মাত্র সর্ত্ত কারণ সর্ত্তের কোন অংশ অদল বদল করিবার তাহাদের অধিকার নাই, অনেক সময় সাক্ষর পত্রের মধ্যে কি আছে তাহাও তাহারা জানিতে পারে না। আমাদের এই ভারতবর্ষেও প্রত্যক্ষ না হউক পরোক্ষভাবে দাস ব্যবসা চলিতেছে। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র কুলি চা বাগানে আসে কিন্তু অতি অল্প লোকেই স্বেচ্ছায় সেখানে আসিতে চায়। তাহারা জানে যে যাহারা যায় তাহাদের মধ্যে অনেকেরই ফিরিবার আসা নাই। আড়কাটিদের অত্যাচার সহ্য করিতে করিতে তাহারা অনেক কষ্টে চা বাগানে উপস্থিত হয় পথে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইলেও তাহাদের একটি কথাও বলিবার অধিকার নাই। গো মহিষাদি পশুগণকেও বোধ হয় তাহাদের অপেক্ষা অধিক যত্ন করা হয়।

যাহাতে কাহাকেও অনিচ্ছায়, বা অসমর্থ হইলে চা বাগানে পাঠান না হয় সেই জন্য গভর্ণমেণ্টের কুলী পরিক্ষার ব্যবস্থা আছে। পরিক্ষার স্থান চা বাগানে প্রবেশের পথেই। ব্যবস্থা মন্দ বলিব কিসে,—এক জন সুযোগ্য ডাক্তার কুলীরা সমর্থ বা অসমর্থ দেখিয়া ঠিক করিয়া দেন, স্থানীয় একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সম্মুখে কুলীরা তাহাদের সর্ত্তপত্র সাক্ষর করে। তথাপি কুলীগণের নিরতিশয় দুর্ভাগ্যবশতঃ কুলীব্যবসায়ীও আড়কাটিদিগের জালে পড়িয়া তাহারা কোথায় যাইতেছে,

কেন যাইতেছে, কত বৎসরের জন্য যাইতেছে বা তাহাদের পারিশ্রমিক কি তাহা বুঝিবার কোন অবসর থাকে না। কুলীদিগকে সাহেবের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়া পাঠশালের পড়োদের মত সর্ত্তগুলি সমস্বরে একবার বলাইয়া লওয়া হয়। তাহারা বুঝে যে এখানকার এই নিয়ম। এই কথাগুলা এই প্রকারে যেমন তাহারা শিখাইয়াছে তেমনি প্রকারে বলিতে হয়। সকলেই বলিয়া উঠিল "খুসি সে যাতা হ্যায়"। কিন্তু তাহারা খুসিসে কোথায় যাইবে এবং কিসে খুসি, তাহা তাহারা নিজেই বুঝিতে পারে না। এতদিন পথের কষ্ট হয়তঃ তাহারা চা বাগানের স্বর্গ সুখের কল্পনায় নিরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু যখনই বাগানে পৌছিল তখনই তাহাদের সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাদের কোন স্বাধীনতা নাই, তাহারা প্রভুর নজর বন্দী। অনেক সময় প্রভুরা তাহাদের উপর অতিশয় কঠোর ব্যবহার করেন। এমন নরপিচাশ প্রভু আছেন যে তাঁহাদের হাতে পড়িলে আর উদ্ধারের উপায় থাকে না। স্ত্রী কন্যা গণকে এবম্প্রকার প্রভুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। তাহাদের উপর এই লাঞ্ছনা নিরবে সহ্য করিতে হয়। আমরা এমন কথা বলি না যে সকল প্রভুই এই রূপ। আমরা অনেক হৃদয়বান প্রভুর কথা শুনিয়াছি। তাঁহারা বাস্তবিকই কুলীদের "মা বাপ"। তাঁহাদের নিকট তাহারা বিশেষ সচ্ছন্দ উপভোগ করে এবং সময়ান্তে দেশে যাইয়া অনেক স্বজনগণকে চা বাগানে লইয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করে। সিংহভূম, মানভূম, রাঁচি, সাঁওতাল পরগণায় অনেক দরিদ্র লোকের বাস। যদি তাহারা প্রভুর সদ্ব্যবহার পায় তবে স্বেচ্ছায় বিদেশে যাইয়া বসবাস করিতে নারাজ নহে। কেবল বল প্রকাশ না করিয়া সহৃদয়তা দ্বারা কুলীদের হৃদয় অধিকার করা কি সদ্যুক্তি নহে!

ইক্ষু ঘেঁস বসানতে অনিষ্ট।

বঙ্গদেশে অনেক স্থানে ১৷৷০ ফিট হইতে ২৷৷০ ফিট অন্তর ৬ইঞ্চ গভীর নালিতে ইক্ষু রোপণ করা হয়। এই নালি কাটিবার জন্য সাধারণ চাষের কোদাল ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এত ঘেঁস্ করিয়া রোপণ করিলে শেষে ঘাস মারিবার জন্য কোপান কিম্বা আখের গোড়ায় মাটি দিবার অসুবিধা হয় এবং ঐ সকল কারণে ৫ইঞ্চ কিম্বা ৬ইঞ্চের কম চওড়া কোদাল ব্যবহার না করিলে চলে না। কুইন্সল্যাণ্ড বা ফিজি দ্বীপপুঞ্জে ৬ ফিট অন্তর এক একটি নালী খনন করা হয় এবং প্রত্যেক নালিতে ১৮ইঞ্চ অন্তর পাশাপাশি দুইটী করিয়া ইক্ষু বসান হয়। এই প্রথা ৩ ফিট অন্তর ইক্ষু সহিত বসানর প্রায় সমান, তবে পার্থক্য এই যে তিন ফিট অন্তর সারি করিলে ক্ষেতে লাঙ্গল চালান যায় না কিন্তু ৬ ফিট অন্তর সার হইলে লাঙ্গলের দ্বারা চাষ চলে। এই কার্য্যের জন্য বিলাতি ডবল মাউল্ড বোর্ড লাঙ্গল (double mould board) ব্যবহারে খরচ কম পড়ে এবং পরে ক্ষেত কোপান ও মাটি দিবার জন্য হণ্টার হো ব্যবহার করা চলিতে পারে। এই প্রথায় ইক্ষুরোপণ করিলে প্রতি একরে ১২,০০০ বীজ ইক্ষু বসান চলে। বঙ্গদেশের চলিত প্রথায় প্রতি বিঘায় (১ একর =৩ বিঘা) ৩ কাহন বীজ ইক্ষু (৩×১,২৮০) বসান হয়। যদিও বিঘাতে কিছু কম ইক্ষু বসান হইল তাহাতে বড় লোকসান হয় না, হাত কোদালে সমস্ত করিলে যে খরচ পড়ে ইক্ষু ঘন না বসইালে লাঙ্গল দ্বারা চাষের সুবিধা হইয়া অনেক লোকসান বাঁচিয়া যায় কিন্তু দুই কিম্বা এক বিঘা জমি লইয়া এরূপ উন্নত প্রণালীতে ইক্ষু চাষ চলে না।

সমগ্র পৃথিবীর তুলার খরচ।—যে দেশে যত মাকু চলে তাহার হিসাব পাইলে সে দেশে কত

তুলা খরচ হয় তাহার একটা পরিমাণ করা যাইতে পারে। তুলাকল—স্বামীদিগের নিকট হইতে যে হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে,—

যুক্তরাজ্যে	...	২৮,০০০,০০০	মাকু
জার্ম্মানি	...	১০,০৫৮,৩৭০	”
রুসিয়া	...	৮,২০০,০০০	”
ফ্রান্স	...	৭,০৩৩,১৭০	”
ভারতবর্ষ	...	৬,০৫৩,২৩৪	”
অষ্ট্রীয়া	...	৪,৫৫৭,১৩৭	”
ইটালি	...	৪,১৫০,০০০	”
জাপান	...	১,৯৫৪,৪৫০	”
স্পেন	...	১,৯০০,০০০	”
সুইজারল্যাণ্ড	...	১,৪৯৬,৬৯৮	”
বেলজিয়ম	...	১,৩১২,৭৮০	”

চলিতেছে। সমগ্র পৃথিবীতে মোট ১৩৩,৪২১,০০৪ মাকু চলে।

কিন্তু সমগ্র পৃথিবীতে তুলাজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ের হ্রাস হইতেছে, তাহা নিম্নের তালিকায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়,—

প্রত্যেক হাজার মাকুতে কত বেল তুলা খরচ হইয়াছে ৩ বৎসরের তুলনা করা গেল।

	১৯০৯	১৯০৭	১৯০৭
গ্রেট ব্রিটেন	৬৫,৬২	৭২,৭৪	৮০,২৪
যুক্তরাজ্য	২৯৭,১৭	২৬৭,৮২	৪১৮,৭৩
জার্ম্মানি	১৭৩,৬৪	২৯১,৪৫	১৮০,৭২
রুসিয়া	২৩৬,৫৬	২৫০,০৭	২৩৩,৪২
ফ্রান্স	২৪৯,০৯	১৪১,১৭	১৩৯,৮৫
ভারতবর্ষ	৩৮৭,২৯	৩৯৯,২৪	
অষ্ট্রীয়া	১৮৭,৪৫	১৯৩,৭৭	১৯৬,৬৮
ইটালি	২৩৫,৩৮	২৪৫,৬৮	২৫৫,০১
স্পেন	১৭২,১৫	১৮৫,৪৩	৭৮৭,১৯
জাপান	৬১১,৪৩	৬২৫,৩১	৭৮৭,১৯
সুইজরল্যাণ্ড	৬৪,৯২	৬৩,৬০	৬৩,২১
বেলজিয়ম	১৭০,৭৫	১৮২,৭৬	১৭১,৭৫

বিদেশী চিনি।—দেশী চিনির আমদানী খুবই কমিয়া গিয়াছে নাই বলিলেই হয়। দেশী চিনির দামও খুব অধিক। জাভা চিনির আমদানী ক্রমশঃই বাড়িতেছে। জাভা চিনির আমদানী ১৮৬,৭০৮ টন হইতে ২৩০,৫৯২ টন পর্য্যন্ত উঠিয়াছে; ইহার মূল্য ও ৩০৬৬ ক্রোর হইতে ৪০৫৩ ক্রোর বাড়িয়াছে। জাভাতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেছে। তথা হইতে সুপরিষ্কৃত চিনি আমদানী হইতেছে। তথায় এত বড় ব্যবসা হইতে যে লাভ হয় তাহার সমধিক ভাগ ব্যবসায়ের উন্নতি কল্পে ব্যয় হইয়া থাকে। মরিসাস্ হইতেও চিনির আমদানী কম নহে। উহা স্বদেশী চিনি বলিয়া এদেশে চলিতেছে। এমন কি জাভা মরিসস্ হইতে গুড়ও এদেশে আমদানী হইতে সুরু হইয়াছে।

ঔষধ।—বিগত বর্ষে ৬৪ লক্ষ টাকার ঔষধ এ দেশে আমদানী হইয়াছে। ১৯০৮।৯ সাল অপেক্ষা প্রায় ১৪ ভাগ অধিক। কুইনিনের আমদানী সমধিক বাড়িয়াছে। আমদানী ঔষধের প্রায় ৩৪ অংশ কুইনিন ইহার দামও খুব বাড়িয়াছে। আমাদের দেশে, আমাদের দেশের ঘাটে, মাঠে ও বনে জঙ্গলে ঔষধের গাছ গাছড়ার অভাব নাই কিন্তু আমরা য়ুরোপ ও এমেরিকা হইতে আমাদের ঔষধ আমদানী করি। এখানে ঔষধের কারখানার মধ্যে সবে মাত্র এক বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যল ওয়ার্কস্।

সিংহলে কর্পূর।—পূর্ব্বে সিংহল হইতে অনেক টাকার কর্পূর বিদেশে রপ্তানি হইত। বিগত পূর্ব্ব বর্ষে এক চালানে ৯ হন্দর পরিমাণ কর্পূর

রপ্তানি হইয়াছিল। তাহার দাম প্রায় ১,৯৯৫, টাকা। কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে ১১ই মার্চ যে চালান গিয়াছে তাহার পরিমাণ ২ হন্দর মাত্র মূল্য ৫০০৲ টাকা। যাহা হউক এক্ষণে ছয়, সাতশত একরে কর্পূরের আবাদ হইয়াছে। ইহাতে কর্পূর অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মিস্ত্রির কার্য্যে হাতী।—চা বাগানে হাতী মিস্ত্রির কার্য্যে যোগাড় দিতে দেখা যায়। সে মজুরদিগের ন্যায় পাথর, জল, মসলা আনিয়া মিস্ত্রিকে যোগাড় দিতেছে। এমন্‌কি সময় সময়ে পাথর আনিয়া যথা স্থানে ঠিক ঠিক বসাইয়া নিজেই গাঁথিতে থাকে। কার্য্য পরিদর্শকগণ (overseers) এমন ভাবে হাতী তৈয়ারি করেন যে তাহারা যাইয়া কাজ ঠিক হইয়াছে কি না দেখে এবং নূতন কার্য্য আরম্ভ করিতে ইঙ্গিত করে।

কোন এক সময়ে একটা হাতী একটা দেওয়ালের একটা জায়গা গাঁথিয়াছিল। সেখানটা কিন্তু ঠিক গাঁথা হয় নাই। পরিদর্শক দেখিতে যাইবার সময় সে সেই স্থানটী আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। তিনি যখন পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন তখন সে তাড়াতাড়ি সেখানটা চক্ষের নিমিষে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তাহার ভুল কিছুতেই দেখিতে দিল না হাতীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মানুষের অনেক কাজে লাগিতে পারে।

পত্রাদি।

শশা জাতীয় উদ্ভিদের কীট ঃ— বরবাম চা বাগিচা, (আমগুড়ি পোঃ) হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যা চরণ চক্রবর্ত্তী কয়েকটি পোকার নমুনা পাঠাইয়াছেন। ইহারা তরমুজ ক্ষিরা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি নষ্টকরে। প্রেরিত পোকায় নাম Aulacophora foveicollis Kust। ইহারা সাধারণতঃ লাউ কুমড়া, শশা প্রভৃতি গাছে দৃষ্ট হয়। আর্সেনিকযুক্ত বিষদ্রাবণ প্রয়োগে সাধারণতঃ ইহাদের কিছুই হয় না। এই পোকা মারিবার প্রকৃষ্ট উপায় আলোক প্রয়োগ। একটি লণ্ঠনের দুই পার্শ্বে দুইটি রিফ্লেক্টার দিয়া লণ্ঠনটি গুড় অথবা কেরোসিন ও জল পূর্ণ একটি পাত্রে এমন ভাবে রাখিতে হইবে যে পোকা গুলি আলোক দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া উক্ত পাত্রে পড়ে। পোকা গুলি অধিক দিন উড়ে না সুতরাং ৪।৫ রাত্রি আলোক জ্বালাইলেই অধিকাংশ পোকা মরিয়া যায়। পার্শ্বে যত বেশী অকর্ষিত জমি থাকে পোকার দৌরাত্ম্য ততই অধিক হয়। সুতরাং ফসলের জমির পার্শ্বের জমিতে চাষ দেওয়া আবশ্যক। সাদা আলোকের পরিবর্ত্তে নীল আলোক দেওয়া যাইতে পারে। কৃঃ সঃ

ইক্ষুচাষ ঃ—

শ্রীমন্মথ নাথ বিশ্বাস, ভোলাডাঙ্গা।

মাননীয় কৃষক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—
মহাশয়,

বিগত সন ১৩১৪ সালে যথাক্রমে জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসের কৃষক পত্রে 'ইক্ষু' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সারবান্

অবতারণা উহাতে যথেষ্ট আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে প্রবন্ধের যে, অংশে ইক্ষুর আবাদ প্রণালী সন্নিবেশ করা হইয়াছে সেই অংশে লিখিত হইয়াছে যে ইক্ষু রোপণের চব্বিশ পঁচিশ (২৪।২৫) দিন বাদে সমস্ত জমি খনন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই খনন কাষ্য কোন্ অস্ত্র দ্বারা সম্পন্ন করা উচিত তাহা স্পষ্ট বলা হয় নাই। কোদালি দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিলে ইক্ষু রোপণের পূর্ব্বে জমিতে যে কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য নালী করা হইয়াছে তাহার অস্তিত্ব থাকে না। পরন্ত জমির পয়ঃ প্রণালী না রাখিলেও উহাতে জল জমিয়া শস্য নষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কাজেই এক্ষেত্রে কৃষকের এক কার্য্যে দ্বিগুণ শ্রম ও অর্থ ব্যয় হইতেছে।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর মহকুমার অধীন ইক্ষুক্ষেত্র সমূহে কৃষকগণ প্রথমে নালী না করিয়া সমান অন্তরে সারি করিয়া ইক্ষু রোপণ করে; এবং ইক্ষু গাছ বেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে কোদালি দ্বারা দুই শ্রেণী ইক্ষু গাছের মধ্যস্থ জমি হইতে মাটি তুলিয়া ইক্ষু গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেয়। এইরূপ মাটি তোলাতে সমস্ত জমি ক্ষুদ্র ও অপ্রশস্ত অনেক গুলি নালীতে বিভক্ত হয়।

প্রাগুক্তরূপে মাটি তুলিয়া আকের গোড়া বাঁধা সম্বন্ধে প্রবন্ধকার কোন কথা বলেন নাই। বোধ হয় ইহার কোনরূপ উপকারিতা অথবা অপকারিতা নাই সেই জন্য তিনি এ সম্বন্ধে নিস্তব্ধ আছেন। যদি ঐ রূপ গোড়া বাঁধাতে কোনরূপ অপকার না হয় তবে ঐ উপায় অবলম্বন করা বিধেয় কিনা জানিতে ইচ্ছা করি।

[এই প্রকার ইক্ষুচাষে কোন অপকার দেখিতে পাওয়া যায় না; মোট কথা ক্ষেত হইতে জল নিকাশের জন্য পয়ঃনালা চাই এবং ইক্ষুর গোড়াতে সার ও মাটি দেওয়া আবশ্যক] কৃঃ সঃ

ভাল ফুল ফল :—

কোন পত্র প্রেরক লিখিতেছে যে কি প্রকারে ভাল ফুল উৎপন্ন করা যায়।

[দুই এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে, সামান্যতঃ এইটুকু বলাযায় যে, ফল কিম্বা পুষ্প বৃক্ষের গোড়া কোপাইয়া কারকিৎ মেরামত করিলে, এবং উপযুক্ত সার ব্যবহার করিলে তলস্থ মৃত্তিকা সরস রাখিবার ব্যবস্থা করিলে বৃক্ষলতাদি ভাল ফল ফুল প্রসব করিয়া থাকে। বৃক্ষাদির ডাল ছাঁটা ও মাঝে শিকড়াদি ছাঁটাও সুন্দর ফল ফুল প্রসবের অনুকুল ব্যবস্থা। বৃক্ষাদি যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ রৌদ্র বাতাস পায় তাহার ব্যবস্থা করিলে ফল সন্তোষ জনক হয়। অনেক সময় দেখা যায়, যে ফল ফুল অধিক আলোক পায় সে গুলি খাইতে মিষ্ট ও স্বাদু হয়, আলোকে ফুলের রঙ ভাল হয়। ফল ফুলের উন্নতির আর একটী উৎকৃষ্ট উপায় এই যে, সঙ্কর উৎপাদন দ্বারা বীজ বা কলম হইতে উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর ফুল, ফল উৎপন্ন করা যাইতে পারে।] কৃঃ সঃ।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

যুক্ত প্রদেশের শস্য সংবাদ।—হিমালয়ের সন্নিহিত তিনটি জেলায় সামান্য মাত্রায় বারিপাত হইয়াছে। রবিশস্য ঝাড়াই ও মাড়াই হইতেছে। ইক্ষু ও ক্ষেত্রস্থ অন্য ফসলে জল সেচন করিতে হইতেছে এবং ইহাতে ফসলের উপকার দেখা যাইতেছে। আফিম সংগৃহিত হইয়া তৌলান হইতেছে। কোথাও কোথাও গবাদির রোগ দেখা দিয়াছে কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্র গবাদি ভালরকমই

আছে, পশু খাদ্য প্রচুর সঞ্চিত আছে। খাদ্য শস্যের দাম কোথাও বাড়ে নাই বরং অনেক স্থানে কমিয়াছে।

বঙ্গদেশের গমের আবাদ—১৯০৯।১০। বিহারে প্রধানতঃ গম উৎপন্ন হইয়া থাকে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও হাজারিবাগেও গমের চাষ হয়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে গম বুনানির সময় যদিও সব জেলাতে বৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু ঠিক আবশ্যক মত হয় নাই। অগ্রহায়ণ পৌষের বৃষ্টিতে গমের খুব উপকার হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে ১,৪২৬,৯০০ একর পরিমাণ জমিতে গম চাষ হইয়াছে, বিগত বর্ষে ১,২৫৫,২০০ একর জমিতে গমের আবাদ হইয়াছিল। গম বুনিবার সময় জল হাওয়া অনুকুল ছিল বলিয়া বর্ত্তমান বর্ষে অপেক্ষা কৃত অধিক জমিতে গমের চাষ হইয়াছে।

বিহারে চৌদ্দ আনা ফসল জন্মিয়াছে এবং মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হাজারিবাগ ও অন্যত্র যেখানে যেখানে গম চাষ হয় তথায় বার আনা হইতে তের আনা ফসল জন্মিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। মোটের উপর সমগ্র বঙ্গদেশে বর্ত্তমান বর্ষে ৫৪০,৭০০ টন গম উৎপন্ন হইয়াছে, বিগত বর্ষে ৩১৯,৮০০ টন মাত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। সমস্ত জেলায়ই পূর্ব্ব বৎসরের গম অল্পই সঞ্চিত আছে।

নিম্নে কয়েক বৎসরের প্রতি টাকায় গমের দরের একটা তালিকা দেওয়া গেল।—

	১৯০৭	১৯০৮	১৯০৯	১৯১০
*	১০ সের ৫ছ	৭ সের০ছ	৭ সের ৪ছ	৯ সের০ছ
ক	১১-৪	৭-১	৮-৩	৯-৯

* কলিকাতার বাজার দর।
ক। বঙ্গের অন্যান্য জেলায় গড় দর।

কলিকাতা হইতে ১৯০৯ সালের এপ্রিল হইতে ১৯১০ সালের জানুয়ারি পর্য্যন্ত ৩,৫৪০,০৮৪ মণ গম বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময়ের মধ্যে ৬২,২১৭ মণ মাত্র রপ্তানি হইয়াছিল। রপ্তানি অপেক্ষা আমদানী অধিক। এই সময়ের মধ্যে ৭,১৯৫,০৮৩ মণ গম কলিকাতায় আসিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের আমদানী অপেক্ষা দ্বিগুণেরও অধিক।

বঙ্গদেশের তৈল শস্য—১৯০৯।১০ তৈল শস্যের আবাদ বিহার ও ছোট নাগপুর বিভাগেই অধিক। সর্ব্বত্র প্রায় সময় মত তৈলশস্যের আবাদ আরম্ভ হইয়াছিল কেবল প্রেসিডেন্সী বিভাগে কার্ত্তিকের প্রথমে খুব ঝড় জল হওয়ায় তৈলশস্যের আবাদ একটু বিলম্বে আরম্ভ হইয়াছিল। গমের ন্যায় ইহারও অগ্রহায়ণ পৌষের বৃষ্টিতে খুব উপকার দর্শিয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে ১,৮২৪,৭০০ একর পরিমাণ জমিতে তৈলশস্যের আবাদ হইয়াছে, গতপূর্ব্ব তৈলশস্যের আবাদী জমির পরিমাণ ১,৫৫৭,৯০০ একর ছিল।

বৰ্দ্ধমান, বালেশ্বর ও রাচিতে ষোল আনা ফসল জন্মিয়াছে অন্য ছয়টী জেলার পনর আনা, অপর তিনটী জেলায় বার আনা হইতে তের আনা, বাকী উনিশটি জেলায় দশ হইতে বার আনা ও কেবল মুর্শীদাবাদ, যশোহরে নয় আনা ফসল জন্মিয়াছে। তিসি, রাই এবং শরিষা প্রতি একরে ৬ মণ জন্মিয়াছে অনুমান করিয়া লইলে এবং অন্যান্য তৈল শস্য প্রতি একরে ৪½ মণ জন্মিয়াছে ধরিয়া লইলে সমগ্র বঙ্গে বর্ত্তমান বর্ষে ৩০৮,১০০ টন তৈল শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। বিগত বর্ষের উৎপন্ন তৈলশস্যের পরিমাণ ১৮৯,৭০০ টন মাত্র।

এক একর=৩ বিঘা; একটন=২৭॥ মণ

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের শস্য সংবাদ।— জ্যৈষ্ঠের শেষ ভাগে সর্ব্বত্র প্রায় সুবৃষ্টি হইয়াছে। রাজসাহী বিভাগে কিছু অধিক। অল্প হউক অধিক হউক সকল জায়গায় বৃষ্টি পড়িয়াছে।

আউস ধান ও পাট বুনানি হইতেছে। শারদীয় ধান্য আহরণ করা চলিতেছে।

খাসিয়া পর্ব্বতে আলু তোলা হইতেছে।

সবুজ মক্ষি ও লাল মাকড়সা চা বাগানে দেখা দিয়াছে।

চা আবাদের অবস্থা ভাল। পাট হৈমন্তিক আউস এবং তিল চাষও উত্তম বসিয়াছে।

মোটা চাউলের দর মোটের উপর সমান আছে।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, নাগা পর্ব্বত, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দারঙ্গ ও নওগাঁ হইতে গবাদির রোগাক্রমণের কথা শুনা যাইতেছে।

সার-সংগ্রহ।

বসন্ত রোগ।*

আমাদের দেশে গরুর যে সকল রোগ আছে তাহার মধ্যে বসন্ত বা গুটীতেই অনেক গরু মরে। বসন্ত পীড়ার লক্ষণ জ্বর; কাণ, সিং ও পা আগে গরম ও পরে ঠাণ্ডা হয়; ঘাস খায় না ও গরুর তেজ কমিয়া যায়। বাহ্য প্রথমে শক্ত এবং পরে পাতলা হয়; পাতলা বাহ্যের সঙ্গে রক্ত ও আম পড়ে; মুখ, মাড়ি এবং জিহ্বা খুব লাল হয়, ও ঐ সকল জায়গায় ঘা দেখা দেয়; কখনও কখনও চামড়ার উপরেও গুটী উঠে। পীড়িত গরু ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া দুই হইতে ৮ দিনের মধ্যে মারা যায়।

বসন্ত বা খুর পাকার মধ্যে তফাৎ এই যে, বসন্ত রোগে পাতলা বাহ্য হয় খুরে ঘা হয় না, কিন্তু খুর পাকায় খুরে ঘা হয় পাতলা বাহ্য হয় না।

কোন গরুর বসন্ত হইলে উহাকে তখনই অন্যান্য ভাল গরু হইতে সরাইয়া দূরে শুক্‌না ও গরম জায়গায় রাখিবে; পীড়িত গরুর গোবর, চোনা এবং তাহা যে জায়গার পড়ে সেই মাটী উঠাইয়া দূরে নিয়া পুড়িয়া ফেলিবে। যে ঘরে পীড়িত গরু ছিল সেই ঘরের খাটালের (ভিটার) মাটী উঠাইয়া পুড়িয়া ফেলিবে অথবা মাটীতে পুতিয়া ফেলিবে ও ভিটায় নূতন মাটী দিবে। যে জায়গায় অন্যান্য গরু চরে (ঘাস খায়) সেই জায়গার পীড়িত গরুকে যাইতে দিবে না, কারণ যে জায়গায় ঐ গরু যায় সেই জায়গার ঘাসেও বসন্তের বিষ লাগে এবং তাহাতে ভাল গরুরও বসন্ত হয়।

পীড়িত গরুকে শুক্‌না জাগায় গরমে রাখিবে। খাইতে কেবল ভাতের মাড় কিম্বা মাড়ে ভাতে মণ্ড দিবে। যখন শক্ত বাহ্য হয় বা একেবারেই বাহ্য হয় না তখন রোজ আধ পোয়া লবণ বা সাট্‌ লবন খাইতে দিবে। কুইনাইন রোজ আধ তোলা হইতে ১ তোলা (ডাক ঘরের ৫ পুরিয়া হইতে ১০ পুরিয়া) বেশ কাজ করে। যখন পাতলা বাহ্য হয় তখন প্রাতে একবার ও বৈকালে একবার ভাতের মাড়ের সঙ্গে খড়ি মাটীর গুঁড়া আধ ছটাক, খয়েরঁ সিকি ছটাক, আফিম ছয় আনা এবং দেশী মদ এক ছটাক ভাল করিয়া মিশাইয়া খাওয়াইবে।

পাতলা বাহ্য থামিলে ঔষধ দিবে না। কিন্তু কয়েক দিন ভাতের মাড় বা মণ্ড এবং কাঁচা ঘাস খাইতে দিবে।

যে সকল গরু পীড়িত গরুর কাছে থাকে বা আসে তাহাদিগকে টীকা দেওয়াইবে। টীকাতে

* পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম কৃষি বিভাগ হইতে প্রকাশিত গবাদির রোগ সম্বন্ধীয় ৩নং পত্রিকা।—

কোনও অসুবিধা নাই ও কাজের বাধা হয় না। গাভীন্ গরুকে টীকা দিলে পেটের বাচ্চা নষ্ট হয় না। টীকা দিলে গরুর জোর বাড়ে। যদি ভাল গরুর টীকা দেওয়ার পর বসন্ত হয় তাহা হইলে ব্যারাম ঐ গরুর উপর বেশী জোর করিতে পারে না; গরু শীঘ্রই সারিয়া উঠে। টীকা দেওয়া গরুর ব্যারাম হইয়া সারিয়া উঠিলে আর উহার বসন্ত হয় না; এবং ঐ গরুকে "সারা" বলে। "সারা" গরুর দাম "আসারা" গরুর দাম হইতে অনেক বেশী। টীকা দেওয়া গরুকে পীড়িত গরুর সঙ্গে মিলিতে দিবে যেন উহাদের অল্প ব্যারাম হইয়া "সারা" হইতে পারে। টীকা দেওয়া গরুর যদি অল্প ব্যারাম না হয় তাহা হইলে টীকার জোর কেবল তিন মাসে থাকে। যদি পরে বসন্ত কাছে দেখা দেয় তাহা হইলে গরুকে আবার টীকা দেওয়াইবে।

উদ্ভিদাণু।

পরমাণু সদৃশ ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র জীবগণ মৃত্তিকা মধ্যে অবস্থান করিয়া ভূমির উর্ব্বরতা রক্ষা ও বর্দ্ধিত করে। ইহারা বায়ুমণ্ডল হইতে সোরা-জান (Nitrogen) আহরণ করত ভূমিতে সঞ্চয় করিয়া থাকে। এই অণুগণই নাইট্রো ব্যাক্টরীণ আদি নামে অভিহিত। ইহারা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র — নয়নের অগোচর পদার্থ হইলেও মৃত্তিকা মধ্যে ইহাদিগের কার্য্য অসীম সুতরাং কৃষিকার্য্যে ইহারা অলোচ্য।

উদ্ভিদ শাস্ত্রবিদ প্রফেসর বম্‌সী সাহেব নাইট্রো-ব্যাক্টিরীণ নাম দিয়া যে জীবাণুর প্রচার করিয়াছেন এবং যাহার বিস্তৃত আবাদ করিতেছেন তাহা লইয়া নানা দেশে নানারূপ আলোচনা ও কৃষিকার্য্যে নানারূপ পরীক্ষা চলিতেছে। উক্ত অণুগণের বিশেষত্ব এই যে, উহারা মৃত্তিকায় সংযুক্ত হইলে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা বর্দ্ধিত করে, বপনের পূর্ব্বে তদ্দ্বারা বীজগুলিকে উর্ব্বর করিয়া লইতে পারিলে বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়, তজ্জাত উদ্ভিদগণ সতেজ ও বলবান্ হয়। অনেকদিন আবাদ হওয়ায় যে সকল ক্ষেত্র আপাততঃ হীনতেজ হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে উক্ত অণু সংযোজিত হইলে ক্ষেত্র মধ্যে উহাদিগের বংশ বিস্তৃতি লাভ করে, অতঃপর উহারা বায়ুমণ্ডল হইতে সোরাজান আহরণ করিয়া ক্ষেত্র মধ্যেই সঞ্চয় করিয়া রাখে। কৃষকগণের পক্ষে ইহা বড় কম আহ্লাদের কথা, কম আশার কথা নহে। ইহাদিগের অপর বিশেষত্ব এই যে, সিম্বি শ্রেণীর (Leguminoseæ) উদ্ভিদের সহিত ইহাদিগের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, এই জন্য তজ্জাতীয় প্রায় সমস্ত উদ্ভিদের মূলদেশে ইহারা স্বভাবতই আশ্রয় গ্রহণ করে ও তথায় বিস্তৃত হইতে থাকে। উক্ত জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ের স্থানে স্থানে উহারা আড্ডা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। ঐ বাসস্থান গোলাকার হয় এবং তাহাদিগের আকার ক্ষুদ্র সর্ষপ হইতে বীজআলুর মতন হইয়া থাকে। তাহার বর্ণ অনেকটা শ্বেত সর্ষপের ন্যায় হয় বলিয়া আমি উহাকে 'শ্বেতী' বলিয়া থাকি। অনেকেই হয়ত অবগত আছেন যে শ্বেত সর্ষপ অনেক স্থানে 'শ্বেতী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এ স্থলে সিম্বী শ্রেণীর উদ্ভিদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সিম্বিক উদ্ভিদের পুষ্প মাত্রেরই আকার প্রায় প্রজাপতি সদৃশ। উদ্ভিদ শাস্ত্রে এই সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সিম্বিক শ্রেণীর মূল বিভাগের Papilionaceæ নামকরণ হইয়াছে। সিম্বিক উদ্ভিদের ফল সিম্ববৎ হইয়া থাকে। সিম ও

যাবতীয় দ্বিদল (দাল বা দাইল) ইহার অন্তর্গত। এই সকলের যে কোন উদ্ভিদকে যত্নসহকারে সমূলে ভূমি হইতে উত্তোলিত করত নির্ম্মল জলে ধৌত করিলে 'শ্বেতী' দেখিতে পাওয়া যায় পাঠকগণ সহজেই তাহা পরীক্ষা করিতে পারেন। সিম্বিক শস্য মধ্যে সোরাজান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, এইজন্য ইহা এত পুষ্টিকর ও উত্তাপজনক। আমাদিগের আহার্য্যের মধ্যে চাউল যেরূপ প্রয়োজনীয় দ্বিদলও তদনুরূপ।

উক্ত শ্বেতীর ছাউনির মধ্যে লক্ষ লক্ষ অণু বাস করিয়া থাকে এবং ক্রমশঃ বংশ বৃদ্ধি সহকারে শিকড়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শ্বেতী নির্ম্মাণ করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে প্রস্থত হইয়া অপরাপর উদ্ভিদের শিকড়েও আশ্রয় লয়। এইরূপে যতই ব্যাপ্ত হইতে থাকে ভূমি ততই উর্ব্বরা হইতে থাকে, সেই সঙ্গে তজ্জাত ফসল সতেজ হইতে থাকে— উদ্ভিদের বর্ণ ঘন ও সমুজ্জল হয়, ফলন ফুলনও বেশ হয়। ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র—কি শূন্যমার্গ, কি জল মধ্য, কি ভূগর্ভ—ইহাদিগের জ্ঞাতি কুটুম্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে কৃষি কার্য্যের সাহায্যকারী যে সকল জীবাণু বা উদ্ভিদাণু তাহারা, সোরাজান ব্যাপারে লিপ্ত বলিয়া নাইট্রোমনেড্, নাইট্রোস্নমসাস নাইট্রো ব্যাকিটরীন্ ইত্যাদি নামে অভিহিত। সোরাজানের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া উক্ত অণুদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় সোরাণু' নামে অভিহিত করিলাম।

গত বৎসর কয়েক মাস ধরিয়া আমি নানা-প্রকার জমিতে, ভিন্ন ফসলে বিবিধ জাতীয় ঔদ্যা-নিক উদ্ভিদে উক্ত সোরাণুর পরীক্ষা করিয়া বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়া অত্র প্রবন্ধের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কৃষির উন্নতি কল্পে সর্ব্বত্র ইহার পরীক্ষা হওয়া যেরূপ স্পৃহণীয় সর্ব্বত্র ইহার প্রচার ও প্রবর্ত্তন হওয়া তদনুরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। সোরাণুর প্রবর্ত্তনে অনেক লাভ আছে, তন্মধ্যে যে পাঁচটি প্রধান লাভ তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১। ক্ষেত্রে সার প্রদান করিবার তত প্রয়ো-জন হয় না—অন্ততঃ যে সকল ক্ষেত্রে যবক্ষার জানের অভাব আছে অথবা যবক্ষার জানের পরিমাণের সামাঞ্জস্যের অভাব অর্থাৎ যাহাতে প্রয়োজন মত নাই।

২। ক্ষেত্রে সোরাজান সঞ্চিত হইলে ধাতব কঠিন পদার্থ সমূহ (Inorganic matters) সহজে বিশ্লেষিত হয় তন্নিবন্ধন উদ্ভিদগণের অব-য়ব সমূহ পরিপুষ্ট ও দৃঢ় হয়।

৩। উদ্ভিদের অঙ্গ সৌষ্ঠবের বৃদ্ধির সহিত মূলও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহার আশু ও অবি-চ্ছিন্ন ফল উদ্ভিদগণ মৃত্তিকা হইতে অধিক পরি-মাণে আহার্য্য পদার্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়।

৪। বীজ সোরাণুর চাষ করিয়া অর্থাৎ বীজ সোরাণু পুষিয়া তাহাদিগের বংশ বৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়, অতঃপর সেই সকল বীজ সোরাণুজাত বংশ মৃত্তিকা সংযুক্ত হইলে তাহারা আপনাদিগের বংশ আপনা হইতে বাড়াইয়া লয়। উক্ত সোরাণু পূর্ণ ক্ষেত্রস্থ মৃত্তিকা ক্ষেত্রান্তরে প্রবর্ত্তিত হইলে সে ক্ষেত্রেও উর্ব্বর হইয়া উঠে, সুতরাং যত্ন করিয়া উহার (সোরাণুর) আবাদ করিলে কিংবা তাহাদিগকে জীবিত রাখিতে পারিলে বীজ সোরাণু পুনরায় ক্রয় করিবার প্রয়োজন হয় না।

৫। নিতান্ত অনুর্ব্বরা ভূমিতেও সোরাণু সংযোজিত হইলে তাহা শস্যশালিনী হইয়া থাকে কিন্তু বাঙ্গালার 'লোনা' ও বিহারের বা পশ্চি-মোত্তর প্রদেশের 'উষর' ভূমিতে উহা দ্বারা

উপকার হইবে কি না সে বিষয়ে আমার বিশেষ সংশয় আছে কারণ উল্লিখিত প্রকারের মৃত্তিকায় সোরাণুর জীবিত থাকা সম্ভব নহে। দ্বারভাঙ্গার কয়খণ্ড উষর ভূমিতে সোরাণু প্রয়োগ করিয়াছিলাম কিন্তু তাহার ফল দেখিবার অবসর আমি পাইনাই। তবে ঈদৃশ জমিতে সোরাণুর প্রবর্ত্তন করিতে হইলে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে। (উদ্ধৃত) শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে। এফ্, আর, এইচ্, এস্।

[এতদ্ সম্বন্ধে কৃষকের ১৩১৫ সালে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত নাইট্রোজেন জীবাণু প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য] কৃঃ সঃ।

বাঙ্গালার নৌ বাণিজ্য।

আলোচ্য বৎসরে পৃথিবীর নানাদেশ হইতে বঙ্গে মোট ৪৬ কোটী ৬২ লক্ষ্য টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল, সুতরাং ১৯০৮।৯ খৃষ্টাব্দের তুলনায় আমদানীর হিসাবে এবারে ২ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকার মাল এ দেশে অধিক আমদানী হইয়াছে। বিগত ১৯০২—১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গত ছয় বৎসরের আমদানী মালের গড়পড়তা হিসাবে আলোচ্য বৎসরে বঙ্গে ৯ কোটী টাকার মাল অধিক আমদানী হইয়াছে দেখা যায়। বঙ্গদেশ হইতে যে সকল দেশীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা হইয়া থাকে, এবারে সেই বাণিজ্যের কিছু উন্নতি হইয়াছে, আলোচ্য বৎসরে ৭০ কোটী টাকার মাল বঙ্গদেশে হইতে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়াছে। গত ১৯০৮।৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ হইতে ৬৬ কোটী টাকার পণ্যসম্ভার বিদেশে প্রেরিত হয়।

বৈদেশিক পণ্যসম্ভারের মধ্যে আলোচ্য বর্ষে কার্পাস পণ্য বা বস্ত্রাদির আমদানী সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোটের উপর এ বৎসরে বিদেশ হইতে ২০ কোটী টাকার বস্ত্রাদি বঙ্গে আসিয়াছে। এই পণ্যের অধিকাংশ ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড হইতে প্রেরিত হইয়াছিল।

বিগত ১৯০৮।৯ খৃষ্টাব্দে এদেশে যত টাকার যন্ত্রাদির আমদানী হইয়াছিল আলোচ্য বৎসরে সেই স্থলে যন্ত্রাদির আমদানীর পরিমাণ শতকরা ৩৭ হিসাবে কম পড়িয়াছে। কারখানার প্রতিষ্ঠা ও পুরাতন কলের উন্নতি সাধন করিবার জন্য লোকের যে পরিমাণ নূতন যন্ত্রাদির আবশ্যক হইয়াছিল, পরে সেরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে; সুতরাং বিদেশী কল কব্জার আমদানী কিছু কমিবেই।

আলোচ্য ১৯০৯।১০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে চিনির আমদানী খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় এবারে আমদানীর খাতে শতকরা ৬ এবং মূল্যের হিসাবে শতকরা ৯ হিসাবে চিনির আমদানী ও বিক্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গে, ব্রহ্মদেশের তৈলের আমদানীও বেশ বাড়িয়াছে। মোটের উপর আলোচ্য বৎসরে এককোটী পঞ্চাশ লক্ষ্য টাকার তৈল ব্রহ্মদেশ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছে। আর বিদেশী তৈলের আমদানী পরিমাণে শতকরা ১৯ এবং মূল্যে শতকরা ২৩ হিসাবে হ্রাস পাইয়াছে। ব্রহ্মদেশে তিনদল নূতন ব্যবসায়ী কেরোসিন তৈলের ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়াতে ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা আরও বাড়িয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্যের হিসাবে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, এবারে কয়লার রপ্তানীর পরিমাণ বড়ই হ্রাস পাইয়াছে, বিগত ১৯০৫।৬ খৃষ্টাব্দের পর রপ্তানী কয়লার পরিমাণ কখনও এরূপ হ্রাস পায় নাই। তবে রপ্তানীর পরিমাণ আবার বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।

রাঢ়ের কৃষি।

ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙ্গালার শতকরা ৮৫ জন লোক কৃষিজীবি একথা অনেকদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। গবর্ণমেণ্ট গত কয়েক বৎসর হইতে কৃষির উন্নতি সাধন জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কৃষক, কমলা, সঞ্জীবনী প্রভৃতি দুই তিনখানি সংবাদ ও সাময়িক পত্রে কৃষিবিষয়ে দুই একটী করিয়া প্রবন্ধও প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন সুফল ফলিয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। বাঙ্গালা দেশের রাঢ় অঞ্চলের লোকেরা প্রায় সকলেই কৃষিজীবি, শতকরা ৯৯ জন লোকই বোধ হয় কৃষিলব্ধ শস্যে উদর পূর্ণ করে এবং কৃষিলব্ধ শস্য বিক্রয় করিয়াই অন্যান্য খরচ পত্র নির্ব্বাহিত করে। এক একজন কৃষকের প্রচুর জমি জায়গা আছে, কিন্তু একমাত্র কৃষিকার্য্য করিয়া কাহারও উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। রাঢ় অঞ্চলে নানবিধ ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ধান, ইক্ষু, গম, যব, বুট, সর্ষপ, অরহর, মসুর, কালোমুগ, গোলআলু, প্রভৃতি ফসলই প্রধান। একজন গৃহস্থের এই সকল ফসলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ পর্য্যাপ্ত নহে। আমাদের দেশের শিক্ষিত কৃষিবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে এ দেশের নিরক্ষর কৃষকগণ জমিতে নিয়মিত সার দিতে জানে না, কাজেই তাহাদের পর্য্যাপ্ত ফসলও উৎপন্ন হয় না। এ দেশের কৃষিবিৎ পণ্ডিতগণ সারের মহিমাই ঘোষণা করিতেছেন। হাড় চূর্ণ, রেড়ির খৈল, সোরা, নাট্রোজেন, ধঞ্চে ও পাটের সবুজ সার প্রভৃতির কথাই আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায় জলের কথা কেহই ভাবিতেছেন না। জল না পাইলে শুধু সার দিয়া কি করিবে। আগে জলের ব্যবস্থা তার পরে সারের উপকারীতা বুঝানো। আমরা দেখিতেছি একমাত্র জলের অভাবে রাঢ় অঞ্চলের কৃষি ক্রমশঃই অধোনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। সময়ে আর বৃষ্টি হইতেছে না, আষাঢ় মাস যদি অনাবৃষ্টিতে কাটিয়া যায় তবে ফসল অর্দ্ধেক হয়। শ্রাবণের শেষে বৃষ্টি হইলে সিকি ফসলও হয় না। রাঢ়ের মৃত্তিকা সেরূপ সরস নহে, রবিখন্দেও জলের প্রয়োজন হয়। ইক্ষুতেও যথেষ্ট জলের দরকার। কিন্তু কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত রাঢ়ের অধিকাংশ স্থানেই মাঠে জল পাওয়া যায় না। কাজেই ফসলের পরিমাণও সামান্য দাঁড়ায়। জলের অভাবে যে স্থানে দুইমণ ফসল হওয়া উচিত সে স্থানে আধমণের বেশী হয় না। আমরা রাঢ়ের মধ্যে বহু পল্লীগ্রামের কথা জানি। কয়েকখানি পল্লীতে জলের বেশ সুবিধা আছে, সেগুলিতে অন্য পল্লী অপেক্ষা ফসল অনেক বেশী উৎপন্ন হয়। আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যেখানে জলের সুবিধা আছে সেখানে এক বিঘা ইক্ষুর জমিতে একশত মণ গুড় উৎপন্ন হয়, আর যেখানে জলের সুবিধা নাই সেখানে এক বিঘায় ১৫ মণ হইতে ২০ মণের বেশী আর হয় না। অন্যান্য ফসলও এই অনুপাতেই কম হইয়া থাকে। কৃষকগণ বিজ্ঞান সম্মত উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্য না জানুক, তাহারা যে জমি তৈয়ারী করিতে, মৃত্তিকার গুণ অনুসারে সার দিতে একবারেই জানে না তাহা নহে। তাহারা সময়ে জল পাইলে এখন যে ফসল উৎপন্ন করিতেছে তাহার অপেক্ষা দশ গুণ অধিক ফসল উৎপন্ন করিতে পারে। জলই কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায়। পর্য্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা থাকিলে এ অঞ্চলের কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইতে পারে। পূর্ব্বে জলের এমন শোচনীয় অবস্থা ছিল না। দেখিতে

পাওয়া যায় রাঢ়ের মধ্যে ঠিক মাঠের মধ্য স্থলে বহুস্থানে বড় বড় পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকা প্রভৃতি ছিল। তা ছাড়া প্রায় দুই ক্রোশ অন্তরই এক একটী ছোট ছোট স্রোতস্বিনী আছে, পাঁচ ছয় ক্রোশ অন্তর বড় নদীও আছে। নদী বালুকা পূর্ণ, বারো মাস বহতা থাকে না। ছোট স্রোতস্বিনী সকল ভরাট হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন পুষ্করিণী সকলের চিহ্ন পর্য্যন্ত অনেক স্থলে লুপ্ত, সে সব শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট বহু টাকা ব্যয় করিয়া অনেক স্থানে ক্যানাল কাটাইয়া দিতেছেন। এখানে সেরূপ ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। যে সব ছোট ছোট স্রোতস্বিনী (কান্দর) রাঢ়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত আছে সেইগুলির মধ্যে মধ্যে বাঁধ ও কপাট করিয়া দিলে বর্ষার সমস্ত জল বাহির হইয়া যাইতে পারে না। একার্য্য বহু ব্যয়সাধ্য না হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে ব্যয়সাধ্য বটে। গবর্ণমেণ্ট জমিদারগণকে লইয়া একার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারেন। নিরক্ষর কৃষকদের এ বিষয়ে কোন হিতাহিত জ্ঞান নাই। তাহাদিগকে বুঝাইয়া যদি আহ্বান করা যায় তাহা হইলে সানন্দে তাহারাও ইহাতে যোগদান করিবে। কার্য্য অসম্ভব নহে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের পক্ষ হইতে এই হিতকর কার্য্যের অনুষ্টান হইলে আরও ভাল হয়। (প্রসূন)

লেবু রসের গুণ।

কাগজী কিংবা পাতি লেবুর রস প্রত্যহ সৈন্ধব লবণ সংযোগে কিঞ্চিৎ গরমজলে মিশাইয়া ব্যবহার করিলে অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণ রোগ আরাগ্য হয়।

পিত্তাধিক্যে কাশীর চিনির সহিত লেবুর রস ব্যবহার পরম হিতকারী।

লেবুরসের সহিত মিছরির গুঁড়া মিলাইয়া মধ্যে মধ্যে হেন করিলে বমন ইচ্ছা প্রশমিত হয়।

ভাতের সহিত লেবুর রস ব্যবহারে অরুচি সারিয়া যায়।

পাতি লেবুর শাঁস পুরাতন ঘৃতের সংযোগে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া ভাল হয়।

মেলেরিয়া প্রধান দেশে প্রত্যহ লেবু রস ব্যবহার করিলে সহজে মেলেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না।

ফলকথা লেবুর রসে যকৃতের ক্রিয়ার সাহায্য হয়, কোষ্ঠ সাফ্ হয়, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু সরল হয়।

ইহার বাহ্য প্রয়োগে আবার মানব দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়ঃ—

সামান্য পরিমাণ লেবুর রস জলসংযোগে বাহুলতা, ঘাড়ে, মুখে, মর্দ্দন করিলে শুদ্ধ যে মুখের রং ফর্সা হয়, তাহা নহে, ইহা দ্বারা চর্ম্ম কোমল হয়।

ম্যাগনেসিয়া এবং লেবুর রস একত্রে মিশাইয়া উত্তমরূপে ফেটাইয়া মুখে, হস্তে, হস্ততলে গ্রীবার ব্যবহার করিলে নারীগণের অপূর্ব্ব শ্রী বৃদ্ধি হয়, এমন কি কাল চামড়াও একটু ফর্সা হইয়া দাঁড়ায়। ইহা মুখ প্রভৃতি স্থানে লাগাইয়া ১৫ মিনিট কাল রাখিয়া তাহার পর ধৌত করিয়া ফেলিতে হয়। ইহা দ্বারা মুখের ও ঘাড়ের কুঞ্চিত লোল মাংশ বেশ সুডোল হয়।

নখের দাগ প্রভৃতি উপসর্গে এক চামচ লেবুর রস এক বাটী গরম জলে মিশাইয়া নখ এবং হস্ত ধৌত করিলে নখের দাগ নষ্ট হইয়া নখগুলি বড় সুন্দর হইবে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দেশে স্নানীয় জলে লেবুর রস মিশাইয়া স্নান করা একটী বিশেষ আনন্দদায়ক ভোগসুখের মধ্যে গণ্য। ইহারা স্নানীয় জলে কতকগুলি লেবুকে কাটিয়া ফেলিয়া দেয়, তাহার

পর অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে লেবুর রসকে কচ্‌লাইয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্নান করিয়া থাকে।

মুখ ধুইবার সময় জলে লেবুর রস দিয়া দন্তধাবন করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূরহয়। এবং ইহাতে দন্ত ও মুখরোগ নিবারিত হয়, ইহা প্রতক্ষ। ইহা দ্বারা দন্তের মূলে যে Tarter বা এক প্রকার চূণের মত দ্রব্য জমিয়া দাঁত আল্‌গা করে, তাহা জন্মিতে পারে না।

স্বাস্থ্য রক্ষার সহায়তা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকরা ব্যতীত বস্ত্রাদিতে দাগ লাগিলে বা হস্তে কোন প্রকার রঙ্গের দাগ লাগিলে লেবুর রস এবং একটু সামান্য মাত্র লবণ একত্রে মিশাইয়া দাগের উপর মর্দ্দন করিয়া ধৌত করিলে তাহা অনায়াসে উঠিয়া যায়।

লেবুর এতগুলি আবশ্যকীয় গুণ আছে, পাঠাকগণ পরীক্ষা করিলে ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইবেন।

ভাতই পৃথিবীর প্রধান খাদ্য।—ভারত, চীন ও জাপানের লোক ভাত খায়, একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি চীন ও জাপানে বাস করিয়াছিলেন, তিনি বলেন যে তাহাদের মধ্যে অজীর্ণ রোগ নাই। গম, বার্লী প্রভৃতি শস্য যেমন পুষ্টিকর, ভাতের এক গুণ আছে ইহা অন্য কোন শস্যের নাই; ভাত এক ঘণ্টায় হজম হয় কিন্তু অন্যান্য শস্য আড়াই হইতে সাড়ে তিন ঘণ্টায় হজম হয়। শীঘ্র হজম হয় বলিয়া ভাত পাকস্থলী হইতে শীঘ্র বাহিরে যায় এবং সেই জন্য স্নায়ুর শক্তির অপচয় না হইয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে। আছাটা চালই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, ইহা যদিও দেখিতে একটু অপরিষ্কার কিন্তু জাপানী ও চীনারা ইহাই ব্যবহার করে। ইহা ব্যতীত কোন কোন ডাক্তারের মত এই যে আছাঁটা চাল ব্যবহার করিলে বেরী বেরী রোগ হয় না। (সঞ্জীবনী)

পাট ব্যবসায়ের বৃদ্ধি।—আলোচ্য বৎসরে বঙ্গদেশ হইতে ৩০ কোটী টাকার পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছিল, এ দেশে পাটের ব্যবসায়ের কিরূপ উন্নতি হইতেছে তাহা এই অঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু পাটের মূল্য হ্রাস পাওয়াতে পাটজাত পণ্যদ্রব্যের মূল্য অনেক পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ কম হইলে ও অধিক পরিমাণে মাল বিদেশে রপ্তানী করিতে হইয়াছিল।

ভারতীয় চায়ের আদর।—আলোচ্য বর্ষে চায়ের ব্যবসায়ে এ দেশে চাকরদিগের বিশেষ লাভ হইয়াছে। ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে যত চা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, পূর্ব্বে আর কখনই সেরূপ দেখা যায় নাই। এবারে চা-ব্যবসায়ী মাত্রেই বিশেষ লাভবান্ হইয়াছেন, সুতরাং এই বৎসর চা-ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে সুবৎসর বলিতে হইবে। যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশে ভারতীয় চার আদর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে।

বাঙ্গলা সাঙ্কেতিক লিখন।—মিঃ ডি, এন সিংহ বাঙ্গলায় সাঙ্কেতিক লেখার (Short-hand writing) উদ্ভাবন করিয়াছেন। রাঁচি পুলিস ট্রেনিং কলেজে উহার চলন আরম্ভ হইয়াছে। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট মিঃ ডি, এন সিংহকে এই জন্য এক সহস্র মুদ্র পারিতোষিক দিয়াছেন।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

আষাঢ় মাস।

সব্জীবাগ।—শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্তুত হইতে হইবে। আমন বেগুনের তলা ফেলিতে হইবে। এই সময় শাকাদি, সীম, লঙ্কা, শীতের শসা, লাউ, বিলাতি বেগুন, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী বীজ বপন করিতে হইবে।

পালম্ শাক, টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতি সব্জী বীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই।

মকাই (ছোট মকাই) এবং দে-ধান চাষের এই সময়।

হলুদ, আদা, জেরুজালেম আর্টিচোক, এরোরুট প্রভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। দাঁড়া বাঁধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয় এবং গাছগুলি জলে গোড়া আলগা হইয়া পড়িয়া যায় না।

ফুলবাগিচা।—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা) এমারন্থস, কল্পকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম (Sunflower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখন গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষের কাটিং করিয়া চারা তৈয়ার করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান।—বর্ষা নামিলে আম, লিচু, পিয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ বসাইতে হয়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন—ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়, কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া শিকড় পচিয়া না যায়। আম, লিচু, কুল, পিচ, নানাপ্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এই সময় কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের মোকা বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পিচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। পেঁপে বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছে গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বর্ষার জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি বিচলিত করা কর্ত্তব্য। সুপারি গাছে গোড়ায় এই সময় গোবর মাটি দিতে হয়। ঐ সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। হাড়ের গুঁড়াও এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

কলার মৃত মূল এই সময় ঝাড় হইতে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য এবং কলার তেউড় এখনও নাড়িয়া রোপণ করা চলে জ্যৈষ্ঠে এ কার্য্য আরম্ভ হওয়া উচিত।

যাঁহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছ গুলি দস্তুরমত গজাইয়া উঠিবে।

শস্যক্ষেত্রে।—কৃষকের এখন বড় মরশুম, বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতকস্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পাট চাষ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে পাট তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণবঙ্গে পাট কিছু নাবি হয়, কিন্তু পাট বুনিতে আর বাকি নাই। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে শেষ হইয়া যায়।

বর্ষাকালে ঘাস এবং আগাছা ও কুগাছার বৃদ্ধি হয় সুতরাং সব্জী ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে নিড়ানি দেওয়া উচিত। ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কপি চারা ক্ষেত্রে বসান হইতেছে। পূজার পূর্ব্বেই পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে কলিকাতায় কপি, কড়াই শুঁটী প্রভৃতি আমদানি হয়।

এই সময় পার্ব্বত্যপ্রদেশে সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, কল্পকোম্ব, কেপ গাঁদা, দোপাটী প্রভৃতি ফুল বীজ বপন করা হইতেছে।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

আষাঢ়, ১৩১৭।

সুলভে সেগুণ কাষ্ঠের ফার্ণিচার ও ইমারতি গড়ন প্রভৃতি।



আমরা মৌলমিন্ হইতে উৎকৃষ্ট সেগুণ কাষ্ঠ আমদানী করিয়া মফঃস্বলের গ্রাহকবর্গকে সর্ব্বপ্রকার আলমারী, টেবিল, চেয়ার, পানিল, খড়খড়ি, সার্সী প্রভৃতি অর্ডার মত প্রস্তুত করাইয়া অতি সামান্য মুনফা রাখিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। করোগেট আয়রণ, ষ্টীল জয়েষ্ট, টী আয়রণ, বোল্টনাট, বেড়ার কাঁটাওয়ালা তার প্রভৃতি এবং ফার্ণিচার ও ইমারতি গড়নের জন্য কল, কব্জা, ছিটকিনি, বল্ট, পরকলা, রঙ্গ প্রভৃতি আমাদিগের নিকট উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট অফিসার, মিউনিসিপালিটী ও অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আমাদিগের ফার্ম্ম হইতে সর্ব্বদাই দ্রব্যাদি লইয়া থাকেন। ঠিক জিনিষ উচিত মূল্য, প্রতারিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

বিস্তারিত বিবরণসহ জিনিষের লিষ্ট পাঠাইলে দর দিয়া থাকি ; পত্র লিখিলে আমাদিগের সচিত্র ইংরাজী ক্যাটালগ (মূল্য নিরূপণ তালিকা) বিনা মূল্যে পাঠাইয়া থাকি ; পরীক্ষা প্রার্থনীয়।—

এ, টী, দে এণ্ড কোং।

১৬২।১৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং।

মনোহারী সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য উচিত মূল্যে সর্ব্বস্থানে সরবরাহ করা হয়। অর্ডার সহিত এক-চতুর্থাংশ মূল্য অগ্রিম দেয়। অর্ডার পাইলে মাল পাঠাই, কিছুমাত্র বিলম্ব করা হয় না। আবশ্যকীয় দ্রব্যের দর পত্র দ্বারা জানান হয়। মফঃস্বলবাসীর কিরূপ সুবিধা ও সুযোগ একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ব্যবসায়িগণকে স্বতন্ত্র কমিসন দেওয়া হয়।

হোলসেল এণ্ড রিটেল ডিলার্স।

১ নং রাজার লেন, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা।

স্ত্রী পুরুষের রজঃ ও শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় দোষ ও তজ্জনিত ব্যাধিসমূহ নির্ম্মূল করণক্ষম এবং স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চারক। মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা এক টাকা মাত্র।

যিনি আমার নিম্নলিখিত ঠিকানায় আপনার নাম ধাম পাঠাইবেন, তাঁহাকে কলিকাতা পুলিশ কোর্টের মোকর্দ্দমা হইতে নির্ম্মুক্ত ও উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া পরিগণিত

কামশাস্ত্র

নামক একখানি উপযোগী পুস্তক বিনামূল্যে বিনা ডাকমাশুলে পাঠান যাইবে।

কবিরাজ শ্রীমনিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কিং এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

৮৩, হ্যারিসন রোড,

ব্রাঞ্চ—৪৫, ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের জন্য উপরোক্ত ঠিকানায় লিখুন।

মজুমদার এণ্ড কোং।

পেণ্টর্স ফটোগ্রাফার্স আর্টিষ্টস্ এণ্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

২২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আমাদের কারখানায় থিয়েটারের ষ্টেজ সম্বন্ধীয় সকল প্রকার সিন্ ড্রপসিন্ প্রভৃতি এবং সকল প্রকার অয়েল পেণ্টিং প্রতিমূর্ত্তি সুচারুরূপে অল্পমূল্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ রাজা, জমিদার প্রভৃতি মহোদয়গণের বাড়ীর কার্য্যই আমাদের প্রমাণ। সিনের মূল্য তালিকার জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন। আর সকল প্রকার দেশী বোম্বাই ছবি ও ফটো বাঁধাই এবং বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ম্যানেজার,

শ্রীবরদাপ্রসন্ন মজুমদার।

চুল উঠা ও টাকের মহৌষধ।

এই দুইটী রোগের প্রকৃত ঔষধ এতদিন একবারেই ছিল না। বিজ্ঞাপনে যিনি যাহাই বলুন, ব্যবহারে সে উপকার কয়জন পাইয়াছেন? কিন্তু "সুরমা তৈল" সত্য সত্যই টাকের ও চুল উঠিয়া যাওয়ার অব্যর্থ ঔষধ। তদ্ভিন্ন চুল কটা হইলে, কড়া হইলে, অসময়ে পাকিলে, এবং মাথাগরম হইলে, সুনিদ্রার অভাব হইলে, সুরমা ব্যবহারে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়। যে সকল জিনিষ বায়ু উপশম করে, মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখে এবং চুলের দোষ নষ্ট করিতে পারে, সেই সমস্ত জিনিষই এই সুরমা তৈলের প্রধান উপাদান। সুরমার সদ্গন্ধও অতি মনোরম। একবার একশিশি ব্যবহার করিলেই, এ কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। একশিশির মূল্য ৸৹ আনা মাত্র। মাশুলাদি ।৵৹ সাত আনা। একত্র তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, মাশুলাদি ৸৵৹ আনা। ৵৹ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে, একশিশি সুরমার নমুনা এবং একখানি সুরমা-পঞ্জিকা বিনামূল্যে পাইতে পারিবেন।

জ্বরাশনি।

"জ্বরাশনি" জ্বরের অমোঘ বজ্রস্বরূপ। নূতন, পুরাতন, জীর্ণ বিষম, যেমনই জ্বর হউক, তিন চারি দিন মাত্র জ্বরাশনি সেবন করিলেই তাহা নিশ্চয় বন্ধ হইয়া যায়। অথচ কুইনাইন-আটকান জ্বরের মত সে জ্বর বাম্ববার ঘুরিয়া-ফিরিয়া আক্রমণ করে না। "কুইনাইন ব্যতীত ম্যালেরিয়ার ঔষধ নাই" যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে একবার এই জ্বরাশনি সেবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। কম্পজ্বর, পালাজ্বর, পাক্ষিকজ্বর, যকৃৎপ্লীহাদি উপদ্রবসংযুক্তজ্বর প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার যে কোন অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিয়া দেখুন—ইহা কেমন সহজে ও স্বল্পদিনে দেহ রোগমুক্ত করিয়া, সুস্থ-সবল করিয়া দিবে। পেটেণ্ট ঔষধ খাইয়া খাইয়া যাঁহারা তিক্ত-বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও একবার এই ঔষধ না খাইয়া হতাশ হইবেন না। ইহার এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। মাশুলাদি ।৵৹ সাত আনা।

গণোকোকস্।—"গণোকোকস্" নামধেয় একজাতীয় কীটাণু দূষিত সহবাসে মূত্রনালী দিয়া দেহে প্রবেশ করে। ইহার পরিণাম ফলেই মূত্রনালীর প্রদাহ, স্ফীতি, জ্বালা এবং প্রস্রাবত্যাগে কষ্ট বোধ হয়। আমাদের "গণোকিল" বর্ত্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। ইহা ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা, তজ্জনিত প্রদাহ, জ্বর, উচ্ছ্বাস, ধাতুস্রাব প্রভৃতি নিবারিত হয়। গণোরিয়া সমূলে ধ্বংশ করে বলিয়া এই মহৌষধিটির নাম "গণোকিল" হইয়াছে। এক শিশির মূল্য ১॥৹ দেড় টাকা,

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর

স্বদেশ-গৌরব এসেন্স্।

চামেলী।—চামেলীর সৌরভ বড় স্নিগ্ধ—মধুর।

সাবিত্রী।—সাবিত্রী, সাবিত্রী-চরিত্রের মতই পরম পবিত্র ও স্পৃহনীয় পদার্থ।

মল্লিকা।—বেলা-যূথিকাদির সহিত মল্লিকা চিরদিনই একাসন অধিকার করে।



চম্পক।—চাঁপার তীব্রতা কেমন উজ্জ্বল-মধুরে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জিনিষ!

বেলা।—অবসন্ন গ্রীষ্মবেলায় 'বেলার' গন্ধ যেন স্বর্গসুখ আনিয়া দেয়।

যূথিকা।—আমাদের ঘরের যূথিকাই বিলাতীসাজে 'জেস্মিন্' হইয়া উঠিয়াছে।

কামিনী।—যামিনীর জ্যোৎস্না কামিনীর সৌরভে মধুরতর হইয়া উঠে।

মস্ক্ জেস্মিন।—মিলিত নামই ইহার মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ টাকা। মাঝারি ৸৹ আনা। ছোট ॥৹ আনা। মাশুলাদি ।/৹ পাঁচ আনা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানুফ্যাক্চারিং কেমিষ্টস্।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

REGISTERED No C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

একাদশ খণ্ড,—৩য় সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

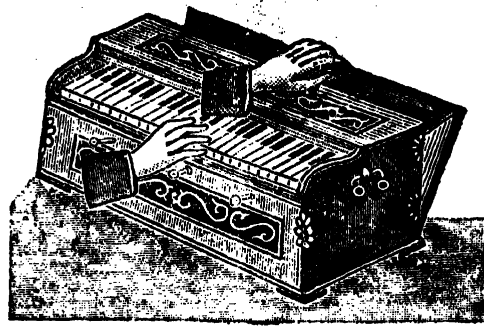
আষাঢ়, ১৩১৭।



কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ সরকার দ্বারা মুদ্রিত।





কৃষক।

সূচী পত্র।

আষাঢ়, ১৩১৭ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

'কৃষকে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

KRISHAK

Under the Patronage of the Governments of Bengal and E. B and Assam.

THE ONLY POPULAR PAPER OF BENGAL

Devoted to Gardening and Agriculture. Subscribed by Agriculturists, Amateur-gardeners, Native and Government States and has the largest circulation. It reaches 1000 such people who have ample money to buy goods.

Rates of Advertising.

1 Full page Rs. 3-8. 1 Column Rs. 2.
½ Column Rs 1-8.

MANAGER—"KRISHAK,"
162, Bowbazar Street, Calcutta.

কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ—তোলা ৵০; ২॥০ তোলা ।০; পাউণ্ড বা অৰ্দ্ধ সের ২॥০ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয়।

এক বৎসরে দুর্ভেদ্য বেড়া হয়। ২॥০ তোলা বীজ এক লাইন করিয়া বসাইলে ৬৬ ফুট বেড়া হয়। বিশেষরূপ ঘন বেড়ার আবশ্যক হইলে দুই লাইন করিয়া বীজ বসান উচিত। বীজগুলি জুলি কাটিয়া ৯ ইঞ্চি অন্তর বসাইতে হয়। দুইটী জুলির মাঝে ৯ ইঞ্চি ব্যবধান থাকা আবশ্যক।

মেম্বর।

নূতন বর্ষারম্ভ হইতেই মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবার উপযুক্ত সময়। যাঁহারা এক্ষণে ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবেন বা আছেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত বীজগুলি পাইবেন।

সভারেণ মেম্বর হইলে—গ্রীষ্মকালে বপনোপযোগী

দেশী সব্জীবীজ	২৪ রকম	২।০
,, ফুলেরবীজ	২০ ,,	২।০
শীতের বিলাতী সব্জীবীজ আমেরিকার টিনে মোড়াই করা ২৪ রকম ১ বাক্স		৫॥০
শীতের বিলাতী সটন কিম্বা ল্যাণ্ডেথের ফুলের বীজ ১ বাক্স		৪॥০
শীতের দেশী সব্জীবীজ	২৪ রকম	২।০
ডাকমাশুল ইত্যাদি		১।০
		—১৮৲

সাধারণ মেম্বর হইলে—

গ্রীষ্ম বর্ষাকালের বপনোপযোগী

দেশী সব্জীবীজ	২৪ রকম	২।০
,, ফুলের বীজ	১০ ,,	১৵০
শীতকালের বপনোপযোগী আমেরিকার মোড়াই করা এক বাক্স ২৪ রকম বিলাতী সব্জী বীজ		৫॥০
বিলাতী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট		১॥০
দেশী সব্জী বীজ ১৮ রকম		১৵০
ডাকমাশুল ইত্যাদি		॥০
		—১২৲

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মেম্বর আমাদিগের দ্বারা পরিচালিত বাঙ্গালা মাসিক পত্র "কৃষক" প্রতি মাসে এক কপি করিয়া পাইবেন এবং এসোসিয়েসন হইতে স্বতন্ত্র বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ও মূল্য ৫৲ টাকার অধিক হইলে টাকায় ৴০ এক আনা হিঃ কমিশন পাইবেন।

স্পেশ্যাল মেম্বর ঃ—কৃষকের গ্রাহকগণ এসোসিয়েসনের স্পেশ্যাল মেম্বর। তাঁহারাও বীজ গাছাদি খরিদ করিলে উচ্চহারে কমিশন পাইবেন।

সভারেণ মেম্বরকে বার্ষিক এক সভারেণ বা ১৫৲ টাকা, সাধারণ মেম্বরকে বার্ষিক ১০৲ ও স্পেশ্যাল মেম্বরগণকে কৃষকের বার্ষিক মূল্য ২৲ দিতে হয়।

গুয়ানো সার।

অত্যুৎকৃষ্ট সার। অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয়। ফুল, ফল, সব্জীর চাষে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। অনেক প্রশংসাপত্র আছে। ছোট টীন মায় মাশুল ॥৵০ আনা, বড় টীন মায় মাশুল ১।০ পাঁচ সিকা। ব্যবহারের প্রণালী টীনসহ পাইবেন।

কার্পাস প্রসঙ্গ।—(সচিত্র) শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত প্রণীত। ভারতবর্ষে কার্পাস চাষ সম্বন্ধে জানিবার ও শিখিবার যাবতীয় বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা।

শর্করা-বিজ্ঞান।—ইক্ষু চাষের নিয়ম, আয় ব্যয়, গুড় প্রস্তুত প্রণালী এবং বিলাতী উপায়ে শর্করা প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। মূল্য ।০ চারি আনা।

চীনা বাদাম বা মাট বাদাম খুচরা ।০ পাউণ্ড, মণ ১০৲ টাকা। পাট বীজ খুচরা ।০ পাউণ্ড, মণ ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকা। ধঞ্চে (সবুজ সারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী) খুচরা ।০ পাউণ্ড, মণ ৮৲ টাকা। এই সকল বীজের দর ঠিক থাকে না সময় সময় কম বেশী হইয়া থাকে।

সার। হাড়ের গুঁড়া (ধানের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ) প্রতি মণ ৪৲ টাকা। রেড়ীর খৈল (আলু ও ইক্ষুর পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক) প্রতি মণ ৪৲ টাকা, দর সকল সময় সমান থাকে না। সোরা সার প্রতি মণ ৬৲ হইতে ১০৲ টাকা। প্যাকিং ও রেল মাশুল স্বতন্ত্র। অর্ডারের সঙ্গে টাকা পাঠান আবশ্যক রেল ষ্টেসন, ঠিকানা ও ডাকগাড়ী বা মাল গাড়ীতে মাল পাঠাইতে হইবে স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মেনেজার কে, এল ঘোষ এফ, আর, এচ, এস, (লণ্ডন)।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন,

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ খণ্ড। } আষাঢ়, ১৩১৭ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার।

শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত।

পূর্ব্বে জলস্রোতে চালিত কলে গম পেষাই প্রভৃতি অনেক কার্য্য চলিত, এখন জলস্রোতে চালিত কল বড় একটা দেখা যায় না। ভূগর্ভে নিহিত পাথুরিয়া কয়লা আবিষ্কারের পর পাথুরিয়া কয়লার সাহায্যেই অধিকাংশ কল কারখানা চলিতেছে। প্রতি বৎসর সমগ্র পৃথিবীর পাথুরিয়া কয়লার খরচ শত শত কোটী মণেরও অধিক। পূর্ব্বকালে রন্ধনাদি কার্য্য কাষ্ঠ দ্বারা নির্ব্বাহ হইত, এখন কাষ্ঠ ক্রমে বিরল হইয়া পড়িয়াছে, পাথুরিয়া কয়লা তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আলোক দানের জন্য শস্যজাত তৈলের মূল্য যেমন বাড়িতে লাগিল, অমনি খনিজ তৈল আসিয়া সে ব্যয়ভার লাঘব করিয়া দিল। অনেকে এখন ভাবেন যে পাথুরিয়া কয়লা ও খনিজ তৈলের কাট্‌তি যেমন দিন দিন বাড়িতেছে, কালে তাহা নিঃশেষ হইয়া গেলে কি উপায় হইবে! কিন্তু দুর্ভাবনার কোন হেতু দেখা যায় না। পূর্ব্ব কালের সেই জলস্রোত ও জলপ্রপাত গুলিত বিদ্যমান আছে। অদ্যাপিও নায়েগারা জলপ্রপাতের শক্তিতে যে তাড়িৎ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা অনেকগুলি নগর নগরীতে তাড়িতালোক প্রদান করিতেছে। পৃথিবীর নানা দেশে বহুতর প্রবল বেগবতী প্রবাহিনী সকল প্রবাহিত, তাহাদের সাহায্যেও কল কারখানা যখন পূর্ব্বে চলিত এখনও চলিবে তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। যদি জল-প্রপাতের জল কমিয়া যায়, যদি স্রোতস্বিনীও শুকায়, সমুদ্র ত থাকিবেই এবং সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটায় জল উঠিবে ও নামিবে। সেই জলের উত্থান পতনের মুখে বাঁধ দিয়া মানুষে সেই জলশক্তিকে তাহার নানা কাজে লাগাইতে পারে। কালিফর্ণিয়ায় ইতিমধ্যেই এমন নূতন যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা সমুদ্রজল হইতে শক্তি সংগ্রহ করিলে তাহারই সাহায্যে তাড়িৎ উৎপন্ন করিয়া সহস্র সহস্র তাড়িতালোক জ্বালা যাইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে মাটির সহিত সার সংযুক্ত না হইলে কিছুতেই মাটির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা যাইত না। সকলেই কিন্তু জানেন যে, খুব বজ্রাঘাত হইলে বা মেঘসঞ্চিত তাড়িতপ্রবাহ বায়ুমণ্ডলকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে ক্ষেত্রস্থ ফসল আশাতীত রূপে বৃদ্ধি পায়। সকলে যেমন এইটি লক্ষ্য করিতেন, বারমিংহাম নিবাসী সার অলিভার লজও ইহা

বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি এক্ষণে কৃত্রিম উপায়ে ক্ষেত্রের উপরে তারের জাল দিয়া তাড়িৎ প্রবাহ চালাইয়া ক্ষেতের ফসলের হার দেড়গুণ বাড়াইতেছেন। ইহাতে যে সার প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই এমন নহে, অপিচ জমি যত সারবান হইবে ততই ফসল অধিক হইবে; কিন্তু নিস্তেজ জমিকে সতেজ করাই তাঁহার এক মাত্র উদ্দেশ্য। জমিতে সার থাকিলে কি হয়, সকল সময়ে সারের কার্য্য হয় না। সারকে কাজে লাগানই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলে সামান্য কিছু অধিক খরচের বিনিময়ে প্রচুর লাভবান হওয়া যায়।

বায়ুর বেগ হইতে শক্তি সঞ্চয় করাও অসম্ভব নহে। বায়ু চালিত জাহাজ বোধ হয় এখনও সমুদ্রে চলে। বায়ুচালিত যন্ত্রের ব্যবহারও আজ নূতন নহে। আমাদের ভারতবর্ষে বায়ুচালিত যন্ত্র কোথাও আছে কি না আমরা জ্ঞাত নহি; কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে অনেক জায়গায় ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ুচালিত যন্ত্র নির্ম্মাণে খুব বেশী রকমের শিল্পনৈপুণ্য নাই, বেশী কিছু খরচও নাই, খান কতক তক্তায় পেরেক আঁটিয়া কয়েক খানা পাখা নির্ম্মাণ করিতে পারিলেই হইল। হলণ্ডবাসী কৃষকেরা বায়ুচালিত যন্ত্রের সাহায্যে কল চালাইয়া নীচের জল উপরে তুলিয়া শস্য উৎপন্ন করিতেছে। সেখানে ক্ষেত পাথারে জল দেওয়া, গৃহকার্য্যের জন্য জল যোগান, শস্য ভানা, শস্য পেষা এমন কি দুগ্ধ মন্থন করা প্রভৃতি শত কাজই এই বায়ুযন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্প খরচে সিদ্ধ হয়।

যাবতীয় তেজের মধ্যেই সূর্য্যতেজ নিহিত রহিয়াছে সুতরাং সূর্য্যকর আমাদের কাজে লাগেই। কিন্তু আমরা সূর্য্যকর হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শক্তি সংগ্রহ করিয়া অগ্নি উৎপন্ন করিতে পারি। কতকগুলি দর্পণের সাহায্যে সূর্য্যকর হইতে এই অগ্নি উৎপন্ন হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে প্রতি বর্গ গজ স্থানে যে রৌদ্র পতিত হয় তাহার শক্তি কম নহে। ঐ শক্তি টুকু কাজে আনিতে পারিলে উহার দ্বারা ১২৪০ মণ ভার এক ফুট উত্তোলন করা যাইতে পারে। সূর্য্যকর যদি কাজে লাগান যায়, তাহা হইলে সাহারা, আরবদেশ, মেক্সিকো, অষ্ট্রেলিয়ার মরুময় স্থান গুলিকে শস্য শ্যামলা করিয়া মনুষ্য বাসোপযোগী করা যাইতে পারে।

সকলেই জানেন নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান আছে। নাইট্রোজেন আবার বৃক্ষ লতাদির প্রধান খাদ্য; কিন্তু তাহারা পত্রাদির দ্বারা বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিতে পারে না, তাই তাহাদের আহারের জন্য জীবজ ও খনিজ নাইট্রোজেন মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। এত কাল এই রূপ প্রথায় কাজ চলিয়া আসিতেছে এখন কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, বৃক্ষ লতাদি পত্র, ত্বক বা শাখা প্রশাখা দ্বারা নাইট্রোজেন

গ্রহণ করিতে না পারুক, শিকড় দ্বারা শরীর পোষণার্থ নাইট্রোজেন সংগ্রহে সমর্থ। শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদ্ এত অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া তাহাদের শিকড়গ্রন্থিতে সঞ্চয় করিয়া রাখে যে, তাহাদের সঞ্চিত নাইট্রোজেন পরবর্ত্তী ফসলের সারের কার্য্যে লাগে। শিকড়গ্রন্থিতে নাইট্রোজেন জীবাণু বিদ্যমান থাকিতে দেখিয়া আমেরিকাবাসী বৈজ্ঞানিকেরা এই জীবাণু সংগ্রহ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে জমির উর্ব্বরতা বাড়াইতেছেন। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যদি কোন দিন জীবজ বা খনিজ সারের অভাব হয় তবে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

প্রকৃতির ভাণ্ডারে অনন্ত শক্তি সঞ্চিত আছে। সেই শক্তি সময় মত সুকৌশলে কাজে লাগাইতে পারিলেই হইল। যে উদ্যোগী সে বর্ষাগমের পূর্ব্বেই ক্ষেতে আল বাঁধিয়া রাখে, এক ফোঁটা জল গড়াইয়া যাইতে দেয় না। যে অলস সে যখন জল গড়াইয়া খালে বিলে সঞ্চিত হয় তখন সে সেই জল খাল হইতে উঠাইয়া ক্ষেতে দিবার চেষ্টা করে। অশেষ প্রকার রত্ন ইতস্ততঃ ছড়ান রহিয়াছে; যে জানে, যে চিনে, সে কুড়াইয়া লয়, অন্যে পায় দলিয়া চলিয়া যায়। যে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও উদ্যোগী সেই প্রকৃতির বরপুত্র।

মালদহে লঙ্কার চাষ।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত।

কৃষি কার্য্যের প্রণালী সকল দেশে একরূপ নহে, জমির প্রকৃতি ও জলবায়ুর দোষগুণের পার্থক্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে একই জিনিষের কৃষির প্রণালী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। সুতরাং আমি যে প্রণালীতে যে জিনিষের চাষ আবাদের কথা লিখিব, তাহা হয়ত অন্য প্রদেশে বিসদৃশ বোধ হইতে পারে, এমন কি বিপরীত হইবারও সম্ভাবনা, এজন্য পাঠক মহোদয়গণ ও কৃষি বিদ্যাভিজ্ঞ বহুদর্শীগণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা চাষের মোটামুটী নিয়মটুকু মাত্র জানিয়া স্ব স্ব দেশের প্রকৃতি অনুযায়ী চাষে প্রবৃত্ত হন। আমার লিখিত যতগুলি কৃষি প্রবন্ধ এযাবৎ "কৃষকে" স্থান পাইয়াছে ও পাইবেক, তাহা মালদহ, দিনাজপুর ও পূর্ণিয়ার জলবায়ুর উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইবে। এক্ষণে ঐ ঐ জেলাত্রয়ের পরস্পর সংলগ্ন স্থানসমূহে যে যে প্রণালীতে লঙ্কার আবাদ হয়, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। গত ১৩১৬ সালের পৌষ সংখ্যার "কৃষক" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার লিখিত "হরিদ্রার চাষ" সম্বন্ধে কিছু মতামত প্রকাশ করায় এই ভূমিকাটুকু লেখা হইল।

লঙ্কার এ অঞ্চলে একটী নাম গাছমরিচ। আবার কেবল মরিচ নামেও অভিহিত হয়। ইহা প্রত্যেক গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। প্রকারভেদে লঙ্কার আকার, বর্ণ ও আস্বাদন প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। বিদেশী লঙ্কাগুলির মধ্যে কতকগুলির আকার খুব বৃহৎ ও দেখিতে

বড় সুশ্রী। দেশী লঙ্কার সকল জাতিই অল্পাধিক পরিমাণে ঝাল ও কতকগুলির মিষ্ট আস্বাদন। ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই ইহার আবাদ হয়। লঙ্কার চাষ বেশ লাভজনক এক বিঘা জমিতে ২।৩ মণ হইতে উর্ব্বরতা শক্তি অনুসারে ৪।৫ মণ পর্য্যন্ত ফলিতে দেখা যায়। প্রতি বিঘায় খরচ গড়ে মোট ৭।৮ টাকার বেশী পড়ে না।

উচ্চ ভিটা দোয়াঁশ ও পলীমাটী লঙ্কা চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট। পার্ব্বত্য কঙ্করময় মাটী ও যে মৃত্তিকায় চূণের ভাগ বেশী থাকে, তাহাও বিলক্ষণ উপযোগী। রবি শস্য ও আশু ধান্যের জমিতে লঙ্কা রোপণ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। কখন কখনও আলু উঠিয়া গেলে সেই জমিতে লঙ্কা জন্মিয়া থাকে। লঙ্কার জমিতে যাহাতে বৃষ্টির জল আবদ্ধ থাকে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

লঙ্কা আবাদের জন্য বৈশাখ মাসেই জমী নির্ব্বাচন করা উচিত, জমির চতুঃপার্শ্বে বৃক্ষাদি থাকিলে তাহাতে লঙ্কার অনিষ্ট করে। অনাবৃত ও রৌদ্র পীঠে স্থান হওয়া আবশ্যক। বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া লঙ্কা রোপণের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত জমিতে মধ্যে মধ্যে চাষ দিয়া রাখিলে মাটী আলগা হইয়া থাকে ও তৃণাদি আগাছা জন্মিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে জমিতে পুরাতন গোময়, ছাই, চূণ ও সর্ষপ খৈল প্রভৃতি সার প্রদান করিয়া জমির উর্ব্বরতা শক্তির সহায়তা করিতে হয়।

বৎসরের মধ্যে যে কোন সময় চারা প্রস্তুত করিয়া লঙ্কার আবাদ করা যায়, সাধারণতঃ একবার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আর একবার ভাদ্র, আশ্বিন এই দুই বার লঙ্কা রোপণ করা হইয়া থাকে, কিন্তু বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে যে লঙ্কা রোপণ করা হয়, তাহা ভাদ্র, আশ্বিনের আবাদী লঙ্কা অপেক্ষা ফলনে কম হয়। আষাঢ় মাসেই বীজ পাতো দিয়া চারা উৎপাদনের প্রশস্ত সময়। স্বল্প সারযুক্ত স্থানে বীজ ছড়াইয়া কেয়ারী প্রস্তুত করিয়া বপন করিতে হয়। যাঁহারা অল্প পরিমাণ স্থানে লাগাইবার জন্য চারা উৎপাদন করিবেন, তাঁহারা গামলায় বা হাঁড়িতে বীজ ছড়াইয়া চারা প্রস্তুত করিতে পারেন। আবার মাটীতে কিছু গর্ত্তের ন্যায় করিয়া বীজ বপন করিয়াও চারা জন্মান যায়। ফল কথা যে কোন রকমেই হউক না কেন যাহাতে কেয়ারী, টব বা গামলার কি গর্ত্তের রস শুষ্ক হইয়া না যায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বীজ ছড়াইয়া তদুপরি উলুখড় পাতলা করিয়া ঢাকা দিয়া জল সেচন করিলে মৃত্তিকায় শৈত্যতা রক্ষা ও বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়।

প্রায়ই ৫।৭ দিনের মধ্যে বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হয়। পিপীলিকা লঙ্কার ও বেগুন বীজের মহা শত্রু, এজন্য উহার উপদ্রব নিবারণার্থে ছাই ছড়াইয়া দিলে কিম্বা হরিদ্রার গুঁড়া দিলে আর পিপীলিকায় অনিষ্ট করিতে পারে না। চারাগুলি ৫।৭ ইঞ্চি বড় হইলেই জমিতে রোপণের উপযুক্ত হয়। জমির উর্ব্বরতা শক্তি অনুসারে দেড় হাত হইতে দুই হাত অন্তর কোথাও বা এক হাত অন্তর

রোপণ করা হয়। চারাগুলি সরল রেখা ক্রমে বসাইবার জন্য দুই দিকে দুইটী খুঁটা পুঁতিয়া দড়ি বান্ধিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে লাইন বক্র হয় না। কেহ কেহ প্রত্যেক গর্ত্তে দুই দুইটী করিয়া চারা রোপণ করিয়া থাকেন। চারা রোপণের সঙ্গে সঙ্গে এবং রোপণ করিবার পরেও ৪।৫ দিন দুই বেলা জল দেওয়া কর্ত্তব্য। বৃষ্টি হইলে আর জল দেওয়ার আবশ্যক হয় না, ১০।১২ দিনেই চারাগুলি বেশ লাগিয়া যায়। চারাগুলি অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত হইলে উহাদের গোড়াগুলি নিড়ানী দ্বারা অল্প অল্প খুঁড়িয়া দিতে হয় ও আগাছা জন্মিলে তাহাও তুলিয়া ফেলিবে। অনন্তর একবার সমস্ত জমি কোদালী দ্বারা কোপাইয়া দিবে। কেহ কেহ উহার মধ্যে লাঙ্গল বাহিয়া দেয়, কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণের প্রথমেই জমি কিছু নীরস ভাব ধারণ করিলে সমস্ত জমিতে একবার প্রচুর পরিমাণে জল সেচন করিয়া দিতে হয়। যাহাতে ক্ষেত্রে এক ইঞ্চি জল দাঁড়ায় কাষ্ঠ নির্ম্মিত "দন" দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করা হয়, তৎপরেই গাছে ফুল ও ক্রমে ফল ধরিতে আরম্ভ করে।

ফাল্গুন মাসেই লঙ্কা পাকিয়া উঠে, কোন কোন গাছে কিছু কাঁচাও থাকিয়া যায়, সেগুলি আবার চৈত্র মাসে পাকিয়া যায়, অথবা কাঁচা তুলিয়াও বিক্রয় করে। এই লঙ্কাগুলি আকারে লম্বা, বর্ণ উজ্জ্বল, লোহিতবর্ণ, আবার কতকগুলি হরিদ্রাবর্ণ। আর এক প্রকার লঙ্কা বৎসরের যে কোন সময় লাগাইলে বার মাসই অল্পাধিক পরিমাণে ফল দেয়, এবং গাছ দুই বৎসর জীবিত থাকে। এই লঙ্কাগুলি অত্যন্ত উগ্র ঝাল, ইহাকে "ধানী" লঙ্কা বলে। সাধারণ গৃহস্থ বাটীতে এইরূপ দশ পাঁচটী গাছ সম্বৎসরই থাকে ও ফল প্রদান করে।

মৎস্যের শ্রেণী বিভাগ।

এই ভূমণ্ডলে যে কত জাতীয় মৎস্য আছে, তাহা এযাবৎ কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তবে জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এ বিষয় যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

ভূমণ্ডলে যত জাতীয় মৎস্য দৃষ্ট হয়, জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ প্রথমতঃ তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—(ক) সম্পূর্ণ বা নিরেট কণ্টক বিশিষ্ট মৎস্যশ্রেণী * এবং (খ) তরুণ বা কোমল কণ্টক বিশিষ্ট মৎস্য শ্রেণী †। উভয় শ্রেণীর শারীরিক গঠনের বিভিন্নতা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক)

১। কঙ্কাল সম্পূর্ণ কণ্টক দ্বারা নির্ম্মিত।

২। মস্তিষ্ক সহজ দ্রষ্টব্য।

৩। করোটীর ঊর্দ্ধ ও পশ্চাৎ অংশে (Cranial) কণ্টক আছে।

৪। কশেরুকা কণ্টক সম্পূর্ণরূপে পৃথক এবং মেরুদণ্ডের পশ্চাৎ প্রদেশের সীমা কণ্টকময় অথবা প্লেটের ন্যায়।

৫। ফুলকা বা Gill শক্ত প্লেট দ্বারা আবৃত ও প্লেটের প্রান্তদ্বয় খোলা।

৬। শল্ক বিহীন ও শল্ক বিশিষ্ট।

উদাহরণ—রোহিত, মিরগেল, কাতলা, বাটা ভোলা, খরশুলা, শৌল, শাল, ইলিশ, চাঁদা, পুঁটি, টেঙ্গরা ইত্যাদি।

---

* Telostai.

† Chondropterygii or Cartiginous fish.

(খ)

১। কঙ্কাল তরুণ বা কোমল কণ্টকদ্বারা নির্ম্মিত।
২। মস্তিষ্ক সহজ-দ্রষ্টব্য।
৩। করোটীর ঊর্দ্ধ ও পশ্চাৎ অংশের (Cranial) কণ্টকে জোড়া নাই।
৪। মেরুদণ্ড তরুণ কণ্টক দ্বারা নির্ম্মিত।
৫। ফুলকা বা Gill অনাবৃত।
৬। শল্ক বিহীন ও শল্ক বিশিষ্ট।

উদাহরণ—শঙ্কর, বোমলা, লটীয়া, হাঙ্গর ইত্যাদি।

উক্ত বৃহৎ শ্রেণীদ্বয়ের আবার কতকগুলি শাখা আছে। সম্পূর্ণ কণ্টক বিশিষ্ট মৎস্য শ্রেণীর পাঁচটি এবং তরুণ কণ্টক বিশিষ্ট মৎস্য শ্রেণীর এযাবৎ একটি শাখা ও দুইটি উপশাখা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

(ক) সম্পূর্ণ কণ্টকবিশিষ্ট মৎস্য শ্রেণীর শাখা।

১। সবায়ুকোষ পাকনালী শাখা (Physostomi)।—ইহাদিগের প্রায় অধিকাংশ ডানাসমূহের রেজ্‌গুলি গ্রন্থিযুক্ত এবং বায়ুকোষ ও পরিপাক যন্ত্র পরস্পর সম্মিলিত। এই শাখাশ্রেণীর অন্তর্গত স্কম্ব্রিসোসিডি জাতি ভিন্ন আর সকলেরই বায়ুকোষ বা পটকা দৃষ্ট হয়*। উদাহরণ—রোহিত, কাতলা, মিরগেল, বাটা, ইলিশ, চেলা, মৌরুলা, পুঁটি, ডানকোনা, খয়রা, ফলুই, চিতল, আড়, টেঙ্গরা ইত্যাদি।

২। সকণ্টকপক্ষ শাখা (Acanthopterigii)।—ইহাদিগের পক্ষ বা ডানা কণ্টকময় এবং অধিকাংশ ডানা গ্রন্থিবিহীন। পৃষ্ঠ, মলদ্বার ও সম্মুখ বা উদর প্রদেশস্থ ডানার কণ্টকের কতক অংশ দ্বারা মেরুদণ্ড নির্ম্মিত। উদাহরণ—ভোলা, খরশুলা, চাঁদা, শৌল, শাল, লেটা, কই, বাম, ভেটকী ইত্যাদি।

* Air Bladder or Pneumatic duct.

৩। পৌচ্ছিক কশেরুক বিহীন শাখা (Anacanthini)।—এই শাখাভুক্ত মৎস্য সমূহের পুচ্ছদেশে কশেরুকা কণ্টক আদৌ দৃষ্ট হয় না, এবং মস্তকের সন্নিহিত পৃষ্ঠ ডানা ও সম্মুখ বা উদর প্রদেশস্থ ডানা সমূহের রেজগুলি গ্রন্থিযুক্ত। উদাহরণ—আরসী, পান ইত্যাদি। এই শাখার অন্তর্গত মৎস্য সচরাচর প্রায় দেখা যায় না, পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ এই শাখাভুক্ত মৎস্য দেখিয়া কৌতুহল চরিতার্থ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কলিকাতা মহানগরীর "ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগারে" (Museum) গেলেই দেখিতে পাইবেন।

৪। সগুচ্ছ ফুলকা শাখা (Lophobranchii)।—এই শাখাভুক্ত মৎস্য সমূহের ফুলকা সগুচ্ছ, ও ফুলকা আবরণের প্রান্তদ্বয় খোলা নয়। ইহাদিগের শরীর তত মাংসল নয়, মুখেতে শুঁড় বা থুংনী আছে, মুখ অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও দন্ত বিহীন। উদাহরণ—কাঁকাল, কড়্‌সী, দাওকাটা ইত্যাদি। এই এই শাখার অন্তর্গত মৎস্যও সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

৫। কুঞ্চিত হনু শাখা (Plectognathi)।—ইহাদিগের কশেরুকাকণ্টক সংখ্যায় বড়ই অল্প। ফুলকা আবরণের প্রান্তদ্বয় বেশী খোলা নয়। মস্তক সাধারণতঃ বৃহৎ ও মুখ অপ্রশস্ত। হনু সঙ্কুচিত বা কোঁকড়ান থাকা প্রযুক্ত, মুখের আকৃতি পক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় হইয়া থাকে। উদাহরণ—টেঁপা, পট্‌কা, পোকসা ইত্যাদি। এই শাখার অন্তর্গত মৎস্যও সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

(খ) তরুণ কণ্টকবিশিষ্ট মৎস্যশ্রেণীর শাখা।

১। বক্রমুখী শাখা (Plagiostomata)।—এই শাখাভুক্ত মৎস্যের শরীরের গঠন প্রায় চোঙ্গার ন্যায়, এবং হনু করোটী হইতে পৃথক। উদাহরণ—বোমলা বা লটিয়া ইত্যাদি। লটিয়া মৎস্য চট্টগ্রামে বিস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শাখা শ্রেণীর যে

দুইটি উপশাখা আছে, হাঙ্গর ও শঙ্কর মৎস্য তাহাদিগের অন্তর্গত।

জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ মৎস্য সমূহকে পূর্ব্বোক্ত ছয়টি শাখা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। প্রত্যেক শাখা শ্রেণীর অন্তর্গত মৎস্য সমূহের পরস্পর শারীরিক গঠন প্রণালীর বিভিন্নতা দেখিয়া ইহাদিগের আবার জাতি, পরিবার, বংশ ইত্যাদি স্থির করিয়াছেন। সকশেরুক জন্তুবর্গের মধ্যে মৎস্য ব্যতীত আর কোন জাতিরই এত শারীরিক গঠনের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা অন্ততঃ আমাদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য মৎস্য সমূহের শ্রেণী, জাতি, পরিবার, বংশ প্রভৃতির একটি ধারাবাহিক তালিকা ও তাহাদিগের বৈজ্ঞানিক নাম নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

(১) সম্পূর্ণ কণ্টকবিশিষ্ট মৎস্যশ্রেণী। (TELEOSTEI.)

সবায়ু কোষ পাকনালী শাখা (PHYSOSTOMI)।

(এই শাখার অন্তর্গত দশটি পরিবার ও ১০৫টি বংশ এযাবৎ স্থিরীকৃত হইয়াছে)।

১ রোহিত	Cyprinus	Rohita
২ কাতলা	,,	Catla
৩ মিরগেল	,,	Mirgala
৪ কালবোস	,,	Calabanshu
৫ বাটা	,,	Bata
৬ ভাঙ্গন	,,	Bangana
৭ কুরচি	,,	Curchius
৮ চাপলী	,,	Chapalio
৯ চেলা	,,	Bacaila
১০ ফুল ফেলা	,,	Phula
১১ ঘোড়া চেলা	,,	Gora
১২ মৌরলা	,,	Mourulla
১৩ অঞ্জনা	,,	Anjana
১৪ পুঁটি	,,	Punteo
১৫ তিত পুঁটি	,,	Ticto
১৬ সরল পুঁটি	,,	Sarana
১৭ কাঞ্চন পুঁটি	,,	Kanchana
১৮ দেবারী	,,	Devari
১৯ তর্	,,	Tor
২০ এলেঙ্গা	,,	Elenga
২১ মহাশাল	,,	Mosal
২২ ভোলা	,,	Bhola
২৩ ডানকোনা	,,	Daniconias
২৪ ফেঁসা	Clupea	Phensa
২৫ গাঙ্গফেঁসা	,,	Telara
২৬ করাতী	Clupanodon	Chapra
২৭ চাকুন্দা	,,	Chacunda
২৮ ইলিশ	,,	Ilisha
২৯ খয়রা	,,	Cortias
৩০ গাঙ্গ খয়রা	,,	Manmina
৩১ ফলুই (ফলি)	Mystus	Kapirat
৩২ চিতল	,,	Chitala
৩৩ রামকরাতী	,,	Ramcarati
৩৪ মাগুর	Macropteronotus	Magur
৩৫ জাগুর	,,	Jagur
৩৬ পাঙ্গাস	Pimelodus	Pangasius
৩৭ আড় (আইড়)	,,	Arius
৩৮ বাঘ আড়	,,	Bagarius
৩৯ গাগড়া	,,	Gagora
৪০ বাচা	,,	Vacha
৪১ টেঙ্গরা	,,	Tengara
৪২ করকী টেঙ্গরা	,,	Carcio
৪৩ রাম টেঙ্গরা	,,	Rama

৪৪ রিঠা	,,	Rita
৪৫ চন্দ্রমারা	,,	Chandramara
৪৬ শিলন্দ	,,	Silondia
৪৭ বাঁশপাতা	,,	Anguis
৪৮ ঘাগোট	,,	Gagata
৪৯ শিঙ্গী	Silurus	Singlo
৫০ পাবদা	,,	Pabda
৫১ কাণীপাবদা	,,	Canio
৫২ বোয়াল	,,	Boalis
৫৩ বারুয়া	,,	Garua

(২) সকণ্টক পক্ষ শাখা।

(ACANTHOPTERIGII.)

(এই শাখার অন্তর্গত ৪২টি পরিবার ও ১৭৮টি বংশ এযাবৎ স্থিরীকৃত হইয়াছে)।

১ আলবুলা	Mugil	Albula
২ কাঁকাশিয়া	,,	Cascasia
৩ খরশুলা	,,	Corsula
৪ পারশিয়া	,,	Parsia
৫ লালচাঁদা (কাটচাঁদা)	Chanda	Lala
৬ নামচাঁদা	,,	Nama
৭ ফুলচাঁদা	,,	Phula
৮ বকুলচাঁদা	,,	Baculis
৯ রাঙ্গাচাঁদা	,,	Ranga
১০ শাল (গজাল)	Ophiocephalus	Marulius
১১ শৌল	,,	Sol or Wrahl
১২ লেটা (গড়ুই)	,,	Lata
১৩ কই	Coius or Anabas	Cabojius
১৪ ন্যাদস (ভ্যাদা)	,,	Nandas
১৫ ভেটকী	,,	Vacti
১৬ বাম্ (বাইম)	Macrognathus	Armatus
১৭ তারাবাম্	,,	Aculeatus
১৮ পাঁকাল	,,	Pancalus
১৯ খলিসা	Trichopodus	Colisa
২০ চুনাখলিসা	,,	Chuna
২১ লাল খলিসা	,,	Lalius
২২ সাদা খলিসা	,,	Sota
২৩ বেলে (বাইল)	Gobius	Giuris
২৪ ভুতো বেলে	,,	Bato
২৫ চ্যাঙ্গ	,,	Changua
২৬ তপস্বী (খষয়া)	Polynemus	Tupsee

পৌচ্ছিক কশেরুকা বিহীন শাখা

(ANACANTHINI)।

(এই শাখার অন্তর্গত ৩টি পরিবার ও ১২টি বংশ এযাবৎ স্থিরীকৃত হইয়াছে)।

১ আরশী	Pleuronectes	Arsius
২ পান	,,	Pan
৩ নফেলা	,,	Nauphala

সগুচ্ছ ফুলকা শাখা

(LOPHOBRANCHII)।

(এই শাখার অন্তর্গত একটি পরিবার ও সাতটি বংশ এযাবৎ স্থিরীকৃত হইয়াছে)।

১ কাঁকাল	Syngnathus	Cuncalus
২ কারসী	,,	Carcee
৩ দেওকাঁটা	,,	Deocata

কুঞ্চিত হনু শাখা (PLECTONATHI)।

(এই শাখার অন্তর্গত দুইটি পরিবার ও নয়টি বংশ এযাবৎ স্থিরাকৃত হইয়াছে)

১ টেপা	Tetrdon	Tepa
২ কট্‌কটিয়া	,,	Cutcutia
৩ পটকা	,,	Patoca

তরুণ কণ্টক বিশিষ্ট মৎস্যের শাখা (CHONDROPTERYGII.)

বক্রমুখী শাখা (PLAGIOSTOMATA)

বক্রমুখী শাখার দুই উপশাখা আছে। প্রথম উপশাখার অন্তর্গত ৪টি পরিবার ও ১২টি বংশ এবং দ্বিতীয় উপশাখার ৬টি পরিবার ও ১৫টি বংশ এযাবৎ স্থিরীকৃত হইয়াছে।

চিঙ্গড়ী।

বহুকাল হইতেই প্রায় সমস্ত সভ্য প্রদেশে চিঙ্গড়ী মৎস্যজাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মণ্ডলী ইহাদিগের কশেরুকার অভাব এবং শারীরিক গঠন প্রণালীর নানাপ্রকার বৈলক্ষণ্য দৃষ্টে ইহা-দিগকে মৎস্যজাতি বলিয়া স্বীকার করেন না। চিঙ্গড়ী অকশেরুক জন্তুশ্রেণীর অন্তর্গত এবং চিঙ্গড়ী ও কর্কট এই উভয় জাতিই এক শাখা ভুক্ত। এইরূপ সমুদ্রজাত তিমি নামক বৃহৎ জন্তুও অণ্ডজ মৎস্য জাতির অন্তর্গত নহে, তাহারা জরায়ুজ।

পৃথিবীর সমস্ত প্রদেশেই চিঙ্গড়ী দৃষ্ট হয়। সমুদ্র, হ্রদ, নদী, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি এমন কোন জলাশয় প্রায় দেখা যায় না, যাহাতে ইহারা বাস না করে। চিঙ্গড়ী অণ্ডজ ও নানাজাতীয়, এবং জাতি অনুসারে ইহাদিগের আকার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পাঠকবর্গ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, এক জাতীয় চিঙ্গড়ী আছে, ইহারা প্রত্যেক তিন মাসে আট বার করিয়া ডিম্ব প্রসব করে, এবং বৎসরান্তে এক একটি চিঙ্গড়ীর বংশাবলী ৪,৬৪২,১৮৯,১২০টি হইয়া থাকে। গল্দা জাতীয় যে এক রকম চিঙ্গড়ী আছে, তাহার এক একটি দীর্ঘে কখন কখন একহস্ত এবং ওজনে প্রায় এক সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। চিঙ্গড়ীজাতি মৎস্য জাতির অন্তর্গত নয় বলিয়া বাহুল্য ভয়ে তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা গেল না।

আষাঢ়—১৩১৭।

ধান্য।

অধিকাংশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রধান খাদ্য চাউল। কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে ধান্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং বিভিন্নদেশে ধান্যের বহুসংখ্যক জাতি দৃষ্ট হয়। আকৃতি, অবয়ব, ওজন, বর্ণ প্রভৃতির হিসাবে যে কত বিভিন্ন প্রকারের ধান্য উৎপাদিত হয় তাহার প্রায় ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে অনেক পার্থক্য থাকিলেও ধান্যের জাতিভেদে উপাদান সমূহ পরিবর্ত্তিত হয় না। যে সমুদয় মূল পদার্থের সংযোগে ধান্য গঠিত হইয়াছে, বিভিন্ন প্রকারের ধান্যে সে গুলির ইতর বিশেষ হয় না, কেবল তাহাদের মাত্রার ইতর বিশেষ হয়। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ-উৎপাদিত প্রধান প্রধান জাতীয় ধান্য সমূহের সম্পূর্ণ রাসায়নিক বিশ্লেষণ না হওয়ায় আমরা উহাদের রাসায়নিক গঠন প্রণালী জানিতে পারি নাই। সম্প্রতি ভারতীয় মিউজেমের সুপ্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ পণ্ডিত মিঃ হুপার ভারতোৎপাদিত বিভিন্নপ্রকার ধান্যসমূহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া তৎসমুদয়ের ফলাফল প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মিঃ ব্যালাণ্ডের "ফরাসী

দেশে আমদানিকৃত চাউলের উপাদান" নামক প্রবন্ধের পর মিঃ হুপারের বর্ত্তমান পুস্তিকাই ধান্যের রসায়ন সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রবন্ধাদির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ, কোচিন চিন, জাপান, যবদ্বীপ, কেরোলিনা, পিডোমোণ্ট (ইতালী) ও সেইগণই ধান্য উৎপাদনের প্রধানতম কেন্দ্র। এই সমুদয় কেন্দ্রোৎপাদিত ধান্যের উপাদান সমূহের মাত্রার পার্থক্য কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বিভিন্ন অবস্থায় উৎপাদিত ধান্যের আকৃতি ও উপাদানের বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে বিশ্লেষণের অঙ্ক সমূহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। শস্য অসম্পূর্ণ ভাবে পরিষ্কৃত হওয়ার জন্য তন্তু ও ধূলা মাটি প্রভৃতির অনুপাতের সময় সময় অনেক তারতম্য হয় বটে, কিন্তু যেটি ধান্যের প্রধানতম উপাদান অর্থাৎ নাইট্রোজেন ঘটিত অ্যালবুমিনয়েড, তাহার মাত্রার ইতর বিশেষ নিতান্তই সীমাবদ্ধ। প্রায় দশটির মধ্যে নয়টি নমুনাতে অ্যালবুমিনয়েডের মাত্রা শতকরা সাত ভাগের কম ও আট ভাগের বেশী দৃষ্ট হয় না।

ধান্য হইতে চাউল তৈয়ারীর প্রথা সকলেই অবগত আছেন। চাউল তৈয়ারীর সময় ধান্যের অনেক সারাংশ চলিয়া যায়। আমাদের দেশে যেরূপ অবস্থায় চাউল বিক্রয় হয় তাহা অপেক্ষা অধিকতর চাকচিক্যশালী করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় চাউল বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু পালিশের জন্যই চাউলের পুষ্টিকর পদার্থ আরও কমিয়া যায়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, আছাঁটা চাউলে শতকরা ৯·৭৮ ভাগ প্রতিদ (proteids) অর্থাৎ নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ আছে। ভুষিতে উহার পরিমাণ শতকরা ৯·২৬ হইতে ১৩·৪১ ও বসার পরিমাণ, ৫·২ হইতে ৬·৭। চাউল পালিশ করিতে যে গুঁড়া বাহির হয় তাহাতে প্রতিদ ও বসা যথাক্রমে শতকরা ৮·৫ হইতে ১১ ও ৫·২ হইতে ৬·৭ ভাগে বর্ত্তমান। পালিশ করা চাউলে প্রতিদের মাত্রা শতকরা ৬·৫৭ মাত্র। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বিক্রয়ের জন্য তৈয়ারী করিতে ক্রমশঃই চাউলে পুষ্টিকর ভাগ কমিয়া যায়। এতদ্ভিন্ন রান্নাতেও চাউলের সারাংশ কতক পরিমাণে নষ্ট হয়। পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে রান্নায় চাউলের অ্যালবুমিনয়েডের শতকরা ·৬০, বসার ·১৩, শ্বেতসার ও শর্করার ৬·২৭ এবং ভস্মের ·১১ ভাগ অপচয় হয়।

উত্তর ভারত, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গই ধান্য উৎপাদনের প্রধান স্থান। বঙ্গদেশে বালাম, আতব ও সিদ্ধ এই তিন প্রকারের চাউল বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় পশ্চিম বঙ্গের কতিপয় প্রধান প্রধান জাতীয় ধান্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইল:—

বিশ্লেষণের তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে দাদখানির রোগীর পথ্য ও উচ্চশ্রেণীর চাউল

নং	ধান্যের নাম।	প্রাপ্তি স্থান।	জলীয়াংশ	নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ অ্যালবুমিনয়েড্স	বসা	শ্বেতসার ও শর্করা	তন্তু	ভস্ম
১	গোলাপসরু	রাঙ্গামাটি	১১·৪০	৭·৪৮	·৭০	৭৮·৯২	·৬০	·৯০
২	পাটনাই স্বাতি	মন্দ্রাবাজার	১১·১৫	৭·৮৭	·৪০	৭৯·৪৬	·৫২	·৬০
৩	ছাঁটা বালাম	কলিকাতা	১০·৮০	৮·৪৯	·৩৬	৭৯·২৯	·২১	·৮৫
৪	রূপসাল	রাজহাট	১১·১০	৬·৯২	·১৬	৮০·৫২	·৬০	·৭০
৫	দাদখানি	দিনাজপুর	১১·১৫	৫·৭৪	·১০	৮১·৬৮	·৪৩	·৯০
৬	বাঁকতুলসী	আবদালপুর	১০·৯০	৭·৪৮	·১২	৮০·৫০	·৩৫	·৬৫
৭	ঘুঁচি	খুলনা	১১·৪০	৮·৯৪	·৭১	৭৭·৬২	·৫৭	·৭৫
৮	কাটারীভোগ	ভাগলপুর	১২·৪০	৭·৩১	·২০	৭৮·৯৬	·৩৮	·৭৫
৯	ঐ	দিনাজপুর	১২·৬৫	৬·৫৮	·৩২	৭৯·১৪	·৪৬	·৮৫
১০	নাগ্রা	বর্দ্ধমান	১১·৮০	৭·৮৭	·৩৮	৭৯·০২	·৩৮	·৫৫
১১	পাটনা টেবল চাউল	কলিকাতা	১২·৭০	৬·৬৯	·২৬	৭৯·৩৭	·৪৮	·৫০
১২	মুড়ির চাউল	কটক	১১·১০	৭·১৯	·২০	৮০·৩৫	·২৬	·৯০

বলিয়া যে প্রতিপত্তি আছে ও যাহার জন্য ইহা অত্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়, তাহার হিসাবে ইহাতে পুষ্টিকর অংশ অত্যন্ত কম মাত্রাতেই রহিয়াছে। এমন কি বঙ্গদেশে সুপরিচিত চাউল সমূহের মধ্যে দাদখানিতেই নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা কম। পক্ষান্তরে দাদখানির ১৫৲ টাকা মণ এবং খুলনার ঘুঁচির ৪৲ টাকা মণ। কিন্তু সারাংশ হিসাবে ঘুঁচি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের চাউল সমূহের মধ্যে যে গুলি অধিকতর পরিচিত তাহাদিগের বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ধান্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বক্তব্য নাই। দাদখানির ন্যায় পূর্ব্ববঙ্গে কালজীরার বেশ নাম রহিয়াছে এবং বিশ্লেষণের ফলে উক্ত নাম উপযুক্ত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বোকা চাল সিদ্ধ করিতে হয় না। গরম জলে ফেলিলেই ভাত হইয়া যায়। উৎপাদনের স্থানে বোকা চাউল চিড়ার ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

নং	ধান্তের নাম।	প্রাপ্তি স্থান।	জলীয়াংশ	নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ অ্যালবুমিনয়েডস	বসা	শ্বেতসার ও শর্করা	তন্তু	ভস্ম
১	কালজীরা	মৈমনসিংহ	১০·৬০	৮·৩২	·২৮	৭৯·৪৮	·৬২	·৭০
২	ধাঁকতুলসি	ঐ	১০·৫৫	৮·২১	·১০	৮০·২২	·৪২	·৫০
৩	আউস	ধুবড়ি	১০·০৫	৭·৯৯	·৩৬	৭৯·৮০	·৮২	১·০০
৪	আমন	চাঁদপুর	১১·০০	৬·৮০	·১৬	৮০·০৩	·৭৬	১·২৫
৫	বর্দ্ধনা	গোয়ালপাড়া	১০·৫৫	৮·১৫	·৪৬	৭৯·১১	·৭৮	·৯৫
৬	সোনামুখি	চট্টগ্রাম	১০·৮৫	৮·৪৯	·৯৪	৭৮·৩৮	·৪৪	·৯০
৭	রাজিমণি	বগুড়া	১১·১০	৬·৬৪	·৫৮	৮০·১৬	·৭২	·৮০
৮	বোকা	তেজপুর	১২·২০	৭·০৩	·৮৬	৭৭·৬৬	·৮০	১·৪৫
৯	ফুরিন	মনিপুর	১১·৩০	৮·৩২	·৬৮	৭৮·৫৩	·৪২	·৭৫
১০	কাটারিভোগ	নওগাঁ, রাজসাহী	১১.৫০	৬·৫২	·২২	৮১·১১	·২০	·৪৫

ব্রহ্মদেশ, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, নেপাল, পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশেও যথেষ্ট পরিমাণে উত্তম চাউল উৎপাদিত হয়। ব্রহ্মদেশের কৃষ্ণ চাউলে নাইট্রোজেন ঘটিত অংশ ৯·২। সুতরাং পুষ্টিকর দ্রব্যের হিসাবে উহাকে ভারতীয় প্রথম শ্রেণীর চাউলের মধ্যে স্থান দিতে পারা যায়। যুক্তপ্রদেশের চাউল সমূহের মধ্যে গোণ্ডা জেলায় তুলসি মহকুমায় উৎপাদিত চাউল ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চাউলরূপে পরিগণিত হয় এবং পাটনা সহরে আসিয়া ইহা নানা স্থানে রপ্তানি হয় বলিয়া ইহার নাম পাটনাই হইয়াছে। অবশ্য এতদ্ভিন্ন অন্য চাউলও পাটনাই চাউল নামে পরিচিত হয়। নেপালে ধান্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হয়। । উক্ত স্থানের নিম্নভূমিতে একটিমাত্র ফসল হইতে পারে। নয়াকোটই নেপালের ধান্য উৎপাদনের সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্র। এই স্থানে প্রায় ২০ জাতীয় ধান্য উৎপাদিত হয়। তন্মধ্যে মালভোগ, কিষণভোগ প্রভৃতিই অন্যতম এবং এই সমুদয়ই সুবিখ্যাত পিলিভিত চাউল নামে বিক্রয় হয়। নিম্নলিখিত তালিকায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের কতিপয় উৎকৃষ্ট চাউলের বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইল ঃ—

মিঃ হুপার কর্ত্তৃক সর্ব্ব সমেত ১৫৯ জাতীয় ধান্য বিশ্লেষিত হয়। বিভিন্ন প্রদেশের জল, হাওয়া ও

নং	ধান্যের নাম।	প্রাপ্তিস্থান।	জলীয়াংশ	অ্যালবুমিনয়েড্স্।	বসা	শ্বেতসার ও শর্করা	তন্তু	ভস্ম
১	সমুদ্রফেন	কাটামুণ্ডু, নেপাল	১১·৩৫	৮·৮১	·৫৬	৭৮·৩৪	·২৪	·৭০
২	শ্যামজিরা	ঐ	১১·৬০	৭·৭৫	·৮৮	৭৮·৫৯	·২৮	·৯০
৩	বাঁশমতি	ঐ	১১·৩৫	৭·৩১	·৬২	৭৯·৮৫	·২২	·৬৫
৪	গৌড়ীয়া	ঐ	১১·৮৫	৭·৩১	·৬৮	৭৯·০৮	·২৮	·৮০
৫	কামোদ	ধুলিয়া, বোম্বাই	১৪·১৫	৯·৭৫	৩·৩৬	৭০·৫৪	·৮০	১·৭০
৬	বাঙ্গালি	চিকলি, সৌরাষ্ট্র	১৪·১৫	৯·০০	২·৯৬	৭১·৩৭	·৯২	১·৬০
৭	ধুলধানি	ব্রোচ	১৩·৬০	৯·৮১	২·৯০	৭১·১২	·৯২	১·৬৫
৮	অম্বামোহর	বেলগম্	১৩·৫০	৯·৫৬	২·৬৮	৭২·৩৯	·৭২	১·৩৫
৯	জীরাশাল	দক্ষিণ কানাড়া	৮·৪০	৬·৭৫	·৯০	৮২·১৭	·৫৮	১·২০
১০	রিয়ান্দ	সুখেত	১২·৯০	৮·১০	·৩০	৭৭·৫২	·৪৮	·৭০
১১	লালবগড়ি	রায়বেরিলী	৯·০০	৮·৬২	২·৭৬	৭৬·৮৩	১·১৪	১·৬৫

মৃত্তিকার গুণে অবশ্য ধান্যের উপাদানের মাত্রার পার্থক্য হইয়া থাকে। বর্ত্তমান অনুসন্ধানের অন্যতম উদ্দেশ্য এই যে, কি কি স্বাভাবিক অবস্থার জন্য এক জাতীয় ধান্য অপর জাতীয় ধান্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হয়। কতিপয় স্থলে দেখা গিয়াছে যে, চাউলের মূল্যের উচ্চতার সহিত নাইট্রোজেন ঘটিত অংশের মাত্রাও অধিক; পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের কালজীরা ও বাঁকতুলসী, কটকের মুড়ির চাউল ও কর্পূরকাটা, নেপালের সমুদ্রফেণ, শ্যামজীরা, বাঁশমতি ও গৌড়ীয়া এবং বোম্বাইর কামোদ ও বাঙ্গালী জাতীয় ধান্যের মূল্য এবং পুষ্টিকর উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে বঙ্গদেশের দাদখানির মূল্য ও সারাংশের সহিত অত্যন্ত অসামঞ্জস্য। মিঃ হুপারের পরীক্ষা সমূহ হইতে কয়েকটি জাতীয় ধান্য কৃষকগণের বিশেষ মনযোগের উপযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় —তন্মধ্যে নেড়াগির্জ্জার ছাঁটা বালাম, রাজহাটের ছিলেট আতব, খুলনার ঘুঁচি ও দুধিয়া মাতাল, ভাগলপুরের লালিবাগড়া, চট্টগ্রামের সোণামুখি, তেজপুরের বড়ধান, রায়বেরিলির লালবগড়ি প্রভৃতি তিন নম্বর তালিকায় উল্লিখিত ধান্য সমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশজাত ধান্যসমূহের বিশ্লেষণের গড়পড়তার হিসাব করিলে নিম্নলিখিত ফল পাওয়া যায়ঃ—

নিম্নোক্ত তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে ভারতীয় চাউলসমূহে প্রতিদের পরিমাণ গড়ে শতকরা ৭'২৫ ভাগ। উহার সর্ব্বোচ্চ মাত্রা পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম এবং বোম্বাইয়ে এবং সর্ব্বনিম্ন মাত্রা কটক ও মধ্যপ্রদেশে। পৃথক পৃথক হিসাবে দেখিতে ব্রোচের ধূনধানিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ প্রতিদ (শতকরা ৯'৮১ ভাগ) এবং কটকের মোৎসাকায় সর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণ প্রতিদ (শতকরা ৫'৪৪ ভাগ)।

নং	প্রদেশের নাম	নমুনার সংখ্যা	জল	নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ (প্রোটিন)	বসা	শ্বেতসার ঘটিত পদার্থ	তন্তু	ভস্ম
১	বঙ্গ	১৪	১১'১০	৭'৫১	'৪০	৭৯'৮২	'৪৪	'৭৩
২	পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম	১৬	১১'১৯	৭'৬৭	'৫৩	৭৯'২১	'৫৮	'৮২
৩	ব্রহ্ম	১০	১১.৫৪	৭'৫৪	'৯৮	৭৮'৫৯	'৫৮	'৭৭
৪	মধ্যপ্রদেশ	৭	৯'০৫	৬'৬৮	'৮৮	৮২'০৫	'৪২	'৯২
৫	যুক্তপ্রদেশ	১০	১০'০৩	৭'৪৬	২'৮৩	৭৭'১৪	১'০০	১'৫৬
৬	নেপাল	১৩	১১'২৮	৭'৫০	'৮৫	৭৯'১৩	'৩২	'৯২
৭	পঞ্জাব	১৪	১২'৮৯	৬'৯৮	'৩৬	৭৮'৬৩	'৩৯	'৭৫
৮	বোম্বাই	১৬	১২'৬১	৭'৬৯	২'৬৫	৭৪'৬৩	'৮৯	১'৫৩
৯	মান্দ্রাজ	১১	১১'৬৯	৬'৮১	১'০৩	৭৯'০০	'৪৯	'৯৮

উপাদানের মাত্রা ও ধান্যের জাতি কিম্বা শস্যের গঠনের সহিত সম্বন্ধ হিসাব করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সারাংশের তারতম্য চাষের উপর নির্ভর করে। নূতন জমি অথবা বিশেষ সারবান জমিতে উৎপাদিত ধান্যই সমধিক পরিমাণে সারবান হয়। ইহার দৃষ্টান্ত ব্রহ্মদেশের টাউঙ্গিয়া, কর্ণাটদেশের কানাপুর জাতীয় ধান্য সমূহ এবং দক্ষিণ কানাড়ার কানারাগড় প্রভৃতি স্থানের ধান্য। সুতরাং ধান্যের জাতি নির্ব্বাচন অপেক্ষা সার ও উন্নত প্রণালীতে চাষই উৎকৃষ্টতর চাউল উৎপাদনের অন্যতম উপায়।

মৎস্য ব্যবসায়।

মান্দ্রাজের সরকারী মৎস্য ব্যবসায়ের ডিরেক্টর সার ফ্রেডারিক নিকলসন সাহেব, লাহোরের শিল্প সম্মিলনীতে মৎস্য ব্যবসা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ পত্রিকা পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ভারতে যেমন কৃষির উন্নতিকল্পে চেষ্টা করা আবশ্যক— মৎস্য ব্যবসায়ের উন্নতি করাও তদনুরূপ প্রয়োজনীয়। সামুদ্রিক মৎস্য ধরিবার ব্যবস্থা করিলে অনেক লোকে ঐ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের যোগাড় করিতে পারে। আর এই গরীব দেশেও একটা প্রধান খাদ্য বস্তুর যোগাড় হইলে অনেক কল্যাণ হয়।

সুধু মৎস্য ধরিবার ব্যবস্থা করিলেই হইবে না, মৎস্য সংরক্ষণ করিতে জানা চাই, কারণ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে মৎস্য আসিতে আসিতে পচিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। মান্দ্রাজ উপকূলে এইরূপ কতিপয় কারখানা আছে, কিন্তু তাহা খুবই অল্প সংখ্যক এবং তাহা হইতে অতি সামান্য মাত্রায়ই মৎস্য সরবরাহ হয় এবং অতি অল্প সংখ্যক লোকের ইহার দ্বারা দিন যাপন হয়। এখন মৎস্য সংরক্ষণের কত নূতন অথচ সহজ প্রথা বাহির হইয়াছে কিন্তু ঐ সকল লোক তৎসমুদয়ের কিছুই জানে না। তাহারা সেই পুরাতন সাবেক প্রথা অবলম্বন করিয়া কাজ চালায়। ১৮৬৯ সালে ডাক্তার দে সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যবস্থা ও উন্নতি করিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে, গভর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে একটি বিবরণী পেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। ১৮৮২ সালে গভর্ণমেণ্ট কিন্তু এ বিষয়ে কতকটা মনোযোগী হন এবং স্থানীয় লোকের শিক্ষার জন্য অনেকগুলি কারখানা মান্দ্রাজ উপকূলে স্থাপিত হয়। তারপর ক্রমশঃই গভর্ণমেণ্টের ইহাতে অধিকতর মনোযোগ দেখা গিয়াছে। এখন মান্দ্রাজের উপকূলে ১৪৩টি মাছের কারখানা। তথা হইতে প্রায় ৫০,০০০ টন মৎস্য সংরক্ষিত হইয়া স্থানান্তরে চালান দেওয়া হইতেছে।

গুপ্ত সাহেবের পরামর্শ মত বঙ্গদেশেও কলের জাহাজ দ্বারা বঙ্গোপসাগরকূলে মাছ ধরিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাদৃশ অধিক পরিমাণে মৎস্য না মেলায় কিম্বা জাহাজখানি সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্মোপযোগী না থাকায় এই কার্য্যে লোকসান হইতে লাগিল এবং সেই জন্য এখানকার মৎস্য ধরিবার ব্যবস্থা স্থগিত হইয়া যায়। এখানে মৎস্য ধরিয়া আনিয়া, মাছ সংরক্ষণ করিবার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। সদ্য সদ্য যাহাতে মাছ কলিকাতার বাজারে আসিয়া পৌঁছায় তারই চেষ্টা করা হইত। বরফ গুদামেও মাছ রাখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে ব্যয়বাহুল্য ঘটায় গভর্ণমেণ্ট এই মৎস্য ধরা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বঙ্গদেশ অপেক্ষা মান্দ্রাজের মৎস্য ব্যবসা কতকটা কার্য্যকরী বলিয়া বোধ হয়। সেখানে যে মৎস্য ধরা হয় তাহার অধিকাংশ সংরক্ষণ করিয়া অন্যত্র খাদ্যের জন্য এবং খাদ্যের অনুপযুক্ত হইলে তাহা সারের জন্য পাঠান হইয়া থাকে; বাকী মৎস্য স্থানীয় লোকের আহারে লাগে।

নিকলসন সাহেব বলেন যে, এই ব্যবসায়ের আরও উন্নতি করা যাইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে পথ প্রদর্শক হইতেছেন। সরকারি কারখানায় কি প্রকারে কাজকর্ম্ম চলিতেছে, মৎস্য ধরিবার ও রক্ষা করিবার কি কৌশল ও বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইতেছে, লোকে তাহা দেখিয়া

শিখিয়া লইতে পারে। অধ্যবসায়ী লোকের তাহাই কর্ত্তব্য। মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট মাছ ধরিবার জন্য বোট তৈয়ারি করাইতেছেন। ইহার মধ্যে এক খানা কলের বোট (Motor Boat) থাকিবে। যদি মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ইহাতে কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে মৎস্যের আমদানী অনেক গুণ বাড়িয়া যাইবে এবং গরীবলোকে সস্তায় মাছ পাইলে তাহা খাইয়াও প্রাণ বাঁচাইতে পারিবে। অধিকন্তু এই সদ্দৃষ্টান্তে অনেক উদ্যোগী ব্যবসাদারও মৎস্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবেন। এই মৎস্য ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে বোট নির্ম্মাণ, বোটের কল কব্জায় লাগাইবার তৈল প্রস্তুত, রসারশি প্রস্তুত, বোটধৃত ঝিনুক হইতে বোতামাদি প্রস্তুত প্রভৃতি আনুসঙ্গিক ব্যবসায় চলিবে।

মৎস্যের ব্যাধি ও মৃত্যু।

মৎস্যের ব্যাধি নানাপ্রকার, তন্মধ্যে সংক্রামক বসন্ত, ক্ষত রোগ ও ফুলকায় পোকালাগা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার রোগ সহজে নির্ণয় করা যায় না। মৎস্য জাতির মৃত্যু সাধারণতঃ কোন সংক্রামক রোগ, জলের বিষাক্ততা ও নানাবিধ দৈব ঘটনা দ্বারাই হইয়া থাকে। জল অনেক রকমে বিষাক্ত হইতে পারে, জল যদি গন্ধকাম্ল *(Sulphuric Acid)* দ্বারা দূষিত হয়, তাহা হইলে সেই জল মৎস্যের পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর হয়। উদ্ভিজ্জ দ্বারাও জল বিষাক্ত হইতে পারে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে জটালঙ্কা, সিঝু (সেউজ) প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ ও কোন কোন ফল পুকুরে পড়িলে মৎস্য সমূহ মরিয়া যায়। কেহ কেহ প্রতিহিংসা লইবার জন্য সময়ে সময়ে ঐ সকল দ্রব্য পুকুরে ফেলিয়া মৎস্য নষ্ট করে। এতদ্ভিন্ন বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি, ঝড়, স্রোতের প্রাবল্য প্রভৃতি নানাপ্রকার দৈব ঘটনায় মৎস্যের মৃত্যু হইয়া থাকে।

রেশম ব্যবসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি ভারতবর্ষ হইতে কাঁচা মালই বিদেশে রপ্তানী হয়। পাটের থলে বোনা হইয়া কিছু কিছু রপ্তানী হয় বটে কিন্তু তাহা ব্যতীত এত যে পাট আমরা বিদেশে পাঠাই তাহা হইতে সস্তা দামের কম্বল, র‍্যাপার, শাল, আলোয়ান এবং নকল ফ্লানেল তৈয়ারি হইয়া আমাদেরই ব্যবহারের জন্য এদেশে আসে। এদেশে ঐ সকল দ্রব্য অতি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সে সকল খাঁটি জিনিষ দীর্ঘকাল ব্যবহারেও খারাপ হয় না। কিন্তু তাহা খাঁটি ও টেকসই হইলে কি হয়—দরে মহার্ঘ বলিয়া সকলে তাহা খরিদ করিতে পারে না—সকলেই সস্তার চক্‌চকে জিনিষ কিনিতে ধাবিত হয়। এই কারণে ভারতজাত খাঁটি জিনিষের আদর দিন দিন কমিতেছে এবং ঐ সকল শিল্পের ক্রমশঃই অবনতি ঘটিতেছে। রপ্তানী মালের মধ্যে রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যের আদর এখনও অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া বোধ হয়। এক ইংলণ্ডেই ৪ লক্ষ টাকার রেশমী কাপড় রপ্তানী হইয়াছে। ইহা আশার কথা বলিতে হইবে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের এই লাভের ও এক রকম একচেটিয়া ব্যবসায়ের উপর তাদৃশ ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায় না। জার্ম্মানির মত দেশে হইলে এই রেশম-ব্যবসায়ে তাহারা অদ্বিতীয় হইবার চেষ্টা করিত। নানাদেশ হইতে সুন্দর সুন্দর নমুনা আনাইয়া নানাপ্রকারের রেশমী বস্ত্র তৈয়ারি হইত। নুতন নুতন কল কারখানার সৃষ্টি হইত। ইংলণ্ড প্রভৃতি যে যে দেশে রেশমী বস্ত্রের আদর সেই সেই দেশে লোক পাঠাইয়া তাঁহাদের মন মত জিনিষ কি হইলে হয় তাহার তত্ত্ব লওয়া হইত। কিন্তু বঙ্গদেশের লোক, যেখানে ভারতীয় রেশম ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া এক প্রকার নিচেষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। স্বাভাবিক নিয়মে উন্নতি হয় হউক—তাঁহারা কিন্তু উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে যেন নিতান্তই নারাজ।

ধারে ব্যবসা।

জনৈক সংবাদদাতা লিখিতেছেন :—অনেকের মনের ধারণা যে, ধারে ব্যবসা অধিক দিন টিকে না —কথাটা একেবারে মিথ্যা না হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্যও নহে। যাহাদের অনেক টাকা আছে, তাহারা নগদ টাকায় কেনা বেচার সুবিধা করিতে পারে ; মাল কিনিয়া রাখিয়া নগদ বিক্রয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে পারে ; কিন্তু যাহাদের অল্প পুঁজি তাহাদের মাল ধরিয়া রাখা চলে না। মাল লইয়া বসিয়া থাকিলে ঘর ভাড়া প্রভৃতি আনুসঙ্গিক খরচ ক্রমশঃ চাপিতে রহিল। ইহাতে তাহাদিগকে ভবিষ্যতে বিব্রত করিয়া তোলে। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ধারে জিনিষ বেচিলেই বা লাভ কি? জিনিষত বিক্রয় হইয়া গেল, টাকা হাতে আসিল না, আবার মাল কিনিবার টাকা আসে কোথা হইতে? এই পরস্পর বিরুদ্ধ কথার মিমাংসা কোথায়?

এইরূপ ব্যবসা করিতে হইলে মূলধনটি তিন ভাগে বিভাগ করিতে হইবে। উহার এক অংশ খরিদ্দারের নিকট ধার বাকি হিসাবে পড়িয়া থাকিবে, দ্বিতীয়াংশ মাল খরিদে নিয়োজিত হইবে এবং তৃতীয়াংশ অভাবনীয় কোন দায়ে খরচের জন্য সর্ব্বদা মজুত থাকিবে। এই প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া ধারে ব্যবসা চালাইলেও কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না এবং সে ব্যবসায়ে লোকসানও হয়না।

ধারে মাল খরিদ অপেক্ষা নগদ পয়সায় মাল কেনা ভাল, কারণ নগদ খরিদে ধার অপেক্ষা অনেক সস্তা পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ব্যবসাদারদের এই জন্য ধারে বিক্রয়ই সম্বল স্বরূপ; তাহারা নগদ টাকায় সস্তায় মাল কিনিবে এবং ধারে চড়া দরে বেচিবে। যাহারা নগদ টাকায় জিনিষ খরিদ করে, তাহারা প্রায় ছোট দোকানে কেনে না—বড় দোকানে, যেখানে সস্তা পায় সেইখানেই যায়? যাহারা সপ্তাহে বা মাসে মাসে মাহিনা পায় তাহাদের প্রায়ই ধারে জিনিষ কিনিতে হয়। দাল, চাউল, ময়দা. ঘৃত প্রভৃতি তাহার দৈনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খুচরা দোকান হইতে ধারে কিনিতে হয় সুতরাং দোকানদার বাজার দর অপেক্ষা কিছু অধিক লাভ করিলেও তাহার খরিদ্দারেরা ধারের খাতিরে অন্যত্র যাইতে পারে না। এই সকল খুচরা দোকানদারের কিন্তু খুব সতর্ক থাকা উচিত। যাকে তাকে ধার দেওয়া কিছুতেই বিধেয় নহে। তাহার দেখা উচিত যে, খরিদ্দারেরা মাসে মাসে বা সপ্তাহে সপ্তাহে তাহার পাওনা কড়ি চুকাইতেছে কিনা। এমন অনেক খরিদ্দার আছে যে, এক জায়গায় কতকগুলি টাকা দেনা করিয়া অপর দোকানে যাইয়া ধারের খাতা খুলিয়া বসিল। এই সকল খরিদ্দারকে চেনা দরকার। সকল দোকানদারেরই তাহাদের উপর লক্ষ্য রাখা উচিত। এক দোকানের ধার চুকাইয়া না দিলে যদি অপর দোকানদার তাহাকে ধারে জিনিষ না দেয়, তাহা হইলে আর কেহই ঠকে না। দোকানদারদের আর একটি বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। মাসে কিম্বা সপ্তাহে কে কত টাকার জিনিষ লয় দোকানদারদের তাহার একটা হিসাব থাকে। যদি কেবল খরিদ্দারকে অপেক্ষাকৃত অধিক টাকার দ্রব্যাদি লইতে দেখা যায়, তবে তাহার প্রতি নজর রাখিতে হইবে। বিশেষ কারণ কিছু খুঁজিয়া না পাইলে তাহাকে স্পষ্ট বলিতে হইবে যে, তাহার অধিক টাকার জিনিষ যাইতেছে, তাহা মাসে বা সপ্তাহে (যাহার যাহা নিয়ম) পরিশোধ হইবে ত।

খুচরা দোকানে খরিদ্দারের নিকট হইতে তাগাদা করিয়া টাকা আদায় করা এক প্রধান কাজ। মাসে বা সপ্তাহে তিনি যেমন দিনে তাঁহার হিসাব মিটান সেই দিন ঠিক উপস্থিত

হইয়া টাকা আদায় করা চাই। সাধারণতঃ গৃহস্থ লোকের নানা খরচ লাগিয়াই আছে, তাঁহাদের ঘরে লক্ষ্মী আসেন কিন্তু বাস বাধেন না। এক দিনের তফাৎ পড়িয়া গেলে হয়তঃ টাকাটা অন্য বাবদে খরচ হইয়া গেলে এবং এইরূপে এক সপ্তাহ বা এক মাসের বাকী পড়িয়া যায়। সে টাকা আদায় হইতে প্রায় ছয় মাস সময় লাগে। অনেক খরিদ্দার নিজেরাই সতর্ক, তাঁহারা তাঁহাদের নিজের কল্যাণের জন্যই উঠ্না দোকানের পাই পয়সা ঠিক নিয়ম মত চুকাইয়া দেন। অধিকাংশের কিন্তু সে জ্ঞান নাই, তাঁহাদের যদৃচ্ছা ব্যবহারের দরুণ নিজেরাও মুস্কিলে পড়েন এবং দোকানদারকেও বিড়ম্বনায় ফেলেন। কল কারখানায় যে সকল লোক কাজ করে, তাহারা প্রায়ই সপ্তাহে মাহিনা পাইয়া থাকে। তাহাদের নিকট হইতে প্রতিসপ্তাহে বিশেষ জিদ করিয়া টাকা আদায় করা উচিত; কারণ ঐ সকল লোক প্রায়ই নিম্নশ্রেণীয় এবং তাহাদের প্রায়ই কোন না কোন নেশা করা অভ্যাস আছে, সুতরাং তাহাদের হাতে পয়সা এক দিনও থাকে না।

খুচরা দোকাদারদের অনেক লোকের সহিত ধার বাকীর কারবার করিতে হয়। ছয় মাস বা বৎসরান্তে যাঁহারা হিসাব মিটান তাঁহাদের সহিত নিজের খাতা বা খতিয়ান দেখিয়া হিসাব মিটান চলে। কিন্তু সপ্তাহে সপ্তাহে বা মাসে মাসে যাঁহাদের সহিত হিসাব মিটাইতে হয়, তাঁহাদের প্রত্যেককে এক এক খানি হাতচিটা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে হিসাব গোলমাল হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। নিজের হিসাবও খুব দুরস্ত থাকা কর্ত্তব্য। খাতার সহিত হাতচিটার মিল থাকা বিশেষ দরকার; নতুবা সামান্য ভুলচুকে খরিদ্দাদের মনে সহজে অবিশ্বাস জন্মিতে পারে।

পত্রাদি।

গোমূত্র সার সংগ্রহ।

বিগত চৈত্র মাসে গোমূত্র সার সংরক্ষণের যে উপায় লেখা হইয়াছে তদ্ভিন্ন আরও একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রথা এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাহাকে সাধারণতঃ গোয়াল কোঁড়া সার কহিয়া থাকে। তাহা এই রূপে প্রস্তুত হয়ঃ—প্রথমতঃ ফাল্গুন, চৈত্রমাসে পুকুরের পুরাতন পাঁক বা আঁটাল মাটী সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া গোয়ালের নিকট স্তুপাকার করিয়া রাখা হয়, পরে গোশালার বা গোয়ালের মেঝের এক কি দেড় ফুট আন্দাজ মাটী উঠাইয়া জমিতে দেওয়া হয় এবং ঐ গর্ত্ত শুষ্ক এঁটেল বা পাঁক মাটী দিয়া ভরাট করিতে হয়। প্রথমতঃ মাটী সমতল করিয়া দিলেও ঐ সময় গরুতে যে মল মূত্র ত্যাগ করে ঐ শুষ্ক মাটিতে লাগিয়া ও গরুর পায় প্রায় মাটী বসিয়া স্থানে স্থানে যে গর্ত্ত হয় তাহাতে অবশ্য তখন গরুদের শুইবার একটু অসুবিধা হয়। এই জন্য মধ্যে মধ্যে গর্ত্তগুলি হইতে পাঁক কাদা উঠাইয়া সারগর্ত্তে ফেলা আবশ্যক। পরে বর্ষা আরম্ভ হইলে ঐ মাটী উল্টাইয়া একটু ঢালু করিয়া মাটী বেশ করিয়া পিটাইয়া বসাইয়া দেওয়া হয়; কারণ ঐ সময় স্বভাবতঃ গোয়ালে অধিক গর্ত্ত ও কাদা হয়। তজ্জন্য ঢালু করিয়া দিলে তখন মূত্রাদি ঢালু স্থান হইতে বহিয়া নর্দ্দমা দিয়া একটী কোণে সংগৃহীত হয় ও তথা হইতে পাত্র দ্বারা স্থানান্তরিত বা অধিক জলের সহিত সার রূপে টাট্কা গোমূত্র ব্যবহৃত হয়। মেজে এইরূপ ঢালু করিলেও যদি বর্ষাকালে মধ্যে মধ্যে গোমূত্র দ্বারা গোয়ালে অল্প অল্প গর্ত্ত হয়, তাহা ঐ পূর্ব্ব সঞ্চিত ও শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা পূরণ করা হয়। এই রূপে বর্ষা গত হইলে অগ্রহায়ণ মাসে আবার মাটী উল্টাইয়া একবার সমান করিয়া দেওয়া হয়। গোময় গোমূত্র এইরূপে

সঞ্চিত হইলে উহা গোয়াল হইতে খুঁড়িয়া রীতিমত চূর্ণ করিয়া জমিতে সার রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা যে উৎকৃষ্ট সার তাহা সকলেরই জানা আছে।

জনৈক পত্রপ্রেরক,—বর্দ্ধমান।

গোল আলুর চাষ।

শ্রীহরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর, কলিকাতা।

তিনি ঘাটশীলাতে (মানভূম) এক খণ্ড জমি লইয়াছেন। তাহাতে আলু চাষ করিতে চান। তাঁহার ক্ষেতের মাটি মধুপুর বৈদ্যনাথের মাটির মত। জল সেচনের সুবিধা আছে। কোন জাতীয় আলুর চাষ করিবেন এবং কি সার ব্যবহার করিবেন, কোন আলু ভাল ইত্যাদি বিষয় জানিতে চান।

[মানভূমের কোন ক্ষেত্রে আলু চাষের পরীক্ষা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। আমরা যতদূর জানি তথায় আলু চাষের উপযুক্ত বেলে দোঁয়াস মাটি আছে। এস্থলে ডুমরাঁও ও বর্দ্ধমান ক্ষেতের আলুর চাষের কথা বলিলে নিজ ক্ষেত্রে আলু চাষ সম্বন্ধে তাঁহার কতটা ধারণা হইতে পারে।

বর্দ্ধমান ক্ষেত্রে পাটনাই, নৈনিতাল ও মান্দ্রাজী আলু চাষের পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে মান্দ্রাজী আলু একর প্রতি ১২০ মণ, নৈনিতাল ১৫৩ মণ এবং পাটনা ১৩৭ মণ ফলে। ডুমরাঁও ক্ষেত্রে নৈনিতালের ফলন ৮০ মণের অধিক নহে, পাটনা ১৬৫ মণ ফলে। আমরা আমাদের নিজ ক্ষেত্রে (গোবিন্দপুর, ২৪ পরগণা) নৈনিতাল প্রতি একরে ১৭৪ মণ, পাটনা ১৯০ মণ ও মান্দ্রাজী ২০৫ মণ পর্য্যন্ত ফলাইতে পারিয়াছি।

আলুতে রেড়ীর খৈল ব্যবহার করাই সর্ব্বপেক্ষা ভাল। আমরা রেড়ী খৈল ব্যবহার করিয়া উক্ত পরিমাণ ফসল পাইয়াছি। বিঘাপ্রতি ১০০ মণ গোময় সার ব্যবহারেও ঐ ফল দাঁড়াইতেপারে। বর্দ্ধমান-ক্ষেত্রের আলুর ক্ষেতে সার পরীক্ষায় নিম্নলিখিতানুরূপ পাঁচ বৎসরের গড় ফলন দাঁড়াইয়াছে।—

১।	গোময় (যত্ন রক্ষিত)	উৎপন্ন আলুর পরিমাণ	
		২৪০ মণ ...	১৮৭ মণ
২।	,, (অযত্ন রক্ষিত)	২৪০ মণ ...	১৬৬ ,,
৩।	রেড়ীর খৈল	২২॥০ মণ ...	২১৩ ,,
৪।	শরিষার খৈল	২৪ মণ ...	১৮০ ,,

স্মিথ সাহেব বলেন যে আলুতে য়ুরোপীয়েরা যে সার ব্যবহার করে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কেননা তাহাতে ফলন খুব বাড়ে অথচ ব্যয় তত অধিক হয় না। তাঁহারা একর প্রতি ২০০ মণ গোময়সার, সুপার ফস্ফেট ৩ মণ এবং সোরা ২ মণ ব্যবহার করেন। যাহারা বিধিমত চাষে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাদের নিজের হলবাহী বলাদাদি থাকায় গোময় সংগ্রহে পয়সা লাগে না। ৩ মণ সুপার ফস্ফেটের দাম ১৫*টাকা ও সোরা ২ মণ ১৬ টাকার অধিক নহে। রেড়ীর খৈল ২২॥০ মণের দাম ৮০ বা ৯০ টাকা এবং ইহার দাম যে রূপ বৎসর বৎসর বাড়িতেছে তাহাতে য়ুরোপীয়গণের পক্ষ অবলম্বন করাই ভাল।

আলু কাটিয়া বা আস্ত বসাইয়া চাষ করিতে হয়। কাটা অপেক্ষা আস্ত বসানই ভাল। এই সম্বন্ধে সঙ্কেত এই যে যত পরিমাণ আলু বসাইবে ফলন ততই অধিক হইবে। বড় আলু বসান সেই জন্য সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, কিন্তু তাহাতে বীজ আলু খরিদ জন্য খরচ অধিক হয়; এই কারণে আলু কাটিয়া বা খুব বড় আলু না বসাইয়া মুর্গী ডিমের মত মাঝারি আলু বসানই সদ্যুক্তি।

আলু চাষ করিতে হইলে তাঁহার আরও জানা উচিত যে, পাটনাই আলু খাইতে নৈনিতাল অপেক্ষা মিষ্ট, কিন্তু সাহেবেরা এবং অনেক বাঙ্গালীতেও নৈনিতাল আলুই পসন্দ করে। নৈনিতাল কিছু অধিক দরে বিক্রয় হয়।] কৃঃ সঃ।

* মিঃ স্মিথ সোরা ও সুপার ফস্ফেটের যে দাম ধরিয়া দিয়াছেন সে দামে কলিকাতার বাজারে ঐ সকল দ্রব্য সকল সময় মিলে না।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

বাঙ্গালার শস্য।—বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইয়াছে বলিতে হইবে। তবে দার্জ্জিলিং রাঁচি, কুচবিহার এবং খুলনায় কতকাংশে, যশহর ও মেদিনীপুরে কিছু অধিক, বর্দ্ধমান বীরভূম, হাওড়া ২৪ পরগণা ও পুরীতে কিছু কম বৃষ্টি

হইয়াছে, অন্যত্র আশানুরূপ হইয়াছে। প্রায় সকল স্থানেই চাষের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে কেবল পুর্ণিয়ায় অতি বৃষ্টি হেতু চাষ বন্ধ হইয়া গিয়াছে সাঁওতাল পরগণা ও যশহরে অবস্থা অনেকটা পুর্ণিয়ারই মত। ভাদুই শস্য বোনা ও পাট নিড়ান হইতেছে। আমন ধান্য ভগলপুর ও পুর্ণিয়ার কোন কোন স্থানে রোয়া আরম্ভ হইয়াছে। আখের অবস্থা ভাল। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, চম্পারণ, মজঃফরপুর, সাঁওতালপরগণা বালেশ্বর, আঙ্গুল, পুরী, সম্বলপুর, রাঁচি, পালামাউ, মানভূম, ও কুচবিহারে মোটা চাউলের দর চড়িয়াছে; সাহাবাদ, সারণ এবং মুঙ্গেরে চাউলের দর কিছু নামিয়াছে।

কোন কোন স্থানে গবাদি পশু রোগাক্রমণের কথা শুনা যাইতেছে।

পশুখাদ্য এবং পানীয় জলের কোথাও অভাব হয় নাই।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের শস্য সংবাদ।—সর্ব্বত্র খুব বৃষ্টি হইয়াছে তন্মধ্যে মালদহ লুসাই পাহাড় এবং চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে কিছু কম। ধুবড়িতেই বৃষ্টির মাত্রা কিছু বেশী রকম। তথায় আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ২০ ইঞ্চ বারি পাত হইয়াছে।

জলপাইগুড়িতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায়, চা ক্ষেত্রের ক্ষতি হইতেছে পোকাও দেখা দিয়াছে খুব রৌদ্র না হইলে উপায় নাই। উক্ত প্রদেশে পাট ক্ষেতের নিড়ান কার্য্য চলিতেছে।

আসামে আমন ধান রোপন হইতেছে এবং পুর্ব্ববঙ্গে আমন ধান্য রোপণ সবে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র।

দার্জিলিঙ্গে 'চা'য়ের একটু আশঙ্কা এবং কাছাড়ে 'চা'য়ে লাল মাকড়সা লাগিলেও মোটের উপর সমগ্র প্রদেশে 'চা'য়ের অবস্থা ভালই দাড়াইয়াছ।

অন্যান্য ফসলও ভালরূপ হইতেছে।

চাউলের দর সামান্য মাত্রায় চড়িয়াছে।

গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দারঙ্গ নওগাঁ, শিবসাগর ও নাগাপর্ব্বতে পশু রোগ দেখা দিয়াছে।

পঞ্জাবে শস্য সংবাদ।—পঞ্জাবের গম মাড়া ও ঝাড়া ভালয় ভালয় শেষ হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা গম অধিক উৎপন্ন হইয়াছে। বোধ হয় ১০ লক্ষ টন মাল মজুত থাকিবে। কিন্তু রপ্তানি নাই। অন্যান্য বৎসর ২৷৷৶০ আনা মণ দরে গম বিকাইয়া যাইতে বাকী থাকিত না, কিন্তু এবৎসর ২৶০ মন দরেও খরিদ্দার নাই। লায়ালপুরে ১৯০৮ সালে ৩৷৷০ আনা এবং ১৯০৯ সালে আগে ৩৸০ আনা দর উঠিয়াছিল। যুক্তপ্রদেশে ও বাঙ্গালায় গম না হওয়াতেই দর চড়িয়াছিল। এখন কিন্তু ক্রেতার অভাবে এত দর কম।

এবৎসর পঞ্জাবে সুবর্ষা হইবে বলিয়া সকলেরই ধারণা এখনও কিন্তু বর্ষা ভাল হয় নাই। অধিক গরম হইলে বৃষ্টি অধিক এই তথাকার লোকের বিশ্বাস, সেই হিসাবে বৃষ্টি এবৎসর অধিক হওয়া উচিত। সরকারী বিবরণীতেও বর্ষা ভাল হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

রোটাক, কর্ণাল, হুসিয়াপুর ও গুরুদাসপুরে এবার সেচনজলের জন্য কুপ খনন হইবে। যাঁহারা কার্য্যের পরিদর্শক হইবেন তাঁহারা এই কুপ খনন কার্য্য কানপুরে ভালরূপে শিক্ষা করিতেছেন। খনন করিবার জন্য শিক্ষিত লোকের বন্দোবস্ত হইয়াছে। আশার কথা বলিতে হইবে কারণ চাষের জন্য সর্ব্বাগ্রে জলের প্রয়োজন।

সার-সংগ্রহ।

ভারতের বাণিজ্য।

ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের সমাচার প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য কেবল কাঁচা মাল লইয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভারত হইতে বিদেশে কেবল খাদ্যশস্য, বীজ, খনির অপরিষ্কৃত ধাতু, অন্য কৃষিজাত ও খনিজ সামগ্রী রপ্তানী হইয়া থাকে। আর ইউরোপের ও মার্কিণের শিল্পজাত সামগ্রী সকল আমরা আমদানী করিয়া থাকি। গত এপ্রেল মাসে নিয়মিত মাসিক আমদানী

অপেক্ষা দুই কোটি একুশ লাখ টাকার অধিক মাল এ দেশে এক মাসে আমদানী হইয়াছে। আর ঐ মাসে নিয়মিত রপ্তানি অপেক্ষা সাত কোটি পঁচাশী লক্ষ টাকা মূল্যের অধিক কাঁচা মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। মোটের উপর গত এপ্রেল মাসে ভারতীয় বানিজ্যে দশ কোটি টাকা মূল্যের অধিক কাঁচা পাকা মালের আদানপ্রদান চলিয়াছে।

যে দেশের শিল্পকলা নষ্ট হইয়াছে, সে দেশের কাঁচা মাল অত্যধিক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী করিতেই হয়। নহিলে নগদ টাকা প্রজার হস্তগত হইতে পারে না। কিছু নগদ টাকা হাতে না হইলে ঘরগৃহস্থলী বজায় রাখা সকলের পক্ষেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। দেশে যদি ভূমিশূন্য শিল্পীর সংখ্যা অধিক থাকিত, তাহাদের শিল্পজাত সামগ্রী সকল বিদেশে রপ্তানী করা চলিত, তাহা হইলে সেই রপ্তানির ফলে বিদেশের টাকা এদেশে আসিত। দেশের শিল্পী বিদেশের টাকার সাহায্যে ঘরে বসিয়া কাঁচা মাল কিনিত, খাদ্য-শস্য সঞ্চয় করিত।

গত এপ্রেল মাসে বিলাতী কার্পাস বস্ত্রের আমদানী একাত্তর লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছে। কাটতি না বাড়িলে আমদানী অধিক হইবে কেন? সামগ্রী পত্র খরিদ করিবার শক্তি কমিবার হেতু এই যে, ভূমি ছাড়া আমাদের কোন সম্পত্তি নাই। শিল্পকলা নষ্ট হইয়াছে, খনিকার্য্য তেমন বিতস্তৃত ভাবে দেশের লোকের হাতে নাই—আছে কেবল কৃষকের লাঙ্গল, আকাশের জল ও ভূমির নিত্য অপচীয়মানা উৎপাদিকা শক্তি। উকীল, ব্যারিষ্টার, চাকুরে, ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি ইংরাজি-নবীশগণ যে টাকা উপার্জ্জন করেন, তাহা দেশের ভূমিজাত টাকা—ইহারা কেহই বিদেশ হইতে টাকা উপার্জ্জন করিয়া আনেন না। উপরন্তু বিলাসের জন্য ইহারা দেশের টাকা বিদেশে পাঠাইয়া দেন। এক ভূমি হইতে প্রজার পেটের ভাত হয়, তৈল লবণ তরকারীর খরচ সঙ্কুলান হয়, নানাবিধ টেক্স যোগাইতে হয়, ডাক্তার ও উকীল খরচা দিতে হয়, ছেলে মেয়ের বিবাহ ও পাল-পার্ব্বণে কাপড় জামার ব্যয়টাও যোগাইতে হয়। ভারতবর্ষের ত্রিশকোটি নরনারীর মধ্যে প্রায় সাড়ে পনর আনা লোক বিদেশ হইতে একটি পয়সাও উপার্জ্জন করিয়া আনেন না। কাঁচা মাল বেচিয়া—বিদেশে রপ্তানী করিয়া আমরা যে অর্থ স্বদেশে আনি, তাহা ত দেশে থাকে না। মানুষের অন্য নানা অভাব দূর করিবার ছলে এ টাকাটাও বিদেশে টানিয়া বাহির হইয়া যায়। আমাদের শিল্পকলা যদি অক্ষুণ্ণ থাকিত, তাহা হইলে কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানী করিয়া আমরা যে অর্থ উপার্জ্জন করিতাম, তাহা এ দেশেই থাকিত।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইব। ভারতবর্ষে এখন অনেকগুলি কাপড়ে ও সূতার কল চলিতেছে। হিসাব-নবীশগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, এখন ভারতে যত তুলা জন্মায় সে সকল তুলা ভারতের সকল কলকারখানায় অনায়াসে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু গত এপ্রেল মাসের মধ্যে ভারত হইতে ছয় কোটি আঠার লক্ষ টাকার কার্পাস বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। বিলাতে চুয়ান্ন লক্ষ টাকার তুলা রপ্তানী হইয়াছে, জাপান পৌনে তিন কোটি টাকার তুলা খরিদ করিয়াছে। অর্থাৎ ভারতে তুলার কাটতি থাকিলেও ভারতবাসীর এত টাকা নাই যে ঘরের তুলা ধরিয়া রাখে। মোট কথা এই, ভারতবাসীর ক্রয়সামর্থ্য একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। "হিতবাদী।"

আলুর আবাদ।—আলু এক্ষণে তরকারির মধ্যে প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলে এখন আলু খাইতে চায়। আলুর চাষ কিন্তু সেই অনুপাতে বিস্তৃতি লাভ করে নাই এমন কি অনেক জেলায় আলু চাষ আদৌ হয় না। এই কথাটি সপ্রমাণ করিবার জন্য আমরা সরকারী বিবরণী হইতে ৮টি জেলায় আলু চাষের জমির পরিমাণ সন্নিবেশিত করিলাম।

		রবিখন্দের নিযুক্ত জমি একর		আলু চাষের জমি একর
দারবঙ্গ	...	৩৭,০০০	...	১,২৮০
মজফরপুর	...	৭৭,৮০০	...	৫,১৮২
মুঙ্গের	...	৫৫,০০০	...	৩০৮
চম্পারণ	...	৩৬,০০০	...	৩,২৬৬

	রবিখন্দের নিযুক্ত জমি একর	আলু চাষের জমি একর
সারণ ...	৩৭,৬০০ ...	৬,০৪৭
পূর্ণিয়া ...	২৬,৭০০ ...	৬,৭৮২
রাঁচি ...	১,৫০০ ...	৪০
সিংভূম ...	৫০০ ...	৯

এতদ্ব্যতীত হুগলী এবং ২৪ পরগণায় আলু চাষ হয়, তাহা কিন্তু অতি সামান্য। উক্ত বিবরনীতে দেখা যাইতেছে অনেক স্থানে এখনও আলু চাষ আরম্ভ হয় নাই। আলু চাষে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত আমরা সিংভূমের কোন পত্র প্রেরককে আলু চাষের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছি।

চারা বা কলম বসাইবার সময়।—আমাদের সমিতির নর্শারি হইতে যাঁহারা চারা বা কলম লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রায়ই জানিতে চান যে, ফল বা ফুলের গাছ বৎসরের কোন সময় বসান শ্রেয়ঃ। তাঁহাদিগেকে সময়োচিত যথাযথ ব্যবস্থা দিলেও আমরা এস্থলে সাধারণের জানিবার জন্য এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চাই।

পক্ষী, সরিসৃপ ও কীট পতঙ্গের মত বৃক্ষাদিরও শীত নিদ্রা আছে। এমন কি মানুষও শীত কয়মাস যেন একটু জড়সড় হইয়া থাকে যেন তাহাদের তাদৃশ বাড় বৃদ্ধি থাকে না! বৃক্ষাদিরও সেই ভাব। শীত কয়মাস বৃক্ষাদিরও ফুর্ত্তি থাকে না বাড় বৃদ্ধি ত পরের কথা। পরে গরমের হাওয়া বহিতে আরম্ভ হইলে গাছের পাতা বাহির হয় গাছ বাড়িতে থাকে এবং তাহাতে ক্রমশঃ ফুল ফল ধরে। সেই জন্য আমরা যে বর্ষার আরম্ভে আষাঢ় মাসে ও বর্ষাশেষে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে গাছ বসাইবার পরামর্শ দিই তাহা সর্ব্বোতভাবে ঠিক নহে। চারা কলম প্রভৃতি বর্ষার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বেই বসান ভাল অর্থাৎ ২৪ পরগণায় গাছ বসাইতে হইলে জৈষ্ঠ মাসে বসান উচিত। বর্ষা আরম্ভ হইলে তারপর বসাইলে বৃষ্টির পসলা চোটে গাছ গুলি কিছু জখম হইতে পারে। সেই জন্য কিছু আগে বসাইতে হয়। চারা গাছের গোড়ায় মাটি বেশ চাপিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, যেন হঠাৎ জল পাইয়া গোড়া আল্‌গা হইয়া না যায়। প্রখর রৌদ্র হইতে বাঁচাইবার জন্য ছায়া কিম্বা জল সেকের আবশ্যক হইলে তাহার জন্য কিছু পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় বটে কিন্তু বর্ষাগমে গাছ গুলি ধরিয়া বসিলে শিঘ্র বাড়িয়া উঠে। শীত কালে বসাইলে গাছ গুলি অনেক দিন না বাড়িয়া চুপ করিয়া থাকে, ফিরে বর্ষা না আসিলে আর তাহাদের আশানুরূপ বাড় দেখা যায় না। এক বৎসর গাছ গুলি লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা গ্রীষ্মে গাছ বসাইয়া একটু আয়াস স্বীকার করাই বিধেয়।

সুরমা ও পুষ্পসার।—আমরা এস, পি, সেন এবং কোম্পানির নিকট হইতে এক শিশি সুরমা তৈল ও যুথিকা ও খস খস নামে দুই শিশি পুষ্পসার পাইয়াছি। তৈলের গন্ধ মনোহর ও ইহার স্নিগ্ধত্ব গুণ আছে। অন্যান্য গুণ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ব্যবহার না করিলে বলা কঠিন। তবে যতটুকু দেখা যায় তাহাতে ইহা কালে কেশরঞ্জনের মত প্রতিষ্ঠালাভ করিবে বলিয়া মনে হয়। পুষ্পসার গুলির গন্ধও মনমুগ্ধকর যদি যথার্থ এগুলি স্বদেশী পুষ্পসার হয় যদি এগুলি বিদেশী পুষ্পসারের নামান্তর মাত্র না হয় তবে দেশের বাস্তবিকই একটা বড় লাভ হইয়াছে। ভবিষ্যতে সৌখিন গণকে আর গন্ধ দ্রব্যের জন্য বিদেশীর মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না বা দেশের অযস্র পয়সা সখের খাতিরে বিদেশে চলিয়া যাইবে না। কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ সেন মহাশয় যখন এস, পি, সেন এবং কোম্পানির এক জন প্রধান অধিনায়ক তখন আমরা নিঃসঙ্কোচে এই গুলিকে এ দেশজাত পুষ্পসার বলিয়া মনে করিতে পারি।

কৃষি সমারচার।—পূর্ব্ববঙ্গ ঢাকা হইতে প্রকাশিত একখানি কৃষি বিষয়ক মাসিক পত্র। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষ। কৃষি কথা প্রচারই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এ খানি "কৃষকে"রই সহযোগী। আমরা সবে মাত্র ইহার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা পাইয়াছি। কৃষি পত্রিকা এদেশে বিরল, এই কারণে আর এক খানি কৃষি

পত্র প্রকাশ হইতে দেখিয়া আমরা খুব আনন্দিত হইয়াছি। কৃষিই আমাদের একটা প্রধান সম্বল কিন্তু সেই কৃষি উন্নতির জন্য আমরা কি করি বা করিতে পারি! রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন দেশের রাজা ও রাজপুরুষগণ এদেশীয় কৃষি ও কৃষকের উন্নতিসাধনের জন্য এক্ষণে কত মহদনুষ্ঠান করিতেছেন কিন্তু আমরা কি করিয়াছি? আমাদের এই কৃষি-পত্র প্রচার সত্য সত্যই "রামের সেতু বন্ধনে কাঠবিড়াল যেমন কাঙ্গালের প্রাণে, গাঝাড়িয়া বালুকণা যোগাইত" সেইরূপ বলুকণা যোগাইবার চেষ্টামাত্র। কৃষি সমাচারের বর্ত্তমান সংখ্যার লেখকগণ কৃষিকার্য্যে সকলকে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ দান করিতে যথোচিত চেষ্টা করিয়াছেন, কৃষিকার্য্য যে ঘৃণ্য নহে বরং শ্রেষ্ঠকর্ম্ম ইহা উপনিষদ ও গীতাদি গ্রন্থ হইতে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; নিম্নে কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখ করা গেল।

"অগ্নৌ দত্তাহুতিঃ সম্যক্ আদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥"

"অন্নাদ্ ভবতি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥" গীতা

"এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবা বৃষ্টিং জুহ্বতি তস্যা
আহুত্য অন্নং সম্ভবতি।" বৃহদারণ্যকোপনিষদ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী বিএ, এম,এস,এ মহাশয় মার্কিণ কৃষকের সহিত এদেশের বর্ত্তমান কৃষকের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে মার্কিণ কৃষকেরা কত উৎকর্ষলাভ লাভ করিতেছে আর ভারতের কৃষক দিন দিন কত অবনত হইয়া পড়িতেছে।

"মার্কিণের কৃষকদিগের উন্নতির মুখ্য কারণ—তাহাদের আত্মসম্মান-বোধ। আমি যাহাদিগকে আমেরিকার কৃষকনামে অভিহিত করিতেছি সেরূপ একটা শ্রেণী আমাদের দেশে নাই বলিলেও চলে।

চাষা অথবা কৃষক বলিলে—নিরক্ষর, অনশনক্লিষ্ট, অর্দ্ধনগ্ন, নীচ জাতীয় লোকের কথাই আমাদের মনে হয়। ভদ্রলোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে যে পারে না, তাহাকেই আমরা চাষা বলিয়া গালি দিয়া থাকি। চাষা নামটা আমাদের দেশে সম্মানের নাম নহে—তাহার ব্যবসায়টীও সম্মানজনক নহে। নিজের ১৫।২০ বিঘা জমি চাষ করিয়া, স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করা অপেক্ষা, পাঁচ জনের খোসামোদ করিয়া, দশ জনের গালাগালি হজম করিয়া, পরের দাসত্ব করতঃ মাসিক পোনর টাকা উপার্জ্জন করাই, আমরা শ্রেয়ঃ মনে করি। কেননা, নিজের জমি চাষ করিলে, আমি চাষা—সকলেরই অবজ্ঞার পাত্র; কিন্তু চাকরি করিলে, আমি বাবু—সম্মানের পাত্র। হায়রে সম্মান!!"

দেবানুগ্রহে "কৃষক" দশ বৎসর অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া একাদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে; ভরসা করি "কৃষি সমাচার"ও দীর্ঘ কাল ধরিয়া কৃষি কথা প্রচারে সমর্থ হইবে এবং "কৃষক" ও "কৃষি-সমাচার" দুই সহোদরের ন্যায় দ্বিখণ্ডিত বঙ্গের দুইটী ভিন্ন কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হইয়াও এক প্রাণে এক যোগে দেশের কৃষির উন্নতি কল্পে মনোনিবেশ করিয়া কৃষি কার্য্যামোদী ব্যক্তিগণের আনন্দ বর্দ্ধনে সমর্থ হইবে। ইহাই আমাদের এক মাত্র ইচ্ছা, ইহাই একমাত্র আশা।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

শ্রাবণ মাস।

সব্জীবাগ।—এই সময় শাকাদি সীম, ঝিঙ্গে, লঙ্কা, শসা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া, পুঁই বরবটী, বেগুন, শাঁকালু, টেঁপারি প্রভৃতি পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালম শাক ও টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতী সব্জী বীজ—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি বপনের এখনও সময় হয় নাই।

এ বৎসর বর্ষা জলদি তথাপি মোকাই (ছোট) এবং দে-ধান চাষের এখনও সময় যায় নাই।

ফুল বাগিচা।—দোপাটী, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা), এমারান্থস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম, (Sun-flower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুল বীজ লাগাইবার সময় এখনও গত

হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া তাহা হইতে দুই একটী গাছ লইয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষের কলম অর্থাৎ ডাল কাটিং করিয়া পুতিয়া চারা তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই বেল প্রভৃতি ফুল-গাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে পারা যায়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে, কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া মারা না যায়। আম, লিচু, কুল, পীচ ও নানাপ্রকার লেবু গাছের গুলকলম করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এখনও কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়্যারং (layering) করা বলে।

আনারসের গাছের ফেঁকড়িগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

যাঁহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তত করিবেন তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তরমত গজাইতে পারে।

শস্য ক্ষেত্র।—কৃষকের এখন বড় মরশুম। বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পূর্ব্ব বঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণবঙ্গে পাট নাবি হয়। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে হইয়া যাইবে। আষাঢ় মাসে বীজ ধান্য বপনের উপযুক্ত সময়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি বিচলিত করা কর্ত্তব্য। গুপারী গাছের গোড়ায় এই সময় গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ কাঁচা গোময় দিলে দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। ফলের গাছে হাড়ের গুঁড়াও এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেতের পয়নালা ঠিক করিয়া রাখা এই সময় বিশেষ আবশ্যক।

যদি দেখিতে পাও, কোন লতা বা গুল্মের গোড়ায় অনবরত অত্যধিক জল বসিয়া ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া দিয়া এরূপে নালা কাটাইয়া দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়া যায়। কলার তেউড় এ মাসে পুঁতিলেও হইতে পারে। বেগুন, আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া, গোড়ায় মাটী ধরাইয়া দিবে। আখের গাছে কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া আর কতকগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে। গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে তখন নিকটস্থ চারি গাছা আখ একত্রে বাঁধিয়া দিবে, নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়িবে কিম্বা ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে চাষ দেওয়া জমিতে সারি করিয়া লঙ্কার চারা পুঁতিবে। এই মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে লঙ্কা পুঁতিতেই হইবে, নচেৎ গাছ ও ফল ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কার ঝাল হয় না। যে দোয়াঁশ মাটীতে বালির অংশ কিছু বেশী আছে সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া ঐ দাঁড়ার উপর আধ হাত অন্তর দুইটী করিয়া শাঁক আলুর বীজ পুঁতিবে। শাঁক আলুর ক্ষেত সর্ব্বদা আল্গা ও পরিষ্কার রাখিবে। এই মাসের শেষে কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আউস ধান কাটে।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

শ্রাবণ, ১৩১৭।

সুলভে সেগুণ কাষ্ঠের ফার্ণিচার ও ইমারতি গড়ন প্রভৃতি।



আমরা মৌলমিন্ হইতে উৎকৃষ্ট সেগুণ কাষ্ঠ আমদানী করিয়া মফঃস্বলের গ্রাহকবর্গকে সর্ব্বপ্রকার আলমারী, টেবিল, চেয়ার, পানিল, খড়খড়ি, সার্সী প্রভৃতি অর্ডার মত প্রস্তুত করাইয়া অতি সামান্য মুনফা রাখিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। করোগেট আয়রণ, ষ্টীল জয়েষ্ট, টী আয়রণ, বোল্টনাট, বেড়ার কাঁটাওয়ালা তার প্রভৃতি এবং ফার্ণিচার ও ইমারতি গড়নের জন্য কল, কব্জা, ছিটকিনি, বল্ট, পরকলা, রঙ্গ প্রভৃতি আমাদিগের নিকট উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। গভর্ণমেন্ট অফিসার, মিউনিসিপালিটী ও অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আমাদিগের ফার্ম্ম হইতে সর্ব্বদাই দ্রব্যাদি লইয়া থাকেন। ঠিক জিনিষ উচিত মূল্য, প্রতারিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

বিস্তারিত বিবরণসহ জিনিষের লিষ্ট পাঠাইলে দর দিয়া থাকি ; পত্র লিখিলে আমাদিগের সচিত্র ইংরাজী ক্যাটালগ (মূল্য নিরূপণ তালিকা) বিনা মূল্যে পাঠাইয়া থাকি ; পরীক্ষা প্রার্থনীয়।—

এ, টী, দে এণ্ড কোং।
১৬২।১৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং।

মনোহারী সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য উচিত মূল্যে সর্ব্বস্থানে সরবরাহ করা হয়। অর্ডার সহিত এক-চতুর্থাংশ মূল্য অগ্রিম দেয়। অর্ডার পাইলে মাল পাঠাই, কিছুমাত্র বিলম্ব করা হয় না। আবশ্যকীয় দ্রব্যের দর পত্র দ্বারা জানান হয়। মফঃস্বলবাসীর কিরূপ সুবিধা ও সুযোগ একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ব্যবসায়িগণকে স্বতন্ত্র কমিসন দেওয়া হয়।

হোলসেল এণ্ড রিটেল ডিলার্স।
৯ নং রাজার লেন, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা।

স্ত্রী পুরুষের রজঃ ও শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় দোষ ও তজ্জনিত ব্যাধিসমূহ নির্ম্মূল করণক্ষম এবং স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চারক। মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা এক টাকা মাত্র।

যিনি আমার নিম্নলিখিত ঠিকানায় আপনার নাম ধাম পাঠাইবেন, তাহাকে কলিকাতা পুলিশ কোর্টের মোকর্দ্দমা হইতে নির্ম্মুক্ত ও উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া পরিগণিত

কামশাস্ত্র

নামক একখানি উপযোগী পুস্তক বিনামূল্যে বিনা ডাকমাশুলে পাঠান যাইবে।

কবিরাজ শ্রীমনিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,
আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়,
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কিং এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।
৮৩, হ্যারিসন রোড,
ব্রাঞ্চ—৪৫, ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের জন্য উপরোক্ত ঠিকানায় লিখুন।

মজুমদার এণ্ড কোং।

পেণ্টার্স ফটোগ্রাফার্স আর্টিষ্টস্ এণ্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স।
২২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আমাদের কারখানায় থিয়েটারের ষ্টেজ সম্বন্ধীয় সকল প্রকার সিন্ ড্রপসিন্ প্রভৃতি এবং সকল প্রকার অয়েল পেণ্টিং প্রতিমূর্ত্তি সুচারুরূপে অল্পমূল্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ রাজা, জমিদার প্রভৃতি মহোদয়গণের বাড়ীর কার্য্যই আমাদের প্রমাণ। সিনের মূল্য তালিকার জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন। আর সকল প্রকার দেশী বোম্বাই ছবি ও ফটো বাঁধাই এবং বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ম্যানেজার,
শ্রীবরদাপ্রসন্ন মজুমদার।

REGISTERED No C. 162.

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

একাদশ খণ্ড,—৪র্থ সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

শ্রাবণ, ১৩১৭।

কলিকাতা: ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়াকস্ হইতে
শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ সরকার দ্বারা মুদ্রিত।





কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ খণ্ড। } শ্রাবণ, ১৩১৭ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

কৃষিপ্রবাদ।

শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস লিখিত।

বৃষ্টি-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আশু বৃষ্টি জানিবার উপায়।

"চাঁদের সভার মধ্যে তারা।
বর্ষে পানি মূষল ধারা॥"

চন্দ্রের চারিদিকে মণ্ডলাকৃতি যে ছায়া পড়ে, সেই ছায়ার মধ্যে যদি তারা থাকে, তবে মূষলধারে বৃষ্টি হয়।

"পশ্চিমের ধনু নিত্য খরা।
পূবের ধনু বর্ষে ধারা॥"

যদি ইন্দ্রধনু পশ্চিমদিকে উদিত হয়, তবে বৃষ্টি হয় না। যদি পূর্ব্বদিকে উদিত হয়, তবে বৃষ্টি হইয়া থাকে।

"উঠ্‌লে জোনাকী গাছের পরে।
তাতে জল হয় সত্বরে॥"

জোনাকী অর্থাৎ খদ্যোতিকাসমূহ বৃক্ষের উপরে বিচরণ করিলে, শীঘ্রই বৃষ্টি হইয়া থাকে।

ঋষি-পরাশর সদ্য বৃষ্টি জানিবার অনেক উপায় নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করা এস্থলে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি। তিনি বলেন যে, জলের নিকট বা জলমধ্যে জলস্তম্ভ দৃষ্ট হইলে আশু বৃষ্টি হয়। পিপীলিকা সকল অন্ন মুখে করিয়া সহসা উর্দ্ধে উঠিতে থাকিলে বা ভেকগণ হঠাৎ ডাকিতে আরম্ভ করিলে তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি হয়: বিড়াল, কুকুর, নকুল, সর্প বা অন্য বিলেশয় (যাহারা বিলে বাস করে) জন্তু সকল অথবা শরভ (হরিণ বিশেষ) সকল প্রমত্ত হইয়া ইতঃস্তত দৌড়িতে থাকিলে তৎক্ষণেই বৃষ্টিপাত সম্ভব। বালকগণ যদি পথিমধ্যে ধূলিদ্বারা সেতুবন্ধন করে বা ময়ুর যদি নৃত্য করিতে থাকে, তবে সদ্য বৃষ্টি হয়। আঘাতজনিত বাতাক্রান্ত ব্যক্তির অঙ্গে যদি সহসা বেদনা উপস্থিত হয়, অথবা সর্প সকল বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করিতে থাকে, তবে আরও বৃষ্টি হওয়া সম্ভব জানিবে।

গ্রহসঞ্চারে বৃষ্টি গণনা।

"শনি রাজা মঙ্গল পাত্র।
চষ খোঁড় কেবল মাত্র॥"

যে বৎসর শনি রাজা এবং মঙ্গল মন্ত্রী হন, সে বৎসর চাষ করা বৃথা হয়। কেননা সে বৎসর শস্যাদি কিছুই জন্মে না।

"বুধরাজা যদি শুক্র মন্ত্রী হয়।
শস্য হবে জমিভরা নাহিক সংশয়॥"

যে বৎসর বুধ রাজা এবং শুক্র মন্ত্রী হন, সে বৎসর নিশ্চয়ই প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি জন্মিয়া থাকে।

পরাশর কৃত কৃষি-সংগ্রহে আমরা গ্রহসঞ্চারে বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির লক্ষণ জানিতে পারি। মঙ্গল ও শনি গ্রহের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন কালে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হয়। বৃহস্পতির অন্য রাশিতে গমনের পূর্ব্বে বসুন্ধরা জলপূর্ণ হয়। গ্রহগণের উদয় ও অস্তকালে, বক্র গমনে ও অতি গমনে প্রায়ই বৃষ্টি হয়। বৃহস্পতি চিত্রানক্ষত্রগত হইলেও মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া থাকে। আর বৃহস্পতি স্বাতীনক্ষত্র প্রাপ্ত হইলে মহামেঘাড়ম্বর হইলেও বৃষ্টি হয় না। বৃহস্পতি শ্রবণাগত হইলে বৃষ্টি ও রেবতীগত হইলে মেঘের নাশ হয়।

মঙ্গলগ্রহ উত্তরফল্গুণী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ শ্রবণা, হস্তা, মূলা, জ্যেষ্ঠা, কৃত্তিকা, মঘা নক্ষত্রে গমন করিলে অনাবৃষ্টি হয়। রবি মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠগত হইলে সমুদ্রও শুষ্ক হয়। শুক্র চিত্রামধ্যগত হইলে আশু অনাবৃষ্টি হয়। মঙ্গল সিংহরাশিতে গমন করিলে পৃথিবী অন্ধকারময় হয় এবং রবিযুক্ত হইলে উহা সমুদ্রও শুষ্ক করিয়া থাকে।

অঙ্গারকো যদা সিংহে তদাঙ্গারময় মহী।
সএব রবিনাযুক্তঃ সমুদ্রমপি শোষয়েৎ॥

জ্যোতিষ বচন সংগ্রহে আমরা জানিতে পারি যে, শনি রাজা হইলে পৃথিবী বৃষ্টিহীনা হয়। সূর্য্য বর্ষাধিপ হইলে মধ্যম, চন্দ্র হইলে প্রচুর, মঙ্গল হইলে অল্প এবং বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র বর্ষাধিপ হইলে উত্তম বৃষ্টি হইয়া থাকে। রবি রাজা হইলে শস্যহানি এবং প্রাণীগণের সর্ব্বদা পীড়া হইয়া থাকে, চন্দ্র রাজা হইলে পৃথিবী শস্যপূর্ণ হয় প্রাণীগণের স্বাস্থ্য ভাল হয়, সুবৃষ্টি ও সুভিক্ষ হয়।

বর্ষাধিপ কি প্রকারে স্থির করিতে পারা যায়, জ্যোতিষীগণ তাহারও সঙ্কেত বলিয়া দিয়াছেন।

শাকং ত্রিগুণিতং কৃত্বা, দ্বিযুতং মুনিনা হরেৎ।
ভাগশিষ্টো নৃপো জ্ঞেয়ো নৃপান্মন্ত্রী চতুর্থকঃ॥

বর্ষাধিপ স্থির করিতে গেলে সেই বৎসর তিন দ্বারা গুণ করিয়া তাহার সহিত দুই যোগ করিবে। তৎপরে তাহা সাত দ্বারা ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে সেই বর্ষে তিনিই রাজা, রাজা হইতে চতুর্থ গ্রহ মন্ত্রী।

বৃষ্টি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মেঘের লক্ষণ নির্ণয় করাই প্রধান কার্য্য। আকাশে মেঘ উঠিলেই বৃষ্টি হয় না, কোন্ মেঘে বৃষ্টি হইবে, কোন্ মেঘে বৃষ্টি হইবে না তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে, কিন্তু যাহারা সর্ব্বদাই মেঘের গতি বিধি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া রাখেন তাহাদের পক্ষে বৃষ্টি গণনা নিতান্ত কঠিন কার্য্য নহে।

বৃষ্টি বিজ্ঞান অর্থেই সাধারণতঃ মেঘ চরিত্রের জ্ঞানই বুঝায়। আবর্ত্ত, সংবর্ত্ত, পুষ্কর ও দ্রোণ ভেদে চারি প্রকার মেঘ সচরাচর দৃষ্ট হয়। এই এক এক প্রকার মেঘ এক এক বৎসর—বৎসরের অধিপতি হয়। মেঘ চরিত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে আবর্ত্ত মেঘ অধিপতি হইলে স্থানে স্থানে, সংবর্ত্ত মেঘ অধিপতি হইলে সর্ব্ব স্থানে, পুষ্কর অধিপতি হইলে অল্প ও দ্রোণ অধিপতি হইলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। কোন্ মেঘ কোন্ বৎসরের অধিপতি-মেঘ দেখিয়া তাঁহারা নির্ণয় করিতে পারেন এবং নিশ্চয় গণনা করিবার গণিতশাস্ত্রোক্ত নিয়মও আছে।

পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব যেরূপ মুখ দ্বারা আহার গ্রহণ করে বৃক্ষাদিও সেই রূপ শিকড় দ্বারা আহার্য্য পদার্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। কোন প্রকার কঠিন পদার্থ শিকড় দ্বারা সংগৃহিত হওয়া অসম্ভব, সেই জন্য লতা গুল্মাদির আহার্য্য পদার্থ গুলি জমিতে রসরূপে বর্ত্তমান থাকা চাই, সুতরাং এই রস উৎপাদনের জন্য মৃত্তিকায় জল সংযোগের আবশ্যকতা আছে। খাল, বিল বা নদীর জল কিম্বা বৃষ্টির জল যে কোন উপায়েই মৃত্তিকায় জল সরবরাহ হউক না, তাহা মেঘচ্যুত বারি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মহামুনি পরাশর যথার্থই বলিয়াছেন,—"বৃষ্টি মূলা কৃষিঃ"। সেই জন্য বৃষ্টিজ্ঞানের যাহা কিছু করা আবশ্যক তাহা অগ্রে প্রয়োজন।

কৃষি-প্রদর্শনী। *

ইহার উদ্দেশ্য ও উপযোগীতা।

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র লিখিত।

কৃষি-বিভাগের নব নব গবেষণার ফলাফল দর্শন করাইতে, নানাপ্রকার নব নব বীজ বা শস্যাদির চাষে কৃষক সাধারণকে প্রবৃত্ত করিতে, অভিনব কৃষি-যন্ত্রাদির সুকৌশল ও সুবিধার সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে, ও যাহাতে তাহারা তাহাদের উপযোগীতা বুঝিয়া নিজ নিজ কার্য্যে ঐ সকল যন্ত্রের ব্যবহার করে তাহার সুযোগ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে সরকার বাহাদুর এদেশে কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া থাকেন। এই প্রকার প্রদর্শনীর প্রয়োজন অতীব অধিক ও উদ্দেশ্য অতীব হিতকর ; এরূপ প্রদর্শনীর বাহুল্য বিশেষ বাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ যাহাতে এরূপ প্রদর্শনীকে কৃষক সাধারণ ও অন্য দর্শকবৃন্দ একটী তামাসা বলিয়া মনে না করে—যাহাতে ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে পারে এই জন্য এই সকল প্রদর্শনী নিম্নলিখিত কার্য্যপ্রণালী অনুসারে করা কর্ত্তব্য।

এই সকল প্রদর্শনীতে প্রথমতঃ অভিনব কৃষি-যন্ত্রাদির স্থান অতীব আবশ্যক। যে সকল যন্ত্র বাস্তবিক কৃষি কর্ম্মের বিশেষ সহায়ক ও যে সকল যন্ত্র চালনায় কোন অসুবিধা ও গোলযোগ নাই, সেই সকল যন্ত্র এই প্রকার প্রদর্শনীতে দেখান উচিত। আবশ্যক হইলে সেই মত যন্ত্র যোগান, যাইতে পারে তাহার প্রতি প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের লক্ষ্য থাকা উচিত। যে যন্ত্র করমাইস মত দিতে পারা যাইবেনা বা যাহা সম্প্রতি উদ্ভাবিত হইয়াছে—এখনও যাহার কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করিতে হইবে তাহার প্রদর্শন কোন উপকারে আসিবে না।

উপযুক্ত কৃষি যন্ত্রাদি প্রদর্শন করিতে হইলে পূর্ব্ব হইতে একটু প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ যে সকল কৃষিযন্ত্র কৃষকগণের ব্যবহারের আবশ্যক মনে করেন সেই গুলির একটি তালিকা করা আবশ্যক, এবং সময় মত দেশ বিদেশ হইতে সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া যে কোন প্রদর্শনীতে দেখাইবার মত ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে। আমেরিকাতেই আজ কাল নূতন নূতন কৃষি-যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতেছে। তথাকার যুক্ত-প্রদেশের কৃষি-বিভাগ আমাদিগকে এ বিষয়ে সম্ভবতঃ সাহায্য করিতে পারেন। তথায় কার্য্যকরী কৃষিযন্ত্রাদি নির্ম্মাণের জন্য উপযুক্ত শিল্পী নিযুক্ত আছেন। যতদিন না ভারতে উক্ত প্রকার কৃষি যন্ত্রাদি নির্ম্মানের কারখানা স্থাপিত হয় ততদিন আমেরিকার সাহায্য ব্যতীত কি উপায় আছে!

তৎপরে যে সকল বীজ সাধারণতঃ অধিক আবশ্যক হয় অথবা সংগ্রহ করা সুলভ নহে তাহার সংগ্রহ সম্বন্ধে সুবিধা ঘটাইতে প্রদর্শনীর লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

বীজ গুলি উৎকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক সুতরাং সেগুলি গভর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন করিতে হইবে। ক্রমশঃ ঐ সকল বীজ অধিক মাত্রায় আবশ্যক হইলে, উহা সমধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই বীজ উৎপাদন সময়ে তত্ত্বাবধারণের ভার উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

* সরকারী কৃষি Journal অবলম্বনে লিখিত।

প্রদর্শনীতে বীজের নমুনা প্রেরণ করা আবশ্যক। সাধারণতঃ চাষীরা যে কোন বীজের কোন এক প্রকারের চাষ করে। এক একটা শস্যের অনেক প্রকারের চাষ প্রবর্ত্তন করিতে হইলে সকল প্রকার বীজের নমুনা তাহাদিগকে দেখান উচিত এবং উহাদের চাষে কি ফসল তাহাও বুঝান আবশ্যক। কোন্ গুলি স্থানীয় জলহাওয়ায় চাষের পক্ষে উপযোগী তাহা নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়া প্রধান কাজ।

এমন সব উপযুক্ত ও দক্ষ লোকের হাতে প্রদর্শনীর ভার দেওয়া কর্ত্তব্য—যাঁহারা সমস্ত প্রদর্শিত দ্রব্যাদি নখদর্পণে রাখিতে পারিবেন এবং আবশ্যক মত উহা দেখাইতে ও উহার বিষয়ে জ্ঞাতব্য যাবতীয় সংবাদ প্রশ্নকারীকে দিতে পারিবেন। নচেৎ অনেক দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াও প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য বিফল হইতে পারে। দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইবার পূর্ব্বে অপর সাধারণ, যাঁহারা প্রদর্শক থাকিবেন তাঁহাদের সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়া প্রস্তুত হইয়া প্রদর্শনীতে যাওয়া কর্ত্তব্য।

প্রদর্শনী স্থলে কৃষি-পরিদর্শকগণের উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক, কারণ তাঁহারাই উপযুক্ত প্রদর্শক। উপরন্তু সর্দ্দার চাষীকেও উপস্থিত থাকিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে, বীজ হউক বা কৃষি যন্ত্রই হউক, যে হাতে হাতিয়ারে নাড়া চাড়া করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা হইয়াছে সুতরাং সাধারণকে বুঝাইতে সেও উপযুক্ত পাত্র।

যখন প্রদর্শনী খোলা হইবে তখন নিম্ন লিখিত ভাবে ঐ প্রদর্শনী খোলা উচিত। প্রথমতঃ যে তাঁবু বা ছাউনির মধ্যে প্রদর্শনী হইতেছে তাহার নিকটে এমন খানিকটে স্থান থাকা আবশ্যক, যথায় কোন প্রকার কৃষিকার্য্য দেখান যাইতে পারে। উন্নত প্রণালীর লাঙ্গলাদির কার্য্য কর্ষণ দ্বারাই দেখান যুক্তি, কিম্বা আক মাড়িবার যন্ত্রাদির কার্য্য হাতে হাতে দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ কেবল যন্ত্র দেখিয়া ও তাহার কার্য্যপ্রণালী শুনিয়া উৎসাহী দর্শকের সন্তোষ হয় না।

এই প্রকার স্থান নির্ব্বাচনের পর প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি ৬ ছয় প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে।

(১) বীজ বা শস্য বিভাগ ;—এই বিভাগে নানা প্রকার শস্য শিশির মধ্যে রাখিয়া সাজাইয়া দেখান উচিত। প্রত্যেক শিশিতে শস্যের নাম ছাপার কাগজে লাগান থাকিবে ও সমস্ত প্রদর্শিত শস্যের তালিকা ও বিশেষ বিশেষ বীজ বা শস্যের কৃষি বিবরণ যুক্ত বিবরণী পত্র বা hand bill এক এক সেট ঐ সহ থাকা কর্ত্তব্য।

(২) পোকা বা কীট বিভাগ ;—এই বিভাগে একটি Show Case বা কাচের আলমারি নানা খুব্‌রিতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক খুব্‌রিতে আলপিন দিয়া গাঁথিয়া পোকা সাজাইয়া রাখা উচিত। যাহাতে দর্শকবৃন্দের কৌতুহল মিটে সেই দিকে লক্ষ্য থাকা চাই। তদ্ভিন্ন এক জাতীয় অনেক পোকা যেখানে যেখানে দেখান কর্ত্তব্য অথচ সমস্ত সংগ্রহ হয় নাই, সেখানে ছবি কিম্বা ঐ পোকা সমূহের ছায়াচিত্র দেখাইলে অনেক কাজ হইবে সন্দেহ নাই। সরকার বাহাদুর এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন ও পুষা কৃষিকলেজে এই পোকা ও তৎচিত্র সংগ্রহ কার্য্য বিশেষ যত্নের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহার ফলে ভবিষ্যত কৃষি-প্রদর্শনীতে পোকা বিভাগের সংগ্রহ অতীব সন্তোষজনক হইবার ভরসা করা যায়।

(৩) আঁইস বিভাগ ;—এই বিভাগে পাট, শণ প্রভৃতি বৃক্ষাদির আঁইস যাহাতে কৃষি সাধারণের বিশেষ প্রয়োজন আছে ও যাহা সর্ব্বদা ব্যবহারে আসে এইরূপ আঁইসের নমুনার কতকগুলি বাণ্ডিল

ও তাহাদের চাষের কথা, তাহাদের দৈর্ঘ্য, টান সহনত্ব, সম্ভব মূল্যাদি ইত্যাদির কথা লেবেলে ছাপাইয়া সংলগ্ন করিয়া দেওয়া উচিত। এসম্বন্ধে বিবরণী পত্র ছাপান হইলেও বেশ হয়।

(৪) বিশেষ শস্য বিভাগ;—এই বিভাগে যে সকল শস্য অতি অল্পায়াসে চাষ ও উৎপন্ন করা যায় অথচ ঐ শস্যের আদর ও মূল্য যথেষ্ট হইতে পারে এমত কতকগুলি শস্যের সংগ্রহ থাকিবে। প্রত্যেক রকমের নমুনার প্যাকেটও ঐ সঙ্গে থাকিবে। সেগুলি পরীক্ষার্থীদিগকে দেওয়া হইবে। এই সহ উহাদের চাষের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে যাবতীয় আবশ্যকীয় কথা থাকাও বাঞ্ছনীয়। নচেৎ উপযুক্ত উপদেশের অভাবে পরীক্ষা যদি সন্তোষজনক না হয়, তাহাহইলে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

(৫) সার বিভাগ;—এই বিভাগে নানা রকম সারের সমাবেশ করিতে হইবে। প্রদর্শিত সার প্রত্যেকের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়া আবশ্যক নচেৎ নমুনা দেওয়া সম্ভব হইবে না। ঐ সারের কার্য্যকারীতা, মূল্য, কোন স্থানে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় এসকল জানাইতে হইলে এবং যদি অর্ডার পাওয়া যায় তাহাহইলে সম্ভব পক্ষে ঐ অর্ডার ও গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) যন্ত্র বিভাগ;—এই বিভাগে নানা জাতীয় উন্নতপ্রণালীর কৃষিযন্ত্র সংগৃহিত হইবে। ঐ সমস্ত সংগৃহিত যন্ত্রের ছবি ও কার্য্য করিবার নিয়মাবলি সহ hand bill বা বিবরণী ছাপান প্রয়োজন এবং আবশ্যক হইলে ঐ সমস্ত যন্ত্রের কার্য্যকারীতা ও সহজে ব্যবহার উপযোগী কি না দেখানও প্রয়োজন। প্রদর্শনীতে যদি যন্ত্রের অর্ডার পাওয়া যায়, তাহা গ্রহণ করা সম্ভব হইলে গ্রহণ করা, নচেৎ কোথায় পাওয়া যাইবে সে সংবাদ দিতে হইবে।

মোটামুটি যদি এই প্রণালীতে কৃষি প্রদর্শনী করা যায় তাহা হইলে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে এবং যে কৃষি সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ জন্য এই প্রকার প্রদর্শনীর প্রয়োজন তাহাও সংসাধিত হইতে পারে।

(৭) প্রদর্শিত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে পুস্তিকা বিতরণ প্রদর্শনীর একটা অঙ্গ। পুস্তিকার বিবরণ গুলি বিশদ ও সাধারণ বোধগম্য হওয়া আবশ্যক। প্রদর্শনী মণ্ডপে প্রবেশের দ্বারেই মধ্যস্থলে একটি মেজের উপর ঐ সকল পুস্তিকা সজ্জিত রাখা কর্ত্তব্য এবং প্রার্থীগণকে তাহার আবশ্যক মত পুস্তিকা বিতরণের জন্য তথায় এক জন লোক থাকা চাই। পুস্তিকা গুলি ইংরাজী ও স্থানীয় ভাষায় হওয়া বিধেয়।

(৮) বীজ ও কৃষি যন্ত্রাদির ব্যবহারের পরীক্ষার ফল চিত্রদ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা মন্দ নহে। চিত্রে লোকের মন সহজে আকৃষ্ট হয়। বিভিন্ন সার প্রয়োগে বা চাষের তারতম্যে কি প্রকারে ফসলের তারতম্য হয়, তাহা ছায়াচিত্র দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। চিত্র গুলি দেখাইতে হইলে যথেচ্ছা ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে; কাচের আলমারির ভিতর সজ্জিত করিয়া রাখাই প্রয়োজন।

(৯) বৃক্ষ, লতাদির শাখা প্রশাখা বা শস্যাদির গুচ্ছ, কাঠ বা পিচবোর্ডে মারিয়া দেখাইলে ভাল দেখায়। সেই গুলি ধুলা বালিতে নষ্ট না হয় তজ্জন্য তাহার উপর কাচের আবরণ দিলে ভাল হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা গুল্মাদি ছোট মাটির টবে দেখান যাইতে পারে।

প্রদর্শনী মণ্ডপটি সুসজ্জিত হওয়া আবশ্যক। সমস্ত দ্রব্যগুলিতে যাহাতে সকলের দৃষ্টি পড়ে এরূপ ভাবে সজ্জিত করিতে হইবে। মধ্যস্থলে একটি ষ্ট্যাণ্ড রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে রাস্তা করিতে হইবে এবং তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে কাঠের গ্যালারি করিয়া দ্রব্য সাজাইতে হইবে। কাষ্ঠাসন গুলি সুদৃশ্য কাপড়ে মুড়িতে হইবে। পিছনের পর্দা গুলি দামী না হউক নয়ন রঞ্জন হইলে ভাল হয়। চলা ফেরার স্থান সুপ্রশস্ত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই—মোট কথা প্রদর্শনী গৃহের সকলটাই যেন চিত্তাকর্ষক হয়। বীজ, যন্ত্রাদি ও তাহাদের ছবি এমন ভাবে সজ্জিত করিতে হইবে, যেন তাহাদের পাশে পাশে ছবিগুলি থাকে। দ্রব্যাদির গায়ে লেখা নাম ও বিবরণ গুলি যেন সুস্পষ্ট হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্য বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত হওয়া উচিত। প্রদর্শিত দ্রব্যগুলি ধারাবাহিক রূপে এমন ভাবে সাজান দরকার, যেন দেখিলেই সাধারণে তৎসম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতে পারে। প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বার ও অলিগলি গুলি বৃক্ষ লতাদি দ্বারা সজ্জিত হইলে মন্দ দেখায় না, কিন্তু যদি তাহাতে ব্যয়বাহুল্য হয় বা আসল দ্রব্যগুলি দেখিবার বিঘ্ন ঘটে তবে তাহা না করাই ভাল। আসল উদ্দেশ্য, শিক্ষা প্রদান। এই শিক্ষা কার্য্য যাহাতে মধুর ভাবে সম্পন্ন হয় তজ্জন্যই এত সাজসজ্জার আবশ্যকতা।

মোচা।

শ্রীজগতপ্রসন্ন রায় লিখিত।

কদলী মোচকং হৃদ্যং কফঘ্নং ক্রিমিনাশনং ;
কুষ্ঠ প্লীহা জ্বর হরং দীপনং বস্তি শোধনং।

অর্থাৎ মোচা আমাদের মুখপ্রিয় কফনাশক আগ্নেয়, বস্তি শুদ্ধিকর এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ ও প্লীহা জ্বররোগের সুপথ্য।

এত্যাধিক গুণ বিশিষ্ট তরকারি মোচা সম্বন্ধেও স্থান বিশেষে কিছু কিছু কুসংস্কার আছে। মোচা বলিলেই বাঙ্গালী সাহেবদের সেই "কেলাকা ফুল" কথাটা মনে আসে। অবস্থাভেদে মোচার আবার দুটী নাম। গোটা মোচা ও এড়া মোচা। কলাগাছের থোড় হইতে আমূল মোচাটী বাহির হইয়া যত দিন তাহাতে কলার ছড়া না বাঁধে ততদিন তাহাকে আসল মোচা বা গোটা মোচা কহিয়া থাকে। মোচার যে রাঙা খোলা আমরা দেখিতে পাই বাস্তবিক উহা কদলী পত্রের ক্ষুদ্র অবস্থান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। মোচা বড় হইলে কাঁদির ফাঁপে ফাঁপে এই রাঙা খোলার গায়ে এক এক ছড়া করিয়া কলা ক্রমশঃ বাহির হইয়া থাকে। এই রূপে সমস্ত কলা (যাহা কাঁদিতে ফলিবে) কাঁদির গায়ে গাঁথা হইলে অবশিষ্ট মোচা ক্রমে ক্রমে একটা করিয়া রাঙা খোলা ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতে থাকে। কলার কাঁদির আগার দিকে এই অবশিষ্ট মোচাকেই এড়া মোচা কহিয়া থাকে।

অনেক স্থানে লোকের বিশ্বাস এড়া মোচা খাইতে নাই ইহা অখাদ্য এবং তিক্ত। এড়া মোচা কেন খাইতে নাই, কিসে অখাদ্য, বাস্তবিক ইহা তিক্ত কিনা তাহা একবারও কেহ পরীক্ষা করিয়া

দেখে না। গৃহস্থ পূর্ব্ব প্রচলিত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই হাজার হাজার এড়া মোচা কাঁদি হইতে কাটিয়া কলার বাগানে পচাইয়া ফেলে। সে সব দেশে যদি এড়া মোচার প্রচলন থাকিত তাহা হইলে কলাবাগানের মালিক কেবল এড়া মোচা হইতেই তাহার বাগান পাইটের সমস্ত খরচ তুলিতে পারিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যেখানে এড়া মোচার প্রচলন নাই, সেখানে একটী পৃথক কলাগাছ মারিয়া তাহারই গোটা মোচা তরকারি রূপে ব্যবহৃত হয়। সচরাচর তাহারা মোচা ও থোড়ের জন্য পৃথক কলাগাছ মারিয়া থাকে, তাহাতে গৃহস্থের বিন্দুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না।

যে গাছের মোচা ও থোড় সর্ব্বশুদ্ধ ছয় পয়সা বিক্রী হইল কিন্তু সেই গাছের কলা পাকাইতে পারিলে অন্ততঃ বার আনা বা পাঁচ সিকা বিক্রয় হইত। অধিকন্তু উহার এড়া মোচা এবং কলা— কাটার পর থোড়ও পৃথক মূল্যে বিক্রয় করা যাইত। এড়া মোচার মধ্যে কেবল কাঁচ বা কাঁচাকলার এড়া মোচাই তিক্ত নতুবা অন্য কোন কলার এড়া মোচা তিক্ত নহে।

বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানে উক্ত মোচার প্রচলন আছে, ইহা খাইতে অতীব সুস্বাদু। এড়া মোচা হইতে গোটা মোচার তরকারি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। মধ্যবঙ্গে এক প্রকার কলা জন্মিয়া থাকে তাহাকে বীচে কলা কহে, কেহ কেহ আবার ডয়া বা ডউরা কলাও বলে। আমার অনুমান ডহর কথা হইতে ডহরে কলার নাম উৎপন্ন হইয়াছে, ডহরে কলার অপভ্রংশ ডয়া বা ডউরা কলা, কারণ এই জাতীয় কলা মধ্যবঙ্গে নাবাল, জলা জমি বা পচা পুকুরের পাড়ে বেশীর ভাগ জন্মাইয়া থাকে। ডয়া কলার গাছ বেশ বড় হয়। এ দেশে গোটা মোচার জন্য এই জাতীয় কলার গাছই গৃহস্থ প্রায়ই মারিয়া থাকে। ডয়াকলার কাঁদি খুব বড় হয় তাহাতে অনেক কলা ধরে। এই কলার গাছ মোচা বেলায় কাটা অপেক্ষা কলা পুষ্ট হইলে তখন কাঁদি কাটিলে মালিকের অনেক লাভ হয় কারণ কাঁচা ডয়া কলা এ দেশে পয়সায় ৩।৪ টা করিয়া হাটে বিক্রী হয়। খুলনা, যশোহর, চব্বিশ পরগণা ও নদীয়ায় যে অপূর্ব্ব উপাদেয় কলা-চড়চড়ির প্রচলন আছে তাহা এই ডয়া কলা হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। ডয়া কলায় অধিক বীচি থাকে বলিয়া বড় কেহ পাকায় না, তবে পাকা ডয়া কলায় ছোটলোকে ভারি রুটি করিয়া খায়।

মোটের উপর যখন ডয়া কলারও এড়া মোচা আমাদের উৎকৃষ্ট তরকারি তখন কেবল গোটা মোচার তরকারির জন্য ডয়া কলার গাছও অকালে নষ্টকরা কোন প্রকারে যুক্তিসঙ্গত নহে। খুলনা যশোহর, নদীয়া, চব্বিশপরগণা জেলায় মোচা ছেচ্‌কি ও মোচার ডাল্‌না যে কিরূপ সুস্বাদু ও মুখরোচক হইয়া থাকে তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন বুঝিতে পারে না। আমার বেশ স্মরণ আছে এক্‌বার বীরভুম জেলার দুটী বন্ধু আমাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা এই মোচার ডাল্‌না ফেলিয়া মাচ মাংস কিছুতেই হস্তক্ষেপ করেন নাই, কেবল মোচার ডাল্‌না দিয়াই দুপুরের আহার সমাধা করিয়াছিলেন।

প্রথমে মোচা সরু করিয়া কুটিয়া লইতে হয় পরে তাহা জলে সিদ্ধ করিয়া ফেলিয়া তেল ও ঝাল ফোড়ং দিয়া ভাজিয়া লও। ভাজার পর গরম মশলা দিয়া নামাইলে মোচা ছেঁচ্‌কী প্রস্তুত হইল।

আর মোচার ডাল্‌না রাঁধিতে গেলে মোচা প্রথমে সরু করিয়া কুটিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে, পরে তাহা সামান্য তেলে ভাজিয়া জিরা মরিচ ও তেজপাত বাটার জল দিয়া ফুটাইয়া পৃথক পাত্রে

ঢালিয়া রাখিতে হয়। অন্য আর একটী পাত্রে ঘি বা তেলের সম্বরা দিয়া তাহাতে উক্ত মোচা ঢালিয়া অল্প পরিমাণে দুধ ও চাউলের গুঁড়া (পিটুলী) দিয়া ফুটাইয়া পরে ঘি ও গরম মশলা দিয়া নামাইয়া পৃথক পাত্রে ঢাকিয়া রাখ ; তাহা হইলে উত্তম মোচার ডাল্‌না প্রস্তুত হইল। প্রায় ২ বৎসর অতীত হইল সেবার আমাদের দেশে তরিতরকারি বড় দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল। এক দিন বাড়ির পার্শ্বের প্রজা, কুমার পাড়ার মেয়েরা আমাদের বাড়িতে (মনিব বাড়ি) তরকারি চাহিতে আসিয়াছিল তাহা আমি দেখিয়াছিলাম। পর দিন আমি কলাবাগানে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি এড়া মোচা দেখিতে পাইলাম। মোচা গুলি কাটিয়া পাড়িলাম। বাড়িতে লইয়া গেলে এড়া মোচার আদর হইবে না ভাবিয়া কাহাকেও অসময়ে দান করিবার মনস্থ করিলাম। এমন সময় দেখি বেড়ার পাশ দিয়া হাকিমগাজী গরু লইয়া যাইতেছে, তাহাকে মোচা কটা লইতে বলিলে সে উত্তর করিল বাবু এড়া মোচা খাইতে নাই যদি দয়া করিলেন ত গোটা কতক ডয়া কলা দিন একবেলার তরকারির জোগাড় হইবে, আজকাল প্রায়ই তরকারি জুটিতেছে না, অনেক সময় কেবল নুন দিয়া ভাত খাইতে হয়। সুধু লবণ দিয়া ভাত খাইবে সেও স্বীকার তবু এড়া মোচায় হাত দিবে না. কারণ বাপ্‌ ঠাকুর দাদার নিষেধ হয় ত কবে শুনিয়াছিল যে এড়া মোচা খাইতে নাই।

কিছুক্ষণ পরে মনে পড়িল কাছেই কুমারপাড়া, ওরা সেদিন বাড়িতে তরকারি চাহিতে গিয়াছিল উহাদিগকে ডাকিয়া মোচা কয়টি দিই। কুমাররা মোচা লইয়া গেল, মনে ভারি আনন্দ হইল, বাড়ি আসিয়া দম্ভ করিয়া বলিলাম অভাবে সব চলে। তোমাদের এড়া মোচায় এত ঘৃণা আজ দেখ পেটের দায়ে পাড়ার কুমারগণ তরকারি খাইবার জন্য অনেক এড়ামোচা লইয়া গিয়াছে। পুষ্করিণীর পাড়েই কুমারপাড়া। ওমা, স্নান করিতে আসিয়া দেখি যে সমস্ত মোচা গুলিই কুম্ভকার মহাশয়ের আঙ্গিনায় দুগ্ধবতী গাভীটীর সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। বুঝিলাম অন্ধ কুসংস্কারটা হঠাৎ কাহারো অন্তর্হিত হইতে চাহে না।

মোচা যখন বাঙ্গালীর অতি উপাদেয় উপকারী তরকারি, মোচার জন্য যখন পৃথক কোন কলার চাষ আবাদ করিতে হয় না, তখন পুষ্টল কলার কাঁদির এড়া মোচা অনেক জায়গায় কোন উপকারে লাগেনা ইহা শুনিলে মনে বড় কষ্ট হয়। এই মোচা কাটিয়া না ফেলিলে কখন কাঁদির কলা মোটা হয় না, যে জিনিষটা গাছে থাকিলে গাছের অপকার হয়, আবার কাটা পড়িলে মানুষের উত্তম আহারে লাগে, তখন সেই জিনিষটার সর্ব্বস্থানিক প্রচলন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থলে এড়া মোচার প্রচলন আছে, কলিকাতায়ও এড়া মোচা চলে, তবে অনেক জেলায় কোন কোন স্থান বিশেষে কেন যে এড়া মোচার এত অনাদর তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দিন দিন পাড়াগাঁয়ে তরকারি যেরূপ মহার্ঘ হইয়া উঠিতেছে তাহাতে অনুমান হয় স্থান বিশেষের এই কুসংস্কারটা আর বেশী দিন প্রচলিত থাকিবে না। যত শীঘ্র যায় ততই মঙ্গল।

শ্রাবণ—১৩১৭।

পুষায় ফল চাষ।

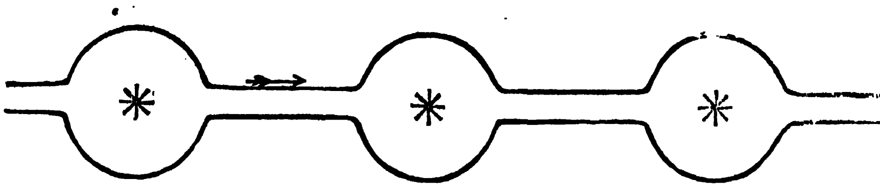
বিগত কয়েক বৎসর হইতে পুষা কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্রে ফল চাষ সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে। ১৯০৬ সালে এতদসম্বন্ধে প্রথম বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসর দ্বিতীয় সংখ্যক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম বিবরণীতে পরীক্ষা সমূহের উদ্দেশ্য ও প্রণালী বিবৃত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান বিবরণীতে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত পরীক্ষা সমূহ দ্বারা কিরূপ ফল হইয়াছে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরীক্ষা সমুদয়ের কতিপয় প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য ধরিয়া প্রত্যেকটিতে কি কি বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে তাহার আলোচনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমেই বৃক্ষ রোপণ প্রণালী—বর্ষার পর ৪ × ২½ ফুট গর্ত্তে চারা বসান হয় এবং প্রত্যেক গাছের নিকটে একটি সছিদ্র কলসী বসাইয়া জল দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু ইহাতে তাদৃশ ফল পাওয়া যায় নাই। ইহার পরিবর্ত্তে আর একটি অভিনব প্রথায় শীতের শেষে গাছ বসান হয়। পৌষ মাঘ মাসে সাধারণতঃ ভারতীয় সমতল জমির গাছ আদৌ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু মাঘ মাসের শেষে আব হাওয়া বদলাইয়া যায় এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। গ্রীষ্ম কালের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত বৃদ্ধির হার একপ্রকার থাকে। তাহার পর বন্ধ হইয়া গিয়া আবার আষাঢ় মাসে বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। সুতরাং শীতের শেষে রোপণ করিলে বর্ষার আগেই গাছ একদফা বাড়িয়া যাইতে পারে এবং মরিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এতদ্ভিন্ন গাছ বসাইবার সময় মাটি উত্তম রূপ চাপিয়া বসাইয়া দেওয়া উচিত। যাহাতে ছোট ছোট শিকড় গুলি মাটির সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে, এইটুকু লক্ষ রাখিতে হইবে।

গাছ বসানর পরই জল সেচন অন্যতম কার্য্য। বিশেষতঃ আমাদের দেশে জল সেচনের উপরই গাছের জীবন নির্ভর করে। প্রথমে সমস্ত গাছ গুলি যাহাতে এক রূপ পরিমাণে জল পায় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। তাহার পর জল-সিক্ত জমি হইতে শুষ্ক জমি পৃথক রাখা ও পাশের দিকে যাহাতে জল চারাইয়া না যায় তাহার বন্দোবস্ত করাও প্রয়োজন। ক্ষেত্র ভাসাইয়া দেওয়ায় বিশেষ কোন সুবিধা নাই। ইহাতে রৌদ্রে জল শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া যায়, নিম্নে প্রবেশ করিতে পায় না এবং পরে অধিক পরিমাণে চাষ দিতে হয়।

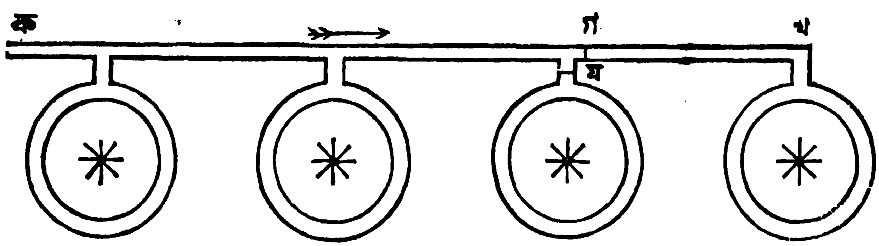
সাধারণ ভাবে নালি কাটিয়া জল দেওয়াকে নালিপ্রণালী বলিতে পারা যায়। লম্বা লম্বা ঋজু নালি কাটিয়া জল দেওয়া যাইতে পারে কিম্বা কোন কোন জাতীয় ফল বৃক্ষের গোড়ার চতুর্দ্দিকে অগভীর গর্ত্ত করিয়া ঐ গর্ত্ত গুলি একটি একটি নালি দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয় (১ম চিত্র)। পুরাতন গাছে এ প্রণালী দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণ উপকার হইলেও নূতন চারা গাছে ইহাতে তাদৃশ সুফল ফলে না। নূতন চারা গাছে

১ম চিত্র।



যাহাতে জল জমিয়া গাছ গুলি নষ্ট না হইতে পারে তজ্জন্য গাছের গোড়ায় উঁচু করিয়া মাটি দেওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ লেবু গাছের গোড়ায় জল জমিলেই গোড়ায় ধসা লাগিয়া গাছ মরিয়া যায়। এই সকল অসুবিধার জন্য বক্র নালী নামক একটি নূতন প্রথায় জলসিঞ্চনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক গাছের সারির সমান্তরালে ৯ ইঞ্চ প্রশস্ত ও ৫।৬ ইঞ্চি গভীর নালি কাটা হয়। সারির প্রত্যেক গাছের ডালপালা যতদুর বিস্তৃত সেই হিসাবে গাছের চতুর্দ্দিকে একটি চক্রাকার গর্ত্ত খনন করা হয়। নূতন চারায় এইরূপ গর্ত্তের ভিতরের ব্যাস প্রায় ৩ হইতে ৪ ফুট। প্রত্যেক চক্রাকার গর্ত্ত সমস্ত জলনালির সহিত একটি ক্ষুদ্র প্রণালী দ্বারা সংযুক্ত হয়। (২য় চিত্র)।

২য় চিত্র।



বড় নালীতে জল দিয়া এক একটি গাছের চতুর্দ্দিকের গর্ত্তে জল পূর্ণ হইলেই উক্ত চক্রের দিকে জল যাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিয়া তৎপরবর্ত্তী গর্ত্তে জল দিতে হয়। এইরূপ প্রণালীতে জল দেওয়ায় সুবিধা ব্যতীত অন্য উপকারও আছে। এতদ্দেশে উইয়ের উপদ্রব অত্যন্ত অধিক এবং প্রথমতঃ সার হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহার পর উই গাছকে আক্রমণ করে। কিন্তু এই প্রণালীতে যদি কেবল চক্রের ভিতর সার প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে প্রথম বার জল প্রয়োগে কেবল যে সার পচিয়া বৃক্ষ পোষণোপযোগী হয় তাহা নহে, চারিদিকে জল বেষ্টিত থাকায়, সার অথবা গাছের গুঁড়ি উই দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে না। বক্র প্রণালীতে প্রত্যেক সপ্তাহে জল দেওয়া অপেক্ষা ২।৩ সপ্তাহ অন্তর এক সপ্তাহে উপর্য্যুপরি ২।৩ বার জল দেওয়া ভাল। বক্র প্রণালীর অন্যান্য উপকারিতা এই যে, এতদ্বারা মোটের উপর জল কম লাগে. জল অধিকদুর প্রবেশ করিতে পারে, জল শীঘ্র শীঘ্র সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক হইয়া যায় না, প্রত্যেক গাছে প্রায় সমান মাত্রায় জল পড়ে, জমির চাষ নষ্ট হয় না এবং সর্ব্বশেষে জল সেচন অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য্য হইয়া পড়ে।

জল সেচন প্রণালী ব্যতীত ফল চাষ সম্বন্ধে অন্যান্য পরীক্ষাও পুষা কৃষি-ক্ষেত্রে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ফলের বাগানের জমির চাষ বিষয়ক

পরীক্ষাই অন্যতম। ফলক্ষেত্রে তিনটি প্রথা অবলম্বিত হয়,—(১) জমিতে নিয়ম মত চাষ দেওয়া (২) কেবল আগাছা বাছিয়া জমি পরিষ্কার রাখা (৩) জমিতে কেবল দূর্ব্বা জন্মান। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, নিয়মিত চাষ দেওয়ার প্রথাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কিন্তু ইহাতে উপরের জমি ধুইয়া যাওয়ার ভয় আছে। বিহার অঞ্চলের চাষারা বাঁধ বাঁধিয়া জমি যাহাতে ধুইয়া না যায় তাহার বন্দোবস্ত করে। এতদ্ভিন্ন গড়ান জমিতে আড়া আড়ি নালী কাটিয়া নালীর উপর দিকে মাটির আড়ি দিয়াও জলের গতির বেগ কমাইয়া দেয়। কিন্তু এইরূপ আড়ি কাটার প্রণালীর সহিত যদি কোন প্রকার সিম্বী (Leguminous) উদ্ভিদ্ জন্মান হয়, তাহা হইলে আরও সুবিধা হয়।

বৃক্ষজাত সাবান।—বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছে যে, তৈল কিম্বা চর্ব্বির সহিত ক্ষার সংযোগে সাবান প্রস্তুত হয়। চীনদেশে এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহার ছাল দ্বারা সাবানের কার্য্য উত্তমরূপে চলে। ঐ সকল বৃক্ষের নাম এই জন্য সপিন্স (Sapinnus)। আমাদের দেশেও এমন গাছ আছে যাহার ফলে সাবানের কার্য্য সাধিত হয়। রিঠা ফল বোধ হয় অনেকেই কাপড় কাচিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। শাল, রুমাল প্রভৃতি পশমী কিম্বা রেশমী বস্ত্র কাচিবার জন্য ইহার বহুল ব্যবহার। ইহাতে কাপড় উত্তম পরিষ্কার হয় এবং জল সঙ্গে ইহা হইতে সাবানের মত ফেণা উঠে। দেশী বা ছাঁচি কুমড়ার জলদ্বারা রেশমী কিম্বা পশমী বস্ত্র পরিষ্কার করা বেশ চলে। পাকা দেশী কুমড়া কুরিবার সময় যে জল বহির্গত হয়, সেই জলই বস্ত্র পরিষ্করণে ব্যবহৃত হয়।

বিহার কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী।

১৯১০।

১৯০৭ সাল হইতে বাঁকীপুরে এই প্রদর্শনীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং তদবধি বাঁকীপুরেই প্রদর্শনীর মেলা বসিতেছে। গভর্ণমেণ্ট কৃষি-বিভাগ এই প্রদর্শনীর জন্য বাৎসরিক ৫০০ টাকা চাঁদা দিয়া থাকেন।

ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ প্রদর্শনীক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির সমাবেশ দেখিতে পাইলে তাঁহাদের উভয়েরই সুবিধা হয়,- বিক্রেতাগণ নানাদেশ হইতে আনীত নমুনা দেখিয়া স্থানীয় শিল্পীগণ কর্ত্তৃক ঐ সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন করিবার প্রয়াস পান; ক্রেতাগণও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য নির্ব্বাচনে সুবিধা পান। এইরূপ প্রদর্শনী দ্বারা কি চাষী কি অপর সাধারণ লোক সকলেই নূতন নূতন কৃষি জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়।

বিহার প্রদর্শনীতে আমরা সাক্ষাৎসম্বন্ধে এই লাভ দেখিতে পাই যে, এখানে আগে কাঁসার কাজ ভাল হইত না, কিন্তু মুর্শিদাবাদ হইতে আনীত নমুনা দেখিয়া স্থানীয় শিল্পীগণ সুন্দর কাঁসার বাসন নির্ম্মাণ করিতেছে। জার্ম্মাণ রৌপ্যের বাসনাদি নির্ম্মাণকার্য্য এখানে এই প্রথম আরম্ভ হইয়াছে। পাটনা সহর হইতে দুই ব্যক্তি কাচের খেলনা, চা পেয়ালা প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্রব্য গুলি মন্দ নহে। গয়ার পাথরের কাজ, পাটনায় মৃত্তিকা বাসনের কাজের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, শিল্প-প্রদর্শনী ইহার কারণ বলিতে হইবে। এই প্রদর্শনী হইতে সাধারণে বুঝিতে পারে যে, বিহারে কম্বল, দরি, কার্পেট, আসন প্রভৃতি ভাল

রূপই তৈয়ারি হইতেছে। পাটনার দোসুতি ও ও দরির খুব খ্যাতি আছে।

কৃষি-বিভাগে প্রদর্শিত আমরা নিম্নলিখিত ধান-গুলি উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি।—

(১) অনাবৃষ্টি সহ ধান	সিলহণ্ডি	অগ্রহায়ণে হয়।	
(২) বন্যা সহ	,, রাঙ্গুনা	,,	,,
(৩) লম্বা ডাঁটা	,, দেশারিয়া	,,	,,
(৪) সুগন্ধী	,, শ্যামজিরা	বসন্তকালে হয়।	
(৫) মিষ্টগন্ধী	,, বাদসাভোগ	,,	,,
(৬) মিহি	,, দাদখানি	(বঙ্গদেশের)	
(৭) প্রচুর ফলা	,, বারহণ্ডি	অগ্রহায়ণে হয়।	
(৮) চেঙ্গা	,, চানক	উত্তরবিহারে হয়	

দুই জাতীয় বুনো ধানও দেখান হইয়াছিল। তেনী নামক ধান্য পুষ্করিণী ও ঝিলেতে জন্মায়, চাউল খুব লঘু। নিম্ন জলা ভূমিতে এক প্রকার বোরা ধান্য জন্মে, তাহাও দেখান হইয়াছিল।

প্রদর্শনীক্ষেত্রে পুষ্প ও শাক সব্জীর সমাবেশ ছিল। হাতোয়া রাজাই ইহার অধিকাংশ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃষি উন্নতি কল্পে সহানুভূতি প্রশংসনীয়।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ হইতে ধানভানা ও চাউল ছাঁটা কল, বিচালিকাটা কল, ভুট্টা ছাড়ান ও আখমাড়া কল এবং হিন্দুস্থান, মেষ্টন ও শিবপুর লাঙ্গল ও আমেরিকান লাঙ্গল দেখান হইয়াছিল।

বর্ত্তমান বিহার প্রদর্শনীর একটু নূতনত্ব এই যে, এবার কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় মৎস্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নানা প্রকারের সামুদ্রিক ও খাল, বিল ও পুষ্করিণী জাত মৎস্যের একত্র সমাবেশ দেখিয়া সকলেই প্রীত হইয়াছে।

মজঃফরপুরের একজন উকীল শ্রীযুক্ত বাসন্তী চরণ সিংহ টীনে আম সংরক্ষণ করিয়া সকলেরই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। মিঃ এ, বি, সরকার সম্প্রতি কালিফর্ণিয়া হইতে রাসায়নিক ফলসংরক্ষণ বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছেন। উক্ত উকীল মহোদয় তাঁহারই সহায়তায় মজঃফরপুরে আম্র সংরক্ষণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এখানে আম, লিচু যথেষ্ট হয়। এরূপ একটী ব্যবসায় দক্ষতার সহিত চালাইতে পারিলে ভবিষ্যতে লাভের আশা বটে।

আমরা অনেকবার বলিয়াছি যে, যাহারা কৃষিক্ষেত্র বা কৃষি-প্রদর্শনী দেখিয়া বিশেষ লাভবান হইবে, তাহারাই অনেক সময় দূরে পড়িয়া থাকে। এই প্রদর্শনীতে কিন্তু চাষীদের জন্য কিছু ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্থানীয় কৃষি-সমিতি প্রদর্শনী ক্ষেত্রে ৩০০ জন চাষীকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আহারাদির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ২০০৲ টাকা প্রদর্শনী কর্ত্তৃপক্ষগণের হাতে দিয়াছিলেন।

বিহার প্রদর্শনী কার্য্যতঃ ফলপ্রদ করিবার চেষ্টা যে কর্ত্তৃপক্ষের খুব ছিল, দরিদ্র প্রজাগণের স্থানীয় আহার্য্য শস্য সংগ্রহেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কি প্রকারেই বা ঐ সকল শস্য হইতে খাদ্য তৈয়ারি হয়, তাহা সাধারণকে বুঝাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমরা সেই আহার্য্য শস্যগুলির উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি।

জনেরা (Serghum Vulgare)। চারি জাতীয় জনেরা বিহারে উৎপন্ন হয়। আষাঢ় মাসে ইহাদের বীজ বোনা হয়। অগ্রহায়ণ এবং পৌষ মাসে শস্য আহরণ হয়। ইহা অন্যান্য কলাই শস্য অপেক্ষা অনাবৃষ্টি সহ, সুবৃষ্টি হইলে বিঘাতে ৩০ মণ উৎপন্ন হয়।

কৃষকগণ ইহার ভাত, রুটী, খৈ, পিঠা, ছাতু কিম্বা গুড় সংযোগে মোয়া প্রস্তুত করিয়া খায়।

মকাই (Maize)। দুই জাতীয় মকাই এতদঞ্চলে হয়। একটির ঢেঙ্গা ফল হয়, অপরটির ফল কিছু খর্ব্বাকৃতি। ইহারও রুটী, পিঠা, ছাতু, ভাত, খৈ ও মোয়া তৈয়ারি হয়। কাঁচা ভুট্টার ফলগুলি আগুণে ঝলসাইয়া সেই দানা গুলি খায়।

চীনা, কাওন, কদো ও শ্যামা (Panicum Milaceum, Italicum, Scrobiculatum and Frumenltaceum)। ইহারা ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। ইহাদেরও অনেক জাতি আছে। প্রত্যেকের দুই ও তিন জাতি বিহারে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে খৈ ও ভাত হয়। ভাজিয়াও খায় এবং শ্যামা ঘাসের বীজে পায়স তৈয়ারি হইতে পারে। এই গুলি ভাদুই শস্য। মণ ১৲ হইতে ১৷৷০ টাকা।

মারুয়া (Eleusine Coracana)। ধান্যের মত বীজ গাছ তৈয়ারি করিয়া পুনরায় রোপণ করিয়া ইহার চাষ হয়। ইহার ময়দায় রুটী হয়। ইহার ছাতুও খাদ্য। বাজরা (Pennisetum Typhoidiun)। সাহাবাদ ও সারণ জেলায় খুব জন্মায়। ইহা খুব অনাবৃষ্টিসহ। ইহা ছাড়া কুলথি (Dolchos Biflorus), উরিদ (Phaseolus Mungol) এবং মুগ (Phaseolus Radiatus) প্রভৃতি কলাই চাষ করিয়া বিহারী চাষীরা তাহাদের অসময়ের খাদ্য সংগ্রহ করে। এই সকল কলাইয়ের দাইল, ছাতু ও রুটী তৈয়ারি করে।

বিহার অঞ্চলে খাল, বিল ও ঝিলের ধারে তেনী নামক এক প্রকার জঙ্গলী ধান জন্মায়। ইহার চাউল খুব লঘু পাক।

সয়বীন (Soy bean) ও মউ আলু তাহাদের অনেক সময় আহারের সম্বল। সয়বীন এক জাতীয় সীমের দানা। ইহার খৈ হয়। মউ আলু (Sweet Potato, Batatus Edulis) তাহারা সিদ্ধ করিয়া খায়। ইহার ময়দায় রুটীও হয়। দুর্ভিক্ষ সময়ে বিহারী চাষীরা আম আঁটির শাঁস গুঁড়াইয়া রুটী প্রস্তুত করে এবং কুসুম ফুলের বীজ ভাজিয়া খায়। অশ্বত্থ, বট, পাকুড়ের (Ficus Religeosa, Bengalensis, Infectoria and Golmerata) ফলও তাহাদের অখাদ্য নহে এবং মহুয়া (Bassia Latefolia) তাহাদের অসময়ের প্রধান সহায় ও একটি প্রধান খাদ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার ফুল সিদ্ধ করিয়া বা শুষ্ক করিয়া ভাজিয়া খায় বা গুঁড়াইয়া ছাতু করিয়া যবের ময়দার সহিত মিশাইয়া থাকে। মকাই কিম্বা যবের গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া ইহার লাড়ু ও তৈয়ারি হয়। ইহা হইতে দেশীমদ হয়, ইহার ফলে তৈল হয়। তৈল প্রায় ঘৃতের মত, ঘৃতের পরিবর্ত্তে বা ঘৃতে মিশাইয়া ইহা ব্যবহার করা হয়। বস্তুতঃ মহুয়া বিহারের একটি মূল্যবান সম্পত্তি।

প্রদর্শনীক্ষেত্রে এই সকল খাদ্যশস্য প্রদর্শিত হওয়ায় প্রদর্শনীটি বাস্তবিক শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল।

সিমলা প্রদর্শনী।—সিমলা পাহাড়ে প্রতি বৎসরই পুষ্প প্রদর্শনী হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বৎসরে তথায় এই সঙ্গে হাঁস মুরগী প্রভৃতি আহার্য্য পক্ষী ও মধুমক্ষিকা প্রদর্শন করা হইয়াছিল। সিমলায় অনেকের আহার্য্য পক্ষীর ব্যবসা আছে এবং তথায় একটি মৌমাছি পালন সমিতি আছে। এইরূপ প্রদর্শনীতে উক্ত সমিতির ও পক্ষী ব্যবসায়ীগণের উৎসাহ প্রদান করা হইবে।

নিম্নবঙ্গে অনেকের পক্ষীর ব্যবসা আছে বটে, কিন্তু কোথাও মৌমাছির চাষ আছে বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। কৃষকের পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ এতদঞ্চলের মৌমাছি চাষের কোন খবর দেন, তবে সাধারণের উপকার হয়। মৌমাছি রক্ষা কার্য্যে ব্রতী এমন লোকের নিকট হইতে এই সম্বন্ধে বিধি ব্যবস্থা ও রক্ষা প্রণালীর সঠিক খবর পাইবার আশা করা যায়।

পত্রাদি।

কফি চাষ।

শ্রীযুক্ত কনকচন্দ্র দাস, নওগাঁ, আসাম।

কফি চাষ, কি প্রকারে কফি খাদ্যোপযোগী করা যায়, জানিতে চান।

[আমরা তাঁহাকে Coffee Planter's manual by J. Ferguson এই পুস্তক খানি পাঠ করিতে পরামর্শ দিই। পুস্তক খানির দাম বোধ হয় ৪৲ টাকার অধিক হইবে না।] কৃঃ সঃ।

বীজ হইতে কাঁটাল চারা।

মাহালছড়ি চট্টগ্রাম হইতে কোন পত্র প্রেরক লিখিতেছেন।

কাঁটালের যখন কলম হয় না, তখন কাজেই বীজ রোপণ করিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বীজ রোপণ করিলেও সেই চারায় পূর্ব্বতন গাছের কাঁটা-লের ন্যায় কাঁটাল না হইয়া অন্য প্রকার হয়। প্রায়ই কোন কোন চারা পূর্ব্বতন গাছের ন্যায় হয় বটে, কিন্তু সমস্ত চারা তদ্রূপ হয় না। অতএব আপনি যদি এমন কোনও উপায় জানেন যে, প্রত্যেক বীজ রোপণ করিলে ঠিক পূর্ব্বতন গাছের ন্যায় হইবে, এইপ্রকার উপায় থাকিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিবেন।

কোন কোন জাতীয় কাঁ াল অতিউৎকৃষ্ট এবং সেই জাতীয় গাছও আছে, কাঁটালও ধরে, কিন্তু পাকিবার সময় হইলেই পচিয়া যায়। তাহার উপায় কি?

আবার কোন গাছ অতি বৃহৎ হইয়াও ফল একেবারেই ধরে না, ধরিলেও ছোট থাকিতে পচিয়া যায়, তাহার উপায় কি?

[বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হইলে নানা কারণে তাহার ফল মাতৃ-গাছের ন্যায় হয় না, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে খারাপ না হইয়া ভাল হইতে দেখা যায়। মাটির গুণে নেয়ো কাঁটালের বীজ হইতে খাজা কাঁটাল উৎপন্ন হইয়া থাকে; মক্ষিকা প্রভৃতির দ্বারা ফুল রেণুর সাঙ্কর্য্যে ভাল হইতে খারাপ, খারাপ হইতে ভাল, কখন বা ঠিক কাঁটাল জন্মায়। কোন একটি গাছের বীজ হইতে মাতৃগাছের মত সঠিক ফল উৎপাদন করিতে হইলে মাতৃগাছটি পুষ্পিত হইবার সময় হইতে বীজ তৈয়ারি পর্য্যন্ত কাপড় দ্বারা ঘিরিয়া রাখা কর্ত্তব্য। আমরা আজ কয়েক বৎসর মাতৃগাছের মত সঠিক কাঁটাল উৎপাদনের নিমিত্ত কাঁটাল গাছের কলম করিতে আরম্ভ করিয়াছি। নির্দ্দিষ্ট ফল দেখিতে পাইলে সাধারণকে তাহা জানাইব।

বোধ হয় পোকাদ্বারা আক্রান্ত হইয়া কাঁটাল ঝরিয়া পড়িতেছে, হয় গাছের কাণ্ডে অথবা ফলের বোঁটার কাছে পোকা আছে। গাছে কিম্বা ফলে পোকা লাগিয়াছে কিনা অনুসন্ধান করিবেন।

যদি গাছ বড় হইয়া থাকে এবং তাহা যদি খুব তেজস্কর হয় অথচ তাহাতে ফল ধরিতেছে না, তবে সে গাছের ডাল এবং শিকড় ছাঁটা আবশ্যক। হাড়ের গুঁড়া ও সোরা প্রয়োগে বৃক্ষের ফল প্রসবের সহায়তা করে।] কৃঃ সঃ।

লাক্ষা।

ডাক্তার শ্রীঅনিলচন্দ্র সেন।
লহর জান চাবাগান, গোলাঘাট।

প্রিয় মহাশয়—

বৈশাখের কৃষক পত্রিকায় দেখিতে পাইলাম; লাক্ষা ১০০৲ টাকা দরে মণ বিক্রি হইতেছে। আপনারা অন্যান্য কারবার করেন সুতরাং এই

কারবার করিতে ইচ্ছুক হইবেন, এমত আশা করিয়া লিখিতেছি, যে, যদি নিজেরাই এই কারবার করেন, তবেত ভালই ; নতুবা কমিশন নিয়া অন্য কোন কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিলে চিরবাধিত হইব।

[কলিকাতা টমাস সাহেবের হাটে গালার খরিদ বিক্রয় যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে। কলিকাতার মেঃ হাওয়ার্থ এবং কোম্পানি তাহার এক প্রধান দালাল। আপনি সবিশেষ খবর তাঁহাদের নিকট পাইতে পারেন। আপনার গালার কারখানা আছে কিনা, যদি থাকে, তবে বৎসরে কত গালা সরবরাহ করিতে পারেন জানিতে পারিলে তাঁহাদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। গালার দর যে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। কাষ্ঠাদির আসবাব পালিশের জন্য গালার ব্যবহার যথেষ্ট। পূর্ব্বে আট আনায় ১ বোতল পালিশ মিলিত, এখন এক বোতল পালিশের দাম ১।০ বা ১॥০ টাকা। লাভের কারবার হইলেই যে আমাদিগকে করিতে হইবে ইহা সম্ভব বা যুক্তিযুক্ত নহে আপনার পক্ষে সুবিধা জনক হইলে আপনি করিতে পারেন।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম শস্য-সংবাদ।—বিগত ৬ই আষাঢ় যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের জলবায়ু ও শস্য সংবাদ এইরূপ :—

মালদহ, লুসাই পার্ব্বত্য-প্রদেশ এবং চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে যথোপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়াছে ; তদ্ভিন্ন, অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি পড়িয়াছে। ধুবড়ীতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। এই স্থানে, বৃষ্টির জল ২০ ইঞ্চি পরিমিত হইয়াছিল। ক্ষেত্রস্থ ফসলের অবস্থা প্রায় সর্ব্বত্রই আশাপ্রদ, আশু ধান্য বেশ জন্মিয়াছে। মালদহ, কামরূপ এবং দারং প্রভৃতি স্থানে আশু ধান্যের চাষ ও বীজ বপন দ্রুত চলিতেছে। পাবনা, গোয়ালপাড়া, কামরূপ এবং গারোহিলে আশু ধান্য কর্ত্তন আরম্ভ করা হইয়াছে। ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, শ্রীহট্ট, কাছার এবং নাগা পাহাড়ে রোয়া (হৈমন্তিক ধান্য রোপণ) চলিতেছে। অতিবৃষ্টিতে জলপাইগুড়ীর ভাদুই ধানের ক্ষতি হইয়াছে। বাখরগঞ্জের ভাদুই শস্যের অবস্থা আশাপ্রদ। চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে রোয়ার জন্য জমি প্রস্তুত হইতেছে। রাজসাহী, বগুড়া প্রভৃতি নানাস্থানেই আশু ধান্য ও পাটের নিড়ানি চলিতেছে। শ্রীহট্ট ও জলপাইগুড়ীতে চার অবস্থা মোটের উপর মন্দ নহে। দারং ও লক্ষীপুর জেলার চার অবস্থা খুব ভাল। ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়াতে ও রৌদ্রের অভাববশতঃ জলপাইগুড়ীতে চা-পাতা বাড়িতেছে না ; চার জন্য রৌদ্র আবশ্যক। শ্রীহট্ট, দারং, নওগাঁ ও শিবসাগর জেলাতে পাতি তোলা (চা-পাতা তোলা) আরম্ভ করা হইয়াছে। খাসিয়া

ও জয়ন্তিয়াতে আলু তোলা চলিতেছে। এবার গোল আলুর ফলন বেশী হয় নাই। চাউলের মূল্য কিয়ৎ পরিমাণে বাড়িয়াছে। গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দারং, নওগাঁ, শিবসাগর এবং নাগাহিলে পশুপীড়া দেখা দিয়াছে। অতিরিক্ত বৃষ্টিতে দিনাজপুরের নালজমির (নিম্ন ভূমি) পাটের ক্ষতি হইয়াছে।

বঙ্গদেশের শস্য সংবাদ।—বিগত ১৩ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত শস্যের অবস্থা আশু ধানে ও পাটে আঁচড়া দিয়া ধান ও পাট পাতলা করিয়া দেওয়া হইয়া গিয়াছে। পাট ও আশু ধানের ক্ষেতের নিড়ানি প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য শেষ হইয়াছে বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই সুবৃষ্টি হইয়াছে এবং সকল স্থানেই আমন ধানের রোপণ কার্য্য সুশৃঙ্খলে চলিতেছে।

কোথাও কোথাও অতি বৃষ্টি এবং জল প্লাবন হেতু শস্য নষ্ট হইয়াছে, ইতিমধ্যে দুটী স্থান হইতে জলপ্লাবনের খবর আমরা পাইয়াছি।

কেন্দুয়া।—এ অঞ্চলে বর্ষার জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় ফসলের অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়াছে। ধান্য ও পাট জলমগ্ন হইয়াছে। কৃষকদিগের মধ্যে হাহাকারধ্বনি উঠিয়াছে।

টাঙ্গাইল।—অতি প্লাবনে এ জেলার সর্ব্বত্রই ধান ও পাট জলমগ্ন হইয়াছে। টাঙ্গাইল জামালপুর অঞ্চলে অধিকাংশ লোকের গৃহে জল উঠিয়াছে। নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের অবস্থাও শোচনীয়। ইতিমধ্যে সর্ব্বত্র চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। এ বৎসর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে, এরূপ আশঙ্কা হইয়াছে।

বাঁকীপুর-ক্ষেত্রে জোয়ার।—গবাদির খাদ্য শস্যের অভাব হওয়ায় এই ক্ষেত্রে ১৯০৮ সালে জোয়ার চাষের ব্যবস্থা করা হয়। কাঁচা জোয়ার গাছ সদ্য গবাদি পশুকে না খাওয়াইয়া তাহা সংরক্ষণ করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ইহার পাকা সাইলো (সংরক্ষণাধার) ১৯০৮ সালে প্রস্তুত হয়।

জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে বিঘা প্রতি ২০ সের হিসাবে ৩০ একর পরিমিত জোয়ার বীজ বপন করা হইয়াছিল। জোয়ার গাছগুলি ফুলিয়া যখন তাহাতে বীজ উৎপন্ন হইল এবং পুষ্ট হইয়া যখন তাহাতে দুধসঞ্চার হইল, তখন জোয়ার গাছ কাটা হইয়াছিল। ভাদ্র মাসে কর্ত্তন কার্য্য শেষ হয়, ঐ সময় ওজন করিয়া দেখা হইয়াছিল যে একর প্রতি ৪১।১ৄ কাঁচা জোয়ার গাছ জন্মিয়াছে।

অতঃপর জোয়ার গাছ কুচাইয়া সংরক্ষণাধারে রক্ষা করা হইয়াছিল। ৩,৭৫০ মণ কুচান জোয়ার আশ্বিন মাসে রক্ষিত হয়। ঐ বৎসর চৈত্র মাসে জোয়ারাধার প্রথম খোলা হয় এবং ঐ সংরক্ষিত জোয়ার হইতে পশুগণকে প্রত্যহ খাইতে দেওয়া হইত। প্রথমে কিছুদিন কাটা বিচালির সহিত মিশাইয়া পশুগণকে জোয়ার খাইতে দেওয়া হইত, কিন্তু পরে প্রত্যেক বলদকে প্রত্যহ দশ সের হিসাবে দিলে দুই বারে খাইতে দিয়া এবং তাহার সহিত অর্দ্ধ সের হিসাবে সরিষার খৈল দিয়া তাহাদের বলহানি হয় নাই, তাহারা ভাল রকম কর্ম্মক্ষমই ছিল।

রাসায়নিক বিশ্লেষণদ্বারা ঐ সংরক্ষিত জোয়ারে নিম্নলিখিত উপাদান গুলি বর্ত্তমান বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে :—

জলীয়াংশ	...	৬০·৮০।
আঁস (দুষ্পাচ্য)	...	১৫·৫০।
ঐ (সুপাচ্য)	...	১০·২০।
শ্বেতসার	...	·৬৪।
ছাই	...	৩·৫৯।
এসেটিক অম্ল	...	১·৫৯।
ল্যাকটিক „	...	১·৮০।
ক্লোরোফিল	...	৫·৮৮।
চিনি প্রভৃতি	...	বাকি *।
		১০০·০০

গ্রহণীয় নাইট্রোজেন ·০৪, সমগ্র নাইট্রোজেন ·২৪। এই রক্ষিত ঘাসে অধিক মাত্রায় চিনি বিদ্যমান থাকায় ইহাতে অম্লগন্ধ সমধিক পরিমাণে ছিল, এবং অম্লরসও অধিক মাত্রায় ছিল, জলীয়াংশের মাত্রাও অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক।

ইহা খুব সাগ্রহে গবাদিতে খাইতেছে। যেখানে ধান চাষ কম হয় সেখানের জন্য জোয়ার চাষে বিলক্ষণ লাভ আছে। বাঁকীপুরে ক্ষেত্রে বীজের জন্য অনেক পরিমাণ জোয়ার চাষ হইয়াছিল। একর প্রতি ১২৷৷০ মণ জোয়ার বীজ উৎপন্ন হইয়াছে।

বর্দ্ধমানক্ষেত্রে পাট চাষে সার।—কয়েক বৎসর হইতে উক্ত কৃষিক্ষেত্রে পাট চাষে সারের পরীক্ষা হইতেছে। পরীক্ষার ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

সার		উৎপন্ন শস্য মণ (৮০ পাঃ) একর প্রতি।				
		১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭	১৯০৮
১। গোময় ৭০ মণ	...	২৪$\frac{৩}{৪}$	২২$\frac{১}{২}$	২৩$\frac{১}{২}$	২৪	২৩
২। রেড়ীর খৈল ৭৷৷০ মণ	...	২০$\frac{১}{২}$	১৯$\frac{৫}{৮}$	২৩$\frac{১}{৪}$	২৩$\frac{৩}{৪}$	২৩$\frac{১}{২}$
৩। হাড়ের গুঁড়া ১১$\frac{১}{৪}$	...	১৩$\frac{১}{২}$	১৯$\frac{৩}{৪}$	১৯$\frac{১}{২}$	২০	১৯
৪। { হাড়ের গুঁড়া ৫$\frac{৩}{৪}$ সোরা ২ }	...	২০	১৯$\frac{৭}{৮}$	২০	২১$\frac{৩}{৪}$	২১$\frac{১}{৪}$
৫। বিনা সারে	...	১৫$\frac{৩}{৮}$	১৯$\frac{১}{৪}$	১৯$\frac{১}{২}$	১৯$\frac{১}{২}$	১৮$\frac{১}{২}$

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গোময়ই পাটের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার, কিন্তু গোময়ের সহিত হাড়ের গুঁড়া ও সোরা মিশাইয়া পাটের জন্য একটি মিশ্র সার ব্যবহার করিয়া কিরূপ ফল দাঁড়ায়, তাহা পরীক্ষা করা উচিত এবং ভবিষ্যতে সেই পরীক্ষাই করা হইবে, তবে গোময় সার যে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা হইবে, তাহাতে আর ভুল নাই! কিন্তু গোময়ও সর্ব্বত্র সহজপ্রাপ্য নহে।

ডুমরাও ক্ষেত্রে আখ।—পুনায় ১০ ফিট ×১০ ফিট এক চৌকা রচনা করিয়া, তাহাতে আখ বসান হয়। ইহার মধ্যে চারিটি জলনালি ও চারিটি আইল (ridges) বাঁধা থাকে, আইল গুলিতেই ইক্ষু রোপিত হয়। এই চৌকা গুলির চারিদিকেও জলপ্রণালী থাকে, সেই গুলির সহিত অন্য চৌকার যোগ আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে সমস্ত আখগুলিতে চারিদিক হইতে জল পায়, সুতরাং

এই প্রথা স্থানীয় ইক্ষু রোপণের প্রথা অপেক্ষা ভাল।

ডুমরাও স্থানীয় মুঙ্গো ইক্ষু অপেক্ষা খড়ি ইক্ষু তথায় ভালরূপ জন্মায়। খড়ি ইক্ষু শক্ত বলিয়া তাহার ক্ষেতে শিয়াল ও শুয়ারের উপদ্রব কম হয় এবং ইহা হইতে অধিক গুড় জন্মায়।

ইক্ষুক্ষেত্রে একর প্রতি ১৫০ পাঃ হিসাবে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করিতে হইলে ২০০ মণ গোময় সার এবং ৮ মণ রেড়ীর খৈল কিম্বা কেবল মাত্র ৩০০ মণ গোময় সার দেওয়া কর্ত্তব্য।

বর্দ্ধমানক্ষেত্রে আলু চাষ।—এই ক্ষেত্রে পাটের সহিত আলুর পালটি চাষে এক জমি হইতে একর প্রতি ২০।২৫ মণ পাট এবং সেই বৎসরেই ২০০ মণ আলু উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত আলু পরীক্ষাতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি অনুধাবন করা আবশ্যক ;—

(১) শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে প্রতি বৎসরেই আলু বীজ আমদানী করা ভাল। নৈনিতাল, পাটনা ও দার্জ্জিলিং জাতীয় আলু চাষে লাভ আছে। ইটালিয়ান আলু বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে চাষ হইতেছে, তাহারও পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

(২) বীজের জন্য খুব ছোট আলু ব্যবহার করিতে নাই,—বড় বড় মুরগীর ডিম্বাকার আলু ব্যবহারই উত্তম পরামর্শ।

(৩) যদি বীজ আলু নিতান্ত দুর্ম্মূল্য হয়, তবে আলু কাটিয়া চাষ করিতে হইবে, কিন্তু যেন প্রত্যেক কর্ত্তিত খণ্ডে দুইটি করিয়া চোখ থাকে। খণ্ডিত আলুগুলির কর্ত্তিতাংশে রোগাক্রমণ নিবারণ জন্য চূর্ণের লেপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

(৪) * আলুর জমিতে ১০ বার লাঙ্গল ও ৫ বার মই দিয়া ১৮ ইঞ্চ নালি কাটিয়া প্রত্যেক নালিতে ১২ ইঞ্চ অন্তর আলু বসাইতে হইবে। প্রত্যেক নালিতে প্রথমে গোময় সার, তাহার উপর খৈল প্রভৃতি সার ছড়াইয়া, তদুপরি আলু বসাইতে হইবে।

(৫) নিম্নলিখিত কয়েকপ্রকার সারের মধ্যে যে কোন সার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

একর প্রতি

১। ২২½ মণ রেড়ীর খৈল।
২। ২৪ ,, সরিষার খৈল।
৩। ২৪০ ,, যত্ন রক্ষিত গোময় সার।
৪। { ২০০ মণ গোবর
৩ ,, সুপার ফস্ফেট
২ ,, সোরা

১৯০৮-০৯ সালে ২০ মণ রেড়ীর খৈল ব্যবহার করিয়া এক জমি হইতে ২৬ মণ পাট প্রাপ্তির পর ১৫৭½ মণ আলু উৎপন্ন হইয়াছিল।

[আমরা আউশ ধানের জমিতে ধান উঠাইয়া লইয়া একর প্রতি ৩০ মণ হিসাবে রেড়ীর খৈল ব্যবহার করিয়া ২৭০ মণ হিসাবে পাটনা আলু উৎপন্ন করিতে পারিয়াছি। কালনা (বর্দ্ধমান) হইতে কোন পত্র প্রেরক লিখিয়াছিলেন, তিনি আলুর জমিতে এক একরে ৭০।৭৫ মণ সরিষার খৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং ৩৫০।৪০০ মণ আলু উৎপন্ন করিতে পারেন। তিনি পাটনা আলুরই চাষ করিয়া থাকেন।] কৃঃ সঃ।

---

* আমরা পাটনা ও দার্জ্জিলিং আলু ২০।২২ ইঞ্চ অন্তর আলিতে এবং ৯ ইঞ্চ আলু বসাইয়া অপেক্ষাকৃত অধিক আলু পাইয়াছি।

সার-সংগ্রহ।

সংক্রামক পীড়ায় সাবধানতা।*

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের কৃষি-বিভাগ হইতে প্রকাশিত গবাদির পীড়া সম্বন্ধীয় ২ নং পত্রিকা।

* সংক্রামক পীড়া যাহাতে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে তাহার উপায়।

১। হাট বাজার কি মেলা হইতে গরু মহিষ কিনিয়া আনিলে কি করা কর্ত্তব্য।—হাট বাজার বা মেলায় নানা জায়গা হইতে গরু মহিষ ইত্যাদি বিক্রয় জন্য আসিয়া থাকে এবং যদিও অধিকাংশ ভাল জায়গা হইতেই আসে, তথাপি যেখানে সংক্রামক পীড়াতে গরু বাছুর মরিতেছে তেমন জায়গা হইতেও যে কতকগুলি না আসে তাহা নহে। তাহাতে ফল এই হয় যে, ভাল মন্দ সকল জায়গা হইতেই আসিয়া একত্র মিশামিশি করাতে, তন্মধ্যে সুস্থ গরু মহিষের শরীরেও সংক্রামক রোগের বিষ প্রবেশ করিতে পারে, এবং কোনও কোনও স্থলে এমনও দেখা যায় যে, ঐরূপ হাট বাজার হইতে গরু কি মহিষ কিনিয়া আনিলে খরিদ্দারের গ্রামে গরু বাছুরের কোনও সংক্রামক পীড়া না থাকা স্বত্বেও দিন কয়েকের মধ্যেই উক্ত নূতন গরু কি মহিষ সংক্রামক পীড়া হইয়া মারা যায় এবং তাহাতে সমস্ত গ্রামময় ঐ পীড়া ছড়াইয়া পড়ে। অতএব যদি হাট বাজার কি মেলা হইতে কোনও গরু মহিষ কিনিয়া আনা হয়, অথবা কোনও গরু মহিষ যদি ঐরূপ জায়গাতে বিক্রয় জন্য গিয়া আবার ফিরিয়া আসে, তবে সেই গুলিকে ৩০ দিন পর্য্যন্ত আলাদা করিয়া বাঁধিয়া রাখা উচিত, গ্রামের অন্য গরু মহিষ যেখানে চরে কি জল খায়, সেখানে ঐ গুলিকে যাইতে দেওয়া কি অন্যান্য গরু বাছুরের সঙ্গে মিশিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এই ৩০ দিনের ভিতরে ঐ গুলির মধ্যে কোনটির কোনও রূপ পীড়ার লক্ষণ দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ ঐটিকে অন্যান্য সমস্ত গরু মহিষ হইতে একেবারে আলাদা করিয়া রাখা উচিত।

২। কোনও গ্রামে গরু মহিষের সংক্রামক পীড়া দেখা দিলে কি করা কর্ত্তব্য।—এইরূপ পীড়া হওয়া মাত্রই পীড়িত গুলিকে সুস্থ গরু বাছুরের নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া পৃথক জায়গায় রাখিবে, এবং প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যাবেলা সুস্থ গরু বাছুরগুলিকে ভালরূপ লক্ষ্য করিয়া দেখিবে ও তন্মধ্যে কোনটি যদি নিস্তেজ দেখায় কি রীতিমত ঘাস না খায়, তবে ঐটিকে অন্য-গুলির নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া পৃথক রাখিবে।

গরু মহিষের সংক্রামক পীড়ার বিষ বড়ই ভয়ানক জিনিষ, ঐরূপ রোগে পীড়িত হইয়া কোনও জন্তু যেখানে থাকে তথাকার মাটী পর্য্যন্ত ঐ বিষে দূষিত হইয়া উঠে. এবং মানুষ, কুকুর ইত্যাদি ঐরূপ জায়গার উপর দিয়া হাঁটিয়া গেলে তাহাদের পায়ের মাটির সহিত ঐরূপ পীড়ার বিষ এক স্থান হইতে অন্যত্র ছড়াইয়া পড়িতে পারে, এবং ভাল গরু মহিষের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে; অতএব পীড়িত গরু মহিষকে কেবল পৃথক করিয়াই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে। যেখানে পীড়িত জন্তুকে পৃথক করিয়া রাখা হয় তাহার চারিদিকে এমন ভাবে বেড়া দিবে, যেন পীড়িত জন্তু কোনও মতেই তাহার বাঁহিরে যাইতে না

পারে এবং যাহারা ঐগুলিকে সেবা শুশ্রূষা করে পীড়া বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ঐ জায়গার বাহিরে যাইতে দেওয়া কি অন্যান্য গরু বাছুরের নিকট যাইতে দেওয়া উচিত নহে। তাহাদের ও পীড়িত গরু মহিষের খাইবার জিনিষ ও জল অন্য লোক আনিয়া দেওয়া উচিত এবং এই বেড়ার ভিতর হইতে ঘাস, জল, কাপড়-চোপড় কি বিছানা-পত্র ইত্যাদি সরাইয়া লইয়া অন্যত্র যাওয়া উচিত নহে।

৩। সংক্রামক পীড়ার বিষ নষ্ট করিবার উপায়।—পীড়া বর্ত্তমান থাকা কালে পীড়িত গরু মহিষকে আলাদা করিয়া পৃথক জায়গায় কি ভাবে রাখিতে হইবে তাহা উপরে লিখা হইয়াছে। তখন ঐগুলিকে যে সব খড় কুটার উপর শুইতে দেওয়া হয় পীড়া শেষ হইলে তাহা ঐ জায়গার সীমার ভিতরেই পুড়াইয়া ফেলিবে এবং তাহার মধ্যেই ঐগুলির গোবর, চোনা, মুখের লালা প্রভৃতি অন্যূন ৪ হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহাতে পুতিয়া ফেলিবে এবং পারিলে তাহার উপর কিয়ৎ পরিমাণ কলিচুণ চাপা দিয়া গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিবে। যে ঘরে পীড়িত গরু মহিষ রাখা হইয়াছিল তাহার বেড়াও খোঁটা খুব গরম জলে চুণ মিশাইয়া তাহা দ্বারা ধুইয়া দিবে এবং ঐ ঘরের ভিটা মাটির হইলে ঐ মাটি উঠাইয়া লইয়া অন্যত্র পুতিয়া ফেলিবে, কিন্তু পাকা ভিটা হইলে কেবল খুব গরম জলে ভালরূপ ধুইয়া দিয়া তাহাতে গুঁড়া চুণ বেশ করিয়া ছড়াইয়া দিবে। অনেক সময়ে মাছিতে পীড়িত গরু মহিষের শরীর হইতে রোগের বিষ লইয়া আসিয়া ভাল গরু মহিষের গায়ে বসে তাহাতে ঐগুলিরও উক্ত পীড়া হইতে পারে। অতএব পীড়িত গরু মহিষের নিকটে ধুঁয়া জ্বালাইয়া রাখিলে গায়ে মাছি বসিয়া ঐ গুলিকে বিরক্ত করিতেও পারে না অথচ পীড়ার বিষও ছড়াইয়া দিতে পারে না।

৪। পীড়িত গরু মহিষের শুশ্রূষা।—পীড়িত গরু মহিষকে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, কোনও রূপে ঠাণ্ডা লাগিতে দিবে না ও কেবল ভাতের মাড় কি মাড়ে ভাতে অথবা নরম কচি ঘাস খাইতে দিবে, এবং আবশ্যক মতে খাইবার জন্য পরিস্কার টাট্‌কা জল নিকটে রাখিয়া দিবে। আরোগ্য হইলে পরও ৩০ দিন পর্য্যন্ত এইগুলিকে পৃথক রাখিবে এবং অন্য গরু বাছুরের সঙ্গে মিশাইবার পূর্ব্বে নিম পাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জলে এইগুলিকে ভালরূপ ধোয়াইয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে।

৫। মৃত গরু মহিষের সৎকারের ব্যবস্থা।—কোনও সংক্রামক পীড়াতে গরু কি মহিষ মারা গেলে তাহার মৃত দেহ পোড়াইয়া ফেলিবে, অথবা তাহার গোবর, চোনা ইত্যাদি এবং তাহা যে মাটিতে পড়ে তৎসমস্ত উঠাইয়া লইবে এবং এক জায়গায় গভীর গর্ত্ত করিয়া মৃতদেহের সহিত তাহা পুতিয়া ফেলিবে। ঐ গরু কি মহিষের চামড়া উঠাইয়া লইতে দিবে না কারণ চামড়ার সহিতও সংক্রামক রোগের বিষ ছড়াইয়া পড়িতে পারে।

৬। নিকটে গরু মহিষের কোনও সংক্রামক পীড়া দেখা দিলেই তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী থানাতে অথবা জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট সংবাদ দিবে, তাহা হইলে সরকার হইতে পশুচিকিৎসক ডাক্তার সেখানে পাঠান হইবে, তিনি গিয়া সরকারী ব্যয়ে পীড়িত গরু মহিষের চিকিৎসা করিবেন এবং কি করিলে ভাল হইবে তৎসম্বন্ধে গ্রামের লোককে

উপদেশ দিয়া তাহাদের উপকার করিবেন। যদি ঐ পীড়া বসন্ত হয় তবে উক্ত ডাক্তার গ্রামের সুস্থ গরু মহিষকে টীকা দিবেন, তাহা হইলে সেই-গুলি আর বসন্ত রোগে মারা যাইবে না। টীকার উপকারিতা সম্বন্ধে গবাদির চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ৩ পত্রিকাতে বিস্তারিত ভাবে লেখা হইয়াছে।

মিথিলেটেড স্পিরিট।
(METHYLATED SPIRIT)

দুইটি দ্রব্যের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়। (১) সাধারণ সুরা ও (২) ১/৯ অংশ কাষ্ঠ সুরা। কিয়ৎদিন পূর্ব্বে স্বল্পমূল্যে সুরাসার (Spirits of wine) সরবরাহ করিতে হইলে কাষ্ঠ সুরাদ্বারা কার্য্য চালান হইত কিন্তু নীলবর্ণ এক প্রকার তৈলাক্ত দ্রব্যের ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কার হওয়ায় উহার প্রচলন ইউরোপ হইতে অপসারিত হইয়াছে। আলকাতরা হইতে এই তৈলাক্তদ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহা তরল পদার্থের সঙ্গে উত্তমরূপে মিশিতে পারে। এই নীল ও তৈলাক্ত দ্রব্য হইতে প্রস্তুত জিনিষের নাম Aniline colour। পরিশুদ্ধ মাইথেল সুরা ইহার সঙ্গে উত্তমরূপে মিশিয়া থাকে।

শুষ্ক ও বিশুদ্ধি করণ প্রক্রিয়ায় কাষ্ঠ হইতে এক প্রকার সুরা প্রস্তুত হয় তাহাকে কাষ্ঠ সুরা কহে। ইহার মধ্যে আলকাতরার জলীয় অংশ ও এসিটিক্ এসিড্ আছে। এই দ্রব্য দুইটির পৃথক করণোপায় নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—কাষ্ঠ সুরার সঙ্গে কিঞ্চিৎ চুণ মিশ্রিত করিতে হইবে এবং পরে বিশুদ্ধ করণের প্রক্রিয়ানুযায়ী কার্য্য করিলে এসিটিক্ এসিড্ ও স্পিরিট জলের উপর ভাসিতেছে, দেখিতে পাওয়া যাইবে। এক্ষণে এই স্পিরিট সহজ উপায়ে প্রাপ্ত হইতে অধিক আয়াসসাধ্য কার্য্যের আবশ্যক হইবে না। অবিশুদ্ধ স্পিরিটে কেবল এক প্রকার টক গন্ধ অনুভূত হয়, নতুবা আর সকলই স্পিরিট অব ওয়াইনের মত। সাধারণ স্পিরিট যাহা বাজারে বিক্রয় হয়, তাহার মধ্যে ২০ হইতে ৬০ ভাগ পর্য্যন্ত জলমিশ্রিত থাকে এবং অপরাপর দ্রব্য অতি স্বল্প পরিমাণেই থাকে ও তাহাতে কোন কার্য্যেরও ব্যাঘাত হয় না। মাইথেল সুরাসর প্রস্তুত হইতে পারে ঈদৃশ বৃক্ষ ভারতে দৃষ্ট হয় না। যদ্যপি কোন রাসায়নিক পণ্ডিত ইহার তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন তবে এই পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপে প্রেরণ করিলে ইহার অনুসন্ধিৎসুগণ বাধিত হইবে।

গালা প্রস্তুতের নূতন প্রণালী।

ভারত-গভর্ণমেণ্টের বনবিভাগের রাসায়নিক পণ্ডিত শ্রীযুত পুরাণ সিং লা হইতে গালা প্রস্তুত করিবার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এখনকার প্রচলিত প্রথাতে গালা প্রস্তুত করিতে অধিক সময় লাগে, ব্যয়ও অধিক হয় এবং অনেক গালা নষ্ট হয়। রজন বা শঙ্খবিষ না মিশাইলে গালার কার্য্য চলে না; বিশুদ্ধ গালা প্রায়ই পাওয়া যায় না। শ্রীযুত সিংহ যে প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাতে সকল জাতীয় "লা" হইতে অতি বিশুদ্ধ গালা অল্পব্যয়ে অল্প সময়ে প্রস্তুত করা যাইবে। ইহাতে গালা আদৌ নষ্ট হইবে না। বিশুদ্ধ গালার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ভারতের গালার ব্যবসায় আরও উন্নতি লাভ করিবে এবং এই নব-প্রবর্ত্তিত প্রথাটি ঐ উন্নতির বিশেষ সহায়তা করিবে।

কুসুম, পলাশ, শাল, বাবলা, বট প্রভৃতি কয়েক প্রকার বৃক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক জাতীয় কীট রজনের মত যে মল ত্যাগ করে, তাহাকেই "লা"

বলে। কোন্ প্রাকৃতিক বা রাসায়নিক নিয়মে ঐ সকল কীট হইতে লা প্রস্তুত হয় তাহার কারণ এখনও অনুসন্ধান বা আবিষ্কার হয় নাই। ঐরূপ অনুসন্ধান এবং আবিষ্কার ইউরোপ ও আমেরিকার উপকারে আসিতে পারে, কিন্তু ভারতের গালার ব্যবসায়ের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে বলিয়া বোধ হয় না। পাছে কৃত্রিম নীলের ন্যায় কৃত্রিম গালা আবিষ্কৃত হইয়া দরিদ্র ভারতবাসীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়, এই আশঙ্কায় ভারতের শিল্পীগণ বিচলিত হইয়াছেন। কৃত্রিম নীল এবং কর্পূর আসল নীল ও কর্পূরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ঐ জাতীয় (Synthetic) গালার সৃষ্টি এখনও হয় নাই, সেই কারণে ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজারে ইহার বড়ই আদর। কিছু দিন পূর্ব্বে উহারা রঙের জন্য গালা লইত কিন্তু যে অবধি আলকাতরা হইতে নানাবিধ রঙ্ প্রস্তুত হইতেছে, সেই অবধি গালার কারখানায় প্রস্তুত রঙ্ বিক্রয় বঙ্গে বন্ধ হইয়াছে।

আমাদের দেশে লার কাটি হইতে যে উপায়ে গালা প্রস্তুত করে, তাহাতে অত্যন্ত দেরী হয় এবং উহা হইতে কিয়ৎপরিমাণে গালাও নষ্ট হয় এবং ব্যয়ও অধিক হয়। এই সকল বিষয়ের উন্নতির জন্য এ পর্য্যন্ত নানারূপ চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। চেষ্টা নিষ্ফলের কারণ, বৈজ্ঞানিক হিসাবে গালা যে ঠিক কি পদার্থ, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। সাধারণতঃ এইরূপ বিশ্বাস যে, একজাতীয় কীটের মল, পলাশ, কুল প্রভৃতি বৃক্ষের অতি ছোট ছোট ডালে লাগিয়া লা হয়। প্রাকৃতিক কোন্ নিয়মে এখন লা-রূপে পরিণত হয়, তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। এ কারণ এই অভিজ্ঞতা শিল্পের পক্ষে তত সুবিধাকর না হইলেও ভারতের পক্ষে মঙ্গল বলিতে হইবে; কারণ, যে দিন গালার সকল তত্ত্ব পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের আয়ত্তাধীন হইবে, সম্ভবতঃ সেই দিনই তাঁহারা কৃত্রিম গালা আবিষ্কার করিয়া ভারতের গালার ব্যবসা নষ্ট করিবেন।

যে কাঠির গাত্রে লা লাগিয়া থাকে, প্রথমতঃ সেই কাঠিগুলি গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া আনে, কাঠির সহিত যে "লা" থাকে, তাহাকে "খারা লা" বলে। ঢেঁকি অথবা ঐ জাতীয় অপর কোন যন্ত্রের সাহায্যে খারা লা হইতে "বিউলি" (Seed-Lac) বাহির করে, তৎপরে ঐ সকল বিউলি জলে ভিজান হয়। যে সময় জলে ভিজে, সেই সময় রঙ্ বাহির করিবার জন্য অনবরত জল ঘোলা করিতে থাকে। জল যদি না ঘোলান হয়, তাহা হইলে গালার অবস্থা নিকৃষ্ট হয়। এই প্রথাটি সন্তোষজনক নয়, কারণ, ইহাতে অনেক সময় নষ্ট হয় ও গালাকে সম্পূর্ণভাবে রঙবিহীন করা যায় না এবং অনেক পরিমাণে গালা নষ্ট হয়। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে। কার্ব্বনেট অব সোডা, সোহাগা প্রভৃতি রাসায়নিক জিনিষ ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাতে গালা সম্পূর্ণভাবে রঙবিহীন হইলেও গালার রঞ্জনের মত আটাবিশিষ্ট উপাদান নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ঐ উপায় ত্যাগ করিতে হইল। তাহার পর, গালার রঙবিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাগুলিকে মোটা কাপড়ের নলের মধ্যে পূরিয়া অগ্নির উত্তাপে গলান হয়, এবং কলার খোলার উপর ঢালিয়া বিক্রয়োপযোগী গালা প্রস্তুত করা হয়। কোন কোন স্থানে টিন কিংবা তাম্রের যন্ত্রবিশেষের দ্বারা উত্তপ্তাবস্থাতেই রুটির মত বেলিয়া "চাঁচ গালা" তৈয়ারী করে। বঙ্গে ভাল মন্দ সকল রকম গালাই এই একই উপায়ে প্রস্তুত হয়।

কিন্তু যেরূপেই ধৌত করা হউক না কেন, কিছুতেই "লার" সমস্ত রঙ বাহির হয় না। সম্প্রতি এমন একটি উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে যাহাতে দীর্ঘকালব্যাপী কষ্টকর ধৌত কার্য্যের আর আবশ্যক হইবে না এবং যদি ঐ উপায়ে কার্য্য করা হয়, তাহা হইলে এদেশোৎপন্ন সকল লা হইতেই অল্প পরিশ্রমে অতি অল্পব্যয়ে অতি উৎকৃষ্ট রঙবিহীন ও মলহীন গালা প্রস্তুত হইবে। ইহাতে গালার ব্যবসায়ের অবস্থা আরও উন্নত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই নবাবিষ্কৃত উপায়টির বিস্তারিত বিবরণ শ্রীযুত পি, সিংহ "Note on the Manufacture of pure Shellac" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সিংহ মহাশয়

ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট মেময়ার নামক রসায়নবিষয়ক সাময়িক সন্দর্ভের প্রথম ভাগের দ্বিতীয় অংশে ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন। এই প্রথাটি বড়ই সহজ এবং আশানুরূপ ফলপ্রদ। মিথিলেটেড স্পিরিট দ্বারা লা গলান হয়। তাহাতে লার গালান অংশ সম্পূর্ণরূপে গলিয়া স্পিরিটের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এবং রঙের ভাগ নীচে পড়িয়া থিতাইতে থাকে। সকল শ্রেণীর লা এই প্রথাতে অতি শীঘ্রই উৎকৃষ্ট গালারূপে পরিণত হয়। ইহাতে যে সকল যন্ত্রাদির আবশ্যক হয়, উক্ত পুস্তকের নোটে তাহার প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। যদিও স্পিরিটের মূল্য অধিক, কিন্তু ঐ স্পিরিটের অধিকাংশ নষ্ট হয় না বারবার ব্যবহারে লাগান যাইতে পারে। ইহাতে লা ধৌতের আবশ্যক হয় না। গালা পরিষ্কৃত করিবার জন্য যে রজন মিশ্রিত করা হয়, তাহারও প্রয়োজন নাই, এবং লা হইতে প্রচলিত প্রথা অপেক্ষা অধিক গালা নির্গত করা যাইতে পারে। এই প্রথাতে মজুরি এবং অপরাপর ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম, এবং ইহাতে যে গালা প্রস্তুত হয়, বাজারে অপর সকল প্রকার গালা অপেক্ষা তাহার মূল্য অধিক হওয়াই সম্ভব।

গাভীর জল পান।—গাভীগণকে যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করিতে না দিলে, তাহাদের দুধও পর্য্যাপ্ত মাত্রায় হয় না। খৈল, ভুসি, কলাই প্রভৃতি খাদ্য যত শুষ্ক খাইতে দাও, তাহাতে তাহাদের দুগ্ধ গাঢ় হইতে পারে, তাহাদের শরীর পুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু প্রচুর জল খাইতে না পাইলে তাহাদের দুধের পরিমাণ বাড়িবে না। দুধে যে যে উপাদান আছে তাহার শতকরা ৮৭ ভাগ জল। অনেকে মনে করেন, যে গাভী বেশী জল খায়, তাহার দুধ পাতলা হয়। বস্তুতঃ অপেক্ষাকৃত কিছু পাতলা হয় বটে, কিন্তু তাহাতে দুধের গুণের কিছু ব্যতিক্রম হয় না, দুধের অন্যান্য উপাদনগুলি সমভাবেই থাকে। গাভীগণকে যতই অধিক জলপানে অভ্যস্ত করা যাইবে, ততই দুগ্ধ লাভ হইবে। কোন কোন গাভী স্বভাবতঃই বেশী জল পান করে। অনেক গাভীকে কিন্তু জল পান অভ্যাস করাইতে হয়। বিচালী, ভুসি দিয়া জাব মাখিয়া গামলায় প্রচুর জল দিতে হয় এবং গামলার তলায় বড় বড় খৈলের চাপ ফেলিয়া দিলে গাভীগণ খৈলের লোভে গামলার তলা পর্য্যন্ত মুখ প্রবেশ করাইয়া থাকে এবং এই রূপে প্রচুর সিক্ত খৈল ও খৈলজল পানে অভ্যস্ত হয়। দুগ্ধবতী গাভীকে জল পান করানই গোয়ালাদের একটী প্রধান কার্য্য। কিন্তু গাভীগণের পানের জল সুপরিষ্কৃত ও সুস্বাদু হওয়া কর্ত্তব্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকের ইহা জ্ঞান নাই—এই গাভীগণকে প্রায় খানা ডোবার পঙ্কিল ও অপরিষ্কৃত কটু জলে পরিতৃপ্ত হইতে হয়। আমাদের দেশে গবাদির রোগের ইহা একটা মূল কারণ। অবিশুদ্ধ জল পান করিলে গাভীর দুগ্ধও নিকৃষ্ট গুণসম্পন্ন হয় এবং সেই দুগ্ধ পানে বালক বালিকার স্বাস্থ্য নাশের সম্ভাবনা। মানুষের খাদ্য পানীয় যেমন বিচার বিবেচনা করিয়া নির্ব্বাচন করা উচিত, গবাদির পক্ষেও সেই নিয়ম অবলম্বন করা বিধেয়, নচেৎ পরোক্ষে আমাদেরই অমঙ্গল হয়।

শিল্পবৃত্তি।—ভারত গবর্ণমেণ্ট এবারে শ্রীমান্ হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়কে সরকারী শিল্প বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। এই যুবক পেন্সনপ্রাপ্ত ও খ্যাতনামা রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। বিগত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে যে বয়ন বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, তাহাতেই ইনি বয়ন বিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীমান্ হৃষীকেশ এই শিল্প বৃত্তির সহায়তায় বিলাতে গিয়া কলের তাঁতে বস্ত্র বয়ন, সূত্ররঞ্জন প্রভৃতি শিখিয়া আসিবেন। এই সরকারী শিল্প বৃত্তির পরিমাণ বার্ষিক ২২৫০ টাকা। শ্রীমান্ হৃষীকেশের উদ্যম সফল হউক ইহাই আমাদিগের কামনা।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

ভাদ্র—আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর

কৃষিক্ষেত্র। যে সকল জমিতে শীতকালের ফসল করিতে হইবে, তাহাতে এই মাসে গোময়াদি সার প্রয়োগ করিয়া চষিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

সার মিশ্রিত গামলা বা কাঠের বাক্সে কপিবীজ বপন করিয়া এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। মৃত্তিকার সমপরিমাণ পাতা সার মিশ্রিত করিতে পারিলে ভাল হয়। জলদি ফসলের জন্য ইতিপূর্ব্বেই চারা প্রস্তুত হওয়া উচিত। আর একটি কথা এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অধিক জমিতে চাষ করিতে গেলে বাক্সে বা গামলায় বীজ বপন করিয়া পোষায় না। উচ্চ জমিতে চারিদিকে আইল বাঁধিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বীজতলা আবশ্যক মত হোগলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কোন কোন সুনিপুণ চাষী খেঁতো বাঁশের মাচান করিয়া তাহার উপর "৬।৮" ইঞ্চি পুরু মাটি ছড়াইয়া বীজ বপন করে।

অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট বোমা বা বিচালি গুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা বীজ ক্ষেত্রে জল ছিটাইতে হয়।

আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে যাহাতে আলু বসাইবে তাহাতেও এই সময় উত্তমরূপ চাষ দিতে হইবে ও সার ছিটাইতে হইবে।

শীতকালের জন্য লাউ, কুমড়া বীজ এই সময় বসাইবে। লাউ, কুমড়া বীজ ৩।৪ দিন হুকার জলে ভিজাইয়া বপন করিলে বীজ গুলি পোকায় নষ্ট করিতে পারে না।

ওল ও মানকচু এই তুলিবার সময়। এই সময় তাহারা খাইবার উপযুক্ত হয়।

এই মাসের প্রথমেই, উত্তর-পশ্চিম, বেহার প্রভৃতি স্থানে কপির চারা ক্ষেতে বসান শেষ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালা প্রদেশে এই মাসের শেষে কার্য্য আরম্ভ হইবে। পাটনাই ফুলকপির চারা ক্ষেতে বসান এতদিন হইয়া যাওয়া উচিত।

সেলেরী (Celery), এসপারেগস (Asparagus) ও দুই এক জাতীয় টমাটোর (Tomato) চাষ এই সময় হওয়া উচিত।

লাউ, কুমড়া, শাঁকালু, বীট, পাটনাই শালগম ও গাজর, পালম, নটে প্রভৃতি নানাপ্রকার শাক সব্জী, শসা প্রভৃতি দেশী সব্জী তৈয়ার করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

মূলা, মটর প্রভৃতির জন্য জমিতে গোবর সার দিয়া ভাল করিয়া চষিয়া তৈয়ারি করিয়া রাখিতে হইবে।

ফলের বাগান।—লিচু, লেবু প্রভৃতি ফল গাছের যাহাদের গুল কলম করিতে হইবে তাহদের গুল কলম করা শেষ হইয়াছে, কিন্তু আম প্রভৃতির জোড়কলম বাঁধা এখনও চলিতেছে।

বীজ নারিকেল, হইতে চারা করিবার জন্য এই সময় মাটিতে বসাইতে হইবে।

যে সকল নারিকেল, গাছ হইতে পাকিয়া ও শুকাইয়া আপনি পড়ে, তাহাদিগকে গলন নারিকেল কহে। একটী শীতল স্থানে কাদা করিয়া তাহাতে গলন নারিকেল এক পাশে হেলাইয়া বোঁটার দিক উপরে রাখিয়া বসাইতে হয় ও আবশ্যক মত জল সিঞ্চন করিতে হয়।

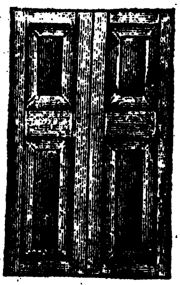
ফুলের বাগান।—বালসম্ (Balsam) জিনিয়া (Zinnia). কনভলভিউলাস মেজার (Convolvulus Major), আইপোমিয়া (Ipomœa) প্রভৃতি ফুল গাছ তৈয়ার করিবার এই সময়। কতকগুলি জাপানী লিলি আছে সেগুলি জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে বসান উচিত, কারণ সেগুলির বর্ষাতেই ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়। এই সময় প্যান্সী, এষ্টার, মিগোনেট বীজ প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বপন করা উচিত।

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

ভাদ্র, ১৩১৭।

সুলভে সেগুণ কাষ্ঠের ফার্ণিচার ও ইমারতি গড়ন প্রভৃতি।



আমরা মৌলমিন্ হইতে উৎকৃষ্ট সেগুণ কাষ্ঠ আমদানী করিয়া মফঃস্বলের গ্রাহকবর্গকে সর্ব্বপ্রকার আলমারী, টেবিল, চেয়ার, পানিল, খড়খড়ি, সার্সী প্রভৃতি অর্ডার মত প্রস্তুত করাইয়া অতি সামান্য মুনফা রাখিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। করোগেট আয়রণ, ষ্টীল জয়েষ্ট, টী আয়রণ, বোল্টনাট, বেড়ার কাঁটাওয়ালা তার প্রভৃতি এবং ফার্ণিচার ও ইমারতি গড়নের জন্য কল, কব্জা, ছিটকিনি, বল্ট, পরকলা, রঙ্গ প্রভৃতি আমাদিগের নিকট উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট অফিসার, মিউনিসিপালিটী ও অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আমাদিগের ফার্ম্ম হইতে সর্ব্বদাই দ্রব্যাদি লইয়া থাকেন। ঠিক জিনিষ উচিত মূল্য, প্রতারিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

বিস্তারিত বিবরণসহ জিনিষের লিষ্ট পাঠাইলে দর দিয়া থাকি: পত্র লিখিলে আমাদিগের সচিত্র ইংরাজী ক্যাটালগ (মূল্য নিরূপণ তালিকা) বিনা মূল্যে পাঠাইয়া থাকি: পরীক্ষা প্রার্থনীয়।—

এ, টী, দে এণ্ড কোং।

১৬২।১৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কিং এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

৮৩, হ্যারিসন রোড,

ব্রাঞ্চ—৪৫, ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের জন্য উপরোক্ত ঠিকানায় লিখুন।

আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা।

স্ত্রী পুরুষের রজঃ ও শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় দোষ ও তজ্জনিত ব্যাধিসমূহ নির্ম্মূল করণক্ষম এবং স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চারক। মূল্য ৩২ বটিকার কোটা এক টাকা মাত্র।

যিনি আমার নিম্নলিখিত ঠিকানায় আপনার নাম ধাম পাঠাইবেন, তাঁহাকে কলিকাতা পুলিশ কোর্টের মোকর্দ্দমা হইতে নির্ম্মুক্ত ও উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া পরিগণিত

কামশাস্ত্র

নামক একখানি উপযোগী পুস্তক বিনামূল্যে বিনা ডাকমাশুলে পাঠান যাইবে।

কবিরাজ শ্রীমনিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজুমদার এণ্ড কোং।

পেণ্টর্স ফটোগ্রাফার্স আর্টিষ্টস্ এণ্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

২২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আমাদের কারখানায় থিয়েটারের ষ্টেজ সম্বন্ধীয় সকল প্রকার সিন্ ড্রপসিন্ প্রভৃতি এবং সকল প্রকার অয়েল পেণ্টিং প্রতিমূর্ত্তি সুচারুরূপে অল্পমূল্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ রাজা, জমিদার প্রভৃতি মহোদয়গণের বাড়ীর কার্য্যই আমাদের প্রমাণ। সিনের মূল্য তালিকার জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন। আর সকল প্রকার দেশী বোম্বাই ছবি ও ফটো বাঁধাই এবং বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ম্যানেজার,

শ্রীবরদাপ্রসন্ন মজুমদার।

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



একাদশ খণ্ড,—৫ম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

ভাদ্র, ১৩১৭।

কলিকাতা: ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

সূচী পত্র।

ভাদ্র, ১৩১৭ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ খণ্ড। | ভাদ্র, ১৩১৭ সাল। | ৫ম সংখ্যা।

তামাক চাষ ও শিল্প।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত লিখিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বেঞ্চি কিম্বা টেবিলের উপর বসিয়া চুরুট প্রস্তুতকারী তাহার কাজ করিয়া থাকে এবং সেই নিমিত্ত তাহার কোন প্রকার ব্যয়বহুল যন্ত্র কিম্বা তদ্রূপ অন্য কোনও দ্রব্যের আবশ্যক হয় না। যন্ত্রের মধ্যে কেবল মাত্র একটী সুতীক্ষ্ণ ছুরি, এক বোতল গঁদ, একটা সামান্য ব্রুশ এবং এক খণ্ড চতুষ্কোণ সমতল কাঠ! এই কাষ্ঠখণ্ডের আবার একটা নামকরণ রহিয়াছে। ইংরাজিতে ইহাকে "কাটিং বোর্ড" অর্থাৎ কাট্যাধার কাষ্ঠফলক বলিয়া থাকে। এই কাষ্ঠফলকের উপর তামাকের পাতার নির্দোষ অর্দ্ধভাগ বিস্তৃত করিয়া সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা সাহায্যে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত চারি ধার ছাঁটিয়া বা কাটিয়া ফেলিয়া উহাকে চুরুটের মোড়ক আকারে প্রবর্ত্তিত করা হইয়া থাকে এবং অতঃপর অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট তামাকের পাতাগুলি দুই আঙ্গুলের চাপে ফেলিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে সুদীর্ঘ অণ্ডাকারে পরিণত করতঃ পূর্ব্ব বর্ণিত মোড়কের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া ব্রুশ সাহায্যে পাতায় গঁদ মাখাইয়া অত্যন্ত সুদৃঢ় ভাবে আঁটাল করিয়া লাগাইয়া দেওয়া হয়। পরে প্রস্তুত চুরুটের পানাগ্রভাগ টিপিয়া সূক্ষ্ম করে এবং অপর স্থূল বা ভোঁতা অংশ ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া সমতল করা হইয়া থাকে।

অধ্যবসায় ও অভ্যাস গুণে ইহাদের হস্তের অনুধাবন শক্তি এতদূর প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ওজনে কিম্বা আকারে একশত চুরুটের মধ্যে একটীরও ন্যূনাধিক্য উপলব্ধি হয় কিনা সন্দেহ। এই কার্য্যের নিমিত্ত বহুতর কলের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু কায়িক পরিশ্রম দ্বারা যে প্রকার সন্তোষজনক কাজ হইতেছে, তাহা অপেক্ষা যে কলে বড় একটা বিশেষ সুবিধাজনক ফল ফলিয়াছে, অথবা সাধারণের উপকার দর্শিয়াছে এমত বোধ হয় না।

ম্যানিলাতে ন্যূনাধিক পঞ্চবিংশতি সহস্র স্ত্রীলোক এই কার্য্যে নিযুক্তা রহিয়াছে। জাপান, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি অপরাপর স্থানেও এ কার্য্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক।

উপরিলিখিত উপায়ে চুরুট প্রস্তুত করা হইয়া গেলে পর, চুরুটের মোড়কের রঙের ধাত অনুসারে উহা বাছাই করা হইয়া থাকে এবং অতঃপর

বাছাই হইয়া গেলে ফিতা দ্বারা চুরুটগুলি বাণ্ডিল বাঁধিয়া সিডার বা তদনুরূপ অন্য কোন পাতলা কাষ্ঠের বাক্সে ভরিয়া বাক্স বন্ধ করতঃ টিকিট মারিয়া "হট চেম্বার" অর্থাৎ শুষ্ক করিবার কক্ষ মধ্যে ফেলিয়া রাখা হয়। যত দিন পর্য্যন্ত ভালরূপ শুষ্ক হইয়া ধূম্রপানের উপযুক্ত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ণিত শুষ্ক কক্ষ হইতে চুরুট গুলিকে আর স্থানান্তরিত করা হয় না।

কোন কোন প্রকার তামাক সাধারণ শুষ্ক বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে কিয়ৎক্ষণ ধরিতে পারিলেই আপনা হইতে অতি সহজে বিশুষ্ক হইয়া পানোপযোগী হয়, কিন্তু অপরাপর চুরুটগুলি কৃত্রিম উত্তাপ না পাইলে নষ্ট হইয়া যায়।

এ কার্য্যের নির্দ্দিষ্ট সময় নিরূপণ করা বড় সহজ কথা নহে। কোন কোন প্রকার তামাক দুচার দিনেই বিশুষ্ক হইয়া উঠে বটে, কিন্তু অপরাপর গুলি শুষ্ক করিতে মাসের পর মাসও চলিয়া যায়।

তামাক পাতা হইতে আর একটী দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহার নাম নস্য। নস্য প্রস্তুত করিবার জন্য স্কটল্যাণ্ড ও অপরাপর স্থানে সুবৃহৎ কলকারখানা রহিয়াছে। তথায় একটী কারখানাতে প্রতি সপ্তাহে সাত হাজার কি ততোধিক পাউণ্ড নস্য প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল কারখানাতে দৈনিক অন্ততঃ ত্রিশ পাউণ্ড নস্য যে গুঁড়া হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানাতেও সুবৃহৎ লৌহপাত্র রহিয়াছে, এবং তাহাতে ভীমকায় উদুখলদণ্ড সংলগ্ন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তামাক পাতার শিরাংশগুলি অত্যন্ত মসৃণ গুঁড়াতে পরিণত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ভীমকায় দণ্ড ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে উত্থিত ও পতিত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে উহার গায়ে আঘাত করিতে থাকে। নস্য প্রস্তুত করিবার জন্য যে শির কিম্বা পাতা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেগুলিকে প্রথমতঃ হাতে কিম্বা কলে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া স্তূপ করা হয়, এবং পরিশেষে সেগুলিকে আর্দ্র করিয়া কাপড় দ্বারা আবৃত করতঃ "হট চেম্বার" অর্থাৎ শুষ্ক কক্ষে ফেলিয়া রাখিলে প্রায় সপ্তাহকাল তাহা তথায় তদবস্থায় থাকিবার পর উপরিবর্ণিত উপায়ে গুঁড়া করিবার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হইয়া উঠে।

তামাকের শির বা পাতা যত বেশী জলে ভিজান যাইবে, তাহার গুণ ততই খারাপ হইবে; কিন্তু চুরুট ইত্যাদি প্রস্তুত কার্য্যে ইহাতে অত্যন্ত সুবিধা হয় এবং ওজনেও পাতাগুলি অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাওয়া প্রযুক্ত কোন কোন কারখানার লোকেরা জিনিষ সস্তা দিবার জন্য অত্যন্ত অপকৃষ্ট তামাকের পাতা ব্যবহার করে। ইহাতে জলের অংশই অধিক এবং সেই নিমিত্ত তদ্দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যনিচয় অত্যন্ত কুৎসিৎ ও বিস্বাদ হইয়া থাকে। কেহ কেহবা ব্যয় সাফল্যের জন্য প্রস্তুত নস্যের সহিত শঙ্খের বা ঝিনুকের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া দেয় এবং কেহবা আগাছা, লতা, পাতা, গুল্ম শুষ্ক করিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পর তাহার দ্রব্যগুণ ও রস নষ্ট হইলে ঐ গুলি সমুদয় সংগ্রহ করিয়া গুঁড়া করিয়া নস্যের সহিত মিশ্রিত করে। সুতরাং ক্রেতাগণকে বাজে মার্কা নস্য ব্যবহার যাহাতে না করিতে হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ছাগ।

শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত।
(গোবিন্দপুর কৃষিক্ষেত্র।)

ছাগ, মেষ কিম্বা খাদ্যার্থ পক্ষী পালন কৃষির একটি প্রধান অঙ্গ। আমাদের দেশে চাষীমাত্রেই ছাগ মেষাদি পালন করে না, স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের লোক ব্যবসায়ের জন্য ছাগ মেষ পালন করিয়া থাকে। কৃষিকর্ম্মে নিয়োজিত পশুগণের মধ্যে ছাগ মেষাদির স্থান হইলেও চাষের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় হিসাবে ইহাদের পালন করায় বিশেষ লাভ আছে। যাহাদের বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র আছে, তাহাদের ক্ষেত্রজাত তৃণশস্য এত অপচয় হয় যে, তদ্দ্বারা এবং যৎসামান্য অতিরিক্ত ব্যয়ে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাগাদি পালিত হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের দেশের চাষীরা অধিক মূলধন লইয়া চাষাবাদে প্রবৃত্ত হয় না এবং অনেকেরই বিস্তৃত ক্ষেত্র নাই— তাহাদের টাকা, তাহাদের জমি চাষের জন্যই কুলাইয়া উঠে না—সেই কারণে তাহারা আর অন্য কোন দিকে মন দিতে পারে না। এই সকল পশু প্রতিপালনে যে লাভ অতি বিস্তর তাহা তাহারা জানিয়া শুনিয়াও বোকা হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশে ছাগমাংস দ্বারা মানুষের খাদ্য সংস্থান জন্য ছাগ ও ছাগী পালিত হয়। হিন্দুরা ছাগ মাংস এবং মুসলমানেরা ছাগ ও ছাগী উভয়ের মাংস সুষ্ঠু আহার বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ছাগী অপেক্ষা ছাগ মাংস অধিক সুস্বাদু। আহারের জন্য ছাগী অপেক্ষা ছাগ হননই অধিকতর সমিচীন—কেননা ছাগী দ্বারা ছাগ বংশের অধিক বিস্তার হইয়া থাকে। অধিকন্তু ছাগীর দুগ্ধ একটা উপরি লাভ।

গোদুগ্ধের সহিত তুলনা করিলে ছাগী দুগ্ধ কম হিতকারী নহে, বরং তাহাতে দুই একটি গুণ অধিক আছে।

উভয় দুগ্ধের রাসায়নিক বিশ্লেষণ নিম্নে দেওয়া গেল।

গাভীদুগ্ধ।	ছাগীদুগ্ধ।	
৮৪·৭	৮২·৬	জল
৪·০	৪·৫	মাখন
৫·০	৪·৫	শর্করা
৩·৬	৯·০	পনীর ও শ্বেতসার

উহা গোদুগ্ধ অপেক্ষা ঘন, সুমিষ্ট, ইহাতে পনীরের ভাগ অধিক, কিন্তু ইহা হইতে সহজে পনীর উঠান যায় না। ছাগ দুগ্ধের আর একটা বিশেষত্ব এই যে ছাগীরা কটু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি নানাবিধ তৃণশস্য খাইলেও দুধে ঐ সমস্ত তৃণশস্যের স্বাদগন্ধ পাওয়া যায় না। গাভীগণ কিন্তু যদি রোসনা ঘাস বা কুচলে পাতা বা অন্য কোন অরুচিকর তৃণ পত্রাদি খায়, তবে তাহাদের দুধের গন্ধেও কটু, তিক্ত স্বাদে সে দুধ অপেয় হইয়া উঠে।

এক এক জাতীয় ছাগলের নিতান্ত কম দুধ হয় না—পাটনাই ছাগলের প্রায় প্রত্যহ ৵২৷৷৹ হইতে ৵৩ সের দুধ হয়। বঙ্গদেশীয় ছাগলের এক পোয়া কিম্বা দেড় পোয়া, বড় বেশী হয়ত অর্দ্ধ সের দুধের অধিক হয় না। কোন পরিচিত বন্ধু কিন্তু আমাকে জানাইয়া ছিলেন যে, তিনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, দোয়াঁসলা ছাগল—যাহার লোম ছোট ও দাড়ী ছোট তাহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুধ হয়।

ছাগীগণ প্রসবের পর হইতে পুনঃ প্রসবের সময় পর্য্যন্ত দুধ দেয়, কিন্তু প্রসবের সময় যত অগ্রসর হয়, ততই দুধ কমিয়া যায়। গর্ভ সঞ্চারের

সময় হইতে ইহাদের প্রসবকাল ২১ কিম্বা ২২ সপ্তাহ। প্রসবের সময়ে ইহাদিগকে অধিক আহার দেওয়া উচিত নহে বা গর্ভকালীন অধিক তেজস্কর খৈলাদি খাওয়ান নিষিদ্ধ।

কাঁচা ঘাসই ইহাদের প্রধান খাদ্য। তবে মাংস কিম্বা দুধের গুণ বৃদ্ধি করিতে হইলে ইহাদিগকে ছোলা, ভুষি, জৈ প্রভৃতি খাওয়ান উচিত। শীতকালে যখন কাঁচা ঘাস মেলে না, তখন ইহাদিগকে শুষ্ক ঘাস ও সুবিধা মত শালগম, গাজর, ম্যাঙ্গোল্ড, বীট ও জৈ খাওয়াইলে ইহাদের দুধ কমে না।

ছাগাদি পশু প্রতিপালন করিতে হইলে তাহাদের জন্য চরিবার স্থান আবশ্যক। বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র থাকিলে ফসল উঠাইয়া লইবার পর ঐ সমস্ত মাঠে ইহাদের চরিবার স্থান হইতে পারে এবং তাহাতে চাষেরও সুবিধা হয়। ছাগাদি, চরিবার সময় যে মলমূত্র ত্যাগ করে তদ্বারা জমির উর্ব্বরতা বাড়িয়া যায়। জমি পড়িয়া থাকিলেই তাহাতে আগাছা কুগাছা জন্মিবে ; জমিতে ছাগাদি চারণের ব্যবস্থা থাকিলে আগাছা ও তৃণাদিতে ফল ফুল হইবার পূর্ব্বেই ভক্ষিত হইয়া জমি কোনক্রমে জঙ্গলাকীর্ণ হইতে পারে না। ছাগাদি চরিলে কৃষকের আর একটি মহৎ লাভ হয়। ছাগাদির বিচরণ সময়ে ফসলের পোকার বাসা ভাঙ্গিয়া ও তাহারা দলিত হইয়া অনেক মারা পড়ে বা সে ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

ছাগল যখন মাঠে বা বাগানে চরে, তখন লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ছাগলের কিছু অখাদ্য নাই, তাহারা বনে জঙ্গলে যে বৃক্ষ ও লতাদি জন্মে তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষেত্রজ ও উদ্যানস্থ উৎপন্ন যাবতীয় লতা গুল্ম ও বৃক্ষপত্র ও সময় সময় বৃক্ষ ত্বক তাহাদের সুখাদ্য। কাঁটাল ও অশ্বত্থ পাতা খাইতে পাইলে আর কিছুই চায় না। আলু ও শালগম, বীট প্রভৃতি কন্দ ও মূলাদি ইহার উপযুক্ত আহার।

ছাগ এক বৎসরের মধ্যেই সন্তানের জন্ম দানে ও ছাগী ৭ সাত মাসেই গর্ভধারণে সমর্থ হয়। প্রায়ই দুইটী ও কখন কখন তিনটী ছানা হয়।

ছাগী কখন গাভীর স্থান অধিকার করিতে পারে না, কিন্তু যেখানে গাভীর খাদ্যের মত সংস্থান নাই বা যেখানে গোচারণের জায়গা নাই, সেখানে অনায়াসে ছাগ প্রতিপালন হইতে পারে।

ছাগ, মেষ কৃষকের পক্ষান্তরে জমির সার যোগায়, ক্ষেত্র হইতে ফসল উঠাইয়া লইয়া তাহাতে ছাগ, মেষ বাঁধিয়া চরাইলে এই সকল ছাগ মেষের মলমূত্রে জমি খুব উর্ব্বরা হয়।

ছাগী দুগ্ধ ও ছাগের মাংস মানুষের খাদ্য। হিন্দুদের পশু বলীতে ছাগ বলীর নির্দ্দেশ আছে।

ছাগ মাংস—লঘু, স্নিগ্ধ, বল ও পুষ্টিদায়ী।

ছাগী দুধ—মধুর, শীতল ও রক্তপিত্তবিকার, ক্ষয়কাশ নাশী ও ত্রিদোষ নাশী।

এই সকল কারণে যাঁহারা সুপ্রশস্ত কৃষিক্ষেত্র রচনা করিতে সক্ষম, তাঁহারা আনুসঙ্গিক ভাবে ছাগাদি পালনের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিলে বিশেষ লাভবান হইতে পারেন।

ছাগ প্রতিপালনের আর একটি উদ্দেশ্য তাহাদের লোম সংগ্রহ। বঙ্গদেশীয় ছাগলের লোম ছোট বা বঙ্গদেশে পাটনা প্রভৃতির ছাগ রাখিলেও তাহাদের লোম আশানুরূপ বড় হয় না, এই কারণে লোমের নিমিত্ত এখানে ছাগল খুব কমই পোষা হইয়া থাকে। পাটনা, গয়া, উত্তর পশ্চিম বা শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে সাধারণতঃ লোমের জন্য ছাগ পালিত হয় এবং ঐ সকল স্থানে ছাগলের খুব দীর্ঘ লোম হইয়া থাকে। পশুলোম

হইতেই যাবতীয় উৎকৃষ্ট শীতবস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ছাগের চর্ম্মও মূল্যবান। পল্লিগ্রামে কাঁচা চর্ম্ম আট কিম্বা দশ আনা মূল্যে বিক্রিত হয়। ইহার চর্ম্ম হইতে ভাল পাদুকা ও নানাবিধ বাদ্য ভাণ্ড ও আসবাব পত্রের ছাওনী হয়। ছাগ শিশুর চর্ম্মের দস্তানা সাহেব বিবিগণ আদর করিয়া পরেন।

ব্যবসায়ের জন্য অধিক সংখ্যক ছাগাদি পালনের ব্যবস্থা না করিতে পারিলেও গৃহস্থ চাষী-গণের দুই চারিটা ছাগল রাখা অসম্ভব নহে। ইহাদ্বারা সন্তান প্রতিপালনের মত অল্প ব্যয়ে দুধ সংগ্রহ হইবে, পূজাপার্ব্বণে ছাগ বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাহাদের পার্ব্বণের খরচ উঠিয়া যাইবে, এবং সময়ে সময়ে তাহাদের মাংস ভোজনের সুবিধা হইবে।

কি সহরে কি পল্লিগ্রামে চা পান এখন খুব প্রচলিত হইয়াছে। চায়ের জন্য দুধ অনেকেই অতি কষ্টে যোগাড় করিয়া উঠিতে পারেন না, সেইজন্য প্রায় অধিকাংশ লোকেই বিলাতী দুধ ব্যবহারে বাধ্য হন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ছাগ দুধের বন্দোবস্ত অতি সহজেই হইতে পারে এবং তাহাই সুযুক্তি বলিয়া আমার বিবেচনা হয়।

ভুট্টা। (INDIAN CORN).

শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত।

(ভারতীয় কৃষি-সমিতি।)

ফল—মানুষ ও গবাদির খাদ্য, গাছের রসে চিনি, গুড়, সুরা এবং আঁইসে কাগজ হয়।

ভুট্টা এক প্রকার ঔষধি বিশেষ। প্রতি বৎসরই ইহার চাষ করিতে হয়, ফল পাকিলে গাছ মরিয়া যায়। বাঙ্গালাদেশে প্রায় ২,০০০,০০০ একর পরিমাণ জমিতে ভুট্টার আবাদ হইয়া থাকে। ভুট্টা গাছের সহিত আক গাছের সাদৃশ্য আছে। উদ্ভিদতত্ত্বে ইহারা একজাতীয় বলিয়া উল্লিখিত হয়। আকের মত ইহার পাপ হয়—ইহার অগ্র ভাগের প্রতি পাপে প্রতি গ্রন্থিতে পুষ্পোদ্গম হয়, আকের কিন্তু তাহা হয় না।

নানাপ্রকারের ভুট্টা আছে, কিন্তু বঙ্গদেশে জৌনপুর ভুট্টাই ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। দার্জ্জিলিংএ জৌনপুর ভুট্টা ভাল জন্মায় না, তথায় আমেরিকান ভুট্টার চাষ করা ভাল।

ডুমরাঁও ও বাঁকিপুরে গভর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রে ভুট্টা চাষ দেখা গিয়াছে যে, একর প্রতি গড়ে ২০ হইতে ২৫ মণ ভুট্টা জন্মিতে পারে।

ভুট্টা চাষে দোয়াঁশ জমিই প্রশস্ত। যে জমিতে আক হয়, আলু হয়, তাহাতে ভুট্টাও হইবে।

ছয় সাতবার লাঙ্গল ও তিন চারিবার মই দিয়া তবে ভুট্টা বুনিতে হয়। খুব তেজস্কর গাছ হইতে যে ফলগুলি খুব পুষ্ট এবং যে গুলি বড় ভাল, সেই গুলি বীজের জন্য রাখিতে হয়। শুষ্ক স্থানে ফলগুলি পর বৎসর চাষের জন্য ঝুলাইয়া

রাখা বিধি। জ্যৈষ্ঠ. আষাঢ়, শ্রাবণ পর্য্যন্ত ইহার চাষ হয়। এক বিঘা চাষের জন্য তিন চারি সের বীজ যথেষ্ট। লাঙ্গলের শিরালে ১ ফুট অন্তর দুই তিনটি হিসাবে বীজ বপন করিতে হয়। সারি গুলি এক হাত অন্তর হওয়া উচিত।

ইহার চাষের জন্য সারবান মৃত্তিকার আবশ্যক। কিন্তু আক কাটিয়া ভুট্টা বুনিলে বা আলু তুলিয়া লইয়া ভুট্টা চাষ করিলে এদেশে বড় কেহ জমিতে সার দিয়া ভুট্টা বুনে না, কারণ আলুও আকের জমিতে যথেষ্ট সার দেওয়া হয়, ফসল উঠাইয়া লইবার পর যে সার জমিতে থাকিয়া যায়, তাহাতে ভুট্টার সার পর্য্যন্ত হয়।

একায়েক ভুট্টা চাষ করিতে হইলে এক বিঘা জমিতে ৪।৫ গাড়ী গোবর সার ও ২।৩ মণ খৈল সার দিলে ফসল ভাল হয়, শীঘ্র ফসল তৈয়ারি হয়।

জমিতে ঘাস বা অন্য তৃণ জন্মিতে দেওয়া উচিত নহে। কোদাল দ্বারা গোড়ায় মাটি দিয়া আইল বাঁধিয়া দিতে হইবে, যেমন আকের দিতে হয়। গাছ ঘন জন্মিলে পাতলা করিয়া দিতে হয়। গাছ ছোট থাকিতে থাকিতেই এই কার্য্য শেষ করা কর্ত্তব্য।

ভুট্টার ক্ষেতে হাত কোদালই প্রকৃষ্ট যন্ত্র। চাষ বহু বিস্তৃত হইলে, প্লানেট যুনিবার হাত কোদালই ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহাতে নিড়ান কাজ অতি সুসম্পন্ন হয় এবং একবারে ৮।১০ বার নিড়াইবার কাজ মেটে।

ফলের দানাগুলি শক্ত হইলে এবং পাকিতে আরম্ভ হইলে ও গাছের অগ্রভাগ শুকাইতে আরম্ভ করিলে শস্য আহরণ করিতে হইবে।

আমাদের দেশে ইতর লোকে ভুট্টার ফলগুলি কাঁচা বা আগুনে একটু ঝলসাইয়া খাইয়া থাকে। ভুট্টার ছাতু মানুষের এমন কি গবাদিরও আহার। গাছগুলি এতাবৎ সর্ব্বত্রই জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হইত।

ভুট্টা গাছের নূতন ব্যবহার,—ইহা আর অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পরিত্যক্ত হয় না। ভুট্টা গাছের রসে চিনি প্রস্তুত হইতেছে,—অবশিষ্ট গুড় হইতে সুরা এবং পরিত্যক্ত ছিবড়া (আঁইস) হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। কোন আমেরিকাবাসী বহু বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া, তাঁহার অভিজ্ঞতার ফলে পরিত্যক্ত ভুট্টার গাছগুলির এরূপ সদ্ব্যবহারের পরিচয় দিতেছেন। ধন্য তাঁহার উদ্যোগ, ধন্য তাঁহার অধ্যবসায়।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা তিনি জানিয়াছেন যে, এক টন আকের রস হইতে যে পরিমাণে চিনি জন্মিবে ইহা হইতেও সেই পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইবে; উপরন্তু গাছের আঁইস হইতে সোডা সংযোগে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত উপযোগী গুঁড়া তৈয়ারি হইবে।

তাঁহার বহুদর্শনের ফলে তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, ভুট্টা গাছ হইতে যদি ভুট্টার শীষ, গাছ পূর্ণবয়স্ক হইবার পূর্ব্বে তুলিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে গাছগুলি শীঘ্র বুড়াইয়া যায় না অপিচ এই প্রকারে গাছ গুলিকে চারি হইতে ছয় সপ্তাহ অধিক কাল জীবিত রাখা যায়। এই রূপে ইহাদের দীর্ঘ জীবন দান করিতে পারিলে ইহার শারীরিক গঠনের পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই সঙ্গে ইহার আয়তন, গুরুত্ব, ও রসে শর্করার পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। এই সময় ইহার রস খুব সুপরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

অধুনা আমেরিকার ২০টি বিভিন্ন প্রদেশে ইহার পরীক্ষা চলিতেছে এবং সর্ব্বত্রই ভুট্টা গাছের এই রূপ গুণ স্বাভাবিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে

ভুট্টা গাছ হইতে চিনি বাহির করিবার প্রথা ইক্ষু চিনি প্রস্তুত প্রথার অনুরূপ, কল কব্জা সবই এক, ইক্ষুচিনি প্রস্তুত করিতে যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি (Chemicals) আবশ্যক ইহার জন্য তাহাই আবশ্যক।

একটন (২,০০০ পাঃ) ভুট্টা গাছ হইতে অপরাপর কঠিন পদার্থ বাদ দিয়া ২৭০ পাঃ শর্করা (১ পাঃ = প্রায় অর্দ্ধসের) মিশ্রিত রস পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ২৪০ পাঃ দানাদার শর্করা, ২০ পাঃ ভুরা (Uncrystalizable Sugar) এবং ১০ পাঃ অপর পদার্থ। গড়ে ইহা হইতে শুকনা ১ নং চিনি ১৬০ পাঃ, ২নং চিনি ৩০ পাঃ উৎপন্ন হইবে। যাহাতে প্রায় ৭০ পাঃ চিনি (Uncrystalizable Sugar) বিদ্যমান আছে এরূপ ৬ গ্যালন মাত অবশিষ্ট থাকিবে এবং তাহাহইতে ৯৫ প্রুফ প্রায় ৫ গ্যালন সুরাসার তৈয়ারি হইবে। অধিকন্তু রস নিষ্কাসিত ডাঁটার ছিবড়া হইতে ৩০০ পাঃ শুষ্ক আঁইস পাওয়া যাইবে। সেই আঁইস হইতে ২০০ পাঃ কাগজ প্রস্তুত উপযোগী গুঁড়া উৎপন্ন হইবে।

আবিষ্কর্ত্তা ভুট্টাগাছের কোন অংশ বৃথা নষ্ট করেন নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভুট্টা গাছের শীষগুলি (ears) কচি অবস্থাতেই তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। এক টন কচি শীষ হইতে এমন ২১০ পাঃ রস উৎপন্ন হইবে যে রস হইতে ৩১ গ্যালন ৯৫ প্রুফ সুরাসার জন্মায় এবং ৮৫ পাঃ শুষ্ক কাঠের গুঁড়া পাওয়া যায়, যাহাতে কাগজ হইবে।

ভুট্টার পাকা দানা হইতে বিলাতে মদ তৈয়ারি হয়। আবিষ্কর্ত্তা দেখিয়াছেন কাঁচা ও কচি দানা হইতে মদ তৈয়ারি করিলে সুরাসারের পরিমাণ অনেক বাড়ে এবং তৈয়ারি করিবার খরচও অপেক্ষাকৃত কম।

ভাদ্র—১৩১৭।

উচ্চ জমিতে শুষ্ক চাষ।

এমন অনেক জমি আছে যে, বৎসরে প্রায় নয় মাস জলমগ্ন থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে এরূপ জমির পরিমাণ অনেক। ঐ সকল জমিতে বৎসরে দুই তিনবার ধান এবং পাট ভিন্ন অন্য কিছুই হয় না। ঐ সকল জমিতে ধোয়াট ও পলি পড়িয়া জমিগুলি স্বভাবতঃ উর্ব্বরা হইয়া থাকে এবং তাহাতে চাষের পারিপাট্য বা বিশেষ বিশেষ সার প্রয়োগে শস্য বৃদ্ধির কোন সুযোগ ঘটিয়া উঠে না। এক জমিতে সার প্রয়োগ করিলে তাহা জলের গতিতে কোথায় যাইয়া পৌঁছিবে তাহার ঠিকানা নাই। উচ্চ জমি চাষেই চাষীর বিদ্যা, বুদ্ধি ও কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। জমি সরস রাখাই উচ্চ জমি চাষের মূলমন্ত্র। বৃক্ষ লতাদির খাদ্য জমিতে সঞ্চিত থাকিলেই বৃক্ষ লতাদি তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। জলের সহিত মিশিয়া সে গুলি রসরূপে পরিণত হইলে তবে তাহা বৃক্ষ লতা নিজ নিজ শিকড় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে। জমিতে এই রস সমভাবে রক্ষা করাই চাষীর প্রধান কার্য্য এবং ইহার জন্য জল সঞ্চয় আবশ্যক।

প্রধানতঃ বৃষ্টির জল, নদী, খাল ও কূপাদিতে সঞ্চিত মৃত্তিকার নিম্ন স্তরের জল ও বায়ুমণ্ডলে

সঞ্চিত আর্দ্রতা হইতে চাষের জমিতে জল সংগৃহীত হয়। ইহার মধ্যে বৃষ্টির জলে চাষের যেমন সুবিধা হয়, অন্য জলে তেমন হয় না। কিন্তু সকল স্থানে সমান বৃষ্টি হয় না, কোথাও কোথাও বৃষ্টির জল অতীব বিরল। যেখানে বৃষ্টির জলে চাষ করিতে হইবে, সেখানে খুব সতর্ক হইতে হয়। তোমার ক্ষেত পাথার ফাটিয়া চৌচির হইয়া রহিল, উপরের মাটী শক্ত হইয়া রহিল। বৃষ্টি হইয়া কতক জল ফাটল দিয়া পাতালে প্রবেশ করিল, কতক জল গড়াইয়া ক্ষেত হইতে বাহির হইয়া গেল, তোমার ক্ষেতের মাটী ভিজিল না এবং তাহাতে ফসল উৎপন্ন করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ছিটে ফোঁটা বৃষ্টির জলটুকু কাজে লাগাইতে গেলে জমি সর্ব্বদাই চষিয়া খুঁড়িয়া ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে। বঙ্গদেশ কিম্বা মান্দ্রাজের অনেক স্থানে চৈত্র, বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া মাঝে মাঝে বেশ বৃষ্টি হয়, সেখানে বৃষ্টির পর সময় মত যখন যাহা আবশ্যক সেই বীজ বুনিয়া, তাহার পর জমি চষিয়া মই দিয়া ও মধ্যে মধ্যে এক আধ বার চষিয়া দিয়া ফসলের প্রতীক্ষা করা চলিতে পারে, কিন্তু এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে বৎসরে সামান্য মাত্রায় বারিপাত হয়, সেখানে জমিটি বেশ গভীর করিয়া চষিয়া বৃষ্টিপাতের অপেক্ষা করিতে হয়। তারপর জমিটি বৃষ্টির জলে সিক্ত হইলে ভালরূপে চাষ মই দিতে হয়। এমন কি মুগুর দ্বারা ঢিল ডেলা ভাঙ্গিয়া মাটী চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া খুব চাপিয়া মই দিতে হয়। মাটী খুব চাপিয়া রাখাই উদ্দেশ্য এবং সেই জন্য কোথাও মইয়ের পরিবর্ত্তে ভারি কাঠের তক্তা ব্যবহার করা হয়। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে যেখানে ১২ ইঞ্চির অধিক বারিপাত হয় না, তথায় এক্ষণে এরূপ প্রথায় জমিতে রস সঞ্চয় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইতেছে। তাহারা মাটি চাপিবার জন্য অধিক ভার বিশিষ্ট রুল ব্যবহার করিয়া থাকে। রুল বা তক্তাই হউক মাটিটি চাপিয়া দিয়া পুনরায় তাহাতে ভাসা ভাসা লাঙ্গল ও মই দিতে হয়। এইরূপ করিলে জমির সঞ্চিত রস বাহির হইয় যাইতে পারে না। এই সকল জমিতে বীজ বপনের একটু কৌশল আছে। হাতের দ্বারা ঢালার উপর বীজ না ছড়াইয়া বীজগুলি লাঙ্গলে নালি কাটিয়া তাহাতে বপন করাই ভাল; বীজগুলি নালিতে আল্‌গা না রাখিয়া মই কিম্বা অন্য কোন যন্ত্র দ্বারা চাপিয়া দেওয়া ভাল। বীজ বপনের পর নালিদ্বয়ের মধ্যস্থলগুলি লাঙ্গল দিয়া অল্প অল্প চষিয়া দিলে জমি হইতে রস সহজে উবিয়া যাইতে পারে না। মান্দ্রাজে ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে লাঙ্গলের মুড়াতে বীজ বপনের জন্য বাঁশের নল লাগান থাকে, তাহাতে নালি কাটা ও বীজ বপন এককালে হইয়া যায়। যে সকল রবিখন্দ কিম্বা কলাই প্রভৃতিতে কম জলের আবশ্যক, সেই শস্যই এতৎপ্রদেশে চাষের উপযুক্ত। সর্ব্বত্র কিন্তু বৃষ্টি পাতের পরই বীজ বপনের সময় উপস্থিত হয় না, সেখানে জমি গুলিতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রস সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। পরে সময় উপস্থিত হইলে আবার অল্প অল্প চাষ দিয়া বীজ বুনিতে হইবে।

এই সকল জমিতে চাষ করিতে হইলে জমি যাহাতে গভীর ভাবে কর্ষিত হয় এমন লাঙ্গলাদি ব্যবহার করিতে হইবে। বৃষ্টির পর জমি চষিয়া আল্‌গা ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না, জমি চাপিয়া তাহাতে জল সঞ্চিত রাখিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এজন্য রোলার কিম্বা তক্তা বা অন্য কিছু কৃষিযন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে। মইয়ের দ্বারা এ কার্য্য সুচারুরূপে হওয়া কঠিন। পূর্ব্বে

বলা হইয়াছে, বীজ বুনিয়া বা চারা রোপণ করিয়া লাইনের মাঝে মাঝে চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য; ইহাতে জমির রস উবিয়া যায় না। অনেক স্থলে এই কার্য্যের জন্য লাঙ্গলই ব্যবহার করা হয়, কিন্তু লাঙ্গল ব্যবহার অপেক্ষা যদি হাত কোদালে কোপান যায় বা নিড়ানি দ্বারা আগাছা তুলিয়া জমিটি খুসিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল হয়। এতদঞ্চলে বীজ বপনের সময় বীজগুলি কয়েক ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া বপন করাই কর্ত্তব্য ইহাতে বীজ শীঘ্র ফুটিবার সহায়তা হয়। বীজ বসাইয়া বীজগুলি মাটির সহিত চাপিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে শুষ্ক হাওয়ায় বীজগুলি শুকাইয়া জীবনহীন হইয়া যাইতে পারে।

যে সকল প্রদেশে বৎসরে ১২ কিম্বা ১৪ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিবারি পতিত হয় না, তথায় ক্ষেতে ঘন ঘন আলি বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, অর্থাৎ যেটুকু জল জমিতে পড়িল, তাহা যেন সমভাবে ক্ষেতে বসে এবং সমুদয় মৃত্তিকা সমভাবে সিক্ত হয়।

উচ্চ জমি চাষেই চাষী তাহার কৃতিত্ব দেখাইতে পারে। নীচু জমি চাষ করিয়া ইচ্ছা মত ফসলের হার বৃদ্ধি করা বা তাহাতে অধিক লাভবান হওয়া যাইতে পারে না। সুবৎসর এবং দুর্ব্বৎসর হিসাবে সেখানে ফসলের তারতম্য হইবে। কিন্তু উচ্চ জমি পাইলে চাষীরা তাগেবাগে চাষ করিয়া দুর্ব্বৎসরেও সুফল ফলাইতে পারে, দুর্ব্বৎসরেও সে সজাগ থাকিতে পারে এবং এক গুণ অধিক পরিশ্রমের বিনিময়ে দশ গুণ লাভবান হয়।

এই ত গেল দুর্ব্বৎসরের কথা।—সুবৎসরেও যে জাগ্রত সেই জিতিয়া যায়। চাষী মাত্রেই, যাহারা সব্জী চাষ করে, তাহারা আলু, বেগুন, পটল, মূলা, মটর ইত্যাদির চাষ করিয়া থাকে। চাষ করিলেই সময় মত ফসল উৎপন্ন হইবে, কিন্তু যে, মূলা আগে ফলাইবে, সে একটা ছোট মূলা এক পয়সায় বেচিবে। বাজারে পটল উঠিলে ॥০ আনা॰ কখন কখন ১৲ টাকা সের বিক্রয় হয়, অসময়ের পালম শাক সোণার দরে বিক্রয় হয়। প্রথম প্রথম আলু ৵০ আনা, ৵১০ পয়সা সের বিক্রয় হয়, পরে ১২॥ পয়সা সের আলু কিনিবার সময় লোকে বাছা আলু চায়। নূতন জিনিষ উঠিবার মুখেই অধিক লাভ হয়, আবার যখন জিনিষটা ফুরাইয়া যায় তখনও যোগান দিতে পারিলে লাভ আছে। কচি কচি মটর শুঁটী চৈত্র বৈশাখেও আদরের জিনিষ। সজাগ চাষীর এইগুলি লক্ষ্য আছে এবং উচ্চ জমি চাষেই এই লাভের অবসর আছে।

ঠিক হিসাব ধরিতে গেলে একখণ্ড উচ্চ জমি হইতে যে লাভ হয়, একখণ্ড আমন ধানের নীচু জমি হইতে সে লাভ হওয়া অসম্ভব। আমরা এস্থলে আউসের উচ্চ জমিও বাদ দিলাম, কারণ তাহাতেও সুচাষী আশানুরূপ বা মনে করিলে আশাতীত ফসল দাঁড় করাইতে পারে। তিন বিঘা জমিতে আলু কিম্বা আখ চাষ করিতে পারিলে, বৎসরান্তে সুচাষীর ঘরে নিশ্চয়ই ৬০০৲ টাকা যাইবে। আলু চাষে লাভ অপেক্ষাকৃত অধিক। আলু তিনমেসে ফসল; আলুর পর আর একটা লাউ, কুমড়া বা চৈতে শসা প্রভৃতি ফসল পাওয়া যায়। যে সুদক্ষ চাষী তাহারই লাভ হয়, মনের মত করিয়া চষিয়া, সার দিয়া, যথাসম্ভব বৃষ্টির জল সঞ্চয় করিয়া পরিশেষে না কুলাইলে জল সেচিয়া ফসল রক্ষা করিলে, তবে তাহার লাভ হয়। দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে তাহাদের জাগ্রত স্বপ্ন অলীক হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? যদি ফলে, যদি চাষীর হাতে পড়ে তবে উচু জমিতেই পর্য্যাপ্ত মাত্রায় ফসল হয়—তিন বিঘা পরিমাণ নীচু আমন ধানের জমিতে যদি বড় বেশী ফলে, তবে ৫০ মণের অধিক ধান পাইবার আশা

খুব উচ্চ আশা বলিতে হইবে। এই ৫০ মণ ধানের দাম বড় জোর ৭৫০৲ টাকা, কিন্তু একখানি আউসের জমিতে রীতিমত চাষ দিয়া, জমিতে ঢালার উপর ধান না বুনিয়া অন্যান্য শস্যের ন্যায় জমিতে নালি ও গর্ত্ত কাটিয়া, প্রতি গর্ত্তে ৫টি হিসাবে এক ফুট অন্তর ধান্য বীজ বসাইয়া গেলে যদি ভাল বীজধান ব্যবহার করা যায়, যদি প্রতি গর্ত্তে উপযুক্ত পরিমাণ হাড়ের মিহি গুঁড়া ও সোরা বা সুপার ফস্‌ফেট সার দেওয়া যায়, যদি জমিতে অসময়ে জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয় বা আবশ্যক মত জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা থাকে, তবে একটী ধান গাছের গোড়ায় কেন ২০টা তেউড় হইবে না, প্রত্যেক তেউড়ের প্রত্যেক শিষে কেন ২০০টা হিসাবে ধান ফলিবে না এবং এই হিসাবে ঝড়্‌তি পড়্‌তি বাদ দিলে কেন তিন বিঘায় ১০০ মণ ধান উৎপন্ন হইবে না, এবং তাহার পর সেই জমিতে আলু বা পাট জন্মাইলে বিনা সারে কেন আরও ১৫০৲ টাকা আসিবে না। এতটা যত্ন থাকিলে তবে ত আসিবে। ইহা সুনিশ্চিত মনে করিলে আসিতে পারে এবং উচ্চ জমিতে শুষ্ক চাষে সোণা ফলিতে পারে।

ত্রিবাঙ্কুর কৃষি বিভাগ।

এখানকার কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার কার্য্যতঃ রায়তদের সহিত মিশিতেছেন, অফিসে বসিয়া কাগজ কলম লইয়া নাড়া চাড়া করিয়া তিনি সন্তুষ্ট নহেন। ত্রিবাঙ্কুরে অনেক নারিকেলের আবাদ আছে। ঐ সকল নারিকেল গাছে পোকা লাগিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট হইতে সম্পূর্ণ রোগাক্রান্ত নারিকেল বৃক্ষ সকল কাটিয়া ফেলিবার আদেশ প্রচারিত হইল। যদি ডিরেক্টার তাহাদিগকে ইহার উপকারিতা না বুঝাইতেন, রায়তেরা হয়তঃ সে আদেশে কর্ণপাত করিত না। তিনি গ্রামে গ্রামে যে বৃক্ষগুলি রোগমুক্ত হইবার সম্ভাবনা কম সেই বৃক্ষ গুলিকে উৎপাটন করিয়া দুই তিন ফুট গুঁড়ী সমেত শিকড়গুলি পুড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন, যে বাগানে রোগ ঢুকিয়াছে তাহাতে অন্য গাছগুলির জন্য চূণ ছড়াইবার ও বৃক্ষগুলিকে সতেজ করিবার জন্য তাহাতে নারিকেল খৈলের সার প্রয়োগের বন্দোবস্ত করিলেন। যে সকল গাছ সবেমাত্র রোগাক্রান্ত হইয়াছে সেই সকল গাছের চতুর্দ্দিকে নালি কাটিয়া সে গুলিকে অন্য গাছ হইতে পৃথক করিবার আদেশ করিলেন। তিনি সকল রায়তদিগকে ডাকাইয়া তাহাদের দুঃখের কথা শুনিয়া তাহারা যাহাতে কর্ত্তিত গাছ গুলির খাজনা রেহাই পায় এবং যাহাতে চূণ ও খৈল সার খরিদ দরে পায় এ সকল বিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন। পল্লী সমূহের স্থানে স্থানে চূণ ও সারের ডিপো খোলা হইতেছে। নিতান্ত গরীব প্রজাগণকে এখন ধারে চূণ ও সার দেওয়া হইবে এবং তাহার মূল্য অনেক কিস্তিতে অল্প অল্প করিয়া শোধ লওয়া হইবে স্থির করিয়া দিয়াছেন ও রায়তদের বাগান দেখিয়া কি কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া দিবার জন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে।

ইহার জন্য রায়ত দিগকে পয়সা খরচ করিতে হইবে না। সার ডিপোর জন্য কর্ম্মচারী, বেহারা নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে। ডিরেক্টর মহোদয় ১০,০০০ টাকার সার ও চূণ খরিদ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট টাকা চাহিয়াছেন এবং গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদিতে আরও আট কিম্বা দশ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

ইহাকেই কার্য্যকারিতা বলি, এত উদ্যোগী না হইলে কোন কার্য্য সর্ব্বতোভাবে করিয়া উঠা যায় না। ইহার কার্য্য প্রণালী অনুকরণ যোগ্য।

জীবন্ত মৎস্য জমান।—মার্কিন মুলুকে কোন অধ্যাপক জীবন্ত মাছকে বরফের মধ্যে রাখিয়া জমাইয়া ফেলেন, পরে আবশ্যক মত কয়েকমাস পরে ঐ বরফ গলাইয়া তাহার ভিতর হইতে সেই জীবিত মাছটিকে বাহির করেন। এই উপায়ে তিনি নানাদেশে জীবন্ত মাছ প্রেরণ করিয়াছেন।

সোডা-হ্রদ।—মধ্য আফ্রিকার মাগাডি নামক স্থানে এক বিশাল সোডা-হ্রদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ হ্রদে যথেষ্ট সোডা বিদ্যমান। আবিষ্কর্ত্তা সেলফোর্ড নামে এক সাহেব; সঙ্গে ইঁহার আরও আট জন ইউরোপীয় আছেন। প্রকাশ, এ হ্রদের বিস্তারপরিমাণ কুড়ি বর্গ মাইল। ইউগাণ্ডার রেল এই মাগাডি পর্য্যন্ত শীঘ্রই বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা।

ভারতীয় কৃষির উন্নতি।

অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগে ভারতের নানাস্থানে এখন কৃষি-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং নানাস্থানে কৃষি উন্নতি কল্পে বিবিধ চেষ্টা হইতেছে।

মধ্য প্রদেশের ছত্রিশগড় পরগণায় অন্যত্র হইতে ভাল চাষী আনাইয়া স্থানীয় চাষীগণকে ধান্য রোপণ প্রণালী, মাট বাদামের চাষ, আকের চাষ ও জল সেচন দ্বারা গমের চাষ শিখান হইতেছে। এই সকল চাষের ব্যবস্থা সেখানে এই নূতন।

বোম্বায়েও সুনিপূণ চাষীরা স্থানে স্থানে যাইয়া গুড় প্রস্তুতের সুপ্রণালী শিখাইতেছে। মান্দ্রাজে রায়তেরা এখন লাঙ্গলের শিরালে তুলা বীজ বপন করিতে শিখিয়াছে এবং তথায় ১৫০০ একর জমিতে এখন ঐ প্রকারে তুলা চাষ হইতেছে। তাঞ্জোরে নদীর চড়ায় চাষীরা এখন এক একটি বীজ ধান রোপণ করিয়া চাষ করিতেছে এবং তাহাদের জমিতে সবুজ সার প্রয়োগ করিতে শিখিয়াছে। সবুজ সার প্রয়োগ প্রচলন করিবার জন্য কৃষি-বিভাগ হইতে শণ ও ধঞ্চে বীজ কৃষকদিগকে খরিদ দরে দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

পঞ্জাবে লায়লপুর ক্ষেত্রে মাসে মাসে কৃষকগণকে শস্য-আহরণ যন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ঢাকা ক্ষেত্রে কৃষকগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যেখানে কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী হয়, বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ হইতে সেখানে বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারি পাঠাইয়া

উৎকৃষ্ট বীজাদি প্রদর্শন করা হয় এবং উন্নত প্রণালীর লাঙ্গল ও জলোত্তলন যন্ত্রের ব্যবহার ও গুড়-প্রস্তুত-প্রণালী কৃষকদিগকে দেখান হয়। ইহা কৃষি-জ্ঞান বিস্তারের বিশেষ অনুকূল বলিতে হইবে। কৃষি-সমিতি সরকারী কৃষিক্ষেত্রে কৃষক পাঠাইয়াও কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন।

মধ্য প্রদেশ হইতে কৃষি গেজেট, যুক্ত প্রদেশ হইতে বিভাগীয় কৃষি পুস্তিকা, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম হইতে কৃষি পঞ্জিকা প্রচারিত হইয়া কৃষি কথা প্রচারের কিছু কিছু সুবিধা হইতেছে। এতৎ প্রসঙ্গে আমরা বঙ্গদেশে ভারতীয় কৃষি সমিতি হইতে প্রকাশিত "কৃষক" মাসিক পত্রিকা এবং সময় নিরুপণ কৃষি পঞ্জিকা প্রচার উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি।

বোম্বায়ে কৃষি পরিদর্শকগণ স্থানীয় কৃষি-সমিতির সহিত এক যোগে উন্নত প্রণালীতে ব্রোচ তুলার চাষ প্রবর্ত্তন করিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদেরই উদ্যোগে সেখানে এখন ভাল মাট-বাদামের চাষ হইতেছে, স্থানীয় চাষীরা ভালরূপে গুড় তৈয়ারি করিতে শিখিয়াছে, জোয়ারে ছত্রক রোগ হয়, সেইজন্য জোয়ার বীজ কীটনাশক আরকে ডুবাইয়া বপন করে, তাহারা এখন ভাল বীজ নির্ব্বাচন করে এবং নূতন ও উন্নত কৃষি-যন্ত্র ব্যবহার করে।

মান্দ্রাজে বিগতবর্ষে সবুজ সারের জন্য অনেক টাকার বন নীলের বীজ ও শণের বীজ বিক্রয় হইয়াছে এবং কৃষি-বিভাগের এক জন কর্ম্মচারি তাঞ্জোরে কৃষিক্ষেত্র স্থাপন কল্পনায় স্থানীয় অবস্থা তাহার সুবিধা ও অসুবিধা অনুসন্ধান করিতেছেন।

মধ্য প্রদেশে আগে রায়তের চাষের জন্য কৃষি বিভাগ হইতে বীজ তৈয়ারি করিয়া দিতে হইত, এখন তাহারা ভাল বীজ নিজেরাই তৈয়ারি করিয়া লইতে শিখিয়াছে। বুড়ী তুলা বীজ তাহার একটা দৃষ্টান্ত। আমেরিকান অপল্যাণ্ড তুলাবীজ হইতে ইহার উৎপত্তি। বুড়ী তুলা খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ভাল জাতীয় গমের বীজও এখানে রায়তদিগের দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ মৈমনসিংহ হইতে সুদক্ষ চাষী আনাইয়া যেখানে নূতন পাট চাষ আরম্ভ হইয়াছে তথাকার চাষীগণকে পাট পচান ও কাচা শিখাইতেছেন।

নাগপুরে কৃষি বিদ্যালয় উঠাইয়া দিয়া স্থানীয় কৃষক বালকগণকে কৃষিক্ষেত্রে রাখিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। রায়পুর ক্ষেত্রে ১২টি বালকের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মান্দ্রাজে কৃষক বালকগণকে মজুর স্বরূপ লইয়া কাজ করান হয় ও সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিকে কৃষিতত্ত্ব শিখান হয়। কটক কৃষিক্ষেত্রে কৃষক বালকগণকে দুই বৎসর শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে এবং তাহারা শিক্ষার্থী (Student Cultivators) নামে অভিহিত।

বোম্বায়ে সহকারী কলেক্টরগণ সফরে যাইবার সময় সুনিপুণ এক এক জন চাষীকে সঙ্গে লইয়া থাকেন। তাহারা মফঃস্বলে যাইয়া স্থানীয় ব্যক্তিগণকে নূতন কৃষি যন্ত্রের ব্যবহার দেখায় এবং গুড় তৈয়ারি করিতে শিখায়।

ভাল বীজ উৎপন্ন করিতে পারিলে কিম্বা নূতন কোন চাষাবাদ প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে মধ্য প্রদেশে তাহাদিগকে প্রশংসা পত্র দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং বোম্বায়ে এরূপ যোগ্য ব্যক্তিকে মাথায় দিবার পাগড়ী বকসিস্ দেওয়া হয়।

সাক্ষাত সম্বন্ধে হাতে হাতিয়ারে কৃষি উন্নতিকল্পে এই সমস্ত চেষ্টা দেখিলে মনে একটু আশার সঞ্চার হয়। এই সবে আরম্ভ মাত্র ; এই বিভাগের কার্য্যও বহুতর ; গভর্ণমেণ্ট এত উদ্যোগী হইয়াছেন, আমাদের চেষ্টা ব্যতীত সে উদ্যোগ সম্পূর্ণ কার্য্যে পরিণত হওয়া কঠিন, ইহা যেন আমাদের স্মরণ থাকে।

পত্রাদি।

কাঁটাশূন্য ফণী মনসা।

AMRIT LAL SIL. NEW LANE,
HYDERABAD, DECCAN.

মহাশয়,

কয়েক মাস পূর্ব্বে "কৃষকে" এক প্রকার কণ্টকহীন ফণী মনসার কথা পড়িয়া ছিলাম আমেরিকায় গো খাদ্য রূপে ব্যবহার হইতেছে লিখিয়াছিলেন। তাহার বীজ জোগাড় করিয়াছেন কি ও ভারতবর্ষে কোন স্থানে তাহার চাষের চেষ্টা করা হইয়াছে কি ? তাহার চাষ সম্বন্ধে আপনাদের কাছে কোন পুস্তকাদি আছে কি ?

[অদ্যাপি ভারতের কোথাও ইহার চাষের বন্দোবস্ত হয় নাই। চেষ্টা করিলে আমাদের দেশী ফণী মনসাকে কণ্টকহীন করা যাইতে পারে। আমরা সেইরূপ চেষ্টা করিতেছি। এই সম্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র পুস্তক এখানে পাওয়া যায় না।

বীজ অপেক্ষা কাণ্ড বা শাখা হইতে ইহার সহজে চারা তৈয়ারি করা যায়। আমরা আমেরিকা হইতেও কণ্টকহীন ফণী মনসার কাণ্ডাদি আনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।] কৃঃ সঃ

গিনি ঘাস।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বিশ্বাস, বেহালা, ২৪ পরগণা।

মহাশয়,

ইতি পূর্ব্বে আমার পত্রের উত্তর আমাকে জানাইয়াছিলেন যে গাভীর আহারের পক্ষে গিনি ঘাস ভাল। ইহাতে গাভীর দুধ বাড়ে। আমি আমার কোন আত্মীয়ের বাগান হইতে

গিনিঘাসের কতকগুলি জড় আনাইয়া অতি সামান্য মাত্রায় চাষ করিতে পারিয়াছি কিন্তু ঘাস গুলি সেরূপ বাড়িতেছে না। ইহার বীজ হয় কিনা? আমার অনুমান হয় যে, বীজ হইতে চাষ করিলে তবে বোধ হয় ভাল ঘাস হইবে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ঘাসের চাষ সম্বন্ধে উপদেশ দিলে বড়ই উপকৃত হইব।

[বীজ বা জড় হইতে এই ঘাস জন্মাইতে পারা-যায়। ইহার বীজ হয়। বীজ অপেক্ষা জড় হইতে চারা জন্মান সহজ এবং ভাল, কারণ বীজ হইতে জন্মাইতে হইলে স্বতন্ত্র স্থানে বীজ বুনিয়া চারা জন্মাইয়া বড় হইলে নাড়িয়া বসান ইত্যাদি অনেক ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়া যায়। জড় হইতে গাছ খারাপ হয় না।

ইহার জমি দোয়াঁস হওয়া আবশ্যক। অন্য ফসলের চাষের মত জমি মাঘ ফাল্গুনে মই দিয়া তৈয়ারি করিতে হইবে এবং তাহাতে বর্ষার পূর্ব্বে গোবর সার দিয়া সারবান করিয়া লওয়া উচিত। বর্ষা পড়িলে উভয় দিকে ৩ ফুট বা ৩৷ফুট অন্তর এক একটি জড় রোপণ করিবেন। গিনিঘাস বৎসরের মধ্যে ৪৷৫ বার কাটিয়া লওয়া যায়। এক বার লাগাইলে এক জমিতে অনেক দিন থাকে। প্রত্যেক ঘাস কাটিয়া লইবার সময় জমিটি কিন্তু কোদাল বা লাঙ্গল দ্বারা খুঁড়িয়া তাহাতে গোময় সার দিতে হইবে। ঝাড় বড় হইলে তাহা হইতে জড় উঠাইয়া লইয়া ক্ষেত পাতলা করিয়া দিতে হয় এবং সেই জড় গুলি অন্যত্র লাগান যাইতে পারে। হিসাব মত চাষ করিতে পারিলে প্রতি বিঘায় ২০০ মণ ঘাস পাওয়া যায়।]

কৃঃ সঃ।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

বঙ্গে তিল শস্য।—১৯১০। খাস বাঙ্গলা, উড়িষ্যা এবং সাহাবাদ, সারণ, মজঃফরপুর ও মানভূমে প্রধানতঃ তিলের চাষ হয়। মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও খুলনায়ও তিল চাষের আদর আছে।

বিগত বৎসরের তুলনায় এবৎসর কম জমিতে তিলের আবাদ হইয়াছে। বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ৩৭,৭০০ একর, এবৎসর ৩৬,৮০০ একর মাত্র। তিলের আবাদ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে সাধারণতঃ ৪৮,৫০০ একর জমিতে তিল চাষ হইতে দেখা যাইত।

একর প্রতি ৪½ মণ জন্মিয়াছে অনুমান করিয়া লইলে ৫,২০০ টন তিল পাওয়া যাইবে। বিগত বর্ষে অধিক জমিতে চাষ হইলেও ৪১০০ টন তিল উৎপন্ন হইয়াছিল।

শস্য সংবাদ। আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গ—শ্রাবণের শেষে আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে জলপ্লাবন হইয়া শস্য নষ্ট হইয়াছে।

পাট কাটা ও পচান হইতেছে, পাটের ফসল আশাপ্রদ।

আউশ ধান্য কাটা হইতেছে, কিয়ৎ পরিমাণ আউশ ধান্য জলপ্লাবনে নষ্ট হইয়াছে।

আমন ধান্য রোপণ হইতেছে চাষের অবস্থা ভাল।

চা পাতা তোলা হইতেছে। চায়ের আবাদ তত সুবিধা মত হইতেছে না, চায়ের জন্য আর একটু রৌদ্র আবশ্যক।

মোটা চাউলের দর সামান্য মাত্রায় নামিয়াছে।

চট্টগ্রাম, মালদা, নাগাপর্ব্বত, গোয়ালপাড়া, দারঙ্গ এবং শিবসাগরে পশুগণের রোগাক্রমণের কথা শুনা যাইতেছে।

টাঙ্গাইল—পাট এখানে ভাল রকম হয় নাই। নূতন পাট যাহা উঠিয়াছে ৫৲ হইতে ৫৷৵ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে। আউশ ধান সমস্ত নষ্ট হইয়াছে, আমন ধানও কতক কতক ভাসিয়া, গিয়াছে। চাষের অবস্থা শোচনীয়।

উড়িষ্যা।—মহানদী ও কাটজুড়ী এই দুইটী নদীর জল বাড়িয়া অনেক ধানের ক্ষেত ডুবিয়া গিয়াছে।

তুলা।—আগষ্ট ১৯১০। জলদী জাতীয় তুলা চাষের প্রধান কেন্দ্র সাঁওতাল পরগণা, এখানে ১০,০০০ একর জমি জলদী তুলা চাষে আবদ্ধ। রাঁচি, আঙ্গুল, মানভূম এবং সিংভূমে প্রায় ২০০০ একর হিসাবে জলদী তুলার চাষ হইয়া থাকে আজ পর্য্যন্ত তুলার আবাদের অবস্থা ভাল। আঙ্গুলে কেবল মাত্র জুন মাসে অতিবর্ষণে এবং সম্বলপুরে পোকা লাগিয়া কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

নাবী তুলা চাষের প্রধান কেন্দ্র সারণ। সমগ্র তুলার প্রায় অর্দ্ধেক এখান হইতে উৎপন্ন হয়। মজঃফরপুর, দারবঙ্গ, কটক এবং সিংভূমে কিছু কিছু নাবী তুলার চাষ আছে। বীজ বপন কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে কেবল মাত্র বাঁকুড়ায়, কটক, বালেশ্বর ও আঙ্গুলে এখনও কিছু বাকী আছে। চাষের অবস্থা মন্দ নহে।

এবৎসরের জলদী তুলার জমির পরিমাণ ৩১,১২৪একর,বিগত বর্ষের পরিমাণ ৩৩,৩৭৯একর।

আজ পর্য্যন্ত নাবী তুলার জমির পরিমাণ ২৭,৩৭৭ একর, এখনও বুনানি চলিতেছে।

সার-সংগ্রহ।

কৃষি সঙ্ঘ।

বহু পূর্ব্ব কাল হইতে ভারতে কৃষিই অনেকের প্রধান অবলম্বন ছিল, এখন কিন্তু সরকারী বড় চাকরির লোভে কিম্বা ওকালতী প্রভৃতি অধিক লাভ জনক স্বাধীন কাজের লোভে অনেকে চাষাবাদে বীতশ্রদ্ধ। চাকুরিত পরাধীনতা এবং ওকালতী বা ডাক্তারী যে একেবারেই স্বাধীন কাজ একথা স্বীকার করা যায় না। এই অবস্থা বিবেচনা করিয়া বেরিলিতে কতিপয় কৃষিতত্ত্ববিদ্ লোক এবং দক্ষ চাষী একজোট হইয়া চাষাবাদে মনোনিবেশ করিয়াছেন। যে সকল জমিদার স্বক্ষেত্রে বাস করেন না, তাঁহাদের জমি চাষ আবাদ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত। কিন্তু ছোট ছোট জমি তাঁহারা লইবেন না। এক এক খণ্ড জমি ৫০ একর (১ একর = ৩½ বিঘা) পরিমিত হওয়া চাই। তাঁহাদিগকে মজুরের ও জলের সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। তাঁহারা বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে চাষ করিবেন ও জমির উন্নতি করিবেন অথচ বৃথা পরীক্ষায় প্রভূত অর্থ ব্যয় করিবেন না। সাধারণে তাঁহাদের চাষাবাদ প্রণালী দেখিয়া শিখিতে পারিবেন, চাষীদের শিখাইতে তাঁহারা প্রস্তুত। যে চাষ যে জমিতে ভাল হইবে এবং তাহা যাহাতে খুব কম খরচে হয় তৎপ্রতি তাঁহাদের নিয়ত দৃষ্টি থাকিবে।

জমিদার মনে করিলেই ইঁহাদের আয় ব্যয়ের খাতা পত্র দেখিতে পারিবেন।

ইঁহারা কৃষক বালকগণকে বিনা খরচে চাষাবাদ শিখাইবেন।

ইঁহারা ভবিষ্যতে পশুপালন ও অন্যান্য কৃষি বিষয়ক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন।

এইরূপ কৃষি সঙ্ঘের আবশ্যক হইয়াছে। কথানুরূপ কার্য্য হইলে ভালই হইবে।

কীটভুক বা মাংসাশী উদ্ভিদ্।

বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, যেমন জীবজন্তুর দেহ পুষ্টিসাধনার্থ আহারের প্রয়োজন হয়, তেমনি উদ্ভিদ দেহ পোষণের জন্যও উদ্ভিদ্ সকলের খাদ্যের আবশ্যক হয়। উদ্ভিদ্ জাতির মধ্যে যদিও রন্ধনের কোন সুব্যবস্থা নাই বা আহার্য্য প্রস্তুত করণানন্তর মুখগহ্বরে প্রেরণ করার কোন সুবন্দোবস্ত নাই, তথাপি ইহারা খাদ্যোপকরণগুলি নানা উপায়ে সংগ্রহ করিয়া এবং সুপাচ্য অবস্থায় রূপান্তরিত করিয়া তদ্দ্বারা জীবন ধারণ করে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যায় যে, কয়েকটী মৌলিক পদার্থের দ্বারা উদ্ভিদ্দেহ গঠিত হয় এবং উদ্ভিদ্দেহ পোষণের জন্যও এই কয়েকটী পদার্থ আবশ্যক। এই মৌলিক পদার্থগুলি সংখ্যায় ১১।১২টী হইবে; যথা—Carbon (অঙ্গারজান) জলজান, অম্লজান, যবক্ষারজান, গন্ধক, ফস্ফরাস্, পটাস্, চূণ, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, ক্লোরিন এবং বালি। এই পদার্থ গুলি উদ্ভিদ্ সকল স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে বায়ু বা মৃত্তিকা হইতে সংগ্রহ করে। এই পদার্থগুলি মৃত্তিকাতে সতত প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে এবং উদ্ভিদ্ সকল যাহার যে পরিমাণে যে পদার্থ আবশ্যক, তাহা দ্রব অবস্থায় জলের সহিত শিকড় দ্বারা মৃত্তিকা হইতে শোষণ করে।

বায়ু হইতে অঙ্গারজান, প্রচুর পরিমাণে ও সামান্য পরিমাণে জলজান, অম্লজান ও যবক্ষারজান গ্রহণ করে। সকল উদ্ভিদেরই আবার বায়ুস্থিত যবক্ষারজান (Nitrogen) সংগ্রহ করিবার শক্তি নাই। Leguminasæ শ্রেণীভুক্ত অড়হর, মটর, কলাই ইত্যাদি কয়েকটী উদ্ভিদের বায়ু হইতে যবক্ষারজান সংগ্রহ করার বিশেষ শক্তি আছে এবং তজ্জন্য বিশেষ উপায়ও আছে। এই জাতীয় উদ্ভিদ্ ব্যতীত অপর জাতীয় উদ্ভিদেরা শুদ্ধ মৃত্তিকা হইতে যবক্ষারজান সংগ্রহ করে। যবক্ষারজান উদ্ভিদের খাদ্যের একটী প্রধান অংশ এবং উদ্ভিদের ভূমি গৃহীত খাদ্যের মধ্যে ইহাকে শীর্ষস্থান দেওয়া যাইতে পারে। কীটভুক্ উদ্ভিদ্গুলি সাধারণতঃ জলাময় বা শৈবালাচ্ছাদিত জমিতে জন্মে। এরূপ মাটিতে পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্যের বিশেষ অভাব, যবক্ষারজান ত আদৌ মিলে না। উক্ত উদ্ভিদ্গুলি বায়ু হইতে কিছু কিছু খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বায়ুস্থিত যবক্ষারজান ইহারা গ্রহণ করিতে পারে না। এই যবক্ষারজান সংগ্রহের জন্যই ইহাদিগকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয় এবং এইজন্যই ইহারা মাংসাহার করিয়া থাকে। মাংসাহারের অভাব ঘটিলে এই গাছগুলি শীঘ্রই নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি আক্রমণ করিবার ফাঁদ এক এক গাছে এক এক রকম, তবে সকল গাছেই রূপান্তরিত পত্রের দ্বারায় এই কার্য্য সম্পাদিত হয়। Drosera (ড্রাসেরা বা নীহারিকা) * কীটভুক্ উদ্ভিদের মধ্যে ইহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ ইহা পৃথিবীর অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। এই গাছগুলি জলাভূমিতে বা শৈবালাচ্ছাদিত জমিতে জন্মে। ছোট নাগপুরের অন্তর্গত হাজারিবাগের ঝিলের (Artificial lake) ধারে

* আমাদের দেশের এই উদ্ভিদের কোন নাম করণ হয় নাই, এই জন্য পাশ্চাত্য নামের (Sundew) অবলম্বনে ইহাকে 'নীহারিকা' আখ্যাদিলাম। এই Drosera জাতীয় অন্য একটী উদ্ভিদ্কে হিন্দিভাষায় "মুখ জলি" বলে।

এই উদ্ভিদ্ খুব দেখিতে পাওয়া যায়। গাছগুলি দেখিতে খুব ছোট প্রত্যেক গাছে ৫।৭টী পাতা থাকে। এই পাতার দ্বারায় কীট আক্রমণ ও ভক্ষণ কার্য্য সংসাধিত হয়। ইহার শিকড় দ্বারা ইহারা জল শোষণ করে। পুষ্পিতাবস্থায় গাছের মধ্যভাগ হইতে একটী পুষ্পদণ্ড বহির্গত হয় এবং তাহাতে অনেক পুষ্প দেখা যায়।

প্রত্যেক পাতার উপরিভাগে সূক্ষ্ম সূত্রবৎ বা খুব সরু চুলের মত অসংখ্য শুঁয়া (Tentacle) আছে। পাতার মধ্যভাগে যে সকল শুঁয়া আছে, তাহা খর্ব্বাকৃতি এবং একটু সবুজ রঙের এবং পাতার কিনারায় যে গুলি আছে, সে গুলি ঈষৎ লম্বা ও একটু বেগুনে রঙের এবং শুঁয়াগুলি একটু বাহিরের দিকে হেলিয়া থাকে। প্রত্যেক শুঁয়ার (tentacle) শিরোভাগে একটী ডিম্বাকৃতি গ্রন্থি (gland) আছে।

এই গ্রন্থি খুব সূক্ষ্ম $\frac{1}{200}$ ইঞ্চি লম্বা। এই গ্রন্থিগুলি হইতে একপ্রকার আটাযুক্ত তরল পদার্থ নির্গত হইয়া ইহাদিগকে সিক্ত ও বেষ্টিত করিয়া রাখে। এই তরল পদার্থ বিন্দুবেষ্টিত গ্রন্থিগুলি ঠিক নীহার বিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং সূর্য্য-রশ্মিপাতে উজ্জ্বল হইয়া চক্ চক্ করে, এই জন্য ইহাকে পাশ্চাত্য ভাষায় Sundew বলে। এই গ্রন্থিগুলি খুব সহজেই উত্তেজিত হয় এবং অল্প উত্তেজনাতেই সাড়া দেয়। উপর্য্যুপরি ৩।৪ বার স্পর্শ করিলে বা কোন দ্রব্যের কণামাত্র কোন গ্রন্থির উপর স্থাপিত করিলে ইহা উত্তেজিত হয় এবং উত্তেজনার ফলে সেই উত্তেজিত গ্রন্থি সংলগ্ন শুঁয়াটি নত হয় এবং তৎপ্রেরিত একটি শক্তি-প্রবাহ (Motor impulse) অন্যান্য শুঁয়াগুলিতে পৌঁছাইয়া তাহারাও উত্তেজিত হইয়া উত্তেজক দ্রব্যের উপর নত হইয়া পড়ে। শুঁয়াগুলির সম্পূর্ণ ভাবে নত হইতে ১ ঘণ্টা লাগে এবং স্থল বিশেষে ৪।৫ ঘণ্টাও লাগে। পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, যবক্ষারজানীয় (nitrogenous) কোন দ্রব্যের দ্বারা উত্তেজিত হইলে শুঁয়াগুলি শীঘ্রই উত্তেজক দ্রব্যের উপর নত হইয়া পড়ে এবং ঐ নত অবস্থায় অনেকক্ষণ অবস্থান করে। কোন একটী গ্রন্থির উপর সামান্য একটু মাংসের কণা দিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐ গ্রন্থি সংলগ্ন শুঁয়াটি ১০ সেকেণ্ডের মধ্যে বক্র হইতে আরম্ভ করিয়া অৰ্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে নত হইয়া পড়ে। শুঁয়াগুলি একবার উত্তেজক দ্রব্যের উপর নত হইলে, তাহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপনান্তে পুনরাগমন করে। শুঁয়াগুলিকে নত অবস্থায় ১ দিন ২ দিন এবং সময় বিশেষে ৭ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে দেখা যায়। এই সময়ের ন্যূনাধিক্য অনেকটা পাতার শক্তির ও বয়সের উপর এবং উত্তাপের (temperature) উপর নির্ভর করে। যে রসের দ্বারা গ্রন্থিগুলি সর্ব্বদা সিক্ত ও বেষ্টিত থাকে, তাহা গ্রন্থি হইতেই নিঃসৃত হয়। এই রস খুব আটাযুক্ত এবং নাতিতরল। যখন গ্রন্থিগুলি কোন উত্তেজক দ্রব্যের দ্বারা উত্তেজিত হয়, তখন উহা হইতে প্রভূত পরিমাণে এই রস নির্গত হইতে থাকে, এবং তখন এই রসে এক প্রকার acid বা অম্লরস দেখিতে পাওয়া যায়।

এই অম্লরসের দ্বারা পরিপাক ক্রিয়া সংসাধিত হয়। যবক্ষারজানীয় কোন দ্রব্যের দ্বারা গ্রন্থিগুলি উত্তেজিত হইলে এই রস খুব বেশী পরিমাণে নির্গত এবং অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। জীব জন্তুর পরিপাক ক্রিয়া, পরিপাক করিবার রস যে Gastric juice দ্বারা সাধিত হয়, তাহাতে যেমন একটী acid অম্ল (Hydrochloric adid) ও একটী ferment উৎসেচক (Pepsin) আছে, তেমনি

এই গ্রন্থি নিঃসৃত রসেও একটী acid ও একটী ferment আছে এবং এতদ্বারা পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। শুঁয়াগুলি উত্তেজক দ্রব্যের উপর নত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপনান্তে যখন পুনরুত্থান করে তখন গ্রন্থিগুলি শুষ্ক থাকে। ইহা হইতে রস নির্গত হয় না, ইহাতে প্রকারান্তরে গাছের উপকার সাধিত হয়। ভুক্তাবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বায়ু দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া যায়, শুঁয়া গুলি সম্পূর্ণভাবে পূর্ব্বভাব ধারণ করিলে পুনরায় গন্থি হইতে পূর্ব্ববৎ রস নির্গত হইতে থাকে।

এই পাতাগুলি দ্বারা কীট আক্রান্ত ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। গাছের কোন প্রকার গন্ধে আকৃষ্ট হইয়াই হউক বা আশ্রয়াশায়ই হউক, যখন কোন ক্ষুদ্র কীট এই পাতার উপর বসে তখন সেই স্থানের গ্রন্থি নিঃসৃত আটাযুক্ত রসে আটকাইয়া যায়; এবং সেই গ্রন্থিগুলিও তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হইয়া অন্যান্য শুঁয়াগুলিতে একটি শক্তি প্রবাহ প্রেরণ করে। ফলে এই শুঁয়াগুলিও উত্তেজিত হইয়া ঐ কীটের উপর নত হইয়া পড়ে এবং গ্রন্থিগুলি হইতে প্রভূত পরিমাণে রস সিক্ত হইয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। ডাক্তার নিটকের (Dr. Nitschke) মতে পত্রাসীন কীট ১৫ মিনিটের মধ্যেই রসে কণ্ঠনালী রোধ হইয়া প্রাণ হারায়। কখন কখন সমস্ত পাতাটি বক্র ভাবাপন্ন হইয়া একটী পেয়ালার (cup) ন্যায় আকার ধারণ করে এবং এইরূপে একটী কৃত্রিম পাকাশয়ের সৃষ্টি হয়।

গ্রন্থি হইতে রস খুব প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে এবং ইহাতে যে acid ও ferment আছে তদ্বারা পরিপাকক্রিয়া সাধিত হয়। কীট হইতে সারাংশটুকু এই গ্রন্থির দ্বারা শোষিত হইয়া উদ্ভিদ্ দেহের পুষ্টি সাধন করে।

Dionæa (ডাইওনিয়া)।—এই গাছও পাতার দ্বারা কীট আক্রমণ ও ভক্ষণ করে। এই পাতার বোঁটা প্রশস্ত এবং ইহার মধ্য ভাগস্থ শিরা দ্বারা পাতাটি দুই অংশে এইরূপ ভাবে বিভক্ত যে আবশ্যক হইলে একাংশ অপরার্দ্ধের উপর সহজেই নত হইতে পারে, এবং মধ্যস্থ শীরাটি কব্জার ন্যায় কাজ করে। পাতার পার্শ্ব হইতে অনেকগুলি সুঁচাল কাঁটা বাহির হইয়া থাকে পাতার উপরিভাগ অনেকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গ্রন্থি দ্বারা সমাবৃত। পাতার প্রত্যেক অর্দ্ধাংশে তিনটী শুঁয়া ত্রিকোণভাব সংস্থিত। এই শুঁয়া গুলি সহজেই এবং শীঘ্রই উত্তেজিত হয়। কোন কীট এই পাতার উপর বসিয়া এই শুঁয়া স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ পাতার উভয় অংশ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যায়। জাঁতি কলে ইঁদুর পড়িলে যেমন হয় সেই রূপ তাহা তৎক্ষণাৎ সজোরে বন্ধ হইয়া যায়। এই জন্য ইংরাজী ভাষায় ইহাকে Venus' Flytrap বলে। কীট এই পত্র মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পত্রের উভয় অংশের চাপে শীঘ্রই পিষ্ট হইয়া যায়। পত্রস্থ গ্রন্থিগুলি প্রথমে বেশ শুষ্ক থাকে কিন্তু শীকার মিলিলে এই গ্রন্থিগুলি হইতে প্রচুর পরিমাণে রস নির্গত হইতে থাকে এবং তাহা দ্বারা এই কৃত্রিম পাকাশয়ে পরিপাক ক্রিয়া সংসাধিত হয়।

কুম্ভমখী।—এই উদ্ভিদে পত্র রূপান্তরিত হইয়া কুম্ভাকৃতি ধারণ করে। এই রূপান্তরিত পত্রের নিম্নভাগটী প্রশস্ত, তার পর লতাতন্তুর ন্যায় সরু হইয়া শিরোদেশে ঠিক্ কলসীর ন্যায় একটী পাত্র ধারণ করে। এই কুম্ভাকৃতি পাত্রের মুখে একটী আবরণ (lid) আছে এবং মুখটি সাধারণতঃ খোলা থাকে। এই পত্রের আভ্যন্তরীণ গাত্রে অনেকগুলি সূক্ষ্ম গ্রন্থি আছে, তাহাহইতে নির্গত একপ্রকার জলীয় পদার্থ কুম্ভের প্রায় ⅓ অংশে পূর্ণ থাকে। কলসীর

আবরণে ও মুখে অনেক গুলি গ্রন্থি আছে, তাহা-হইতে মধু ক্ষরিত হয়। কোন কীট মধু লোভে এই পাত্রে পড়িলেই সলিল-সমাধি প্রাপ্ত হয়। এই কুম্ভস্থ জলীয় পদার্থে যে acid ও ferment আছে তদ্বারা পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই উদ্ভিদ্ গুলি "বিষকুম্ভ-পয়োমুখ"। পাত্রের মুখে ও আবরণে মধু ক্ষরিত হয় এবং তদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কোন কীট মধু আহরণে আসিলে পত্রাভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থে নিপতিত হইয়া প্রাণ হারায়। এই "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" জাতীয় আরও নানা আকারের উদ্ভিদ্ আছে যথা Cephalotus, Saracenia ইত্যাদি।

Saracenia সারাসেনিয়ার পত্র রূপান্তরিত হইয়া ভিস্তির ন্যায় আকার ধারণ করে। এই ভিস্তির ন্যায় পাত্রের মুখ ও রঙ্গীণ আবরণ হইতে মধু ক্ষরিত হয়। এই মধু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কীট পত্রাভ্যন্তরস্থ জলে পতিত হইয়া মরিয়া যায়। কিন্তু এই পত্রাভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থের পরিপাক করিবার শক্তি নাই। এই পাত্রে এক সঙ্গে অনেকগুলি কীট দেখিতে পাওয়া যায়। পাত্রস্থ জলে পতিত হইয়া এই কীটগুলি শীঘ্রই পচিতে আরম্ভ করে। অনেক কীট ও পতঙ্গ আছে, যাহারা এই গাছ ভক্ষণ করে এবং অনেক কীট এই পাত্রে ডিম্ব প্রসব করে এবং এই অণ্ডোদ্গত কীট পাত্রস্থ বিকৃত ও গলিত পদার্থ হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করে। সময়ে সময়ে পক্ষীরা চঞ্চুদ্বারা এই পাত্র দ্বিখণ্ডিত করিয়া অণ্ডোদ্গত কীটগুলি ভক্ষণ করে। এই জাতীয় উদ্ভিদগুলি আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া দেশে পাওয়া যায়।

Utricularia বা Bladderwort (ঝাঁঝি) এগুলি প্রায়ই জলে ভাসিয়া থাকে। হাজারিবাগে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রত্যেক পাতা বহুভাগে বিভক্ত এবং এক একটী পাতায় অনেকগুলি থলি (bladder) আছে। এই থলি ১/১০ ইঞ্চি লম্বা এবং প্রত্যেকের মুখে ৬।৭টী লম্বা শুঁয়া আছে। থলির মুখে একটী অন্তর্ম্মুখীন পাতলা মসৃণ পর্দ্দা valve আছে এবং এই পর্দ্দা অনেকগুলি গ্রন্থি দ্বারা এবং থলির আভ্যন্তরীণ পাত্র অনেকগুলি সূক্ষ্ম শুঁয়ার দ্বারা সমাবৃত। ছোট ছোট জলের কীট এই পর্দ্দা ভিতরদিকে ঠেলিয়া সহজেই থলির ভিতর প্রবেশ করে। প্রবেশ করার পরই পর্দ্দা বন্ধ হইয়া যায়। এই থলি হইতে কোন প্রকার রস নিঃসৃত হয় না। কীট এই থলিতে প্রবেশ করিয়া পচিতে আরম্ভ করিলে, তাহা হইতে এই গাছ কিছু কিছু রস শোষণ করে।—"ভারতী"।

ভারতে দিয়াশলাই।

যে সকল বিদেশীয় দ্রব্য এখন আমাদের পক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য্য হইয়াছে, দীপ-শলাকা বা দেশলাই তাহাদের মধ্যে অন্যতম। বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্যসমূহের মধ্যে ভারতে দেশলাইয়ের যেরূপ বহুল প্রচলন হইয়াছে, অন্য কোন দ্রব্যের সেরূপ হয় নাই। এরূপ গৃহস্থ অতি অল্পই আছে, যাহার বাটীতে বিদেশী দেশলাই প্রবেশলাভ করে নাই।

প্রতি বৎসর প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার দেশলাই ভারতে আমদানি হয়। ব্রিটিস অধিকৃত স্থান সমূহ ও সুইডেন এবং জাপান হইতে প্রধানতঃ দেশলাই ভারতে রপ্তানি হয়।

দেশলাইয়ের আবশ্যক সকলের সুতরাং উহার আমদানী ক্রমশঃ বাড়িয়তেছে। দেশলাই যতই সুলভ মূল্যে বিক্রীত হউক না কেন, উহাতে প্রচুর পরিমাণে লাভ করিতে পারা যায়। সেদিনকার

জাপান ৩২।৩৩ লক্ষ টাকার দেশলাই আমাদের [illegible] রে বিক্রয় করিতেছে। যদি আমাদিগকে এই দেশলাইয়ের ব্যবসায়ে জাপান অথবা সুইডেনের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়, তাহা হইলে এ দেশেই ভাল দেশলাই প্রস্তুত করিতে হইবে এবং সেই দেশলাই সুলভ মূল্যে বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে।

দেশলাইয়ের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, বিদেশীয়দিগের অপেক্ষা কোন কোন বিষয়েই বা আমাদিগের অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্টের বনজাত পণ্য দ্রব্য বিভাগের কর্ত্তা মিঃ আর এস টুরুপ মহাশয় সংপ্রতি একখানি পুস্তক প্রচার করিয়া আমাদের দেশলাইয়ের ব্যবসায়ে সুবিধা অসুবিধা লাভ লোকসানের বিষয় সুন্দররূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। মিঃ টুরুপ বলেন যে দেশেলাই প্রস্তুত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে দেখিতে হইবে যে,—

(১) দেশলাই নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠ পাওয়া যায় কি না; ভারতবর্ষে অরণ্যের অভাব নাই; কোন্ প্রদেশের অরণ্যজাত কোন্ কাষ্ঠ দেশলাই নির্ম্মাণের উপযোগী, তাহা মিঃ টুরুপ বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। দেশলাই নির্ম্মাণের জন্য ইহাই প্রথম দ্রষ্টব্য জাপানে দেশলাই নির্ম্মাণ করিবার কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না বলিয়া ইতিমধ্যেই জাপানকে সুইডেনের প্রতিযোগিতার জন্য চিন্তিত হইতে হইয়াছে। ভারতের অরণ্য সমূহে সাধারণতঃ যে সকল কাষ্ঠ পাওয়া যায়, তাহা লঘুভার এবং অসার বলিয়া অধিকাংশ স্থলেই ইন্ধন রূপে ব্যবহৃত হয়। মিঃ টুরুপ বলেন যে ঐ সকল কাষ্ঠে দেশলাইয়ের বাক্স ও কাঠি ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। দেশলাই প্রস্তুত করিতে হইলে লঘুভার ও অসার কাষ্ঠই আবশ্যক।

(২) শ্রমজীবি; ভারতে শ্রমজীবির অভাব নাই। এ দেশে যত অল্প পারিশ্রমিকে শ্রমজীবি পাওয়া যায়, বোধ হয় পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে সেরূপ পাওয়া যায় না। ভারতে শ্রমজীবিদিগের পারিশ্রমিক অন্যান্য দেশের পারিশ্রমিকের তুলনায় অত্যন্ত অল্প বলিয়াই আমাদের দেশের শ্রমজীবিরা নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও আফরিকা প্রভৃতি দেশে "কুলিগিরি" করিতে গমন করে। সুতরাং শ্রমজীবিদিগের পারিশ্রমিক হিসাবে জাপান বা সুইডেন অপেক্ষা আমাদিগকে অনেক অল্প অর্থ ব্যয় করিতে হইবে।

(৩) স্থলপথে, ও জলপথে কারখানা হইতে দেশের নানাস্থানে দেশলাই প্রেরণেও আমাদের দেশে নিতান্ত অল্প সুবিধা নাই। এ দেশে রেলপথে পণ্য দ্রব্যাদি প্রেরণ করিবার ব্যয় অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি সামান্য; জলপথের ব্যয়ও তদপেক্ষাকৃত অল্প সুতরাং সে বিষয়েও আমাদের যথেষ্ট সুবিধা আছে।

(৪) সুইডেন ও জাপানে দেশলাই নির্ম্মাণের জন্য কাষ্ঠগুলিকে প্রথমে "সিজন" করিয়া লওয়া হয়। আমাদের দেশে সেরূপ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ এদেশের অধিকাংশ কাষ্ঠই স্বভাবতঃ অন্যান্য দেশের সিজন্ করা কাষ্ঠের সহিত সমান। এই সিজন্ করিবার জন্য জাপানী ও সুইডিসদিগকে অর্থ ও সময় ব্যয় করিতে হয়। আমাদিগকে তাহা করিতে হইবে না।

(৫) আমাদিগকে জাহাজ ভাড়া দিতে হইবে না; এই হিসাবে আমাদের বড় অল্প লাভ হইবে না! সুইডেন অথবা জাপান হইতে যে দেশলাই

ভারতে আমদানী হয় তাহাতে শতকরা তিন টাকা জাহাজ ভাড়া দিতে হয়। আমাদিগকে জাহাজ ভাড়া দিতে হইবে না বলিয়া আমাদের লাভের অঙ্ক শতকরা তিন টাকা হিসাবে অধিক হইবে। ইহা বড় সামান্য লাভ নহে।

ভারতবর্ষে যে দেশলাইয়ের কারখানা নাই তাহা নহে ; ভারতবর্ষে এখন অন্যূন আটটি দেশলাইয়ের কারখানা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অভিজ্ঞ পরিদর্শকের অভাবে কোন কারখানা-তেই আশানুরূপ লাভ হইতেছে না। ভারতের কারখানা সমূহে লাভ না হইবার অন্য একটি প্রধান কারণ এই যে, কারখানার স্বত্বাধিকারীরা সাধারণতঃ এরূপ স্থলে কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যেখানে নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কলিকাতাতে দুইটি কারখানা আছে, তন্মধ্যে একটির কল কারখানা উচ্চ অঙ্গের এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। আরও কয়েকটি কারখানা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা হইতেছে। তন্মধ্যে মিঃ বেলার নামক একজন জার্ম্মাণ পঞ্জাবে একটি আদর্শ কারখানা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। জার্ম্মাণির বার্লিননগরে মিঃ বেলারের যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার একটা কারখানা আছে। তাঁহার কারখানায় দেশলাই প্রস্তুত করিবার জন্য যেরূপ উৎকৃষ্ট যন্ত্র নির্ম্মিত হয়, পৃথিবীর কোন দেশে সেরূপ হয় না। ভারতে যদি দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে প্রচুর লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে দেখিয়াই তিনি আপনার কারখানার নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি ভারতে প্রেরণ পূর্ব্বক এখানে কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কল্পিত কারখানাটি যে ভারতে দেশলাই প্রস্তুত করিবার আদর্শ কারখানা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এদেশের দেশলাই নির্ম্মাণের কারখানায় সকল দ্রব্যই সুলভে সরবরাহ করিতে পারা যায়, কেবল দেশলাইয়ের বারুদের মশলা সকল ইউরোপ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের সুলভতা হেতু এত অধিক লাভ হইবে যে, এই সামান্য ক্ষতি নগণ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেও কোন দোষ হইবে না।

বোম্বাইয়ে শিল্পসংক্রান্ত তত্ত্বানুসন্ধান।

বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা মন্ত্রণাসভার সচিববর্গের সহিত উক্ত প্রদেশের শিল্প সংক্রান্ত তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শিল্প বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান আরব্ধ হইয়াছে, বোম্বাই লাট তৎসমুদয়ের কার্য্যপ্রণালীর অনুশীলন করিতে-ছেন। প্রথমে বোম্বাই প্রদেশে তাঁতের কার্য্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার কথা স্থির হইয়াছিল এবং ইংলণ্ডে তন্ত-শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিপ্রাপ্ত মিঃ পি, এন, মেটা এই অনুসন্ধান কার্য্য সম্পাদনের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া-ছিলেন। এখন গভর্ণমেণ্ট বোম্বাই প্রদেশের চর্ম্মশিল্প সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশে এই শিল্প বিষয়ে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি না থাকাতে মিঃ গুথরিকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি লীডস নগরে চর্ম্ম সংক্রান্ত রসায়ন বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ভারতে সাত বৎসর কাল চর্ম্ম শিল্পের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া চর্ম্ম-শিল্প সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান জানুয়ারী

মাস হইতে মিঃ গুথরির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। তিনি ছয়মাসের জন্য চর্ম্মশিক্ষা সংক্রান্ত তত্ত্বানুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। তিনি চর্ম্ম-শিল্প সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার আদেশ পাইয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে তাঁহাকে বিশদ বিবরণ লিখিতে হইবেঃ—(১) চর্ম্ম সরবরাহ এবং যে অবস্থায় উহা চর্ম্মশিল্পীর হস্তগত হয়। (২) অধুনা চামড়ার ক্ষুদ্র বৃহৎ কারখানাসমূহে যে প্রণালীতে চর্ম্মপরিষ্করণ চলিতেছে। (৩) পরিষ্কৃত ও রঞ্জিত চর্ম্ম বিক্রয়। (৪) চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদি উৎপাদন। (৫) চর্ম্ম শিল্পে প্রবৃত্ত সর্ব্বশ্রেণীর ব্যবসায়ীদিগের আর্থিক অবস্থা।

জমান দুগ্ধ।

কলিকাতা বা বঙ্গদেশের অন্য কোন সহরে খাঁটি দুধের বড়ই অভাব হইয়া পড়িয়াছে। পল্লিগ্রামে ও অনেক জায়গায় দুধ মিলে না, এই জন্য জমান দুধ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদের দেশে জমান দুধের কারখানা নাই, সহরে বাজারে যাহা কিছু জমান দুধ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। এমন অবস্থায় যদি এ দেশে দুধ জমাইয়া বিক্রয় করিতে পারা যায় তবে লাভ আছে একথা সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। খাঁটি দুধ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পাঠান সকল সময় সুবিধা জনক নহে কারণ তাহাতে খরচও অধিক এবং দুধ শীঘ্র খারাপ হইবার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু জমান দুধ বড় সহজে খারাপ হয় না।

কিন্তু দুধ জমানর সময় বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। দুধ দোহনের অনতি বিলম্বেই জমান কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। গো-দুধের সহিত মহিষ দুধ বা অন্য কোন দুধ মিশাইতে নাই। এমন কি বিভিন্ন প্রকৃতি গাভী দুধের সংমিশ্রণও অবিধেয়। দুধ টাট্‌কা ও বিশুদ্ধ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

দুধ জমাইবার সময় যেন কিছু ভুল চুক না হয় কারণ একটু সামান্য কারণে সমস্ত দুধটা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কেবল পুথিগত বিদ্যা থাকিলেই দুধ জমান যায় না, একটু বহুদর্শিতা ও কার্য্যকারিতার আবশ্যক। সেই জন্য অল্প স্বল্প দুধ লইয়া প্রথম প্রথম কাজটা শিখিয়া পাকা হইতে হইবে।

দুধ জমাইবার অনেক উপায় আছে কিন্তু আমাদের দেশের জল হাওয়ায় যে প্রথাটা অবলম্বন করা বিধেয় তাহাই আমাদের আলোচ্য। এমন কি আমাদের দেশেও বিভিন্ন স্থানে উক্ত প্রথার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে।

৫০ ভাগ খাঁটি দুধ লইয়া তাহা জ্বাল দিতে হইবে কিন্তু সাক্ষাত সম্বন্ধে উত্তাপ পাইলে চলিবে না। এই কারণে একটি জলপূর্ণ কটাহ আগুনে চড়াইয়া সেই জলের মধ্যে দুধপূর্ণ পাত্রটি বসাইয়া দিতে হইবে যেন পাত্রটির গলা পর্য্যন্ত জলমগ্ন থাকে। এই অবস্থায় দুধে ক্রমাগত কাটি দিতে হইবে এবং যতক্ষণ না দুধ ঘন হইয়া শতকরা ২০ ভাগে পরিণত হয় ততক্ষণ নাড়িতে হইবে। অথচ জল বা জলীয় বাষ্প দুধের সহিত কোন প্রকারে মিশিবে না। ইতিমধ্যে একটু গরম দুধের সহিত ২ ভাগ বোরিক অম্ল মিশাইয়া উক্ত মিশ্রণ পুর্ব্বোক্ত দুগ্ধপাত্রে ঢালিয়া দিয়া পুনরায় একবার দুধ ভাল করিয়া কাটি দিয়া নাড়িয়া দিতে হইবে। বোরিক অম্ল প্রত্যেক দুগ্ধাণুর সহিত মেশা চাই। অতঃপর অর্দ্ধ ঘণ্টা নাড়িলেই যথেষ্ট হইবে। অতঃপর ঐ দুধ ছোট ছোট টিনে ঢালিয়া বায়ুবদ্ধ করিয়া আঁটিয়া

দিতে হইবে। বাহিরের হাওয়া দুধে লাগিলেই দুধ খারাপ হয়, এই জন্য ভাল করিয়া আঁটা আবশ্যক।

এ, কে, রায়।—Industry.

সলমা, চুমকি ও ডাকের কাজ।

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ের এক খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। সল্‌মা, চুমকি ও ডাকের সাজের ব্যবসায়ে বঙ্গদেশের কারিকরগণ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতেছে। অন্ততঃ মুসলমানদিগের সময়ে এই ব্যবসায়ে এ দেশের কারিগরগণ যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিল। ঝুটা ও সাঁচ্চা সল্‌মা, চুমকির কাজ এখনও ৺ কাশীধামের সোণারপুরা পল্লীতে বিস্তর মুসলমান কারিগরে করিয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গালা দেশের মালাকর জাতি সোলার মুকুট, টোপর, আঁচলা ইত্যাদি প্রস্তুত করে। আমরা সম্প্রতি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রকাশিত একখানি পুস্তক পাইয়াছি; পুস্তকের লেখক চব্বিশ পরগণার সবডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মল্লিনাথ রায়। এই পুস্তকে এদেশে সল্‌মা, চুমকি ও ডাকের সাজের ব্যবসায়ের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে; তাহাতে তিনি দেখাইতেছেন যে, তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় এই ব্যবসায়ের বেশ চলন ছিল। এক মেছুয়া বাজারেই নয়খানি দোকান ছিল; প্রত্যেক দোকানে কুড়ি পঁচিশ জন করিয়া কারিগর খাটিত, তাহাদের প্রত্যেকে দিনে গড়ে দুই টাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত উপায় করিত। ১৮৮৭ সালে একজন জর্ম্মাণ-ব্যবসায়ী কলিকাতায় আসিয়া কাজের নমুনা লইয়া যান। এক বৎসরের মধ্যেই জর্ম্মাণী হইতে কম দামে ডাকের সাজের আমদানি হইতে লাগিল। কিন্তু জর্ম্মাণীর আমদানিতে তখনও কলিকাতার ব্যবসায়ে বিশেষ কিছু ক্ষতি হইল না। কারণ তখনও জার্ম্মাণ কারিকরগণ এ দেশের মত সুন্দর কারুকার্য্য খচিত পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে নাই। ১৮৯৭ সালে এ দেশের শেষ আশাটুকু নির্ম্মূল হইল। ঐ সাল হইতে জার্ম্মাণী ঠিক এ দেশের মত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া এ দেশে পাঠাইতে লাগিলেন। এখন মেছুয়া বাজারে মাত্র তিনখানি দোকান আছে। কৃষ্ণনগর, ঢাকা, নেরপুর, পাটনা প্রভৃতি কয়েক স্থানেও এ ব্যবসায়ে অল্প-বিস্তর লোক খাটে। কিন্তু জার্ম্মাণীর আমদানিতে ব্যবসায়ে লাভ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। দেশের লোকে অল্পদামে জার্ম্মাণপণ্য পাইয়া দেশের নষ্টপ্রায় এই শিল্পের উন্নতিসাধনে পরাঙ্মুখ। এখন এ ব্যবসায়ে কারিগরগণ কোন রূপে উদরপূর্ত্তি করে মাত্র।

বিচিত্র উদ্ভিদ।—মলয়প্রদেশের কৃষি-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এক প্রকার উদ্ভিদ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই উদ্ভিদের পাতা ব্যবহার করিলে আফিং খাইবার প্রবৃত্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এক দল কাঠুরিয়া জঙ্গলে কাঠ কাটিতে গিয়াছিল। দীর্ঘকাল জঙ্গলে থাকায় তাহাদের চা ফুরাইয়া যায়। তখন তাহারা একটি বৃক্ষের পাতা শুকাইয়া চায়ের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। ইহারাই এই উদ্ভিদের আবিষ্কারক। মলয়ের খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ এই গাছের পাতা বিনা মূল্যে জনসাধারণকে বিতরণ করিতেছেন। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, যে সকল আফিংখোর এই পাতা ব্যবহার করিয়াছে, এক বৎসরের মধ্যে তাহারা আর আফিং স্পর্শ করে নাই।

কদলী।—আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে কদলী জন্মিয়া থাকে। উহা অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু বলিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে দিন দিন উহার আদর খুব বাড়িতেছে। ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া কলার পুষ্টিকারিতা গুণের বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, রুটী ও মাখমের ন্যায় কলাতে শরীরপোষণের যাবতীয় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। এদেশে অল্পায়াসেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণ কলা জন্মিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের ব্যবসা-বুদ্ধির অভাবে এই কলা বিদেশে রপ্তানী হইতে পারে না। এখন বিদেশীয়গণ ক্রমে ক্রমে যেরূপ কলার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িতেছেন, তাহাতে বিদেশে কলার রপ্তানী করিতে পারিলে দেশের অর্থাগমের একটি পথ প্রশস্ত হইবে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

আশ্বিন—সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর।

সব্জীবাগান।—এই সময় শীতের আবাদ ভরপুর আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বেই জলদি জাতীয় কপি, টমাটো, বিলাতি লঙ্কা প্রভৃতি বপন করা হইয়া চারা তৈয়ারি হইয়াছে। এই সময় নাবী জাতীয় বীজ বপন করিতে হয়। মূলজ সব্জীর চাষ এই সময় হইতে আরম্ভ। মূলা, সালগম, বীটের এই সময় চাষ আরম্ভ করিবে। বেগুন চারা ইতি পূর্ব্বেই ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে, সেগুলি এক্ষণে দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সীম, মটর বীজ এই সময় বপন করিতে হইবে। জলদি কপিচারা যাহা ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাতেও এই সময় মাটি দিতে হইবে ও পাকা পাতা গুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। আলুও এই সময় বসাইবে, পিঁয়াজ চাষেরও এই সময়।

ফুলের বাগান।—এই সময় এষ্টার, প্যান্সি, ভার্ব্বিনা, ডালিয়া, ক্লিয়াস্থাস, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুল বীজ বপন করিতে আরম্ভ করিবে।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই সময় বেগেনিয়া, জিরেনিয়ম প্রভৃতি কোমল গাছগুলির বিশেষ পাট করিতে হয়। এই সকলের কাটিং বসাইতে পারা যায়, কিন্তু পাহাড়ে অত্যন্ত অধিক বৃষ্টি হয়—সুতরাং সাসি দ্বারা আবৃত স্থানে সে সকল কাটিং পোতা উচিত। গোলাপের কলম (Budding) এখন করা যাইতে পারে—বিশেষতঃ হাইব্রীড পারপেচুয়াল জাতীয় গোলাপের, বডিং হইবে। চীনা, টি, বুরবন জাতীয় গোলাপের কাটিংও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এখন করা যাইতে পারে। বৃষ্টির সম্পূর্ণ অবসান না হইলে পার্ব্বত্যপ্রদেশে সব্জী তৈয়ারি করা হইয়া উঠে না। তবে আচ্ছাদনের ভিতর যত্ন করিয়া করিলে কিছু কিছু হইতে পারে। পর্ব্বতে দ্রাক্ষালতার এই সময় বড় বাড় হয়। সেগুলির কাটিয়া গোড়া খুঁড়িয়া একটু বাড় কমাইতে হইবে।

পশ্চিম ভারতে যেখানে বৃষ্টির আতিশয্য আদৌ নাই, তথায় গোলাপ হাপর হইতে নাড়িয়া বসাইয়া গোলাপ ক্ষেত তৈয়ারি করা যাইতে পারে। এই সময় উক্ত প্রদেশে ফুলকপির চারা ক্ষেতে বসান হইতেছে। আশ্বিন মাসের শেষে কার্ত্তিকের প্রথমেই তথায় ফুলকপি তৈয়ারি হইয়া উঠিবে।

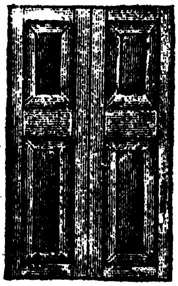
REGISTERED No. C. 192.

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

আশ্বিন, ১৩১৭।

সুলভে সেগুণ কাষ্ঠের ফার্ণিচার ও ইমারতি গড়ন প্রভৃতি।



আমরা মৌলমিন্ হইতে উৎকৃষ্ট সেগুণ কাষ্ঠ আমদানী করিয়া মফঃস্বলের গ্রাহকবর্গকে সর্ব্বপ্রকার আলমারী, টেবিল, চেয়ার, পানিল, খড়খড়ি, সার্সী প্রভৃতি অর্ডার মত প্রস্তুত করাইয়া অতি সামান্য মুনফা রাখিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। করোগেট আয়রণ, ষ্টীল জয়েষ্ট, টী আয়রণ, বোল্টনাট, বেড়ার কাঁটাওয়ালা তার প্রভৃতি এবং ফার্ণিচার ও ইমারতি গড়নের জন্য কল, কব্জা, ছিটকিনি, বল্ট, পরকলা, রঙ্গ প্রভৃতি আমাদিগের নিকট উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট অফিসার, মিউনিসিপালিটী ও অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আমাদিগের ফার্ম্ম হইতে সর্ব্বদাই দ্রব্যাদি লইয়া থাকেন। ঠিক জিনিষ উচিত মূল্য, প্রতারিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

বিস্তারিত বিবরণসহ জিনিষের লিষ্ট পাঠাইলে দর দিয়া থাকি: পত্র লিখিলে আমাদিগের সচিত্র ইংরাজী ক্যাটালগ (মূল্য নিরূপণ তালিকা) বিনা মূল্যে পাঠাইয়া থাকি: পরীক্ষা প্রার্থনীয়।—

এ, টী, দে এণ্ড কোং।

১৬২।১৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কিং এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

৮৩, হ্যারিসন রোড,

ব্রাঞ্চ—৪৫, ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের জন্য উপরোক্ত ঠিকানায় লিখুন।

আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা।

স্ত্রী পুরুষের রজঃ ও শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় দোষ ও তজ্জনিত ব্যাধিসমূহ নির্ম্মূল করণক্ষম এবং স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চারক। মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা এক টাকা মাত্র।

যিনি আমার নিম্নলিখিত ঠিকানায় আপনার নাম ধাম পাঠাইবেন, তাঁহাকে কলিকাতা পুলিশ কোর্টের মোকর্দ্দমা হইতে নির্ম্মুক্ত ও উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া পরিগণিত

কামশাস্ত্র

নামক একখানি উপযোগী পুস্তক বিনামূল্যে বিনা ডাকমাশুলে পাঠান যাইবে।

কবিরাজ শ্রীমনিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজুমদার এণ্ড কোং।

পেণ্টর্স ফটোগ্রাফার্স আর্টিষ্টস্ এণ্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

২২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আমাদের কারখানায় থিয়েটারের ষ্টেজ সম্বন্ধীয় সকল প্রকার সিন্ ড্রপসিন্ প্রভৃতি এবং সকল প্রকার অয়েল পেণ্টিং প্রতিমূর্ত্তি সুচারুরূপে অল্পমূল্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ রাজা, জমিদার প্রভৃতি মহোদয়গণের বাড়ীর কার্য্যই আমাদের প্রমাণ। সিনের মূল্য তালিকার জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন। আর সকল প্রকার দেশী বোম্বাই ছবি ও ফটো বাঁধাই এবং বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ম্যানেজার,

শ্রীবরদাপ্রসন্ন মজুমদার।

REGISTERED No C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



একাদশ খণ্ড,—৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

আশ্বিন, ১৩১৭।

কলিকাতা: ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট. ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

সূচী পত্র।

আশ্বিন, ১৩১৭ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২১। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵৹ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

KRISHAK

Under the Patronage of the Governments of Bengal and E. B and Assam.

THE ONLY POPULAR PAPER OF BENGAL

Devoted to Gardening and Agriculture. Subscribed by Agriculturists, Amateur-gardeners, Native and Government States and has the largest circulation. It reaches 1000 such people who have ample money to buy goods.

Rates of Advertising.

1 Full page Rs. 3-8. 1 Column Rs. 2.
½ Column Rs 1-8.

MANAGER—"KRISHAK,"
162, Bowbazar Street, Calcutta.

কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ খণ্ড। | আশ্বিন, ১৩১৭ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

কৃষি-প্রবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস লিখিত।

বৃষ্টি বিজ্ঞান।

ধান।

বাঙলা দেশে ধান্য একটি প্রধান চাষ। ধান চাষে অভিজ্ঞতা সকলেরই অল্প বিস্তর থাকা উচিত; সেইজন্য আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে ধান সম্বন্ধে চলিত প্রবাদগুলি একত্র সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিব।

ধান চাষে বৃষ্টি।

"আষাঢ় শ্রাবণে পূবে বাও।
হল তুলে দিয়ে বাণিজ্যে যাও॥"

আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হইয়া জমিতে জল দাঁড়ান নিতান্ত আবশ্যক। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে পূর্ব্বদিক দিয়া বায়ু বহিলে, বৃষ্টি খুব কম হয়। মধ্যে মধ্যে এক এক খানি মেঘ উঠিয়া সামান্য সামান্য বৃষ্টি হইয়া, উড়িয়া পশ্চিমদিকে চলিয়া যায়, সে মেঘের পরিসরও খুব কম। অনেক সময়ে মাথার উপর দিয়া বৃষ্টি হইতে হইতে চলিয়া যায়, কিন্তু উভয় পার্শ্বের আকাশ পরিষ্কার থাকে। পূর্ব্বদিক দিয়া বায়ু বহিলে বৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু সে বৃষ্টি এত সামান্য যে, তাহাতে অনেক সময়ে কৃষিকার্য্যের, বিশেষতঃ ধান চাষের কিছুই উপকার হয় না। তজ্জন্য লাঙ্গল তুলিয়া দিয়া বাণিজ্যে যাইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

"ভাদরে আশ্বিনে পূবে বাও।
আ'ল কেটে দিয়ে ঘরে যাও॥"

ভাদ্র মাসে পূর্ব্বদিক দিয়া বায়ু বহিলে অপেক্ষাকৃত অধিক বৃষ্টি হয়। ভাদ্র, আশ্বিন মাসে ধানের জমিতে প্রায়ই জল দাঁড়াইয়া থাকে। সে সময়ে অল্প জল হইলেও জমি জলপূর্ণ হইয়া থাকে। ভাদ্র, আশ্বিনে পূবে হাওয়া হইয়া বৃষ্টি হইবার সূচনা হইলে ধানের জমির আ'ল কাটিয়া দিতে হইবে।

"যদি বর্ষে মকরে।
ধান হয় টেকরে॥"

মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলে, তৎপরবর্ত্তী বৎসরে উচ্চ জমিতেও ধান্য জন্মে, অর্থাৎ সে বৎসর বর্ষায় প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে। তজ্জন্য উচ্চ জমিতেও আবাদ হইয়া ধান্য জন্মিবার কোন বাধা থাকে না।

"চৈত্রে হয় যদি বৃষ্টি।
হয় তবে ধানের সৃষ্টি।"

চৈত্র মাসে বৃষ্টি হইলে, পর বৎসর প্রচুর পরিমাণ ধান্য জন্মিয়া থাকে।

"পূর্ণ আষাঢ় দখিণা বয়।
সেই বৎসর বন্যা হয়॥"

যদি সমস্ত আষাঢ় মাস দক্ষিণদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, সে বৎসর নিশ্চয়ই বন্যা হইয়া থাকে।

"আমে ধান।
তেতুলে বান॥"

যে বৎসর প্রচুর পরিমাণে আম হয়, সে বৎসর অধিক ধান্য জন্মিয়া থাকে। যে বৎসর অধিক তেঁতুল হয়, সে বৎসর অতিশয় বন্যা হইয়া থাকে।

ধান চাষের সময়।

"আষাঢ়ের পুর, শ্রাবণের তের।
এর মধ্যে আবাদ যত পার॥"

সমস্ত আষাঢ় মাস এবং শ্রাবণ মাসের ১৩ই পর্য্যন্ত ধান্য রোপণের মুখ্য সময়। ঐ সময়ে ধান্য রোপণ করিলে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে। শ্রাবণের শেষের এবং ভাদ্র মাসের রোপিত ধান্য পূর্ব্বোক্ত সময়ের রোপিত ধান্যের সমতুল হয় না।

"আষাঢ়ে কাড়ান নাম্‌কে।
শ্রাবণে কাড়ান ধান্‌কে॥
ভাদরে কাড়ান শীষ্‌কে।
আশ্বিনে কাড়ান কিস্‌কে॥"

পূর্ব্বে বোনা ধানের অধিক প্রচলন ছিল। অধিকাংশ জমিতেই ধান্য বপন করিয়া, সামান্য জমি ধান্য রোপণ করিবার জন্য রাখা হইত। আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে ধান্য চারা একটু বড় হইলে এবং জমিতে জল দাঁড়াইলে, সেই জমিতে চাষ দেওয়াকেই কাড়ান কহে। আষাঢ় মাসে সকল বৎসর জমিতে জল দাঁড়ায় না এবং দাঁড়াইলেও সকল জমির কাড়ান হয় না; নাম মাত্র সামান্য কাড়ান হয়। যদি শ্রাবণ মাসে কাড়ান হয়, তবে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে। যদি ভাদ্র মাসে কাড়ান হয়, তবে প্রচুর ধান্য জন্মে না। ধান গাছের মূল হইতে নূতন চারা বাহির হয় না। কাড়ান দিবার পর যে ধান গাছগুলি অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতে শীষ বাহির হয় মাত্র। আশ্বিন মাসে ধানের গাছ বড় হয়, সে সময়ে কাড়ান অর্থাৎ জলের সহিত চাষ দিলে ধানের গাছগুলি পচিয়া যায়। কিছু মাত্র ধান হইবার আশা থাকে না।

"ভাদরে রুইলে শীষ্‌কে।
আশ্বিনে রুইলে কিস্‌কে॥"

সাধারণ জমিতে ভাদ্র মাসে ধান্য রোপণ করিলে, রোপিত ধান গাছের গোড়া হইতে অধিক পরিমাণে নূতন চারা বাহির না হইয়া, কেবল রোপিত ধান্য চারাগুলি হইতে শীষ বাহির হয়। আশ্বিন মাসে ধান্য চারা রোপণ করিলে, প্রায় কিছুই হয় না। কিন্তু উর্ব্বরা ভূমিতে ভাদ্র মাসে ধান্য চারা রোপণ করিয়াও প্রচুর ধান্য জন্মিতে দেখা যায়। এমন কি নদীর পলি পড়া মাটিতে আশ্বিন মাসে ধান্য রোপণ করিলে প্রচুর ফল পাইতে দেখা গিয়াছে।

"আষাঢ়ের খোবরে।
ভাদরের গোবরে॥"

আষাঢ় মাসের সামান্য জলে ভূমি কর্ষণ করিয়া ধান্য রোপণ করিলে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে, ভাদ্র মাসে গোবরের অর্থাৎ সারের উপর ধান্য রোপণ করিলেও সেরূপ ধান্য জন্মে না।

এই প্রকারের আর একটি বাক্য আছে,—

"আষাঢ়ে রোয় ফলকে।
শ্রাবণে রোয় দলকে॥
ভাদ্রে রোয় তুষকে।
আশ্বিনে রোয় কিসকে॥"

আষাঢ় মাসে ধান রোপণ করিলে ভাল ধান হয়, শ্রাবণে খড় (দল=গাছ) অধিক হয়, ভাদ্রে রোপণে ধানে শস্য হয় না, কেবল চিটা হয়। আশ্বিনে আদৌ কিছুই হয় না।

আষাঢ়ে ধান্য রোপণ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা আর একটি বাক্যের দ্বারা সপ্রমাণ হয়;—

"বৈশাখি বোনা, আষাঢ়ে রোয়া।
জায়গা হয় না ধান থোয়া॥"

বৈশাখে বীজ বপন করিয়া আষাঢ় মাসে ধান্য রোপণ করিতে পারিলে ধান রাখিবার স্থানে কুলায় না

"আশ্বিন মাসে না করে হেলা।
আ'লের উপর দিবে ঢেলা॥"

আশ্বিন মাসে বর্ষা প্রায় শেষ হইয়া যায়। বৃষ্টি খুব কম হইয়া থাকে। অথচ ধানের জমিতে ঐ সময়ে প্রচুর জলের আবশ্যক। তজ্জন্য আলস্য বা অবহেলা না করিয়া, আশ্বিন মাসে জমির আইলের উপর মাটির ঢেলা কাটিয়া দিতে হইবে; যেন জমির আইলের উপর দিয়াও জল বহিয়া না যায়।

"আষাঢ়ের পঞ্চ দিনে রোপয়ে যদি ধান।
সুখে থাকে কৃষিবল বাড়য়ে সম্মান॥"

আষাঢ় মাসের ৫ তারিখের মধ্যে ধান্য রোপণ করিলে প্রচুর ধান্য ও খড় জন্মায় এবং কৃষক হলবাহী বলদাদি লইয়া সুখে সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে।

অন্যত্র এইরূপ আর একটি প্রবাদবাক্য আছে,

"আষাঢ় মাস মধ্যে যদি রোপণ করে ধান।
সুখে থাকে কৃষিবল বাড়য়ে সম্মান॥"

আষাঢ় মাস মধ্যে যদি ধান্যচারা রোপণ করা হয়, তবে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে। প্রচুর ধান্য পাওয়ায় কৃষক সুখী ও সম্মানিত হয়।

"শ্রাবণে পুরো, ভাদ্রে বার।
এর মধ্যে যত পার॥"

সমস্ত শ্রাবণ ও ভাদ্রের ১২ তারিখ পর্য্যন্ত ধান্য রোপণ চলে। বলা বাহুল্য যে, ইতিপূর্ব্বেই বীজ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।

অতঃপর ধান্য বপন সম্বন্ধে বিহার অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদবাক্যগুলি সন্নিবেশিত করিতেছি;—

"অরদরা ধান, পুনরবস পৈয়া।
গেল, কিষাণ যে বোয়ে চিরায়ে॥"

অরদরা অর্থাৎ আদ্রাতে ধান্য বপন করিলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, পুনরবস অর্থাৎ পুনর্ব্বসুতে ধান বুনিলে চিটা (পৈয়া) হয়, চিত্রা নক্ষত্রে ধান বুনিলে কৃষাণ নষ্ট হয়।

"উত্তরায়ে* জমি রোপহু ভেইয়া।
তিন ধান হো'য়ে তের পৈয়া॥"

উত্তরফল্গুনীতে (ভাদ্রের শেষ ভাগে—ভাদ্র ২৮শে হইতে ১০ই আশ্বিন পর্য্যন্ত) ধান রোপণ

* আর্দ্রা—১০ই হইতে ২১ আষাঢ়; পুনর্ব্বসু ২২ আষাঢ় হইতে ৪ ঠা শ্রাবণ।

করিলে, যদি তিনটি ধান হয়, তবে ১৩টি চিটা হইবে।

"কুশী আমাবাস চৌটি চান।
অবকী রোপব ধান কিষাণ॥"

ভাদ্র মাসের অমাবস্যায় ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কুশ ঘাস মাটিতে রোপণ করে, এইজন্য ঐ অমাবস্যাকে কুশী অমাবস্যা বলে। কুশী অমাবস্যার পর চতুর্থীতে কৃষাণ আর তোমার ধান্য রোপণের আবশ্যক নাই, কারণ তাহাতে কোন ফল হইবে না।

ধান রোপণের সময় সম্বন্ধে উড়িষ্যাতেও একটি চলিত কথা আছে;—

"ফাল্গুন চাষা সোণা কষা।
চৈত্র চাষা কুটুম্ব পোষা।
বৈশাখে চাষা হাকিম পোষ:।
জৈৎ চাষা মুলিয়া চাষা।
আষাঢ় চাষা. বেলুহু বসা।"

ফাল্গুনে চাষ করিলে সোণা ফলে, চৈত্রে চাষ করিলে কুটুম্ব তরণের উপযুক্ত, বৈশাখে চাষ করিলে জমিদারের খাজনা পরিশোধ মত ধান জন্মে। জ্যৈষ্ঠের চাষে কৃষাণদিগের বেতন দিতে কুলায়, কিন্তু ধান চাষের জন্য আষাঢ় মাসে জমি চষা অপেক্ষা বন গমন বা আত্মহত্যা করা ভাল।

যুক্ত আহার।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু এম,আর,এ,এস, লিখিত।

যুক্ত আহার এবং তাহার সংগ্রহের উপায় কি? অধুনা এই সমস্যাই প্রধান সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। বাঙলা দেশের অনেক জায়গায় দুধ, ঘি, উপযুক্ত মাত্রায় মিলে না। পর্য্যাপ্ত না হউক, নিত্য না হউক, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত শরীর রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে খাওয়া চাই। যাহা হউক প্রাপ্ত বয়স্কেরা না হয় অপরাপর দ্রব্যের দ্বারা শরীর রক্ষা করিল, কিন্তু শিশুদের আর উপায়ান্তর নাই—দুধই তাহাদের এক মাত্র সম্বল। দুধ অভাবে বাঙলার অনেক শিশু ফেন্ ও সাবু প্রভৃতি খাইয়া রুগ্ন ও জীর্ণ শীর্ণ; এই কারণে বাঙলার শিশুর অকাল মৃত্যু যত এমন আর কোথাও নাই বলিলেই হয়।

যাহা না খাইলে শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না তাহাই যুক্ত আহার, যেমন শিশুর যুক্ত আহার গো দুগ্ধ। যাহাতে কোন রসের আধিক্য নাই তাহাই অন্ন—তাহাই নিত্য আহার্য্য, তাহাই যুক্ত আহার। চাউল, গম ও যব প্রভৃতি শস্য হইতে যে খাদ্য বস্তু প্রস্তুত হয় তাহাই সদন্ন। এই সকল খাদ্য বস্তুতে কোন একটা রসের আধিক্য নাই, সুতরাং এই গুলি নিত্য ব্যবহারে অসুখ নাই, অথচ ইহাতে শ্বেতসার প্রচুর আছে সুতরাং ইহা শরীর পোষক ও বীর্য্য বর্দ্ধক।

শিশু কিন্তু এই সকল শ্বেতসার প্রধান খাদ্য জীর্ণ করিতে পারে না সুতরাং দুগ্ধই তাহার এক মাত্র আহার।

দাইলও আমাদের দেশে নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য মধ্যে পরিগণিত। উত্তর পশ্চিম ও যুক্ত প্রদেশের

সাধারণ লোকের দাইল ও রুটীই এক মাত্র আহার। ইহাতে তাহাদের শরীর সম্পূর্ণ রক্ষা হয় বলিতে হইবে, কারণ তাহাদের দেহ সবল ও সুস্থ। বাঙলা দেশে নিত্য বা দু বেলা দাইল রুটী ব্যবহার করা চলে না। বাঙলার আর্দ্র ও শৈত্য প্রধান স্থানে পরিপাক ক্রিয়া কম হয় সেই জন্য ভাত দাইল বা ভাত মাছের ঝোলই এখানকার যুক্ত আহার। মাছের ঝোলের স্নিগ্ধকারিতা গুণ আছে।

দাইলের মধ্যে মসুর ও মাষকলাই অতি পুষ্টিকর। মৎস্য, মাংস এমন কি দুগ্ধ এতাদৃশ পুষ্টিকর নহে। এই জন্য এই দুই দাইল আমিষ মধ্যে গণ্য। আমাদের দেশের বিধবা এবং ব্রহ্মচারীগণ এই দুইটী দাইল আহার করেন না। মসুর দাইলে কিন্তু রুক্ষতা দোষ বা মাষকলায়ে শ্লেষ্মা বর্দ্ধনত্ব দোষ আছে। সেই জন্য মসুর দাইল, ঘৃত ও আদা ও হিং সংযোগে এবং মাষকলাই দারুচিনি ও জৈত্রী সংযোগে ব্যবহার করিতে হয়। মুগ ও বুটের দাইল অপেক্ষাকৃত কম তেজস্কর হইলেও প্রায় মৃগ মাংসের তুল্য পোষক। এই দুই দাইল নিত্য সকলে ব্যবহার করিতে পারে।

আলু ক্রমশঃ আমাদের নিত্য আহার্য্যের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিতেছে। কিন্তু রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় ইহাতে প্রায় ৯৫ ভাগ জল এবং ইহাতে যতটুকু পুষ্টিকর খাদ্য আছে তাহা সহজ পাচ্য নহে। এই জন্যই ডাক্তারেরা অধিক আলু খাইলে অগ্নিমান্দ্য বা ডিস্পেপ্‌সিয়া হয় বলিয়া অনুমান করেন।

মোটামুটি জানা উচিত যে ষড় রস আমাদের নিত্য সেবনীয়। কটু (ঝাল), তিক্ত, কষায়, অম্ল, লবণ এবং মিষ্ট এই কয়টি ষড় রস। কিন্তু কোন একটি রস যুক্ত দ্রব্য অধিক আহার করিতে নাই। লবণ যুক্ত তিক্ত দ্রব্য দিয়া ভোজন আরম্ভ করিতে হয়, তৎপরে লবণযুক্ত ঝাল অর্থাৎ ঝোল, দাইল প্রভৃতি ব্যঞ্জন, তাহপর লবণ ও মিষ্ট সংযুক্ত অম্ল বা দধি, তদন্তে মিষ্ট বা মধুর রসযুক্ত দ্রব্য খাইয়া আহার শেষ করিতে হয়। বলা বাহুল্য ভাত ও রুটীর সঙ্গে ঐ সকল দ্রব্য আহার বিধেয়।

যুক্ত আহারের কথা মোটামুটি বলা ও বুঝান যাইতে পারে কিন্তু এই উপযুক্ত আহার সংস্থান কি প্রকারে হয় ইহাই ভাবনার বিষয় হইয়াছে। বাঙলায় এমন অনেক চাষী আছে যাহারা নিত্য ব্যবহার্য্য অনেক দ্রব্যই উৎপন্ন করে, কিন্তু তাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জমি চষিয়া খুঁড়িয়া শস্য উৎপাদন করিলেও তাহাদের পর্য্যাপ্ত আহার মিলে না, ঋণ দায়ে ও করভারে তাহাদের সর্ব্বস্ব শোষিত হইয়া যায়। তাহাদের অবশেষে শাক, কচু, খুদ, কুঁড়া আহার করিতে হয়। যুক্ত আহার দূরে থাকুক, সব সময় প্রাণ রক্ষার উপযুক্ত আহারই মেলে না। আবার বৎসরের পর বৎসর অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হেতু শস্যহানি হইলে দেশময় হাহাকার পড়িয়া যায়, তাহাদের ত কথাই নাই। দেশে গোচারণের মাঠ নাই, উপযুক্ত পরিমাণ গাভী বলদও নাই। জমির জল নিকাশের বা জল সংস্থাপনের সুব্যবস্থা নাই। ইহার প্রতিবিধান কি ?

এমন অবস্থায় শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের ও ধনীগণের সাহায্য ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তাঁহারা যদি দেশের লোকদিগকে বাঁচাইতে চান তবে এক এক খণ্ড বিস্তৃত জমি লইয়া এক একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র রচনা করুন, চাষীগণকে তাহাদের কার্য্যের সহায় করিয়া লউন, স্বক্ষেত্রে জীবন ধারণ উপযোগী সমুদয় দ্রব্য উৎপন্ন হউক, স্বক্ষেত্রে বলদ গাভী রক্ষিত হউক, তাহাদের মলমূত্রে জমি সারবান হউক, বলদ দ্বারা ভূমি সুকর্ষিত হউক, গাভী দুগ্ধে শিশুর জীবন রক্ষা

হউক, তাহা হইলে কি আহার্য্য-শস্য, কি দধি-দুগ্ধ, ঘৃত, কিছুরই অভাব হইবে না এবং এতদ্বারা চাষীগণের ও গবাদির পর্য্যাপ্ত আহার মিলিবে, ধনীর ঐ কার্য্যে নিয়োজিত ধন অটুট থাকিবে, উপরন্তু তাঁহার আহার্য্য বস্তু অনায়াস লভ্য হইবে এবং উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা অপরাপর আবশ্যক মিটিবে।

এ বিষম জীবন সংগ্রামের দিনে ভূমি ভিন্ন আমাদের গতি নাই; দেশ রক্ষা করিতে হইলে, প্রজা রক্ষা করিতে হইলে, এই উপায় অবলম্বন শ্রেয়ঃ। যাহা কিছু ভূমি হইতে উৎপন্ন হইবে এবং যাহা সাধারণ প্রজার জীবন যাপনের জন্য ব্যয়িত হইবে, তাহাই আমাদের এক মাত্র সম্বল। আজ কাল ওকালতি, ডাক্তারি, বাণিজ্য, ব্যবসায়ে অনেকে অনেক পয়সা রোজগার করেন বটে এবং তাহাতে দেশের ধন বৃদ্ধি হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যে ধনে সাধারণ লোকের অধিকার নাই, সে ধন বৃদ্ধিতে সাধারণ প্রজার লাভও নাই। ব্যক্তিগত লাভে ব্যক্তি বিশেষের বিলাসিতা বাড়াইয়া দেয় মাত্র, দেশের যে দুরবস্থা সেই দুরবস্থাই থাকিয়া যায়। আমাদের এক্ষণে এমন সহজশ্রম শিল্পের অবতারণা করা উচিত যাহা দেশের টাকায় সংসাধিত হইতে পারে এবং যাহাতে সাধারণ লোক পোষণ হয়, এবং এমন ভাবে কৃষির পরিচালনা করা কর্ত্তব্য যাহা দ্বারা সাধারণ প্রজা পর্য্যাপ্ত আহার ও আচ্ছাদনের যোগাড় করিয়া লইতে পারে।

আশ্বিন—১৩১৭।

বিদ্যালয়-উদ্যান।

আজকাল শিল্প-শিক্ষাগার বা সাধারণ বিদ্যালয়ের সংলগ্ন এক একটি উদ্যান স্থাপন করিয়া ছাত্রগণকে উদ্যান রচনা ও কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার অনেক স্থানে ব্যবস্থা হইয়াছে এবং হইতেছে। পূর্ব্বে কৃষকের পুত্র পুরুষপরম্পরাগত অভ্যাস বশতঃ চাষবাস করিতে শিখিত। উদ্যান পালকের পুত্র উদ্যান কার্য্য শিখিত—গৃহই তাহাদের শিক্ষালয় ছিল। আগে অনায়াসে বা অল্পায়াসে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত, যেখানকার শস্য সেই খানেই থাকিত, তখন অভাবও অল্প ছিল, কোন প্রকার প্রতিযোগীতা ছিল না, সুতরাং অল্প পরিশ্রম ও অল্পায়াস স্বীকার করিলে, সাধারণ অভিজ্ঞতা লইয়া লোকে একপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিত।

এখন কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। কি প্রকারে জমি হইতে অধিক ফসল পাওয়া যাইবে, অথচ জমির কিম্বৎ অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে ও শিখিতে হইবে। অল্পস্থানে কি প্রকারে আবশ্যকানুযায়ী লতা গুল্মের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে,

কি প্রকারে নিজ ক্ষেত্র বা উদ্যান, সুপরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত থাকিবে, ইত্যাদিবিষয়ে এখন প্রধান আলোচনা প্রয়োজনীয়। সেই জন্য এই কৃষি-বিজ্ঞান ও উদ্যান রচনা শিখাইবার ব্যবস্থা।

বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও শিক্ষা পদ্ধতি ঠিকমত প্রবর্ত্তিত হয় নাই। শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত শিক্ষকগণ বালকদিগকে কি পুস্তক পড়াইবেন বা কিরূপ প্রণালীতে শিক্ষা দিবেন, তাহা অনেক সময় ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না। এইরূপ শিক্ষা সম্বন্ধে পুস্তকাদিও অতি বিরল। অনেক স্থলে শিক্ষকগণের অভিজ্ঞতাও তাদৃশ অধিক নহে, যে তাঁহারা নিজে নিজে একটা প্রণালী ঠিক করিয়া লইবেন।

বালকগণকে সামান্যতঃ উদ্ভিদতত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে। চিকিৎসা শাস্ত্র শিখিতে গেলে যেমন শরীরতত্ত্ব অবগত হইতে হয়, তেমনি উদ্ভিদগণের শিকড়, মূল, কাণ্ড, ত্বক, পত্র, পুষ্প প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া দেখাইতে হইবে; বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ওষধি পৃথক করিয়া চিনাইতে হইবে; কি প্রকারে উদ্ভিদগণ আহার গ্রহণ করে, কি প্রকারে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে, সূর্য্যালোকের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ কি; কি প্রকারে বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয়, কি প্রকারেই বা উদ্ভিদগণ ফুল ফল প্রসব করে ইত্যাদি বিষয় সহজ ও সরলভাবে ছাত্রদিগকে বুঝাইতে হইবে।

মৃত্তিকার সহিত উদ্ভিদের চির সম্বন্ধ। ভূমি হইতে উদ্গত হয় বলিয়া তাহারা উদ্ভিদ। কিন্তু এমন উদ্ভিদও আছে, তাহারা মৃত্তিকা হইতে উদ্গত হয় না, পরন্তু তাহারা পরজীবি—অপর বৃক্ষশাখা আশ্রয় করিয়া থাকে এবং বায়ুমণ্ডল হইতে তাহাদের আহার সংগ্রহ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। যাহা হউক সেগুলি বাদ দিলে সাধারণতঃ মৃত্তিকার সহিত উদ্ভিদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ একথা বেশ বুঝা যায়, সুতরাং উদ্ভিদতত্ত্ব জানিতে হইলে মৃত্তিকাতত্ত্বও জানা চাই।

কি প্রকারে মৃত্তিকায় সার ও রস সঞ্চিত হয়, মৃত্তিকার প্রাকৃতিক গঠন প্রভৃতি বিষয় ছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে, তবে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, ভূমি কর্ষণের আবশ্যকতা কি, সার প্রয়োগ ও জল সিঞ্চনের কারণ কি।

দুইটা বা চারিটা গাছের নাম শিখিলেই উদ্ভিদতত্ত্ব জানা হইল না, দু এক কোদাল মাটি উলটাইতে পারিলেই মৃত্তিকা বিচার করিতে শিখা যায় না। নিম্ন বিদ্যালয় সমূহে সম্পূর্ণ কৃষি-বিজ্ঞান ও উদ্যানতত্ত্ব শিখাইবার অবশ্য অবসর নাই। সেখানে ছাত্রগণকে অতি সামান্য মাত্র শিখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে; কিন্তু সকলেরই দেখা উচিত যে, শিক্ষা অল্প হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যেন ভুল শিক্ষা না হয় এবং অল্প বিস্তর মূল তত্ত্ব গুলি যেন তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হয়।

বিদ্যালয়ের বাগানটি কি প্রকার হওয়া উচিত, এসম্বন্ধে দুই এক কথা বলা এস্থলে আবশ্যক বলিয়া আমরা মনেকরি।

ঐ সকল উদ্যান স্বভাবতঃ ছোটই হইয়া থাকে। ছোট হইলেও উদ্যানটি যাহাতে সুন্দর ও সুদৃশ্য হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা প্রথম কার্য্য। উদ্যানের বেড়া, পাতাবাহার গাছের হইলে ভাল হয়। জল সংস্থানের জন্য নিকটস্থ কোন স্রোতস্বিনী হইতে পয়ঃপ্রণালী বা কূপ বা কৃত্রিম হ্রদ থাকা চাই। উদ্যানটির ঘাট, পথ এবং লতা গুল্মাদির এরূপ সন্নিবেশ আবশ্যক, যেন উহা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। বালকদিগের স্বভাবের সহিত এই প্রথম পরিচয় হইতেছে, যেন তাহারা তাহাদের এই স্বহস্ত রচিত উদ্যান হইতে স্বভাবের সহিত একটা

নিকট সম্বন্ধ পাতাইতে পারে। যদি সম্ভব হয়, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র কৃত্রিম পাহাড় বা উচ্চ নীচ ভূমি ভাগ রচনা করা মন্দ নহে—কৃত্রিম স্রোতস্বিনী, কৃত্রিম সেতু বা বাঁধ বাঁধিতে শিখিলে ছেলেদের শিক্ষা, সখ, দুই মেটে। এখন যাহারা বালক হইয়া শিক্ষা করিতেছে, ভবিষ্যতে তাহারা প্রভু হইতে পারে, তখন এ শিক্ষা তাহাদের কাজে লাগিবে এবং অনেকের পক্ষে ইহা অর্থকরী বিদ্যা না হইয়া ভবিষ্যতে তাহাদের উদ্যান বা বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি বিধানের হেতুভূত হইবে। ফল কথা এই যে, সকলেরই প্রাণ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়—মধুমক্ষিকা ও অন্যান্য পতঙ্গগণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ফুলে এত গন্ধ, এত সৌন্দর্য্য। উদ্যানটি সুন্দর হইলে ছেলেরা তৎপ্রতি মনোযোগী হইবে এবং স্থানীয় লোকেরও এই উদ্যানগুলি দেখিবার জিনিষ ও আদর্শস্থানীয় হইবে।

উদ্যানে নানা জাতীয় এবং ঐ সকল জাতির মধ্যে যেগুলি উৎকৃষ্ট এরূপ বৃক্ষ লতাদির সন্নিবেশ আবশ্যক। কারণ এই উদ্যানের বৃক্ষ লতাদি দেখিয়া স্থানীয় লোকে সেইগুলি জন্মাইবার চেষ্টা করিবে। শস্য উৎপাদনের জন্য পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, সেখানে যাহা হয় না এমন দুই এক রকম শস্য উৎপাদন করিয়া স্থানীয় শস্য-সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রত্যেক বালক যেন স্বহস্তে বৃক্ষাদি রোপণ করে এবং সেগুলিকে পালন করিতে শিখে। এইরূপে তাহারা বৃক্ষ-লতাদিকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে শিখিবে এবং বাল্য জীবনের এই শিক্ষা ভবিষ্যতে তাহাদের অশেষ কাজে লাগিবে।

বিদ্যালয়ের উদ্যানে যে কেবল জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় গাছগুলি থাকিবে, এমন নহে; তথায় সুন্দর বাহারী বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদির সমাবেশ হওয়া উচিত। মানব জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান করিতে গেলে সৌন্দর্য্যটা একেবারে বাদ দিলে চলে না।

কিন্তু কেবল বাহারী গাছ থাকিলেই উদ্যান সুন্দর দেখায় না—সেগুলি ঘাট পথাদির স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সুসজ্জিত করাই উদ্যান রচনার প্রধান কৌশল। আবশ্যকীয় ও বাহারী গাছগুলির একত্র সমাবেশ ও সুসজ্জাই ইহার মূলমন্ত্র। অনেকে নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি বৃক্ষাদি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে রোপণ করিয়া অকারণ উদ্যানের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলেন, অথচ সেইগুলি শ্রেণীবদ্ধ বা স্তবকে স্তবকে রোপিত হইলে সুন্দর দেখায়। এই সকল ক্ষুদ্র উদ্যান, এই হিসাবে আদর্শ হওয়া উচিত।

বালকদিগের ব্যবহারের জন্য কৃষি-যন্ত্রাদি কর্ম্মোপযোগী হওয়া উচিত বটে, কিন্তু কোদাল, খন্তা, কুঠার, নিড়ানি, কাঁচি প্রভৃতি যেগুলি ছেলেরা ব্যবহার করিবে সেগুলি অতিশয় ভারি না হয়—সেগুলি বালকগণের সহজে ব্যবহারের উপযোগী অথচ সুন্দর ও সুশ্রী হওয়া আবশ্যক।

বালকের ব্যবহারের উপযুক্ত নূতন ধরণের কৃষি-যন্ত্রগুলি বিদ্যালয়ের উদ্যানে প্রথম প্রচলিত হওয়া উচিত।

যে সকল বালক এই উদ্যানে কৃষি-শিক্ষানিরত থাকিবে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ সময়ের সদ্ব্যবহার শিখাইতে হইবে। সময় মত যে কাজ হয়, তাতেই সুফল, অসময়ে করিলে বিফল, কখন কখন কুফলও ফলে। বালকদিগকে সময়ে জমি কোপাইতে, সময়ে জমি নিড়াইতে, সময়ে গাছে জল দিতে, সময়ে বীজ বুনিতে, সময়ে চারা নাড়িয়া বসাইতে, সময়ে গাছ ছাঁটিতে, সময়ে শস্য আহরণ করিতে, শিখাইতে হইবে। অত্যাবশ্যক না হইলে,

সকালবেলাই উদ্যানের কার্য্য করা ভাল। উদ্যানের যন্ত্রগুলি, এমন কি ঝাড়ু ও ঝুড়ি প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্য, কর্ম্মান্তে সুপরিষ্কৃত করিয়া যথোপযুক্ত স্থানে রাখিতে শিখান কর্ত্তব্য। উদ্যানের কার্য্য করিবার সময় তাহাদের স্বতন্ত্র পোষাক হইলে ভাল হয়।

সুশিক্ষকগণ, বালকগণের সামর্থ্যানুসারে তাহাদের কাজের পরিমাণের তারতম্য বিধান করিবেন। সকলদিকে দৃষ্টি না থাকিলে এবং সুবিবেচক না হইলে সুশিক্ষক হওয়া যায় না।

নারিকেল।—ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল জন্মে; বৎসরে চারিবার নারিকেল ফলে; অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টির সঙ্গে ইহার তত অধিক সম্পর্ক নাই। ইউরোপ ও আমেরিকায় নারিকেল তৈল, নারিকেলের ছোবড়ার রজ্জুর বড়ই আদর। নারিকেলের মাখন দ্বারা অল্প দামে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। ফরাসী সৈন্যদের মধ্যে নারিকেলের মাখন ব্যবহারের প্রচলন হইয়াছে; ইউরোপের অনেক স্থানে ঘির পরিবর্ত্তে তাহাই ব্যবহার করে। নারিকেলজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কারখানা তৈয়ার করিতে বেশী মূলধনের দরকার করে না। আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকাতে নারিকেল খোসা সহিত রপ্তানী হয়। গত বৎসর যত নারিকেল রপ্তানী হইয়াছে তন্মধ্যে শতকরা ৩৮ জর্ম্মাণীতে, ২০ ইংলণ্ডে ও ১৮ আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

আমাদের দেশী লোকেরা নারিকেলের গুণ জানিয়া যদি নারিকেলের চাষ করে এবং কারখানা করিয়া নারিকেল হইতে নানাপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন করে, তবে তাহারা বেশ লাভবান হইতে পারে।

কৃষি যন্ত্রের ব্যবহার।

চাষের জন্য মাটি কোপান, মাটি উলট পালট করার উদ্দেশ্য বোধ হয় চাষী মাত্রেই অবগত আছে, তবে তাহারা এই মাত্র বুঝে যে ইহাতে ফসলের উপকার হয়। কেন উপকার হয় এবং কিসে উপকার হয়, আমাদের দেশের চাষীরা বুঝাইতে পারিবে না।

কোদাল বা লাঙ্গল দ্বারা মাটিতে চাষ দিলে মাটির ভিতরে রৌদ্র ও হাওয়া লাগিয়া মৃত্তিকাকে উর্ব্বরা করিয়া তুলে। মৃত্তিকাস্থিত পাঁক মাটি বা কালা মাটি বায়ুমণ্ডল হইতে এমোনিয়া আহরণ করিতে পারে এবং বায়ু সংস্পর্শে মৃত্তিকার কার্ব্বনিক ও নাইট্রিক অম্ল উৎপন্ন হইয়া নাইট্রোজেন যুক্ত জীবজ পদার্থগুলি শীঘ্রই উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী হয়। মাটিতে বৃষ্টির জল বসিবার সুবিধা হয় এবং মৃত্তিকার নিম্নস্তর পর্য্যন্ত খোদিত হওয়ায় অতিরিক্ত জল চুয়াইয়া বাহির হইয়া যাইবার রাস্তা সাফ্ হয়। মাটি চষিয়া খুঁড়িয়া গুঁড়া করিতে পারিলে তবে লতা ইত্যাদি তাহাতে তাহাদের শিকড় বিস্তার করিতে পারে। মাটি না চষিলে তাহাতে উপযুক্ত মাত্রায় রস বা উত্তাপ সঞ্চিত হয় না।

মাটি গভীর চাষের এত গুণ ইহা আমাদের দেশে অনেকেই কিন্তু ভাল করিয়া বুঝে না। ভাল চাষীরা, যাহারা চাষের মর্ম্ম বুঝিয়াছে, লাঙ্গলের পরিবর্ত্তে কোদাল দ্বারাই জমি কোপান সুযুক্তি বলিয়া মনে করে। কিন্তু অধিক জমি হইলে হাত কোদালে তত জমি কোপান সম্ভব নহে। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় এখনও সেই পূর্ব্বতন

লাঙ্গলাদি দ্বারা চাষাবাদ হয়, তাহাতে জমির উপর আঁচড় দেওয়া হয় মাত্র, ঐ সকল লাঙ্গলাদির দ্বারা মৃত্তিকা উপযুক্তরূপে খনিত হওয়া অসম্ভব। জমিতে মই দিবার প্রথাও অনেক স্থানে নাই। পূর্ব্বে এ প্রথায় এক রকম কায চলিত, কারণ নিত্য নূতন উর্ব্বরা জমি মিলিত এবং দেশের এত অভাবও ছিল না। এখন যে ভারতের নূতন ও উর্ব্বরা জমি ফুরাইয়া গিয়াছে এমন নহে, কিন্তু লোক সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি হওয়ায় এবং অভাব সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া ও সাময়িক নানা পরিবর্ত্তন হেতু, জমি চাষাবাদের সূক্ষ্ম তত্ত্ব গুলি কাজে লাগাইবার আবশুক হইয়া পড়িয়াছে। কলে চালিত কত কৃষি-যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, কত সস্তায় সেগুলি দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু সে সকল কৃষি-যন্ত্রের ব্যবহারের এখানে অবসর কোথায়! এখানে অদ্যাপিও একটা বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র রচিত হইল না এবং কৃষিকার্য্যে ধনী ও জমিদারগণ এখনও উদাসীন; তবে কে আর ঐ সকল যন্ত্রের ব্যবহার করিবে এবং কি প্রকারেই বা সস্তায় শস্য উৎপন্ন হইবে?

এখানে এখনও কুত্রাপি বীজ বপনের যন্ত্র ব্যবহৃত হয়,—হাতেই বীজ ছড়ান ও গাছ পোঁতা সর্ব্বত্রই হইতেছে। শস্য আহরণ কার্য্য এখানে এক বিষম ব্যাপার, কত পরিশ্রম এবং কত সময় যে লাগে তাহার ইয়ত্তা নাই; ধান, যব, ছোলা, যই সকলই হাতে কাস্তে দ্বারা কাটা হয়, কিন্তু আমেরিকায় এই কাটা, বাঁধা কার্য্য, যন্ত্রের সাহায্যে চক্ষের নিমিষে হয়। এখানে শস্য ঝাড়া, মাড়া, পরিষ্কার করা, কত ধীরে ধীরে, কত অধিক সময়ে, মানুষ ও বলদ দ্বারা সংসাধিত হয়, এই কাযের জন্য দুই তিন মাস সময় লাগিয়া যায় এবং কতক শস্য এই কারণে অগত্যা ঝড় বৃষ্টিতে নষ্ট হয়। একবার আমেরিকায় গিয়া দেখ দেখি—দেখিবে যে গম, যব, ভুট্টা ও অন্যান্য কড়াই, সরিষা ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে ঝাড়া, মাড়া ও পরিষ্কৃত হইয়া বিক্রয়ের জন্য বস্তাবন্দি হইতেছে। তথায় সময় অল্প লাগে, অল্প পরিশ্রমে হয় এবং খরচেরও অনেক সুবিধা হইয়া যায়। আমেরিকার কানসাস্ ষ্টেটের কথা ধর, দেখিবে সেখানকার জলহাওয়া, মাটি, প্রায় ভারতের অনুরূপ; সেখানে এক বৎসরে ১৯০৯ সালে ষোলকোটী নব্বই লক্ষ মণ শস্য, কলের সাহায্যে আহৃত হইয়াছে। আমাদের দেশের অনেকে ইহা রূপ কথা বলিয়া মনে করিবেন।

দিন দিন এখন জন মজুরের দাম চড়িয়া যাইতেছে, কোথাও বা মজুর মেলে না, ইহার উপর বিদেশী ব্যবসাদারগণের প্রতিযোগিতা আছে, এতদবস্থায় সস্তায় দ্রব্যাদি না তৈয়ারি করিতে পারিলে আমরা কত দিন টিকিব! সুতরাং এখনও কি আমাদের যৌথ কারবার খুলিয়া নূতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করিবার কথা ভাবিবার সময় আসে নাই?

খুচরা ব্যবসায়।

খুচরা জিনিষ বেচাকেনা অনেকে খুব সহজ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা নহে। ব্যবসায়ের তিনটি স্তর আছে, প্রথম দ্রব্য প্রস্তুত করণ, দ্বিতীয় ব্যবসায়ীদিগকে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় এবং তৃতীয় খুচরা খরিদ্দারকে দ্রব্য বিক্রয়। প্রথম দুইটী কার্য্য ব্যবসাদার, ব্যবসাদারে হইয়া থাকে, তাঁহারা উভয়ে শিক্ষিত অথবা ব্যবসাদারীতে অভ্যস্ত, সুতরাং সেখানে সমানে সমানে কাজ হয় বলিয়া, তত কিছু গোলযোগ নাই। কিন্তু খরিদ্দারকে জিনিষ দেখাইয়া বুঝাইয়া বিক্রয় করায় একটু নিপুণতার আবশ্যক হয়। খুচরা ব্যবসায়ীকে, লোকের ভাব গতি লক্ষ্য করিয়া চলিতে হয়, জিনিষ দেখাইবার রীতি পদ্ধতি শিখিতে হয়, ভদ্রোচিত অথচ চালাক চতুরের মত চালচলনে অভ্যস্ত হইতে হয়। যে কোন ব্যবসাই কর না কেন, ব্যবসায়ের মূল সূত্র সততা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম-কুশলতা। খুচরা ব্যবসাদারকে বিশেষতঃ বিনয়ী হইতে হইবে, এইরূপ ব্যবসায়ীর প্রত্যুৎপন্নমতি থাকা নিতান্ত প্রয়োজন এবং তাঁহাকে সব সময়ই একঘেয়ে রকম হইলে চলিবে না। নূতনত্বে মানুষ আকৃষ্ট হয়, সেই জন্ম তাঁহার চালচলনে নূতন নূতন ভাব থাকার প্রয়োজন হয়। খরিদ্দারের প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন তাঁহার অন্যতম কার্য্য, বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে তবে ব্যবসা স্থায়ী হয়, তবে তাহাতে উন্নতি হয়।

দোকান ঘরটি যথোপযুক্ত হইবে এবং দ্রব্যগুলি তাহাতে সুসজ্জিত থাকিবে। কাঠের গ্যালারী, বেঞ্চ বা আলমারি যেখানে যেরূপ আবশ্যক, তদুপরি জিনিষগুলি সজ্জিত হওয়া দরকার—সব জিনিষ যেন খরিদ্দারের নজরে পড়ে এবং সেগুলি সাজাইবার গুণে যেন ভাল দেখায়।

দোকান ঘরে চলা ফেরা করিবার যেন স্থান থাকে এবং আসবাব পত্রগুলি যেন নয়নরঞ্জন করে। ভাল রকম সাজসজ্জা দেখিলে তবে খরিদ্দার আকৃষ্ট হয়। দোকানদারকে একটি ভাল জায়গায় বসিতে হইবে, যেন সেখান হইতে সব জিনিষ তাঁহার সহজপ্রাপ্য হয়, তাঁহার বসিবার আদব কায়দাও আছে। অল্পস্থানে অধিক দ্রব্য সাজান এবং সুন্দররূপে সাজানই দোকান রক্ষার কৌশল। খরিদ্দারকে মাঝে মাঝে নূতন দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিতে হইবে—মাঝে মাঝে নূতনত্ব চাই; তা না হইলে খরিদ্দার ভুলে না। যে সকল জিনিষ দোকানে রাখিবে, তাহা যেন সব সময়ে ভাল রকমের হয়—সর্ব্বদাই খরিদ্দারে যেন সেই একই জিনিষ পায়, আজ ভাল, কাল মাঝারি, পরশ্ব মন্দ পাইলে, খরিদ্দারের মনে সন্দেহ জন্মিবে এবং তাহাতে পসার নষ্ট হইবে। খরিদ্দারের পসন্দ মত জিনিষ দোকানে রাখা আবশ্যক এবং নূতন নূতন দ্রব্যাদি দ্বারা খরিদ্দারের মন আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। নূতন জিনিষ প্রচলন সময়ে তাহার ভালমন্দ খরিদ্দারকে বুঝাইতে হইবে এবং সেই জিনিষ ব্যবহারে তাহাকে অভ্যস্থ করিতে হইবে এবং দরের কম বেশী খরিদ্দারকে বিনীত ভাষায় বুঝাইতে হইবে।

নিম্ন বঙ্গে গোলাপ।—বৈদ্যনাথ, দেওঘর, জামতাড়া, মিহিজাম প্রভৃতি নাতি শীতোষ্ণ পার্ব্বত্যপ্রদেশে সর্ব্বপ্রকার গোলাপ ভালরূপ জন্মিয়া থাকে, এমন কি সিংভূমে, ঘাটশিলাদি স্থানে সুন্দর গোলাপ হইতে আমরা দেখিয়াছি। দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় যে গোলাপ পার্ব্বত্য দেশেরই গাছ। যেখানে বরফ জমে বা তুষার পাত হয়, সেখানে গোলাপ খুব ভাল না হইলেও ইহা শীত প্রধান দেশেই হয়। আমরা কিন্তু আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া নিম্ন বঙ্গের সমতল ক্ষেত্রে দোয়াঁশ মাটিতে গোলাপের পরীক্ষা করিতেছি। এখানে খুব যত্ন করিলে বা বিশেষ সার প্রয়োগ করিলে গোলাপ বড় হয় বটে, কিন্তু পার্ব্বত্যপ্রদেশে যেমন সহজে বড় হয় এখানে তেমন হয় না। পার্ব্বত্য দেশে যেমন গোলাপের রঙ ভাল হয়, এখানে তেমন সুন্দর রঙ হয় না। কতকগুলি গোলাপগাছ বিশেষ যত্ন করিলেও এখানে অধিক দিন বাঁচে না বা আশানুরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। এখানে লা-ফ্রান্স গোলাপ প্রায় শতকরা ২৫ টা মরিয়া যায়। গ্রেস ডারলিং পার্ব্বত্য প্রদেশে যেমন জোর করে এখানে তেমন জোর করে না এবং শতকরা অনেক মরে। পারল্ ডি জার্ডিন লতানিয়া ধরণের গোলাপ, কিন্তু বাঙলা দেশে ইহাকে খুব লতাইতে দেখা যায় না। হার ম্যাজেষ্টি, প্রিন্স বিয়াট্রিস্ প্রভৃতি গোলাপের এ দেশে বড় বাড় নাই।

নিম্ন বঙ্গে গোলাপ চাষের আরও প্রতিবন্ধক এই যে এখানে মাটির শৈত্য পার্ব্বত্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী এবং শীত পড়িতে অনেক বিলম্ব হয়। মাটি গোলাপের প্রয়োজন মত শুষ্ক না হইলে ও শীত না পড়িলে গোলাপ ভালরূপ ফুটে না সুতরাং গোলাপ ফুটিতে এখানে অনেক বিলম্ব হয়।

আরও দেখা গিয়াছে যে দোয়াঁশ মাটি অপেক্ষা একটু ভারি কর্দ্দমাক্ত মৃত্তিকায় গোলাপ রোপণ করিলে ভাল হয় এবং প্রতি বৎসর নূতন অথচ শুষ্ক পাঁককাটি চূর্ণ প্রয়োগ করিলে গোলাপ গাছ তেজ করে।

পত্রাদি।

কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা।

ভারতীয় কৃষি-সমিতির (Indian Gardening Association) অনেক সভ্য ভারতে কৃষি শিক্ষা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন জানিতে চান। আমরা তাঁহাদিগকে পৃথক পৃথক পত্র দ্বারা না জানাইয়া গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা সংক্ষেপে এস্থলে উল্লেখ করিলাম;— ইতিমধ্যে কয়েকটি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং কৃষি-বিদ্যালয়-সমূহের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি করা হইবে; এবং কৃষি-শিক্ষার জন্য উপযুক্ত-রূপ পরীক্ষা ও 'ডিপ্লোমা' উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে। যাহারা কৃষি-বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবে এবং কৃষি-শিক্ষার সেই উপাধি পাইবার আশা করিবে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'ম্যাট্রিকিউলেশন' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই হইবে। কৃষি-বিদ্যালয়ে তিন বৎসর কাল তদানুসঙ্গিক পাঠ্যগ্রন্থ পাঠ ও কৃষি-কার্য্য শিক্ষার আবশ্যক। তিন বৎসরের পর পরীক্ষা। প্রধানতঃ পুষার কৃষি-কলেজের অধ্যাপকগণের সাহায্যে সেই পরীক্ষা পরিগৃহীত হইবে। বলা বাহুল্য, সকল কৃষি-বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের জন্যই একরূপ পরীক্ষা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সকলেরই একরূপ আশা-ভরসা। এই কৃষি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে যে উপাধি ('ডিগ্রি') দেওয়া হইবে, তাহা অনেকটা 'বি-এ' বা 'বি-এস-সি' উপাধির তুল্য হইবে, এবং সেইরূপ উপাধি-প্রাপ্ত ছাত্রগণের কাজ-কর্ম্মের বিষয়ও গভর্ণমেণ্ট সুবিবেচনা করিবেন। প্রাদেশিক

কৃষি-বিদ্যালয়সমূহের পরীক্ষা ও উপাধির সহিত যদিচ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না, এবং কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের হস্তেই এই কৃষি-শিক্ষা-বিভাগের সর্ব্বকর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকিবে, তথাপি কৃষি-বিদ্যালয়ের কার্য্য-সৌকার্য্যার্থের জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেবও সময় সময় সাহায্য ও পরামর্শ-দানে কুণ্ঠিত হইবেন না। কৃষি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের উপাধি গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য করিবেন; সে উপাধি আবশ্যক-মত গভর্ণমেণ্টের পুস্তক-পত্রিকাদিতেও প্রকাশিত হইবে। ঐ কৃষি-পরীক্ষার ডিগ্রির নাম "লাই-সেন্সিয়েট অব এগ্রিকল্‌চার"। ঐ 'ডিগ্রি' প্রাপ্ত হইয়া পুষা-কলেজে দুই বৎসর কাল পড়িলে, 'পোষ্ট-গ্রাজুয়েট' পরীক্ষা দিতে পারিবে। ছাত্রগণ তখন ইউরোপ আমেরিকায় গিয়াও কৃষিকার্য্য শিখিবার বিশেষ সুযোগ পাইবে। গভর্ণমেণ্ট মনে করেন,—এইরূপ পরীক্ষা-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে এদেশের কৃষি-বিভাগ-সমূহের অনেক কাজেই ভারতবাসীরা প্রবেশাধিকার লাভ করিবে।

পানে পোকা।

এই সম্বন্ধে আমরা অনেক পত্র পাইয়াছি। দুই চারি জনকে আমরা আমাদের অভিমত জানাইয়াছি কিন্তু সকলকে স্বতন্ত্র পত্রলেখা অসুবিধা হেতু আমরা কৃষকে আমাদের অভিমত প্রকাশ করিলাম। আমরা নানা স্থান হইতে পান আনাইয়া অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি। পচা পানে কখন কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণু লক্ষিত হইলেও সেগুলি মানুষের পক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাণহানিকর বলিয়া আমাদের মনে হয় না, এবং পান খাওয়ায় বিশেষ কোন বিপদের আশঙ্কা দেখিতে পাই না। আমরা এস্থলে গভর্ণমেণ্ট রসায়ন তত্ত্ববিদ ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয়ের অভিমতও সন্নিবেশিত করিলাম;—"বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অনেক পান পরীক্ষা করা গেল—কোনরূপ অনিষ্টকর দ্রব্য দেখিতে পাইলাম না।" কৃষক সম্পাদক।

সার কখন ব্যবহার উপযোগী হয়?

শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, জমিদার ও পূর্ব্ব বাঙলা ও আসামের ছোট লাট সভার সদস্য।

ফুল বাগানে—বিশেষতঃ গোলাপ গাছে ও সব্জী বাগানে, গাছের গোড়ায় যে ঘোড়ার ও গরুর মল সার রূপে দেওয়া হইবে, সেই মল কত দিনের পুরাতন হওয়া আবশ্যক?

আমরা ত মল, বিশেষ পুরাতন অর্থাৎ fermentation দ্বারা একেবারে মৃত্তিকার ন্যায় না হইলেও অন্ততঃ এক বর্ষের পুরাতন না হইলে গাছের গোড়ায় দিই না। তাহা দিলে গাছে পোকা হয় ও fermentation জনিত উত্তাপে গাছ মরিয়া যায় বলিয়াই আমাদের ধারণা। Barton West তাহার "Practical Gardening for Indian Amateurs গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় টাটকা সারের কথাই লিখিয়াছেন:—

"Of manures that of the horse is the most valuable in its fresh state, but is very liable by fermentation to lose much of its value" এই সকল পরস্পর বিরোধী উক্তির কোনটি অবলম্বনীয়?

১৩১৩ সালের কৃষকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাতে ৪৭ পৃষ্ঠাতেও ইহাই লিখিত আছে।

কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র দে F. R. H. S. মহোদয় প্রণীত কৃষিক্ষেত্র নামক পুস্তকের ১০৬-১০৮ পৃষ্ঠায় যেখানে সারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন

সেখানে খুব পুরাতন সার দিতে নিষেধ করিয়া অপেক্ষাকৃত টাটকা ২৩ মাসের অর্দ্ধ পচা মল দিতেই বলিয়াছেন। ১০৬ পৃষ্ঠা "টা কা সার হইতে দগ্ধ (fermented) সার কত লঘু ও হীনবল" p. 107 "টাটকা সার ব্যবহার করার পূর্ব্বে কথঞ্চিৎ উত্তপ্ত হইতে দেওয়া উচিত." p. 108 "পুরাতন সার মধ্যে সার পদার্থ অল্প থাকে; এজন্য উহার শক্তিও অধিক দিন থাকে না। সার ২৷৩ মাস স্তূপমধ্যে থাকিলেই ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে।"

২৷৩ মাসে অশ্বের বা গরুর মল প্রায়ই পচে না কতদিনের পুরাতন সার দেওয়া যাইতে পারে?

গোলাপ গাছের জন্য কোন বিশেষ সার আপনাদের নর্শরীতে আছে কি? কত মূল্যে পাওয়া যায়?

[পুরাতন ও পরিণত সার ব্যবহার করাই ভাল তখনই ইহাতে সঞ্চিত সার পদার্থ গুলি বৃক্ষ লতাদি গ্রহণ করিতে পারে, টাটকা অবস্থায় সেই পদার্থ গুলি বিদ্যমান থাকিলেও উদ্ভিদের গ্রহণ উপযোগী হয় না। সত্যই সার স্তূপে যে নাইট্রোজেন থাকে তাহা পচিয়া (Fermentation) এমোনিয়া কার্ব্বনেটে পরিণত হয় তখন ইহা অতিশীঘ্র উড়িয়া যায়। সার অধিক দিন রাখিয়া দিলেই ইহার কতক নাইট্রোজেন অংশ নিশ্চয়ই নষ্ট হইবে কিন্তু চেষ্টা করিয়া তাহা অনেক পরিমাণে নিবারণ করা চলিতে পারে এবং সার যতই পুরাতন হউক তাহার সারত্ব নষ্ট হয় না।

গর্ত্তে সার ভাল করিয়া চাপিয়া রাখিতে হয় এবং ইহার সহিত স্তরে স্তরে জিপসম, বা বোন সুপার বা কাইনিট চূর্ণ মিশাইয়া রাখিতে হয় এবং সারস্তূপের উপর ধুলামাটি ও তৃণের আচ্ছাদন দিতে হয়। এই রূপে সার রক্ষিত হইলে এমোনিয়া সহজে উড়িয়া যাইতে পারে না।

আমাদের গরম দেশে টাট্‌কা সার দেওয়া সুযুক্তি নহে, কারণ উত্তাপে উদ্ভিদের নিশ্চয়ই কিছু ক্ষতি হয়, অথচ সেই সার হইতে তখনই তখনই উদ্ভিদের বিশেষ কোন উপকার হয় না। শীতপ্রধান দেশে এই উত্তাপই উদ্ভিদের কাজে লাগে, সেই জন্য সেখানে অনেক সময় টাট্‌কা সার দেওয়া চলে। অধিকাংশ স্থলে আমরা বৈদেশিক গ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়া আমাদের মতামত প্রকাশ করি, সেই কারণে কিছু গোলযোগ হয়। সব দেখিয়া শুনিয়া দেশের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা দেওয়াই কিন্তু বিধি।

সার যদি রাখিবার সুবিধা না হয়, তবে শস্য ক্ষেত্র বা বাগানে, যেখানে গাছ বসান হয় নাই, সেইখানে লইয়া গিয়া জমির সহিত চষিয়া দেওয়া ভাল, তাহা হইলেও মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া সার জমিতেই সঞ্চিত থাকিবে এবং ক্রমে বৃক্ষ লতাদির গ্রহণোপযোগী হইয়া উঠিবে। আমরা এস্থলেএকটি সমীচীন বৈদেশিক মত উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না,—

"Farm yard manure is a "General manure"—that is, it supplies all the essential elements of plant food. The immediate return from an application of farm yard manure (Specially in its fresh state) is much less than from the same amount of plant food applied in artificial manures. The effect of Farm yard manure is spread over a considerable number of years, its nitrogen being chiefly present, not as amonia. but in the form of carbo-

nacious compound, which decompose but slowly in the soil." American Journal of Agriculture.

গোলাপের জন্য একটা মিশ্রিত সার আপনি তৈয়ারি করিয়া লইতে পারেন। এক ভাগ সরিষার খৈল, দুইভাগ পুরাতন পাঁকমাটি এবং দুই ভাগ পোড়া মাটি উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া প্রত্যেক গাছে অর্দ্ধ সের হিসাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। বৈদ্যনাথ, দেওঘরের মত পাহাড়ে কাঁকুরে মাটিতে পোড়া মাটী দিতে হয় না। খৈল যদি খুব তেজস্কর হয়, যদি খুব ঝাঁজ থাকে, তবে মিশ্রণটি তিন চারি দিন রাখিয়া তবে গাছের গোড়ায় দেওয়া কর্ত্তব্য। এসোসিয়েসন অফিসে গোলাপের জন্য এক প্রকার মিশ্র সার পাওয়া যায়।] কৃঃ সঃ।

চায়ে সার।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শিলকোট চা বাগান, পোষ্ট লোহাবা,

চায়ের সার কি? চায়ের গাছে হাড়ের গুঁড়া সার দিলে কোন উপকার পাওয়া যাইতে পারে কি না এবং যদি উপকার হয় প্রত্যেক গাছে কত পরিমাণ গুঁড়া দিতে হইবে?

[চায়ের জন্য পটাস, ফস্‌ফোরিক অম্ল ও নাইট্রোজেন সার রূপে আবশ্যক। ফস্‌ফরিক অম্লের জন্য আমরা হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করি কিন্তু হাড়ের গুঁড়া মাটীর রসের সহিত মিশিয়া সাররূপে পরিণত হইতে এবং বৃক্ষের গ্রহণোপযোগী অম্ল উপাদান করিতে বিলম্ব ঘটে, সেই জন্য হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার না করিয়া সুপার ফস্‌ফেট ব্যবহার করা আবশ্যক। হাড়ের গুঁড়ার সহিত সল্‌ফিউরিক অম্ল সংযোগে ইহা উৎপন্ন হয়। ইহাতে ফস্‌ফরিক অম্ল বৃক্ষের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় পাওয়া যায়। নাইট্রোজেন সারের জন্য খৈল ব্যবহার করিতে হয় এবং বৃক্ষ লতাদি পুড়াইয়া যে ছাই পাওয়া যায় কিম্বা শুক্‌না গোময় পুড়াইয়া যে ছাই হয়, তাহা দ্বারা পটাস সার প্রয়োগের কায হয়, কিন্তু ইহাতে না কুলাইলে খণিজ পটাস প্রয়োগ করিতে হয়।

প্রত্যেক বিঘা চায়ের ক্ষেতে মিউরিয়েট বা সলফেট অব পটাস ১ হন্দর, সুপারফসফেট ১ হন্দর ব্যবহার করিলে চায়ের ক্ষেতে উপযুক্ত সার দেওয়া হয়। তবে জমি বুঝিয়া সারের কম বেশী করা উচিত ও ঐ সারের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিমাণ চুণ মিশাইলে মন্দ হয় না। চুণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপকার সাধন করে।

এক বিঘাতে যত গুলি চায়ের গাছ আছে ঐ মিশ্রিত সার তত গুলি গাছে বিভাগ করিয়া দিতে হইবে।] কৃঃ সঃ।

কৃষি ও কৃষক।—রঙ্গপুর ইত্যাদি উত্তর বঙ্গ দেবমাতৃক দেশ, বৃষ্টির জলেই এ অঞ্চলে চাষাবাদ হইয়া থাকে; বৃষ্টি না হইলে, হৈমন্তিক আবাদ একেবারেই হয় না। এবার জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাস হইতেই খুব বৃষ্টি হইতেছে। যদিও পূর্ব্বের অতিবৃষ্টিতে আবাদের কতক ক্ষতি হইয়াছিল; কিন্তু পরে মধ্যে মধ্যে রৌদ্র হওয়াতে সে ক্ষতি প্রায় পূরণ হইয়া আসিল। এখনও বেশ বৃষ্টি হইতেছে, ইহাতে উচ্চ ভূমি রোপণের খুব সুবিধা হইয়াছে, কৃষকও প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া কৃষিতে লাগিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমাদিগের বিশ্বাস যে, এবার আবাদ ভালই হইবে। রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ ৩০ ভাদ্র।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

পঞ্জাবে আখ।—১৯১০। পঞ্জাবের ২২টি জেলায় আখের চাষ হয়। এবারে তথায় কিছু কম জমিতে আখের আবাদ হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের জমির পরিমাণ ৩৯১,৯০০ একর, বিগত বর্ষে ৪১১,৭০০ একর পরিমাণ জমিতে আখের আবাদ হইয়াছিল। মাঘ, ফাল্গুনে বৃষ্টি কম হওয়ায়, খালে জল ছিল না বলিয়া এবং সম্ভবতঃ ইক্ষু রোপণের সময় গুরগাঁ ও দিল্লিতে প্লেগ দেখা দেওয়ায় আখের আবাদের পরিমাণ তথায় এত কম হইয়াছে।

অন্যান্য স্থানে আখের বর্ত্তমান অবস্থা ভাল কিন্তু রোটকে খুব জলের অভাব হইয়াছে।

বঙ্গে ইক্ষু চাষের বর্ত্তমান অবস্থা।—১৯১০। আখের চাষ বিহারেই খুব অধিক, তদ্ব্যতীত বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মুর্শীদাবাদ, হাজারীবাগ, ও মানভূমেও ইক্ষু চাষ সমধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। রোপণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি আবহাওয়া আখ চাষের বেশ অনুকূল বলিতে হইবে। চাষও ভাল হইতেছে।

বিগত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বর্ষে কিছু অধিক জমিতে আখের আবাদ হইয়াছে। ১৯০৯ সালের জমির পরিমাণ ৩৩৭,৫০০ একর, এবৎসর ৩৪০,৬০০ একর পরিমাণ জমিতে আখ চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। যতদূর দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে গুড়ও অন্য বৎসর অপেক্ষা কম হইবে না।

বঙ্গের অনেক স্থলে সুধু ইক্ষু গুড়ের উপর নির্ভর করিতে হয় না, জায়গায়, জায়গায়, খর্জ্জুর ও তালের গুড় যথেষ্ট পাওয়া যায়। যশোহর ইহার মধ্যে খেজুরগুড়ের প্রধান আড্ডা। ইক্ষুগুড় বাদে খর্জ্জুর গুড়ও বঙ্গে প্রায় ১,৩১৭,৯৫১ হন্দর (হন্দর =১ মণ ১৫ সের) উৎপন্ন হয় এবং তালের রস হইতে বৎসরে প্রায় ১৫,৬৪৭ হন্দর চিনি জন্মায়।

মেদিনীপুর কাঁথিতে চাষের জন্য জলের অভাব—এ বৎসর বর্ষার প্রারম্ভে সুবৃষ্টি দেখিয়া আশা হইয়াছিল যে, উত্তম ধান্য ফসল হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান ভাদ্র মাসে অনাবৃষ্টি বশতঃ সে আশা ফলবতী হইবে না এক্ষণে এরূপ আশঙ্কা হইতেছে। কাঁথির নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামের মাঠে জল কমিয়া যাওয়ায় ধান্য চারাগুলি শীর্ণ হইয়া গেলেও একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় নাই বটে, কিন্তু আরও কিছুদিন যদি বৃষ্টি বন্ধ থাকে, তাহা হইলে সেই সকল ধান্যচারা যে নষ্ট হইবে না এরূপ আশা করা যায় না। উত্তরস্থিত দূরবর্ত্তী অনেক গ্রামে জলাভাব কষ্টের গুরুত্ব অধিকতর অনুভূত হইতেছে। রামনগর থানার অন্তর্গত অনেকগুলি গ্রামে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। কাঁথির দক্ষিণস্থ হরিপুর হইতে পশ্চিমাভিমুখে ভোগরাই পর্য্যন্ত সমুদ্রপুর, বালীসাই, করঞ্জী, রঘুনাথপুর, চাঁদপুর, হাউড়বুড়ি, নচ্ছন্দরপুর, বিষ্ণুপুর, দেউলী, বারাঙ্গা, পালধুই, চন্দনপুর, জগদীশপুর, চন্দনেশ্বর, বসন্তপুর, বেগুণাড়িহা, গদাধরপুর, কাশীপুর ও বীরকুলা প্রভৃতি বঙ্গোপসাগরের তীরবর্ত্তী স্থান সমূহের এবং রামনগর থানার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব পশ্চিমাংশস্থিত বহু গ্রামের উচ্চ ভূমি সকল জলাভাবে "পতিত" অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। নিরন্ন গরীব প্রজাদের গৃহে এখন হইতে হাহাকার উঠিতেছে। আবাদ নষ্ট হইলে বর্ত্তমান বৎসরের খাজনা আদায় দুরূহ হইবে। নৈসর্গিক জলাভাব কৃত্রিম উপায়ে দূর হইতে পারে কিনা খাসমহলের ম্যানেজার ও

সব্ ম্যানেজার মহাশয়গণের অনুগ্রহপূর্ব্বক সে বিষয় সরেজমীনে দেখিয়া শুনিয়া স্থির করা ও তদনুসারে কার্য্য করা আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি। কৃত্রিম উপায়ে জল দিবার ব্যবস্থা পূর্ত্ত-বিভাগ করিবেন সত্য, কিন্তু রাজস্ব বিভাগ হইতে যদি পূর্ত্তবিভাগ জল দিবার উপায় সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ হন, তাহা হইলে সহজে এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিবে। সে বৎসর যখন মিঃ হেফারম্যান্ মহোদয় কাঁথির পূর্ত্তবিভাগের সব্ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন, তখন কাঁথির দক্ষিণ ও উত্তরাংশের মাঠে জলাভাব হইলে তিনি তদানীন্তন সব্ডিভিসনাল অফিসার মিঃ টেলারের পরামর্শ-মতে সুবর্ণরেখার জল কেনেল পথে আনাইয়া প্রজাদের অনেকটা উপকার করিয়াছিলেন। তাহাতেই আমরা জানি যে, এ প্রদেশের অনাবৃষ্টি বশতঃ জলকষ্ট সুবর্ণরেখার জল দ্বারা দূর করা একেবারে অসম্ভব নহে। সে বৎসর অনেক সময়ান্তে, অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে, জল আনান সত্ত্বেও অনেকটা উপকার হইয়াছিল, এ বৎসর এখনও সময় অতীত হয় নাই, এ সময় আমরা আমাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সহৃদয় সব্ডিভিসনাল অফিসার মিঃ গিয়ারী সাহেব বাহাদুরকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি যেন এ বিষয়ের বিহিত প্রতিকার করিয়া গরীব প্রজাদিগকে আশঙ্কিত অন্নকষ্ট হইতে অব্যাহত রাখেন।—"নীহার" ২১ ভাদ্র।

সার-সংগ্রহ।

মালদহে সরিষার চাষ।

সরিষা এদেশের লোকের পক্ষে একটী লাভ-জনক খন্দ। রবি শস্যের মধ্যে সরিষা সর্ব্ব প্রধান, ইহা ভারতে চিরদিনের শস্য, অন্য কোন বিদেশ হইতে আনীত হয় নাই। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে সর্ষপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এক্ষণে মালদহ জেলায় যে প্রণালীতে সরিষার আবাদ হইয়া থাকে, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল।

সরিষার চাষের পক্ষে উচ্চ ডাঙ্গাজমীই প্রশস্ত, তবে যে সকল জমীতে বন্যার জল উঠিয়া আবার কার্ত্তিক মাসে নামিয়া যায় ও বেশ শুষ্ক হয়, সেই জমীতেও ইহার চাষ ভাল হয়। বরং উচ্চ ডাঙ্গা জমী অপেক্ষা বন্যাপ্লাবিত জমীতেই ফলন বেশী হয়; কারণ ঐ জমীতে বন্যার পলি পড়িয়া উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে, উচ্চজমীতে সার দেওয়ার আবশ্যক হয়। ইহার চাষ করিতে হইলে প্রথমে চৈত্র-বৈশাখ মাসে, জমীতে বেশ উত্তম করিয়া চাষ দিয়া তাহাতে আশু ধান্য, পাট, কলাই, কাওন প্রভৃতি আশু ফসল আবাদ করিয়া নাগাদ আশ্বিন মাসের মধ্যেই ঐ সকল ফসল উঠিয়া গেলে, পরে কার্ত্তিক মাসে পুনরায় চাষ দিয়া উচ্চ জমী হইলে, তাহাতে কিছু পুরাতন গোময়, ছাই, পচাপুকুরের পাঁক প্রভৃতি সার দিতে হয়, অনন্তর জমীতে বেশ রস থাকিতে থাকিতেই সর্ষপ বপন করিতে হয়। জমীর রস শুষ্ক হইয়া গেলে সরিষা ভাল হয় না।

এক বিঘা জমীতে ৵২ দুইসের বীজ হইলেই হয়। বীজ বপনের ৫।৭ দিনের মধ্যেই গাছ হয়, এক মাসের গাছ হইলেই উহা ফুলে সুশোভিত হইয়া উঠে, পরে ফল ধরে। মাঘ মাসেই সরিষা

পাকিয়া উঠে। তবে যেগুলি নাবি করিয়া অর্থাৎ কার্ত্তিকের শেষ কিম্বা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ভাগে বপন করা হইয়াছে, ঐগুলি ফাল্গুন মাস নাগাদ পাকিয়া থাকে। সরিষা বেশ পাকিয়া উঠিলেই উহা গাছসহ উপাড়িয়া ২।৩ দিবস রৌদ্রে শুকাইয়া ৩।৪ দিন গাদা করিয়া রাখিতে হয়, এইরূপ গাদা করিয়া শুমাইবার প্রয়োজন এই যে, ইহাতে তৈল ভাল হয়। অনন্তর গাদা ভাঙ্গিয়া রৌদ্রে উত্তমরূপ শুষ্ক করিয়া ঝাড়িয়া লইতে হয়। ঝাড়ান সরিষা ২।৪ দিন ভাল করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখা উচিত। গাদা মাড়িয়া রাখিবার সময় বৃষ্টি পাইলে সরিষার বর্ণ কাল হইয়া যায়, ও দরেও কম বিক্রীত হয়। এ জন্য এবিষয়ে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। যে সরিষার বপন জন্য বীজ রাখিতে হইবেক, তাহা শুমাইলে বীজ ভাল হয় না। উহা মাঠ হইতে গাছ সমেত তুলিয়া আনিয়া রৌদ্রে উত্তমরূপ শুষ্ক করত বীজ ঝাড়িয়া রাখিবে।

যথানিয়মে সার ইত্যাদি দিয়া বেশ করিয়া চাষ আবাদ করিলে জমী বিশেষে ৩।৪ মণ বিঘা প্রতি ফলিতে দেখা যায়। এক বিঘা জমীতে রীতিমত চাষ আবাদের খরচ ৩।৪ টাকার বেশী পড়িবে না, বিক্রীদর ৪৲ টাকা মণ হইলেও কৃষকের বিঘায় ১০।১২ টাকা লাভ থাকিতে পারে।

সরিষা সাধারণতঃ তিন প্রকার হয়। শ্বেত সর্ষপ, লাল সর্ষপ ও কালী। কাজলী সরিষাকে এ অঞ্চলে রাই সরিষা বলে, তিন প্রকার সরিষারই তৈল হয়। তবে শ্বেত ও লাল সরিষারই বেশী, রাইএর তৈল খুব কম হয় ও ইহার ঝাঁজ বড়ই তীব্র, এ জেলায় লাল সরিষারই চাষ অধিক পরিমাণে হয়। বাকী দুই প্রকার অত্যল্প হইয়া থাকে। শ্বেত সরিষার চাষ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বেশী হয়। শ্বেত ও লাল সরিষার উভয়ের গুণ সম্বন্ধে কোন প্রভেদ নাই। কাজলী সরিষার যদিও তৈল কম হয়, তথাপি ইহা তরকারীর সহিত ব্যবহার হইয়া থাকে, আরও একটী বিশেষ গুণ এই যে, কোন বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে এই রাই গরম জলের সহিত বাটিয়া খাইলে বমি হইয়া যায় এবং বিষক্রিয়া সহজে নষ্ট হয়। গো-চিকিৎসাতেও ইহা নানা ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

সরিষার যেমন উৎকৃষ্ট সদ্গন্ধ এবং সদ্‌গুণ বিশিষ্ট তৈল হয়, এমন উত্তম তৈল অন্য কোন জিনিসের হয় না। খাওয়া, মাখা, জ্বালানী, সকল রকমেই চলে; খৈলেও অনেক গুণ আছে। সরিষার খৈলের তরল সার প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষ লতাদিতে দিলে উহার তেজ বৃদ্ধি হয়। গরুকে খাওয়াইলে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান হয়, এবং লাঙ্গল, গাড়ী, ইত্যাদি টানিতে বিশেষ মজবুত হইয়া থাকে, জমীতে সর্ষপ খৈল সাররূপে ব্যবহার করা যায়। ইহাতেও জমীর উৎপাদিকা শক্তি খুব বৃদ্ধি হয়।

এক মণ সরিষাতে ১৩।১৪ সের আন্দাজ তৈল ও অবশিষ্ট খৈল হয়। প্রায় ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে কেরোসিন তৈলের ব্যবহার ছিল না, তখন এক সর্ষপ তৈলে খাওয়া, মাখা, জ্বালান প্রভৃতি সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইত, এবং দরও বেশ সুবিধা ছিল, টাকায় ৴৩ সের তৈল পাওয়া যাইত; এত অধিক খরচ সত্ত্বেও সরিষার তৈলের দাম অতি সুলভ ছিল। আর এখন কেরোসিন, রেড়ি, তিল, পোস্ত, নারিকেল, তিসি, ইত্যাদি অনেক তৈল ব্যবহৃত হইতেছে, তথাপি সরিষার তৈলের বাজার দিন দিন আগুন হইতেছে, এখন দেড় সের দুই সেরের বেশী টাকায় পাওয়া যায় না। খৈলেরও অতি সুলভ মূল্য ছিল, আট দশ আনা মণের বেশী

ছিল না, এখন তাহাও সময় সময় ১৷৷০, ২৲ বা তদূর্দ্ধ পর্য্যন্ত মণ বিক্রয় হইতেছে। তৈল ও খৈল মহার্ঘ হইবারই কথা। সরিষা এত মহার্ঘ হইবার কারণ পূর্ব্বে অধিকাংশ কৃষকই সরিষা বপন করিত। তাহাতে প্রচুর সরিষা পাওয়া যাইত এবং দামও সুলভ ছিল। এখন শতকরা ২০।২৫ জন সরিষার আবাদ করে, তাহাও রীতিমত হয় না। এজন্য সরিষাও কম উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু লোকের সরিষার তৈল ব্যবহার না করিলে ত চলে না, সুতরাং অনেকস্থলে লোকেরা কলের বিষাক্ত তৈল ব্যবহার করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট, কাপড় চোপড় অপরিষ্কার ও দেহের উজ্জ্বল বর্ণ মলিন করিতেছে। এমন হিতকর ও লাভজনক ব্যবসায়ে কাহারও অবহেলা করা উচিত নয়।

চায়ের আবাদ।

চায়ের ব্যবহার এক্ষণে দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার আবশ্যকতা দিন দিন অনুভূত হইতেছে। আবাদ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে চায়ের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চীন এবং জাপান ভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও চার চাষ আবাদ ছিল না এবং আর কোন দেশে চা জন্মিতে পারে বলিয়াও কেহ অবগত ছিল না। জনৈক সাহেব আসামের অরণ্য মধ্যে প্রথমতঃ চা বৃক্ষের আবিষ্কার করেন। তদ্দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় যে, ভারতবর্ষেও চা জন্মিতে পারে। তৎপর ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রথমতঃ চার আবাদ আরম্ভ হয়। প্রথমে কেবল আসামেই চার চাষ হইতে আরম্ভ হইয়া অবশেষে ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই চার চাষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কয়েকটি চা-ক্ষেত্র এবং এক একটা সম্প্রদায় মিলিত হইয়া কার্য্যাদি করা হইতেছে, চীন এবং জাপানে সেরূপ নয়। আমাদের দেশে যেমন সকল কৃষকই ন্যূনাধিক ধানের চাষ করিয়া থাকে সে দেশে সেইরূপে চার চাষ করে। সে দেশে কৃষকদিগের চা প্রস্তত করিতে হয় না, প্রস্তত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। কৃষকেরা কেবল মাত্র পাতা তুলিয়া লইয়া সেই সকল কারখানায় বিক্রয় করে। ভারতবর্ষের চা-প্রদেশ সকলেও কৃষকেরা অল্প অল্প করিয়া চা ক্ষেত্র করিতে আরম্ভ করিলে, কালে এদেশেও তদ্রূপ (পাতা ক্রয় করিবার) কারখানা অথবা সম্প্রদায় হইতে পারে। কৃষকেরা অন্যান্য কার্য্যের সঙ্গে যদি অল্প অল্প পরিমাণে চা ক্ষেত্র করে, তবে তাহাতে অধিক ব্যয় আবশ্যক হয় না, বরং অন্যান্য অনেক কৃষি অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে এবং সহজ পরিশ্রমে সম্পাদিত হইতে পারে। চা গাছ অনেক কাল জীবিত থাকে। চীন, জাপানে ৫০০ বৎসরের চা-বাগিচাও বর্ত্তমান আছে শুনা যায়।

চার ব্যবহার সমুদায় ইউরোপব্যাপী; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেশেও ন্যূনাধিক রূপে চার ব্যবহার প্রচলিত আছে। একমাত্র গ্রেট ব্রিটনে প্রতি বৎসর ১৪ কোটি টাকার চা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর ন্যূনাধিক ৩ কোটি টাকার চা রপ্তানি হইতেছে। চীন এবং জাপানের স্থানীয় ব্যবহার ভিন্ন ৩০ কোটি টাকার চা অন্যান্য দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। দিন দিন যেমন চার আবাদও বৃদ্ধি পাইতেছে তেমন সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকতাও বৃদ্ধি পাইতেছে। চার আবাদ বৃদ্ধি হওয়ায় মূল্য কমিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবার যাঁহারা আশঙ্কা করেন তাঁহাদের ভ্রম।

চা আবাদের উপযুক্ত স্থান।—স্বভাবতঃ যে স্থানে সর্ব্বদা উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত

হয়, অথচ সেই বায়ুতে আর্দ্রতা অধিক থাকে (রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বায়ুর এই গুণ অতি সহজে পরীক্ষা করা যাইতে পারে), যে স্থানে বসন্ত ঋতুতে অপেক্ষাকৃত অধিক বৃষ্টিপাত হয়, বর্ষাকালে রৌদ্র বৃষ্টি সমপরিমাণে থাকে, অর্থাৎ ক্রমাগত অনবরত বৃষ্টি না হয়, কখন রৌদ্র কখন বৃষ্টি হয়, সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অন্ততঃ ২।৩ বার বৃষ্টি হয়, শীত ঋতুতে অত্যন্ত হিমপাত হয় (কিন্তু বরফ না পড়ে), গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত কম থাকে, বর্ষার জলে ক্ষেত্র প্লাবিত না হয়। এই সকল গুণ বিশিষ্ট স্থান, চা আবাদের পক্ষে উত্তম উপযোগী।

এ'ত গেল, স্থানীয় প্রাকৃতিক লক্ষণ। এ ভিন্নও কতকগুলি লক্ষণ দেখা আবশ্যক। ভূমির উর্ব্বরতা সর্ব্বদা দেখা আবশ্যক। স্থানীয় জল বায়ুর স্বাস্থ্যকারীতা, মালামাল আমদানি রপ্তানির যোগ্য নদী, খাল অথবা অন্য রকম সুবিধা, সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী জলের সুবিধা, স্থানীয় কুলির সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা, এই সকল বিবেচনা করা আবশ্যক। নগর কি উপনগরের নিকটবর্ত্তী স্থান পাইলে অধিক সুবিধা, অন্ততঃ বাজার, বন্দর এবং লোকালয় অধিক দুরবর্ত্তী না হয়। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া কার্য্যক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিতে হয়।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে আসাম, কাছাড়, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, দারজিলিং (নিম্ন প্রদেশ), দারজিলিং (হিমালয়), দেরাদুন, কাংগ্রা, কমাউন, নিলগিরি-শ্রেণী, মান্দ্রাজ, রাঁচি, নাগপুর, হাজারিবাগ, জলপাইগুড়ি, ভুটান, মণিপুর প্রভৃতি স্থানে চা জন্মিতেছে।

এ ভিন্ন কাশ্মীর, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, এই সকল রাজ্যেও চা জন্মিতে পারে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আমরা বোধ করি ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই চা জন্মিতে পারে, তবে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা সকল স্থানে না থাকিতে পারে। অধুনা ঢাকার অন্তঃপাতী ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানেও অল্প অল্প চার চাষ হইতেছে, তবে ফসল তত সুবিধা হইতেছে না।

যে সমস্ত চা প্রদেশের নাম উল্লেখ করা হইল, তাহার সমুদায় স্থানেই যে চার চাষ হইতে পারে তাহা নয়, স্থানীয় অনেক লক্ষণের দ্বারা স্থান নির্ব্বাচন করিতে হয়। বর্ত্তমানে যে সমস্ত স্থানে চা জন্মিতেছে তন্মধ্যে উপর আসাম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

উল্লিখিত সকল চা-প্রদেশে কিম্বা তদন্তবর্ত্তী সমুদায় বাগিচাতেই সর্ব্বপ্রকার সুবিধা রহিয়াছে তাহা নয়, অনেক স্থানেই কোন না কোন প্রকার অসুবিধা আছে। কদাচিৎ কাহার ভাগ্যে সর্ব্ব-প্রকার সুবিধাও ঘটিতে পারে।

উল্লিখিত চা প্রদেশ সমূহের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে এস্থলে কতকটা সংক্ষেপ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আসাম সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, কিন্তু আসামেও অসুবিধা আছে। আসামে বর্ষাকালে পর্য্যায়ক্রমে রৌদ্র বৃষ্টি হয় না, আমদানি রপ্তানির অসুবিধা। কাছাড়ের প্রধান গুণ, বসন্ত ঋতুতে বৃষ্টি অধিক হয় এবং বর্ষাকালেও রৌদ্র বৃষ্টির অবস্থা আসাম অপেক্ষা ভাল, কিন্তু ভূমি তেমন সারবিশিষ্ট নয়। আসামাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর. আমদানি রপ্তানি সম্বন্ধে আসাম অপেক্ষা ভাল, কাছাড় দ্বিতীয় স্থানীয়। * চট্টগ্রাম,—ভূমি উর্ব্বরা। বর্ষাকালে অতি বৃষ্টির অনিষ্ট নাই, কিন্তু বসন্ত ঋতুতে বৃষ্টি হয় না। তাহাতেই চা অধিক জন্মে না, কাছাড় অপেক্ষা

* কাছাড় এবং দারজিলিং এই উভয়ের মধ্যে কে দ্বিতীয় কে তৃতীয় তাহাতে সন্দেহ আছে।

জল বায়ু স্বাস্থ্যকর, কুলির সুবিধা আছে এবং আমদানি রপ্তানি সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা চট্টগ্রামে অধিক সুবিধা। চট্টগ্রাম তৃতীয় স্থানীয়। দারজিলিং নিম্ন প্রদেশ—ভূমি উর্ব্বরা, আসাম, কাছাড় অপেক্ষা স্থানীয় কুলির সুবিধা, কিন্তু আমদানি রপ্তানি পক্ষে সুবিধা নাই। শ্রীহট্ট—কাছাড়ের সদৃশ, কাছাড় অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। এতদ্ভিন্ন আর যে সকল স্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে সে সকল স্থান অধিকাংশ বিষয়েই নিকৃষ্ট, কেবল মাত্র কুলির সুবিধা। যেমন ফসলও কম হয়, তেমন ব্যয় কম পড়ে, স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও প্রায় সকল স্থানই নিকৃষ্ট, কেবল কাংগ্রা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট। এই সকল সুবিধা অসুবিধা যতই থাকুক কিন্তু ভারতবর্ষের কোন স্থানেই কোন চা-কর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন এরূপ শুনা যায় নাই।

আমরা চট্টগ্রাম হইতে দারজিলিং পর্য্যন্তই চা আবাদের পক্ষে অধিক উপযোগী মনে করি। ইহার স্থান বিশেষের গুণের ন্যূনাতিরেক থাকিলেও অনুপযোগী নহে। সমুদায় চা প্রদেশের সমালোচনা করিতে হইলে তাহাতেই প্রায় একখানি সাধারণ রকম পুস্তক হইতে পারে।

চা-ক্ষেত্রের জমি।—ভূমির গুণাগুণেরউপরই চা-ক্ষেত্রের লাভের ন্যূনাতিরেক নির্ভর করে। অন্যান্য কৃষিক্ষেত্রের ন্যায় চা-ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ করিয়া বাগিচা নির্ম্মাণ করা সুবিধাও নয়, ব্যয়ও সহজ নয়। এপর্য্যন্ত যতগুলি চা-বাগিচা হইয়াছে, অন্যূন ১০০ একশত একরের কম বাগিচার কথা প্রায় শুনা যায় নাই। এইরূপ বিস্তারিত ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ করিতে হইলে চাতে আর অধিক লাভ থাকে না।* সারদিলে উপকার না হয় তাহা বলা হইতেছে না। কিন্তু সাধারণতঃই যে ভূমি অধিক উর্ব্বরা এবং সমধিক সারবিশিষ্ট, সেই স্থল নির্ব্বাচন করাই বিধি। স্থানীয় লোকে চা-বাগিচা করিলে তাহার পক্ষে ক্ষেত্র, বাড়ীর নিকটস্থ হওয়ায়, কথঞ্চিৎ অনুর্ব্বরা হইলেও সার প্রয়োগ করিয়া চা-বাগিচা করায় অসুবিধা নাই, যে ব্যক্তি দূরদেশ হইতে গিয়া চা-বাগিচা করিবে তাহাকে অবশ্য সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম স্থান দেখিয়া বাগিচা করাই উচিত। তাহার পক্ষে সকলই দূরদেশ। চার পক্ষে অস্থিচূর্ণই উত্তম সার। রেড়ির খইল দ্বিতীয়, গোবর চতুর্থ শ্রেণীর সার। সারের গুণানুসারে অল্পাধিক প্রয়োগ করিতে হয়।

ভূমি নির্ব্বাচন করিতে অনেক গুলি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়। আঠালমাটি একেবারে চার অনুপযোগী। যে মৃত্তিকা বসন্ত ঋতুতে স্বভাবতঃ ফাটিয়া যায়, তাহাতে চা হইতে পারে না। নিরবচ্ছিন্ন বালিতে কোন উদ্ভিদ্‌ই ভাল জন্মে না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দোয়াঁশ মৃত্তিকাই উত্তম; কিন্তু কেবল ইহার দ্বারাই ভূমির লক্ষণ স্থির হইল না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, 'কাল বর্ণ মৃত্তিকা চা-ক্ষেত্রের অনুপযোগী।' আমরা এ কথা স্বীকার করি না, যে মৃত্তিকার উপর নানাবিধ পলিত সার স্তূপাকারে জমিয়া মৃত্তিকার বর্ণ কাল হইয়াছে, তাহা চা ক্ষেত্রের পক্ষে উত্তম উপযোগী। (আঠাল মাটির যে কৃষ্ণবর্ণ লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাই অনুপযোগী; সে কেবল চা কেন সকলেরই অনুপযোগী)। যে মৃত্তিকা সহজে চূর্ণ করা যায়, অর্থাৎ একখণ্ড মৃত্তিকা এক হাতের উপরে রাখিয়া অন্য হাতে চাপ দিলে সহজে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় তাহা চা-ক্ষেত্রের উপযোগী। বালির

---

* কোন কোন স্থানে সার দেওয়ার ব্যবহারও হইয়াছে, কিন্তু সে অধিকাংশই পুরাতন বাগিচা, এখন ফেলিয়া গেলে ক্ষেত্রের ক্ষতি হয় বলিয়াই এরূপ ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, তবে যেখানে কুলি সস্তা ও সারও সুলভে পাওয়া যায়, সেখানে দিলে লাভ হয়।

ভাগ অধিক থাকিলেও সহজে এরূপ চূর্ণ হইয়া থাকে, অতএব তাহার আরও পরীক্ষা করিতে হয়। সেই চূর্ণীকৃত মৃত্তিকায় একবিন্দু জল দিয়া হস্তে ডলিলে দলা হইতে পারে, ফাটিয়া না যায়। বালির ভাগ অধিক থাকা জানিবার জন্য সেই হস্ত রৌদ্রের দিকে ধরিলে বালুকাকণা সকল চিক চিক করে, তাহাতে বালির ন্যূনাধিক্য জানা যায়। ক্ষেত্রের কোন এক স্থান অন্যূন ২ ফিট পরিমাণ খনন করিলে, নীচে উত্তম শুভ্র বর্ণ মৃত্তিকা পাওয়া যায় এবং উপরে অন্ততঃ ৫।৬ ইঞ্চি পরিমাণ পলিত উদ্ভিদাদির স্তর থাকে, তাহা উত্তম জ্ঞান করিতে হইবে, কিন্তু ইহার নীচের মৃত্তিকাও কঠিন না হয় রসাল থাকে, অথচ জল না উঠে। মৃত্তিকার অত্যন্ত সিক্ততাও চার অনিষ্টকারী এবং একেবারে নীরস শুষ্কতাও অনিষ্টকারী, তথাচ অধিক সিক্ততা অপেক্ষা শুষ্কতা ভাল।

ক্ষেত্রের উপরিভাগের একখণ্ড মৃত্তিকা শুষ্ক করিয়া দগ্ধ করিলে যদি পাঁচ ভাগের এক ভাগ কমিয়া যায়, তবে তাহা উত্তম উর্ব্বরা ভূমি জানা যাইবে। ইহার ন্যূনাধিক্যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টতার ন্যূনাধিক্য জ্ঞান করিতে হইবে। এ ভিন্ন আর এক উপায় আছে—সাধারণতঃ, ভিন্ন এক স্থানের (চা-ক্ষেত্রের অনুপযোগী স্থানের) একখণ্ড মৃত্তিকা ও নির্ব্বাচিত ক্ষেত্রের তৎপরিমাণ এক খণ্ড মৃত্তিকা, উভয়কে শুষ্ক করিয়া ওজন করিলে যদি নির্ব্বাচিত ক্ষেত্রের মৃত্তিকা ১৬ ভাগের ১ ভাগ ওজনে কমিয়া যায়, তাহা হইলে মৃত্তিকা উত্তম জ্ঞান করিতে হইবে।

যে স্থান ঘন নিবিড় তৃণ গুল্মাচ্ছন্ন জঙ্গলময়, চা-ক্ষেত্র তদ্রূপ স্থান দেখিয়া মনোনীত করা উচিত। সেই জঙ্গলাদি শীত ঋতুর সময় সতেজ থাকে, কি নিস্তেজ হয়, তাহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। সতেজ থাকিলে তাহাতে উদ্ভিদাদির পলিত সার অধিক আছে বুঝিতে হইবে, বৃহৎ বৃক্ষাদিবিশিষ্ট জঙ্গলে তত পরিমাণ সার থাকে না। অত্যন্ত উচ্চ নীচ বন্ধুর বা অত্যধিক উচ্চ টিলা ভূমি, চা-ক্ষেত্রের পক্ষে উত্তমোপযোগী নহে; প্রথমতঃ তাহাতে পলিত সারাদি অধিক থাকিতে পারে না, বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া নীচে গড়াইয়া পড়ে, দ্বিতীয়তঃ ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ কোদালী দেওয়াতে মাটি আল্গা হইতে থাকে, আর বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া গাছের গোড়ার মাটি নীচে নামিয়া গিয়া শিকড় ভাসিয়া উঠে ও গাছ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তৃতীয়তঃ তদ্রূপ ক্ষেত্রে সার দিলেও সুবিধা হয় না, তাহাতেও উক্ত কারণ ঘটে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব চা-কর সাহেবদের বিশ্বাস ছিল যে উচ্চ টিলা ভিন্ন চা জন্মিতে পারে না। এখন তাঁহারা পরিতাপিত হইতেছেন, অনেকে তৈয়ারি বাগিচা পরিত্যাগ করিয়া সমতল স্থানে বাগিচা করিতেছেন।† কিন্তু সমতল ক্ষেত্র উত্তম হইলেও এরূপ স্থান না হয় যাহাতে বৃষ্টির সময় চতুর্দ্দিকের জল আসিয়া ক্ষেত্র প্লাবিত করে, কি জল অধিক সময় স্থায়ী থাকে। গাছের গোড়ায় জল জমিয়া থাকিলে কি মৃত্তিকায় সিক্ততা থাকিলে, গাছ বাড়িতে পারে না এবং পত্রশালী হয় না। যেখানে নিতান্ত তদ্রূপ সম্ভাবনা ঘটে, সেখানে ক্ষেত্রের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন দিকে ৪। ৫ ফিট পরিমাণ গভীর নালা করিতে হয়, তারপর ক্ষেত্রের অবস্থানুসারে ২০ হাত ব্যবধানে (গাছের চারিটী শ্রেণী অন্তর) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা করিয়া বড় নালার সহিত যোগ করিয়া দিতে হয়। ক্ষুদ্র নালা সকলও ২ ফিটের কম গভীর না হয়। এইরূপ করিলে আর কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। ঐ নালা সকল প্রতিবৎসরই কিয়ৎ পরিমাণে ভরিয়া যায়, ক্ষেত কোপাইবার সময়

† আমরা নিকৃষ্ট বাঙ্গালী হইলেও এবং সাহেবদের এই সংস্কার জন্মিবার পূর্ব্বেই সমতল ক্ষেত্রে বাগিচা করিয়াছিলাম। তখন কোন সাহেব হাসিয়াছেন।

সেই নালার মাটি ক্ষেত্রে তুলিয়া দেওয়াতে অনেক উপকার হয়। ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী ঝর্ণা কি ঝিল প্রভৃতি যাহাতে সর্ব্বদা জল থাকে, সেই জল বিশিষ্ট স্থান হইতে ক্ষেত্র যদি অন্যূন ৪ ফিট উচ্চ না হয় তবে তাহা চা ক্ষেত্রের উপযোগী হইবে না, কারণ নালার দ্বারা তাহার সিক্ততা দূর করা যাইবে না। সিক্ততা নিবন্ধন, গাছের বৃদ্ধি এবং পরিপুষ্টি হইতে পারিবে না।

যে পরিমাণ স্থানের পাট্টা কি অন্যরূপ বন্দোবস্ত করা হয়, তাহার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ স্থানে আবাদি জঙ্গল রাখা আবশ্যক, কয়লা এবং কাষ্ঠের আবশ্যক, এই জন্য কতকটা জমি পতিত রাখিতে হয়। যেখানে বিস্তৃত জঙ্গল নিকটে থাকে এবং তাহা কাটিতে কেহ বাধা না দেয়, সেখানে রাখা আবশ্যক হয় না।—"চা-কর।"

বৃষ্টিপাত—এবার অনেক স্থান হইতেই অতি বৃষ্টি ও জলপ্লাবনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; তথাপি দেখা যায় কোন কোন স্থানে নিয়মিত বৃষ্টিপাত হয় নাই। পশ্চিম বাঙ্গলার ৫ স্থানে কম বৃষ্টি, ৪ স্থানে অতিবৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গলায় ১৩ স্থানে বৃষ্টির আধিক্য দেখা গিয়াছে, তিন স্থানে অল্প বৃষ্টি হইয়াছে। আসামে কেবল মাত্র গৌহাটীতে বৃষ্টি ২ইঞ্চি কম হইয়াছে। বেহারে ১০ স্থানে কম বৃষ্টি হইয়াছে, ৪ স্থানে বৃষ্টির আধিক্য দেখা গিয়াছে। ছোট নাগপুরে ৪ স্থানে বৃষ্টির অল্পতা, ১ স্থানে আধিক্য, উড়িষ্যাতে ৩ স্থানে আধিক্য ও ৩ স্থানে অল্পতা হইয়াছে। কলিকাতাতে এক রাত্রিতে ২ ঘণ্টার মধ্যেই ২ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু এখনও ৬৩ ইঞ্চি কম বৃষ্টিপাত হইয়াছে। কক্স বাজারে ৩২·১৯ ইঞ্চি, মেদিনীপুরে ১৪·৯০ ইঞ্চি, বালেশ্বরে ১৮·২০ ইঞ্চি কম বৃষ্টি পড়িয়াছে। অপর দিকে কুচবিহারে ৪৩·৯৩ ইঞ্চি, ময়মনসিংহ ও চেরাপুঞ্জীতে ২৮, কুমিল্লায় ১৭·৫৪, মতিহারীতে ১৪·৬০ ইঞ্চি অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হইয়াছে।

গরুর বলবর্দ্ধক ঔষধ।—পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, দুর্ব্বল, রুগ্ন ও নিস্তেজ গোরু সকলকে মধ্যে মধ্যে রাইসরিষা, কাঁচা হলুদ, পেঁয়াজ ও চিটাগুড় এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেক ভাগ, সমপরিমাণ একত্রে উত্তমরূপে ছেঁচিয়া ফেলিয়া রেড়ী পাতার সহিত খাওয়াইলে, দুর্ব্বল গরুও খুব হৃষ্টপুষ্ট ও সবল হইয়া থাকে। এই মিশ্রিত দ্রব্যগুলির মোট পরিমাণ অন্ততঃ একপোয়া আন্দাজ হওয়া আবশ্যক। এই ঔষধটি গোরুর পক্ষে একটী বিশেষ তেজোবর্দ্ধক। তদ্ব্যতীত বীট কিম্বা সৈন্ধব লবণ গুঁড়া করিয়া মাঝে মাঝে ভাতের ফেন ও কুঁড়ার সহিত গোরুকে খাইতে দিলে গোরুর নানাপ্রকার রোগ দূর হইয়া শরীর পুষ্ট হয়। ঐ লবণ গোরুর পক্ষে প্রধান জীর্ণকর ঔষধ।

চামড়ার লোভে গোহত্যা।—গড়বেতায় কতকগুলি চর্ম্ম ব্যবসায়ী গো-চর্ম্মের লোভে বিষ প্রয়োগ দ্বারা গোহত্যা করিতেছে। যেখানে রাখালগণ গরু চরাইয়া থাকে সেই সেই স্থানে উক্ত ব্যবসায়ীর জনবৃন্দ বিষ নিক্ষেপ করে। লতা পাতার সহিত গো-সমূহ বিষ ভক্ষণ করিয়া অচিরে প্রাণত্যাগ করে। এইরূপে আট দশটী গোহত্যা হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার সর্ব্বত্রই এরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে। ইহাতে কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিতেছে। আশাকরি কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন। মেদিনীপুর হিতৈষী।

শস্য-সংবাদ।—সরকারী-রিপোর্টে প্রকাশ,—পূর্ব্ববঙ্গ আসামে হৈমন্তিক ধান্যের অবস্থা মন্দ নহে; চা, আখ এবং কাপাসের অবস্থা ভাল। পশ্চিম বঙ্গের অনেক স্থানের ধান্যের অবস্থা সন্তোষজনক। যুক্ত প্রদেশে ফসলের অবস্থা ক্রমেই ভাল দাঁড়াইতেছে। পঞ্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশেও প্রায় তাই। মধ্য ভারতে খুব ভাল; মধ্যপ্রদেশে সন্তোষপ্রদ; বোম্বাই মান্দ্রাজেও বেশ। ব্রহ্মে অনেক স্থানেই এখনও বৃষ্টির দরকার। পশ্চিম বঙ্গেও বৃষ্টি এখন অনেক স্থানেই আবশ্যক। ৭ই আশ্বিন।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

কার্ত্তিক—অক্টোবর-নভেম্বর।

আশ্বিন মাস গত হইল, বিলাতী সব্জী বপন করিতে আর বাকী রাখা উচিত নহে। কপি, সালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মূলা এবং নাবী জাতীয় সীম, সালগম, বীট, গাজর, পিঁয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপন কার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিঁয়াজ ও পটল চাষের এই সময়। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ গত হইলেই রবি শস্যের জন্য জমি তৈয়ারি করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মুসুরী, মুগ, তিল, খেঁসারি প্রভৃতি রবিশস্যের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবি ফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখা যায় যে, আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়, সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে।—যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে।

সুল্পাদি।—সুল্প, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনি, ইত্যাদি এদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়।

কার্পাস।—গাছ কার্পাসের দুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে দিয়া রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে।

তরমুজাদি।—তরমুজাদি, বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। তরমুজ মাটি চাপা দিলে বড় হয়।

উচ্ছে।—৪।৪ হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩।৪ টার অধিক পুঁতিবে না।

পটোল।—পটোলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন কল বাহির হইলেই ভূমিতে পুতিবে। পুনঃপুনঃ খুসিয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট।

পলাণ্ডু।—কলসমেত এক একটী পিঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটির "যো" হইলে খুঁড়িয়া দিবে।

মটরাদি।—শুঁটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেত্রের পাইট।—যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদিগের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান।—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ।—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে, এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশির পাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বীজ বপনে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট।—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ২।৪ দিন এই রূপ করিয়া পরে ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

কার্ত্তিক, ১৩১৭।

সুলভে সেগুণ কাষ্ঠের ফার্ণিচার ও ইমারতি গড়ন প্রভৃতি।



আমরা মৌলমিন্ হইতে উৎকৃষ্ট সেগুণ কাষ্ঠ আমদানী করিয়া মফঃস্বলের গ্রাহকবর্গকে সর্ব্বপ্রকার আলমারী, টেবিল, চেয়ার, পানিল, খড়খড়ি, সার্সী প্রভৃতি অর্ডার মত প্রস্তুত করাইয়া অতি সামান্য মুনফা রাখিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। করোগেট আয়রণ, ষ্টীল জয়েষ্ট, টী আয়রণ, বোল্টনাট, বেড়ার কাঁটাওয়ালা তার প্রভৃতি এবং ফার্ণিচার ও ইমারতি গড়নের জন্য কল, কব্জা, ছিটকিনি, বল্ট, পরকলা, রঙ্গ প্রভৃতি আমাদিগের নিকট উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট অফিসার, মিউনিসিপালিটী ও অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আমাদিগের ফার্ম্ম হইতে সর্ব্বদাই দ্রব্যাদি লইয়া থাকেন। ঠিক জিনিষ উচিত মূল্য, প্রতারিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

বিস্তারিত বিবরণসহ জিনিষের লিষ্ট পাঠাইলে দর দিয়া থাকি; পত্র লিখিলে আমাদিগের সচিত্র ইংরাজী ক্যাটালগ (মূল্য নিরূপণ তালিকা) বিনা মূল্যে পাঠাইয়া থাকি; পরীক্ষা প্রার্থনীয়।—

এ, টী, দে এণ্ড কোং।

১৬২।১৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কিং এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

৮৩, হ্যারিসন রোড,

ব্রাঞ্চ—৪৫, ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের জন্য উপরোক্ত ঠিকানায় লিখুন।

আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা।

স্ত্রী পুরুষের রজঃ ও শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় দোষ ও তজ্জনিত ব্যাধিসমূহ নির্ম্মূল করণক্ষম এবং স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চারক। মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা এক টাকা মাত্র।

যিনি আমার নিম্নলিখিত ঠিকানায় আপনার নাম ধাম পাঠাইবেন, তাঁহাকে কলিকাতা পুলিশ কোর্টের মোকর্দ্দমা হইতে নির্ম্মুক্ত ও উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া পরিগণিত

কামশাস্ত্র

নামক একখানি উপযোগী পুস্তক বিনামূল্যে বিনা ডাকমাশুলে পাঠান যাইবে।

কবিরাজ শ্রীমনিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজুমদার এণ্ড কোং।

পেণ্টর্স ফটোগ্রাফার্স আর্টিষ্টস্ এণ্ড

জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

২২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আমাদের কারখানায় থিয়েটারের ষ্টেজ সম্বন্ধীয় সকল প্রকার সিন্ ড্রপসিন্ প্রভৃতি এবং সকল প্রকার অয়েল পেণ্টিং প্রতিমূর্ত্তি সুচারুরূপে অল্পমূল্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ রাজা, জমিদার প্রভৃতি মহোদয়গণের বাড়ীর কার্য্যই আমাদের প্রমাণ। সিনের মূল্য তালিকার জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন। আর সকল প্রকার দেশী বোম্বাই ছবি ও ফটো বাঁধাই এবং বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ম্যানেজার,

শ্রীবরদাপ্রসন্ন মজুমদার।

REGISTERED No C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



একাদশ খণ্ড,—৭ম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

কার্ত্তিক, ১৩১৭।

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

সূচী পত্র।

কার্ত্তিক, ১৩১৭ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

KEATING'S

INSECT POWDER.

কিটিংসের কীটনাশক মহৌষধ।



অনেক কষ্টে গাছ প্রস্তুত হইয়া উঠিলেও তাহার পরে গাছের অনেক বিপদ হয়। গাছের গোড়ায় পিপীলিকা ও একপ্রকার পোকা হইয়া গাছ নষ্ট করিয়া ফেলে, তখন অতিশয় মনস্তাপ হয়। বেগুন গাছে পোকা ও পিপীলিকা হইয়া গাছের মূল কাটিয়া দেয়। কখন কখনও বীজ বপন করিলে পিপীলিকা শ্রেণী সেই বীজ বহন করিয়া লইয়া যাইয়া নিজেদের গর্ত্তে প্রবেশ করে, সুতরাং বীজ হইতে চারা হইতে পারে না। যাঁহাদের কৃষিকার্য্যে সখ আছে তাঁহারা যেন সর্ব্বদাই এই দ্রব্য নিকটে রাখেন, তাহা হইলে এ মনোকষ্ট সহ্য করিতে হইবে না। বিলাতে টমাস কিটিং নামক জনৈক রসায়নবিদ্ এক প্রকার পাউডার প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা সমগ্র ভারতে "Keating's Insect Powder" বা কিটিংসের কীট নাশক ঔষধ বলিয়া বিখ্যাত। ইহা দ্বারা সমস্ত প্রকার কীট, পিপীলিকা, উই মরিয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত ঔষধ।

মূল্য ১ কৌটা ৷৶০ আনা, মাঝারী ।৶০ আনা, নমুনা কৌটা ।০ আনা।

কলিকাতা

মেসার্স বিহারীলাল দাঁ কোম্পানী—ভারতের এজেণ্টস্।

৫২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে ক্রয় করিতে পারিবেন।

ইহা দ্বারা ছারপোকাও মরিবে।—পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ খণ্ড। } কার্ত্তিক, ১৩১৭সাল। { ৭ম সংখ্যা।

মলমূত্র সার।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরি লিখিত

(বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ।)

গোবর।—ঘোড়া, গরু, ভেড়া প্রভৃতি কৃষিক্ষেত্রে পালিত পশুর মলমূত্রকে আমরা গোবর-রূপে বর্ণনা করিব। সকল পশুর গোবর একরূপ নহে; খাদ্য, বয়স ও স্বাস্থ্য অনুসারে পশুদিগের গোবর ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। গরু ও ঘোড়ার মলের মধ্যে, ঘোড়ার মল অধিক সারবান; কারণ ঘোড়া অধিক পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে। অল্প বয়স্ক বর্দ্ধনশীল বা কৃষাঙ্গ পশুর পুরীষ অপেক্ষা বয়োপ্রাপ্ত বা স্থূলকায় পশুর পুরীষ অধিক মূল্য-বান। ইহার কারণ এই যে, বর্দ্ধনশীল বা কৃষাঙ্গ পশুর দেহ গঠনের নিমিত্ত অধিক পরিমাণে সার-পদার্থের প্রয়োজন হয়; এবং শেষোক্ত পশুদিগের আহারের প্রায় সমস্ত সার-পদার্থ মল-মূত্রের সহিত বহির্গত হইয়া যায়। জিড়ান বলদ এবং ঠারা গাইয়ের গোবর পরিশ্রমী বলদ এবং দোয়াল গাভীর গোবর অপেক্ষা উত্তম সার। পরিশ্রমী বলদের

উপাদান সকল।	গরু।		ঘোড়া।		ভেড়া।		শূকর।	
	মল	মূত্র	মল	মূত্র	মল	মূত্র	মল	মূত্র
জল	৮৪·০০	৯২·০০	৭৬·০০	৮৯·০	৫৮·০০	৮৬·৫০	৮০·০০	৯৭·৫০
নাইট্রোজেন	·৩০	·৮০	·৫০	১·২	·৭৫	১·৪০	·৬০	·৩০
ফস্ফরিক এসিড ...	·২৫	...	·৩৫	...	·৬০	·০৫	·৪৫	·১২
পটাস ও সোডা ...	·১০	১·৪০	·৩০	১·৫	·৩০	২·০০	·৫০	·০২
অন্যান্য পদার্থ ...	১৫·৩৫	৫·৮০	২২·৮৫	৮·৩	৪০·৩৫	১০·০৫	১৮·৪৫	২·০৬
সমষ্টি ...	১০০·০০	১০০·০০	১৯০·০০	১০০·০০	১০০·০০	১০০·০০	১০০·০০	১০০·০০

খাদ্যের শতকরা ৯০—৯৫ ভাগ সার-পদার্থ নিঃসৃত হয়। কিন্তু বর্দ্ধনশীল পশু ও দোয়াল গাভীর খাদ্যের ৫০—৭৫ ভাগ সার পদার্থ মাত্র মল-মূত্রের সহিত পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। মূল কথা, যাহাদের জীবন ধারণ করিতে অল্প মাত্রায় পুষ্টিকর পদার্থের প্রয়োজন. তাহারাই অধিক সারবান জিনিস মল-মূত্রের সহিত পরিত্যাগ করে।

উপরিস্থিত তালিকায় বিভিন্ন পশুর মল-মূত্রের উপাদান সকলের পরিমাণ প্রদত্ত হইল।

উল্লিখিত তালিকা দৃষ্টে প্রতীতি হইবে যে, শূকর ব্যতীত অন্যান্য জন্তুর মল অপেক্ষা মূত্র অধিক সারযুক্ত। কিন্তু আমাদের দেশে কোথাও মূত্র রক্ষা করিবার ব্যবস্থা নাই।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, উপযুক্ত আহার প্রাপ্ত প্রত্যেক পশু এক দিবসে কত মলমূত্র পরিত্যাগ করে:—

গরু	...	৩৭ সের
ঘোড়া	...	২৪ ,,
ভেড়া	...	১৭ ,,
শূকর	...	৪১ ,,
গোবৎস	...	৩৩ ,,

আমরা দিনের মলমূত্র প্রায়ই সংগ্রহ করিতে পারি না। তাহা ছাড়িয়া দিলে, একটী সাধারণ গরু বৎসরে ৭০।৮০ মণ সার প্রদান করিয়া থাকে।

মলমূত্র রক্ষার ব্যবস্থা এদেশে একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গোময়াদি সাধারণতঃ গোশালার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ফেলিয়া রাখা হয়। তথায় রৌদ্র বৃষ্টিতে ইহার অনেক সার পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। বিলাতের রাজকীয় কৃষি-সমিতির সুপ্রসিদ্ধ ভূতপূর্ব্ব রাসায়নিক ডাক্তার ভোলকার পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ৯ মাস মধ্যে, এইরূপ রক্ষিত সারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সুব্যবস্থামত সার রক্ষা করিলে ইহার এক-পঞ্চমাংশের অধিক নাইট্রোজেন কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না। অন্য দিকে, তাজা গোবর জমীতে দিলে ইহা শীঘ্র পচিয়া দ্রবণীয় হয় না; এমন কি, এঁটেল মাটীতে ইহার কতকাংশ বহু বৎসর পর্য্যন্ত অদ্রবণীয় ভাবে অবস্থিতি করে।

উক্ত দুই প্রণালী মত সার পরীক্ষা করিয়া ভোলকার সাহেব নিম্নস্থ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন:—

প্রণালী।	যে দিন সার রক্ষিত হয়, ৩রা নবেম্বর, ১৮৫৪	৩০শে এপ্রেল, ১৮৫৫	২৩ আগষ্ট. ১৮৫৫	১৫ই নবেম্বর, ১৮৫৫
সাধারণ প্রণালী সারের পরিমাণ	২,৮৩৮ পাউণ্ড	২,০২৬ পাউণ্ড	১,৯৯৪ পাউণ্ড	১,৯৭৪ পাউণ্ড
নাইট্রোজেনের পরিমাণ ...	১৮·২৩ ,,	১৮·১৪ ,,	১৩·১৪ ,,	১৩·০৩ ,,
বিশেষ প্রণালী সারের পরিমাণ	৩,২৫৮ ,,	১,৬১৩ ,,	১,২৯৭ ,,	১,২৩৫ ,,
নাইট্রোজেনের পরিমাণ ...	২০·৯৩ ,,	১৯·২৬ ,,	১৬·৫৪ ,,	১৮·৭৯ ,,

উক্ত তালিকা দৃষ্টে প্রতীতি হইবে যে, দ্বিতীয় পরীক্ষার দিন সাধারণ প্রণালীর নাইট্রোজেনের বিশেষ কোন ক্ষয় ঘটে নাই, ইহার কারণ এই যে, এই দিন পর্য্যন্ত সার বিকৃত হইয়া আদৌ বৃক্ষের গ্রহণোপযোগী হয় নাই; কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ পরীক্ষার দিন ইহার পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে। বিশেষ প্রণালীর সার দ্বিতীয় পরীক্ষার সময়েই বিকৃত হইয়া নাট্রোজেনের পরিমাণ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে। ভোলকার সাহেব এই সময়েই ইহা জমীতে প্রয়োগ করিতে বলেন। তৃতীয় পরীক্ষার সময়, এই সারের নাইট্রোজেনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মাত্র বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি বলেন যে, সারের গাদা এত শুষ্ক না থাকিলে, এই বিনষ্ট নাইট্রোজেনের পরিমাণ এত অধিক হইত না। গোময়াদি সার প্রস্তুত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই :—

দুই হস্ত গভীরতাবিশিষ্ট একটি পাকা চৌবাচ্চায় সার জমা করিতে হইবে। রৌদ্র-বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহার উপরে একখানা চালা দেওয়া আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে কোদালি দ্বারা সার চৌরস করিয়া দিতে হয়। চৌবাচ্চা পূর্ণ হইলে, ইহাকে বালুমাটী দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। নানা জাতীয় উদ্ভিদাণু কর্ত্তৃক সার বিকৃত হইয়া য়্যামোনিয়া, হিউমিক্ এসিড, প্রভৃতি পদার্থের উৎপত্তি হয়। য়্যামোনিয়া এই সকল পদার্থ ও জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যৌগিক অবস্থায় থাকে। পরে ইহা অন্য এক প্রকার উদ্ভিদাণু কর্ত্তৃক নাইট্রেটের আকারে পরিবর্ত্তিত হয়। সারের স্তূপ জল সিঞ্চন দ্বারা আর্দ্র না রাখিলে, ইহার অধিকাংশ য়্যামোনিয়া উড়িয়া যায়। যদি এই স্তূপ খুব আলগা থাকে তবে ইহার পচন ক্রিয়া অতি ত্বরায় সমাপ্ত হয়; ইহাতে য়্যামোনিয়া বিনষ্ট হয়। আবার সারের স্তূপ খুব আঁতা থাকিলে, পচনক্রিয়া সুচারুরূপে সমাধা হয় না। যে উদ্ভিদাণু পচন ক্রিয়া দ্বারা নাইট্রেট্ উৎপন্ন করে, তাহার জীবন ধারণ জন্য অক্সিজেন বাষ্পের প্রয়োজন। সারের স্তূপ খুব আঁতা হইলে, বায়ু অভাবে ইহার কার্য্য হইতে পারে না। অক্সিজেনবিহীন এবং স্বল্প বায়ুবিশিষ্ট স্থানে অন্য প্রকার উদ্ভিদাণুর প্রাদুর্ভাব হয়। এক জাতীয় উদ্ভিদাণু শুষ্কসার হইতে নাইট্রোজেন বিযুক্ত করিয়া ইহার বিলোপ করে। চারি বা পাঁচ মাস পরে, সার ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে। বিলাত প্রভৃতি শীতপ্রধান স্থানে সার প্রস্তুত করিতে আরো ২।১ মাসের প্রয়োজন হয়।

সার-স্তূপের মধ্যে মধ্যে জীপসাম চূর্ণ প্রদান করিলে য়্যামোনিয়া রক্ষিত হইতে পারে।

বর্দ্ধমান মহারাজার কৃষিক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত বিশেষ প্রণালীমত সার প্রস্তুত করা হয়। ভারত-গভর্ণমেণ্ট-কৃষি-বিভাগের রাসায়নিক ডাক্তার লেদার উক্ত সার এবং বর্দ্ধমানের রায়তদিগের প্রস্তুত সার পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন :—

সার	জল	অঙ্গারীয় পদার্থ*	দ্রবণীয় পদার্থ*	বালুকা	ফস্ফরিক এসিড	নাইট্রোজেন
বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রের সার ...	৬৫·৫১	১৭·১৯	৩·৫১	১৩·৭৯	০০·৭৩	০০·৬৮
বর্দ্ধমান রায়তের সার ...	৬৫·৬৯	১১·০০	৩·৫২	১৮·৭৯	০০·৩৪	০০·৬১

রায়তদিগের সারে সার-পদার্থ অপেক্ষাকৃত অল্প; ইহার করণ এই যে, রৌদ্র ও বৃষ্টি দ্বারা সার-পদার্থের কতকাংশ বিনষ্ট হয়।

উক্ত উভয়বিধ সার গতবৎসর বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রে আলু ফসলে প্রয়োগ করিয়া, ইহাদের গুণ পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ইহার ফলাফল নিম্নলিখিত তালিকায় দ্রষ্টব্য ঃ—

সার	একরে সারের পরিমান	এক একরে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ
বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রে বিকৃত সার	১৯২ মণ	১৭,০৮৮ পাউণ্ড
বর্দ্ধমান রায়তদিগের বিকৃত সার	১৭২ ,,	২৫,৬২৪ ,,

উক্ত উভয়বিধ সারেই সমপরিমাণ নাইট্রোজেন ছিল। তথাপি উৎপন্ন ফসলের এত পার্থক্য কেন? আমাদের বিবেচনা হয় যে, রায়তদিগের সার অনিয়মে প্রস্তুত জন্য, ইহা উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণোপযোগী ভাবে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এই জন্য, উভয় ফসলের পরিমাণ একরূপ নয়।

বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রে ১৯০৩ সন হইতে ১৯০৭ সন পর্য্যন্ত উক্ত কৃষিক্ষেত্রের প্রস্তুত সার ও রায়তদিগের সার সমপরিমাণে প্রয়োগ করিয়া আলু ফসলে নিম্নলিখিত ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ঃ—

সার	এক একরে সারের পরিমাণ	এক একরে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ
বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রের রক্ষিত সার ...	২৪০ মণ	১৪, ৯৩০ পাউণ্ড
বর্দ্ধমান রায়তদিগের সার ...	২৪০ ,,	১৩, ২৬০ ,,

গোয়ালের মূত্র রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যহ শুষ্ক মাটী, শুষ্ক পাতা বা ঘাস ছড়াইয়া দিতে হয়। চারি বা পাঁচ মাস অন্তর, এই সকল পদার্থ জমীতে দেওয়া যাইতে পারে।

সার রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত না থাকিলে, ইহা জমীতে প্রয়োগ করিয়া, কর্ষণ দ্বারা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত।

গোময় সার প্রয়োগ করিলে, এঁটেল এবং বেলে উভয়বিধ মৃত্তিকারই প্রাকৃতিক গঠন পরিবর্ত্তিত হইয়া সুচাষোপযোগী হয়।

তাজা গোবর প্রয়োগে গাছের ডালপালা ও পাতারই বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু বীজ উৎপন্ন করিবার শক্তি ইহার বড় নাই। উত্তম তামাক ও আলু ইহার দ্বারা উৎপন্ন হয় না।

তাজা গোবর প্রয়োগে ভূমিতে অনেক কীটের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে। সুতরাং আলু প্রভৃতি দুর্ব্বল গাছে তাজা গোবর কখনও দেওয়া উচিত নয়। তাজা গোবর দ্বারা জমীতে আগাছারও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বেলে মৃত্তিকায় গোবর সার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

প্রস্তুত সার শস্য বপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রয়োগ করিয়া লাঙ্গল দ্বারা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। তাজা সার বপনের প্রায় তিনমাস পূর্ব্বে প্রয়োগ করা উচিত।

পুরীষ।—গোবর অপেক্ষা মনুষ্য পুরীষ যে অধিক সারবান পদার্থ তাহা ব্যবহৃত না হইলেও একরূপ সর্ব্ববিদিত। দুর্ভাগ্যক্রমে এইরূপ মূল্যবান পদার্থ বিনষ্ট হইতেছে। চীন, জাপান ও ইউরোপের অনেক স্থানে গোবরের ন্যায় ইহার আদর আছে। ইহার দুর্গন্ধের জন্য আমরা ইহাকে অশুদ্ধ মনে করি। প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা অতি শীঘ্র ইহার গন্ধ বিনষ্ট করা যায়। সাধারণতঃ সহর ও নগরের মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষগণ, ইহার দুর্গন্ধে যাহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট না করিতে পারে, তদ্বিষয়েই মনোযোগী, কিন্তু ইহার কোন সদ্ব্যবহার করিতে সম্পূর্ণ উদাসীন। ইহার গন্ধ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত সেপ্‌টিক-ট্যাঙ্ক নামক পুকুর ব্যবহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিয়ম। এই পুকুরে পচন-ক্রিয়া এক জাতীয় উদ্ভিদাণু কর্তৃক এক দিবসের মধ্যেই সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু এই বিধান ব্যয়সাধ্য কার্য্য, সুতরাং এই বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

মিয়াগের সাহেব দ্বারা আবিষ্কৃত উপায় অপেক্ষাকৃত সহজ। উত্তম কর্ষিত মৃত্তিকায় Λ আকৃতি বিশিষ্ট কাষ্ঠ নির্ম্মিত যন্ত্র বলদ দ্বারা টানিলে ৪ হাত প্রস্থ এবং ৯ ইঞ্চি গভীর গর্ত্ত প্রস্তুত হয়। এই গর্ত্তের তলদেশ কোদালী দ্বারা পুনঃ একবার খনন করা আবশ্যক। তৎপরে এই গর্ত্তে পুরীষ ৩ ইঞ্চি পুরু করিয়া ঢালিতে হয়। অতঃপর উভয় পার্শ্বস্থ মৃত্তিকার উপর পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র টানিলে এই গর্ত্তের পুরীষ ঢাকিয়া যায়। এই উপায়ে ২ বা ৩ মাস মধ্যে, পুরীষ পচিয়া কৃষি-কার্য্যোপযোগী হইতে পারে। এই জমীতে আদৌ দুর্গন্ধ হয় না। এই প্রণালী অনুসারে, সকল মিউনিসিপালিটিতেই পুরীষ রক্ষিত হইতে পারে।

গ্রাম্য মিউনিসিপালীটী নিম্নলিখিত সহজ প্রণালীটী অবলম্বন করিতে পারে। এক ফুট ৯ ইঞ্চি গভীর নালা কাটিয়া ইহার তলদেশে ৩ ইঞ্চি পুরু শুষ্ক মৃত্তিকা ছড়াইয়া দিবে। তৎপরে, ময়লা তিন ইঞ্চি পুরু করিয়া ঢালিয়া, তাহা তিন ইঞ্চি শুষ্ক ধূলা মাটী দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা পুরীষ পচিয়া শীঘ্র কৃষিকার্য্যোপযোগী হয়।

গৃহস্থগণও এইরূপ গর্ত্তে ময়লা ত্যাগ করিয়া, শুষ্ক মৃত্তিকা বা ভস্ম দ্বারা ইহা ঢাকিতে পারেন। পুরীষ পচিয়া গেলে, ইহা কৃষি ক্ষেত্রে কিম্বা বাগানে স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হইতে পারে।

পুরীষ একস্থানে অধিক মাত্রায় পুতিলে, ইহার পচনে অনেক বিলম্ব হয়; কারণ, প্রয়োজনীয় বহুজাতীয় পচনকারী উদ্ভিদাণু বায়ুহীন স্থানে বাস করিতে পারে না। পুরীষ বিলম্বে পচিলে ইহার দুর্গন্ধে অচিরাৎ পার্শ্ববর্ত্তী লোকালয় অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে।

মনুষ্যের মলে শতকরা দেড় ভাগ নাইট্রোজেন ও এক ভাগ ফস্ফরিক এসিড প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রত্যেক মনুষ্য প্রত্যহ গড়ে অর্দ্ধপোয়া মল ও দেড় সের মূত্র ত্যাগ করে।

এ দেশের কৃষকদিগের জ্ঞান আছে, মূত্র সাররূপে ব্যবহার করিলে গাছ মরিয়া যায়। বস্তুতঃ জলের সহিত না মিশাইয়া যদি খাঁটি মূত্র কোন গাছের তলে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ঐ গাছ মরিয়া যাওয়াই সম্ভব। মূত্র অতি তেজস্কর সার। ইহা অন্ততঃ দশগুণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া জমিতে ব্যবহার করা উচিত। যদি জল

পরিশাইয়া এই সার ব্যবহার করা সুবিধা না হয়, তাহা হইলে যে জমিতে কোন ফসল নাই এমন জমিতে উহা ছিটাইয়া দেওয়া, অথবা যে ধানের বা পাটের জমিতে কিছু জল দাঁড়াইয়া আছে সেইরূপ জমিতে ঢালিয়া দেওয়া, ভাল। তৃণ-জাতীয় অথবা শাক-জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে সোরা-সার ও মূত্র-সার বিশেষ উপযোগী। ধান্য, গোধুম, যব, জই, ভুট্টা, দে-ধান, মড়ুয়া, ইক্ষু; তুঁত, পালমশাক, পাট, বাঁধাকপি, ইত্যাদি ফসলের জন্যই মূত্র প্রভৃতি যবক্ষারজান ঘটিত সার ব্যবহার করা উচিত। মিউনিসিপালিটীর গো-শালা গুলির সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এই বহুমূল্য সার অনায়াসে কৃষিকার্য্যের উন্নতি কল্পে ব্যবহারে আনা যাইতে পারে। প্রত্যেক কৃষকও অনায়াসে মূত্রের অপচয় না করিয়া সাররূপে ইহা ব্যবহার করিতে পারে। মূত্র পচাইয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। টাট্‌কা অবস্থাতে ইহা জমিতে প্রয়োগ করিতে পারিলে ইহা হইতে অধিক উপকার পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ১০।১২ মণ পর্য্যন্ত মূত্র সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

নাদি-সার।—গোময় অপেক্ষাও ছাগল ও মেষের নাদি তেজস্কর সার। এসকল অপেক্ষা পক্ষীর বিষ্ঠা ও পলুপোকার নাদি আরও উৎকৃষ্ট সার। ছাগল ও মেষ জমিতে বিঘা প্রতি ১০০টী এক সপ্তাহ কাল ধরিয়া চরাইয়া লইলে জমি বিশেষ উর্ব্বরা হয়। এই সকল ছাগ ও মেষকে ছোলা, মটর, বা কলাই ও ভুসি জমির উপরই রাখিয়া খাইতে দিলে সার আরও তেজস্কর হয়। জমি ভাগ করিয়া চাষ করিতে পারিলে, ক্রমান্বয়ে জমির এক-ষষ্ঠাংশ প্রতি বৎসর পতিত রাখিয়া উহারই উপর গো-মহিষ চরাইয়া, উহাদের বলকারক আহার দান করিয়া, পতিত জমি সারবান করিয়া লইতে পারা যায়। ময়মনসিংহের কৃষকদিগের মধ্যে এই সুন্দর প্রথা প্রচলিত আছে।

পরিমাণ।—ধান, পাট, ইত্যাদি সাধারণ ফসলের জন্য বিঘা প্রতি ৪০/ বা ৫০/ মণ পচা গোবর-সার ব্যবহার করা উচিত। আলু, ইক্ষু, তামাক, কপি, প্রভৃতি বহুমূল্য ফসলের জন্য বিঘা প্রতি ১৫০। ২০০ মণ পচা গোবর সার ব্যবহার করা উচিত। বীজ বপনের পূর্ব্বে সার ছিটাইয়া দিয়া জমিতে লাঙ্গল মৈ দিয়া পরে বীজ বপন করিতে হয়। ঘোড়ার নাদি পচিয়া ঠাণ্ডা হইয়া গেলে তবে ব্যবহার করা উচিত। গোময়ের অর্দ্ধেক পরিমাণ ঘোড়া নাদি ব্যবহার করিলেও চলে।

মূত্র।—পুরীষের ন্যায় মনুষ্যমূত্রও বিনষ্ট হয়। মল অপেক্ষা মূত্র রক্ষা করা কঠিন। মূত্রস্থ ইউরিয়া ও ইউনিক এসিড নামক নাট্রোজেনযুক্ত পদার্থ অতি ত্বরায় য়্যামোনিয়াম-কার্ব্বনেটরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া উড়িয়া যায়। যথা তথা মূত্র ত্যাগ করিলে, ইহার সমস্তই বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। যথায় অর্দ্ধ-গলিত পত্রাদি বিদ্যমান আছে এবং সর্ব্বদা

গৃহ কার্য্যের জল সঞ্চিত হয়, এমন গর্ত্তে মূত্র ত্যাগ করা উচিত। মধ্যে মধ্যে ধূলা মাটীর দ্বারা ইহা ঢাকিয়া দিতে হয়। ৩ বা ৪ মাস পরে, এই মাটি সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। মূত্রে শতকরা •৩ ভাগ নাইট্রোজেন ও •৪ ভাগ ফস্ফরিক এসিড প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গুয়ানো।—সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানে সামুদ্রিক পক্ষিগণের মল শুষ্ক হইয়া স্তূপাকার ধারণ করে। ইহাকে গুয়ানো- সার বলে। বৃষ্টির দ্বারা ধৌত না হইলে, ইহাতে সাধারণতঃ শতকরা ১২ ভাগ নাইট্রোজেন ও ১২ ভাগ ফস্ফরিক এসিড প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৃষ্টি-ধৌত গুয়ানোতে শতকরা প্রায় •৯ ভাগ নাইট্রোজেন ও ৩২ ভাগ ফস্ফরিক এসিড থাকে।

পায়রার বিষ্ঠাকেও সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট কৃষি-রাসায়নিক ইহাতে ৩ ভাগ নাট্রোজেন ও ১•৩ ফস্ফরিক এসিড প্রাপ্ত হইয়াছেন।

স্বদেশী ও বিদেশী রঙ।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত।

কালের গতি অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য; পর্ব্বত প্রান্তর হইতেছে, প্রান্তর সমুদ্র গর্ভে বিলীন হইতেছে, আবার অতলস্পর্শ বারিধী জলকণা সম্পর্ক শূন্য বালুকাময় মরু প্রান্তরে পরিণত হইতেছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় রঙ। ভারতের পূর্ব্ব প্রচলিত পাকা রঙের পরিবর্ত্তে এক্ষণে বিলাতী অল্পকালস্থায়ী রঙ সমূহের চলন বাড়িয়াছে। প্রয়োজন বশতঃ কয় গজ মাত্র টার্কি রেড অর্থাৎ যাহাকে আমরা সালু কাপড় বলি, বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া জলে ধৌত করিবামাত্র দেখিতে পাইলাম যে, উহার এক চতুর্থাংশ রঙ ধুইয়া বস্ত্রখণ্ড ফিকা রক্তবস্ত্রে পরিণত হইল—পূর্ব্বে উহাকে আমাদিগের পাকা চিরস্থায়ী রক্তবর্ণ বলিয়াই বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এইক্ষণে রঙ কেবল মাত্র জলে আর্দ্রতা হেতু গলিয়া যাইতে দেখিয়া, সেই চির বিশ্বাসের অন্যথা ঘটিল, সুতরাং তখন মনে আরও কতকগুলি ভাবনা স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার প্রথম চিন্তা "কালী"। যে কালকালী, লালকালী প্রভৃতি কালীতে আমরা এক্ষণে পত্রাদি ও দলিল দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করিয়া ভ্রান্ত ধারণাবশে চিরস্থায়ী অথবা বহুবর্ষ স্থায়ী বিবেচনায় মস্তিষ্ক ক্ষয় করিয়া পুত্র পৌত্রের জন্য অতি যত্নে রাখিয়া যাইতেছি, উহার দশ। অর্দ্ধ শতাব্দী পরে যে কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহার কিছুই এইক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি না। এমন কি রাসায়নিকগণ দ্বারা বহু পরীক্ষিত গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্ট্রী অফিসে প্রচলিত (Registration Ink)

রেজেষ্ট্রী কালী যাহা রেজেষ্ট্রী অফিসে ও অন্যান্য আদালতে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে ক্রীত ও ব্যবহার হইতেছে, ঐ রক্তমসীতে লিখিত রেজেষ্টরী অফিসের প্রথম অবস্থায় রেজেষ্ট্রী কৃত কয়েক খণ্ড দলিল দেখিয়া আমরা একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছি। ঐ সকল দলিলের পৃষ্ঠলিপি দেখিয়া এমন কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি নাই যিনি অনুমানেও বুঝিতে পারেন যে, উহাতে কস্মিনকালেও কেহ মসীময় রেখা মাত্রও পাত করিয়াছিল। ফলে রেজেষ্টরের হস্তলিপি এরূপ নির্ম্মলভাবে উঠিয়া পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, তাহাতে কোন স্থানে কাগজে একটু লাল দাগ মাত্রও নাই।

পক্ষান্তরে আমরা কার্য্যোপলক্ষে বহুভূমি দানপত্রে সার্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কৃষ্ণনগরাধিপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বাক্ষরিত যে সকল সনন্দে রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণঃ নাম স্বাক্ষর বাংলা ভূষা ও শেহাই দ্বারা প্রস্তুত কালীতে লিপিবদ্ধ দেখিয়াছি, এখনও তাহার চাকচিক্কশালীতা দৃঢ়তা ও দীর্ঘস্থায়ীতা দেখিলে বোধ হয় যে, আরও সহস্র বৎসরেও উহা ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে কি কলিকাতা বা এদেশের স্থানান্তরে প্রস্তুত কিম্বা বিলাতী আমদানী যে সকল কালী আমরা ব্যবহার করিতেছি ইহা বহুদিন শুষ্ক হইয়া গেলেও উহার উপর কোন রূপে বিন্দুমাত্রও জল পড়িলে তাহা তখনই গলিয়া কালী এমন ধ্যাবড়াইয়া যাইবে যে, উহা "বহুমূল্যের কালী হইলেও" নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষণমাত্র স্থায়ী বলিয়াই বুঝা যাইবে।

বহু বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক ও মৌলবীগণ অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত যে সকল কবচ ও দোয়াতাবিচ ভোজ্যপত্রে, তেড়েঠ বা তালপত্রে অথবা কাগজে লিখিয়া মাদুলী, পদক বা অন্যান্য অলঙ্কার বা তাবিচের মধ্যে পুরিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কিম্বা অধ্যাপক ও মুন্সীদিগের হস্ত লিখিত পুরাতন গ্রন্থাদি দেখিলে, উহা যে অচিরকালের লিখিত নহে, ইহা কখনই বুঝা যাইবে না।

কালী আপামর সাধারণ সকলেরই আবশ্যক, সেই জন্য আমরা এখানে কালীর কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলাম। আর বস্ত্রাদি যে সকল বিলাতী পাকা চিরস্থায়ী রঙে রঞ্জিত বলিয়া বাজারে বিক্রীত হয়, তাহাও জলে ধৌত অথবা রজকালয়ে মল ধৌত হইয়া ফিরিয়া আসিলে সেই পূর্ব্ব বস্ত্র বলিয়া চিনিয়া লইতে পারে এমন সাধ্য কাহারও নাই। এমন কি উর্ণাতন্তু, কৌশেয় বসন, লোমজ, চিনাংশুক অথবা কার্পাস বস্ত্র যাহা কেন হউক না অধিক রৌদ্র ও নীহার বা বর্ষার জল পাইলেও রঞ্জিত বস্ত্র শ্বেত (মলিন) বসনে পরিণত হয়।

বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদিগকে এইরূপ ভ্রমান্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ভাল মন্দ নির্ব্বাচনের শক্তি সামর্থ একেবারেই নাই, অনুকরণ প্রিয়তাই আমাদিগের সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। আমরা এক্ষণে বুঝিয়াছি, যাহা বৈদেশিক, তাহাই উপাদেয়—এবং যাহা দেশোৎপন্ন তাহাই মন্দ। এই ধারণাবশে আমরা বিদেশী ঠাকুর (শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু) হইতে বিদেশী কুকুর পর্য্যন্তর সমাদর করি। বিলাতী মাষ্টার বিলাতী ডাক্তার, বিলাতী বিড়াল কুকুর, বিলাতী গাভী, ওয়েলার ঘোড়া, জাপানী বাক্স, চিনার বাসন, জর্ম্মানীর ছাতী, মোজা, আলোকাধার, ফরাশীর কাচ দ্রব্য প্রভৃতি সর্ব্বদেশের সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যই আমাদিগের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হয়, আমরা কেবলমাত্র দেশজ দ্রব্যের বেলাই অন্ধ হই। সেই সকল দেশীয় দ্রব্য যদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অতি সুলভও হয়, তথাপি আমরা তাহার আদর করিতে জানি না। একান্তপক্ষে দেশজাত দ্রব্য

একবার বৈদেশীকের হস্ত দিয়া ঘুরিয়া আসিলেও আমরা কতকটা তৃপ্ত হইয়া ক্রয় করিতে সম্মত হই, আর তাহাও যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে সর্ব্বশেষে না হয় বিদেশীর প্রদত্ত একটা সার্টিফিকেটও দেখা চাই, নচেৎ মনে ধোঁকা রহিয়া যায়।

এক্ষণে আমাদিগের মূল বক্তব্য বিষয় এই যে, পাকা উদ্ভিজ্জ জাত রঙ পূর্ব্বে এদেশে প্রচলিত ছিল ও বর্ত্তমানে যে খনিজ অতি অপদার্থ অস্থায়ী কাঁচা রঙ প্রচলিত হইয়াছে তাহারই কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

পূর্ব্বে এদেশের কৃষি উৎপন্ন বৃক্ষের কাষ্ঠ, ত্বক্, ফল, মূল, পুষ্প, বৃন্ত ও শিকড় প্রভৃতি রঞ্জন শিল্পে ব্যবহার হইত। তাহার রঙও যেমন চিরস্থায়ী ছিল, রঞ্জিত বস্ত্র প্রভৃতির বহু স্থায়ীত্ব পক্ষেও সেই রূপ সহায়তা করিত। ঐ সকল রঙ একবার বিশুদ্ধভাবে ব্যবহার করিলে, আর কোন কালে তাহার ধ্বংশ হইত না। অধিকন্তু দেখা যায় যে, এই সকল উদ্ভিদজাত রঙ শরীরের পক্ষে কোন-কালে অনিষ্টকর নহে। পক্ষান্তরে খনিজ রঙে অনেক সময় স্বাস্থ্যহানিকর পদার্থ মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়।

আমরা নিম্নে কয়েকটি রঞ্জক উদ্ভিদের নাম প্রদান করিলাম। রঞ্জনবিদ্যা বিশারদ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি এই সকল দ্রব্য লইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন ও উহা কার্য্যোপযোগী করিয়া পুনরায় ব্যবহারে আনিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের প্রভুত উপকার সাধন ও কৃষিকার্য্যের কিছু প্রসারও বৃদ্ধি হইতে পারে।

বাবলার ছাল, গরাণ গাছের ছাল, বকম কাষ্ঠ, আছফুলের শিকড়, কুসুমফুল, হরিতকী, বয়ড়া, আমলকী, নীল, লাক্ষা, সেফালিকা ফুলের বৃন্ত, হরিদ্রা, জাফরাণ, নটকান ফলের বীজ প্রভৃতি পদার্থে পূর্ব্বকালে বস্ত্রাদি রঞ্জন কার্য্য সমাদৃত হইত।

উপরি উক্ত ত্বক্, কাষ্ঠ ও ফল সমূহের দ্বারা চর্ম্ম এবং বস্ত্র রঞ্জনকার্য্য উত্তমরূপে ও সুলভে সম্পাদন হইতে পারে ইহা এখনও আমাদিগের দৃঢ় ধারণা।

বাবলার ছাল, হরিতকী, বয়ড়া ও আমলকী দ্বারা উত্তম পাকা কাল আলপাকা অথবা কেলিকোর ন্যায় রঙ হয়। উহাতে চর্ম্ম এবং বস্ত্র উভয়ই রঞ্জিত হইতে পারে।

গরাণ কাষ্ঠের ছালে চর্ম্ম রঞ্জন হয়। ইহাতে বাদামী রঙ ভাল হয়।

বকমকাষ্ঠ ও আছফুলের শিকড়ে বস্ত্রে লোহিত রঙ হয়।

কুসুম ফুলে কুসুমী রঙ হয় এবং ইহা বস্ত্র রঞ্জন ব্যবহারেরই উপযোগী।

নীলে নীলবস্ত্র প্রস্তুত হয়।

লাক্ষা দ্বারা অলক্তক সদৃশ রঙ এবং বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইতে পারে।

সেফালিকা পুষ্প বৃন্তে হরিদ্রাভ রক্তবর্ণ এবং বস্ত্র রঞ্জনেই ব্যবহার্য্য।

হরিদ্রায় হরিদ্রাবর্ণ এবং জাফরাণে তদপেক্ষা একটু ঘোর ও রক্তাভ হরিদ্রাবর্ণ রঙ দৃষ্ট হয়।

নটকান বীজে গেরি মাটির ন্যায় বর্ণ উৎপন্ন ও প্রতিফলিত হয়, ইহাও বস্ত্র রঞ্জনের উপযোগী।

আমরা বাল্যকালে হরিতকী বয়ড়া, আমলকী, টেরী ফল সহ কয়েক খণ্ড পুরাতন লৌহ জলে দুই এক দিন ভিজাইয়া রাখিয়া শেষে অগ্নিতে পাক করিয়া যে কালী প্রস্তুত করিয়া তদ্দারা কাগজের উপর লিখিতাম, সে লিপি কাগজ নষ্ট হইয়া গেলেও অক্ষর নষ্ট হইত না। ঐ কালীতে অল্পমাত্র হীরাকসের গুঁড়া মিশ্রিত করিলে আরও গাঢ়

কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইত। কেবলমাত্র চারি পয়সা ব্যয়ে দুই পাঁইট বোতল কালী প্রস্তুত হইত। অপিচ অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য ও মৌলবীগণ লাক্ষা রসোৎপন্ন অলক্তক রাগ সহ দ্রব্যান্তর (যাহা আমরা অজ্ঞাত) মিশ্রিত করিয়া যে লাল কালী প্রস্তুত করিতেন তাহাও চিরস্থায়ী হইত। অতঃপর আমাদিগের বাসনা যে, বিলাত প্রত্যাগত রঞ্জন বিদ্যা বিশারদগণ একবার এই সকল প্রস্তাবিত দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

এক্ষণে দেখাইব যে, বিদেশীয়েরা কি কি উপায়ে কি কি দ্রব্য দ্বারা পাকা পাড়, নানারঙের ছিট এবং কার্পাস, পশম, রেশম প্রভৃতি রঞ্জিত করিয়া থাকেন;—

চাঁপাফুলের মত পাকারঙ করিতে হইলে সুগার অব লেড, হীরাকস, গরম জল ও গঁদ দরকার হয়।

পাকা নীল রঙ করিতে হইলে মনছাল (মনঃশীলা—ভয়ানক বিষাক্ত), নীল, বাখারি চূণ ও গঁদ দরকার হইয়া থাকে।

কাপড়ের পাকা পাড় ও পাকা ছিট করিতে হইলে সুগার অব লেড, এসেটীক এসিড, ফটকিরি, প্রভৃতি দ্বারা লাল রঙ তৈয়ার করিতে হয়।

পাকা কাল রঙ তৈয়ার করিতে হইলে পাইরোনিগ্‌নেট্ অব লাইম বা আয়রণ লিকর অথবা ব্ল্যাক লিকর দরকার। হীরাকসের জলে সুগার অব লেড একত্র করিলে এসিটেট্ অব লাইম বা সুগার অব লেড, হীরাকসের সহিত মিশাইয়া ব্ল্যাক লিকর বা আয়রণ লিকর নামক কাল রঙ প্রস্তুত হয়।

ঘোর লাল রঙ বিদেশীয়েরা এইরূপে তৈয়ার করে যথা,—সুগার অব লেড্ ৭॥ সের, সোডা ১ সের ও গরম জল ৫০ সের। প্রথম গরম জলে ফিটকিরি দ্রব করিয়া উহাতে সোডা দিতে হয়, পরে উথলিয়া উঠিলে সুগার অব লেডের চূণ দিতে হয়। পরে ভালরূপ নাড়িয়া তাহাতে গঁদ দিলেই উহা ঘন হইবে ও উহা কাপড়ে ছাপ দিবার উপযুক্ত হইয়া থাকে।

ফিকা লাল রঙের জন্য ফিটকিরি ৪ সের, সুগার অব লেড্ ৩ সের ও জল ৩ সের দরকার হয়।

অত্যন্ত ফিকা লাল রং করার জন্য সুগার অব লেড্ ৭॥ সের, ফিটকিরি ১৮॥ সের, চা খড়ি চূর্ণ ১॥০ সের, নরম খড়ি ২॥ সের ও জল ৫০ সের আবশ্যক হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে এদেশে খদির, জঙ্গাল, টিকা, প্রভৃতি দ্বারা রঙ তৈয়ার করা হইত। এক্ষণে বিদেশীয়েরা বাই ক্রোমেট অব পটাশ প্রভৃতি উগ্র ও বিষাক্ত দ্রব্য দ্বারা খদিরের পাকা রঙ করিয়া থাকে। বিদেশীয়েরা, কাপড় খদিরের জলে ভিজাইয়া ও পরে শুখাইয়া বাই ক্রোমেট অব পটাসের উষ্ণ জলে ভিজাইয়া পরে শুখাইয়া লইয়া থাকে।

কাপড়ের উপর তুঁতে বা জাঙ্গালের ছাপ দিয়া শুখাইলে পরে চূণগোলা দিতে হয়, পরে ঐ বর্ণ নীল হইলে কাপড়টীকে সিমুনক্ষারের (শঙ্খবিষ ব, আর্শনিয়েট অব পটাশ) জলে ফুটাইলে হরিৎ রঙ হইবে।

সুগার অব লেড বা নাইট্রেট্ অব লেডের জলে কাপড় ভিজাইয়া পরে ঐ কাপড় বাই ক্রমেট অব পটাসের জলে ভিজাইয়া ঘোর হরিদ্রা বর্ণ করে। কিন্তু কমলা রঙের পাকা রঙ করিতে হইলে ঐ হরিদ্রাবর্ণ কাপড় চূণের জলে ফুটাইলে ক্রোমেট অব লেডের বর্ণ কমলা হইয়া থাকে। আজকাল বিদেশীয়েরা কমলা রঙের ধুতির সুতা ঐরূপে রঞ্জিত করিয়া থাকেন।

নীলরঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র বা নীলছিটকে এসিটেট্ অব লেডের জলে মগ্ন করিয়া পরে বাই ক্রোমেট্ অব পটাশের জলে মগ্ন করিলে ঐ স্থান পীতবর্ণ প্রাপ্ত হয়।

বিদেশীয়েরা সুতা, রেশম, পশম প্রভৃতি প্রুসিয়েন ব্লু দিয়া রঞ্জিত করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ হীরাকসের জলে কাপড় ডুবাইয়া পরে চুণের জলে ধৌত করিতে হয়। সির্কা বা অন্যান্য অম্ল মিশ্র দিয়া পরে কেরোসায়েনাইড্ অব পটাশের (কেরো-সায়েনাইড্ পটাশ অতি ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ) বা টার্টারিক এসিড, প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা এবং চূণগোলার জলে ভিজাইয়া ঐ কাপড় খানিতে সঙ্খবিষ বা আর্শেনিয়েট্ অব সোডার জলে মগ্ন করিয়া ঘোর হরিৎবর্ণ রঙ করিয়া থাকে।

আমরা যাহা প্রকাশ করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন, বিদেশীয়েরা মনমুগ্ধকর রঙ তৈয়ার করিবার জন্য কিরূপ বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করিয়া কিরূপ অনারোগ্য রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে।

কার্ত্তিক—১৩১৭।

গ্রাম্য বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষা।

পল্লিগ্রামস্থ বিদ্যালয় সমূহের সাহায্যে কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধান করা অধুনা গভর্ণমেণ্টের অন্যতম সাধু উদ্দেশ্য। ভারতের সর্ব্বত্র ইহার সুচনা দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষি-শিক্ষা এখনও ভারতে আরম্ভ হয় নাই এবং কতদিনে আরম্ভ হইবে, তাহারও স্থিরতা নাই। ভারতের ন্যায় কৃষি-প্রধান দেশে কৃষি-শিক্ষা সকলেরই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, এ কথা কেহ না বুঝেন এমন নহে। এককালে ভারতে কৃষির প্রাধান্য ছিল এবং সুজলা সুফলা ভারতভূমি পৃথিবীর উদ্যান বলিয়া সভ্যজগতে চিরদিনই সুপরিচিত। প্রকৃতি তাহার অক্ষয় ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া চিরকালই ভারত ভূমিকে দিব্যাভরণে সাজাইতে ব্যস্ত, ভারতের আবহাওয়া আবহমানকাল নানাবিধ সুখাদ্য শস্য এবং সুরসাল, সুস্বাদ্য ফল প্রসবের অনুকূল, তাহার উপর ভারতের সেই শিল্পনৈপুণ্য, সেই কৃষিকার্য্য ভারতকে এক সময়ে সমগ্র সভ্য ভূখণ্ডের শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছিল। কালের পরিবর্ত্তনের সহিত ভারত সে আধিপত্য হারাইয়াছে। বিদেশী শিক্ষার গুণে এবং নানাপ্রকার কল কব্জার আবিষ্কার

হেতু ভারতের কৃষি ও শিল্প উভয়েরই অবনতি ঘটিয়াছে। ভারতে কৃষি এখন অত্যন্ত অবজ্ঞাত। চিকিৎসা, স্থাপত্য, আইন প্রভৃতি ব্যবসায় অথবা উচ্চ চাকুরির দিকে অনেকেরই এক্ষণে লুব্ধ দৃষ্টি এবং যাহা তাহাদের প্রধান অবলম্বন, সেই নষ্টপ্রায় ভারতীয় কৃষির প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয়ে, যেখানে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাও এখন পর্য্যন্ত অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। কৃষি শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক ও পাঠ্য-পুস্তকের এখনও পর্য্যন্ত নিতান্ত অভাব। ৺ নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত সরল কৃষি-বিজ্ঞান, গিরীশবাবু প্রণীত কৃষি-সোপান ও কৃষি-দর্শন প্রভৃতি, বালকপাঠ্য কৃষি পুস্তক দুই চারি খানি থাকিলেও এখন এদেশে ট্যানারের প্রাথমিক কৃষিতত্ত্ব, হুকারের উদ্ভিদতত্ত্ব, সরল কৃষি-রসায়ন পুস্তকের ন্যায় পুস্তক অদ্যাপি বিরল।

ভূমিকর্ষণ দ্বারা শস্য উৎপাদনের নাম কৃষি, কিন্তু গো মহিষাদি প্রতিপালন করিয়া দুগ্ধ উৎপাদন, ছাগ মেষাদি হইতে মাংস ও পশুলোম সংগ্রহ ও সরবরাহ এবং আনুসঙ্গিক অনেক অনেক কার্য্য পরোক্ষভাবে কৃষির অন্তর্গত। জমি হইতে যথোপযুক্ত মাত্রায় আহার্য্য ও আচ্ছাদনোপযোগী সামগ্রী উৎপাদন করা অথচ তাহাতে ব্যয় বাহুল্য না হয়, কিম্বা জমি নিস্তেজ হইয়া না পড়ে ইহাই কৃষির মুলতত্ত্ব। কৃষির মূলতত্ত্বগুলি ও বৈজ্ঞানিকতথ্য সমুদয় সহজ সরল ভাষায় কৃষক বালকগণকে ও কৃষি শিক্ষার্থী ছাত্র সকলকে বুঝাইয়া দেওয়াই প্রাথমিক কৃষি শিক্ষার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত, কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত উপযুক্ত শিক্ষক ও পাঠ্য নিরুপিত না হয়, ততদিন প্রকৃতপক্ষে ভারতে কৃষি-শিক্ষা দূরে পড়িয়া থাকিবে। ইতিপূর্ব্বে আমরা এ কথার বহুবার আভাস দিয়াছি।

কেবলমাত্র পুস্তক পাঠেও কোন ফলোদয় হইবে না। উদাহরণ দ্বারা যদি বালকদিগের মনে ভারতীয় কৃষির উন্নতি বিধায়ক ভাব জাগাইয়া তোলা যায় এবং কৃষিকার্য্য অবজ্ঞার জিনিস নহে বলিয়া যদি তাহারা একবার বুঝিতে পারে ও ভবিষ্যতে যদি তাহারা তাহাদের পৈত্রিক ব্যবসায়াদির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কৃষি পর্য্যালোচনা করিতে পারে, তবে এবং তখন ভারতে প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষি-শিক্ষা আরম্ভ হইবে। শিক্ষক মহাশয়দিগের এই মূল কথা স্মরণ রাখিয়া ছাত্রগণকে কৃষি-পাঠ্যগুলি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যতদূর সম্ভব ছাত্রগণকে হাতে হাতিয়ারে কাজ শিখাইতে হয় এবং সহজ কৃষি-গ্রন্থগুলি নির্ব্বাচন করিয়া সেই পাঠ্যোল্লিখিত সামগ্রীগুলি ক্রমশঃ ছাত্রগণের দ্বারাই সংগ্রহ করাইয়া সহজ ভাষায় সেইগুলির রূপগুণাদির ব্যাখ্যা করিয়া দিলে, তবে তাহারা কৃষিকর্ম্ম যে কি, তাহা বুঝিতে পারিবে এবং তাহার ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিবে।

মৃত্তিকা বিচার করিবার সময় বেলেমাটি, আটালমাটি, বেলে দোয়াঁশ, কাদা দোয়াঁশ মাটি সংগ্রহ করিতে হইবে, তবে ছাত্রেরা বুঝিবে কেন এটা বেলে মাটি—কেন এটা কাদা দোয়াঁশ, কেন ইহাতে ধান জন্মিবে না, কেন বা উহাতে ধান জন্মিবে। সূক্ষ্ম বীজ হালকা মাটিতে বুনিবার আবশ্যকতা কি বা তালের আঁটির মত আঁটিগুলি ৬ ইঞ্চি মাটির নিচেও বপনে কোন দোষ হয়না কেন? এইরূপ আবার জাতি ও বর্ণানুসারে বৃক্ষ, লতা গুল্মাদির শ্রেণী বিভাগ করিতে শিখাইতে হইবে এবং এইরূপে শিখাইতে পারিলে তবে তাহাদের

মন প্রকৃত জ্ঞান লাভে উদ্বুদ্ধ হইবে। তখন তাহারা মূলতত্ত্বগুলি ছাড়িয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলির আলোচনার অবকাশ পাইবে এবং ভাবিতে শিখিবে যে, একই জমি হইতে কি প্রকারে জমি নিস্তেজ না করিয়া তিন চারিটি ফসল পাওয়া যায়; কি প্রকারে অনাবৃষ্টি সহ ধান বা গম উৎপন্ন করা যায়, কি প্রকারে এক একটা ধান ও গমের শীষে অপেক্ষাকৃত অধিক দানা হয়, ইত্যাদি। তখন এই সকল দিকেই তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য হইবে। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে যথা সম্ভব এই সকল নূতন নূতন চাষবাসের পরীক্ষা হওয়া উচিত। কার্য্যকরী ভাবে শিক্ষা দিতে হইলে, নানাবিধ নূতন নূতন বৃক্ষ, লতা ও তৃণাদি ছাত্রদিগের দ্বারা জন্মাইয়া তাহাদের গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখাইয়া দিলে তবে তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা হইবে।

পরীক্ষা দ্বারাও কয়েকটী বিষয় ছাত্রদের হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। জন্তুদের মলমূত্র টাট্‌কা গাছের গোড়ায় দিলে গাছ মরিয়া যায়, কিন্তু প্রচুর জলের সহিত ব্যবহার করিলে মরে না অপিচ গাছ সতেজে বাড়িতে থাকে, ইহা দেখাইয়া দিতে পারিলে কৃষক বালকগণ আর কখন পশু-গণের মূত্র অপচয় করিবে না।

কতিপয় বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষ, গুল্মাদির ফল, ফুল সমেত শাখা প্রশাখা নমুনা স্বরূপ রাখিয়া দিলে ছাত্রগণকে বৃক্ষাদি চিনাইবার অনেক সুবিধা হয়, অথচ তাহাতে শিক্ষকগণের সমধিক পরিশ্রম হয় না, অথবা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের এমন কিছু অত্যধিক ব্যয় হয় না।

ছোট ছোট ছেলেদের, শিক্ষক মহাশয়গণ কিছু একেবারে পণ্ডিত করিয়া দিতে পারেন না, তবে তাহাদের শিক্ষার ভিতরে এমন একটু নূতনভাব আনিয়া দিতে পারেন, যেন তাহারা সহজে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হয় এবং ভবিষ্যতে সুকৌশলে কৃষিকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে। পৌষ মাসে ধান কাটিয়া লইয়া অনেকেই জমিতে লাঙ্গল দেয় এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত অনেক বার লাঙ্গল মৈ দিয়া থাকে, কিন্তু যদি তাহারা জানিতে পারে যে, মাসে মাসে লাঙ্গল মৈ দিয়া জমি সুপরিষ্কৃত রাখিতে পারিলে এবং জমির ধারভিত কোপাইয়া দুরস্ত করিয়া রাখিলে ফসলে পোকা লাগার ভয় থাকে না, অথবা বৃষ্টিপাতের পর জমিতে লাঙ্গল মৈ দিয়া জমি চাপিয়া রাখিলে, তাহাতে রস সঞ্চিত থাকে, তবে তাহারা ঐ কার্য্য খুব আগ্রহের সহিত করিবে। কৃষকবালক বা কৃষিশিক্ষার্থী বালকগণ যদি জানিতে পারে যে, কাসাভা বা শিমূল আলু হইতে অসময়ে খাদ্য সংগ্রহ হইতে পারে তাহা হইলে উহারা বড় হইয়া ক্ষেতের আশে পাশে কতকগুলি শিমূল আলুর গাছ বসাইতে ভুলিবে না। বার বার একই ফসল যদি একই ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হয়, তবে জমি নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, এরূপ অবস্থায় তাহারা দুই তিনটি ফসলের পালটা পালটি চাষ করিতে ছাড়িবে না, কিম্বা শুঁটিধারি শস্যের আবাদ করিয়া ফাঁকি দিয়া ক্ষেতের উর্ব্বরতা বাড়াইয়া লইতে ত্রুটি করিবে না।

জ্ঞানেই বল, সেই জ্ঞানের চক্ষু খুলিয়া দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষকতা এবং যে সকল পাঠ্যে ইহার সাহায্য হয়, তাহাই প্রকৃত পাঠ্য।

পাট ব্যবসা।—আধুনিক বানিজ্যে পাট একটি প্রধান পন্য বলিয়া পরিগনিত। বৎসরে কত পাট উৎপন্ন হইল, পূর্ব্ব বৎসরের কত পাট মজুত রহিল, তাহা জানিবার জন্য পাট ব্যবসায়ীরা লালায়িত। কারণ এই খবরের উপর কি বিলাতে কিম্বা ভারতে, পাটের দর উটে বা নামে। অন্যান্য শস্য সংবাদের ন্যায় পাট সম্বন্ধে সংবাদ সরকারী বিবরণীতে যথারিতি প্রকাশিত হয়। ঐই রূপ বৎসরে দুইটী বিবরণী প্রকাশিত হইয়া থাকে। জেলার কর্ত্তাগণ পাট সম্বন্ধে যে খবর সংগ্রহ করেন তাহাই বিবরণী আকারে বাণিজ্য অফিস হইতে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টী কৃষি অফিস হইতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু জেলা কর্ত্তৃপক্ষগণের বিবরণীর সঙ্গে, কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরের বিবরণীর প্রায় মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে পাট ব্যবসায়ীগণ বিশেষ অসুবিধা অনুভব করেন। বিগত বর্ষে বাণিজ্য অফিস হইতে প্রথমে ৭২,৮৭, ৮৮৬ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বিবরণী প্রকাশিত হইল, তৎপরে দেখা গেল যে, পাট ৮৮,৬৪,৭৯২ বেল উৎপন্ন হইয়াছে। কৃষি ডিরেক্টর এই মতই প্রকাশ করিলেন। এবৎসর জেলাদার-গণের অনুমান ৬১,৮৬,৩০০ বেল কিন্তু ডিরেক্টর বলেন যে ৭৯,৩২,০০০ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথমে জেলাদারগণের বিবরণী প্রকাশিত হইবা মাত্রেই পাটের দর ৩৬৲ টাকা বেল হইতে ৪৫৲ টাকা বেল দাঁড়াইয়াছিল। ডিরেক্টরের অভিমত যখন পাট ব্যবসায়ীরা জানিতে পারিলেন এবং যখন জানিলেন যে গতবৎসরের দরুণ ৩০০,০০০ বেল পাট মজুত তখন তাঁহারা আশ্বস্থ হইলেন এবং পাটের দরও নামিতে সুরু হইল।

সমগ্র বঙ্গে আজকাল দুইজন কৃষি-ডিরেক্টর হইয়াছেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্মচারী দ্বারা স্থানীয় খবর সংগ্রহে সুবিধা পান বলিয়া এবং তাঁহাদের অধীনস্থ সরকারি ক্ষেত্র সমূহ পরিদর্শন কালে স্থানীয় অবস্থা দেখিতে পান বলিয়া তাঁহারা কতক পরিমাণে সঠিক খবর দিতে পারেন। তথাপিও দেখা যায় যে, তাঁহাদের খবর একেবারে অভ্রান্ত নহে। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, কৃষিডিরেক্টর প্রায়ই বদল হয়। ১৯০৩ সাল হইতে বর্ত্তমান সাল পর্য্যন্ত ৫ জন ডিরেক্টর বদল হইয়াছেন। যদি প্রতিবৎসরই নূতন কৃষি ডিরেক্টর আসেন তবে তিনি কি প্রকারে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন! কৃষি-ডিরেক্টরের পদ স্থায়ী হইলে ইহার প্রতিকারের আশা করা যায়।

পাট ব্যবসায়ী বা পাটের কাজে লিপ্ত অন্যলোকে পাটবিবরণী বাহির করিতে পারে কিন্তু সেই সকল বিবরণী স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য হেতু বিকৃত হওয়া বিচিত্র নহে, সেই জন্য সরকারী বিবরণীর এত আবশ্যকতা। উহাতে ভুল চুক থাকিলেও স্বার্থের কোন সম্পর্ক নাই এবং ইহাতে সম্পূর্ণ না হউক কতকটা ঠিক খবর পাওয়া যায় এবং চেষ্টা করিলে নির্ভুল খবরও মিলিতে পারে।

বর্ত্তমান বর্ষে জেলাদার গণের পাটবিবরণী প্রকাশ হইবামাত্র কৃষি-ডিরেক্টর বুকন সাহেব জেলা-দারগণের ভুল বুঝিতে পারিয়া তিনি স্বয়ং বণিক সভার সম্পাদকের সহিত সাক্ষাত করিয়া এ বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন কিন্তু বণিকসভার উদা-সীনতার জন্য তাঁহার অভিমত সাধারণে প্রকাশিত হয় নাই। ক্যাপিটাল পত্রিকার ম্যাক্স বলিতেছেন যে বুকন সাহেব এই জন্য বণিকসভার সাহায্য না লইয়া স্বয়ং এই সংবাদ সাধারণে প্রকাশ করিলে পাট ব্যবসায়ে এত অধিক ক্ষতি হইতে পারিত না।

আমেরিকায় ফলের চাষ।

শ্রীযুক্ত নলিনবেহারী মিত্র এম,এ, লিখিত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় এক মহা ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত লোকের আহারের জন্য এক রকম সুখাদ্য পিষ্টক তৈয়ার করার ফরমাইস করা হয়। সূপকার কয়েক মণ কিসমিস আনিতে বলিল, কিন্তু সমস্ত আমেরিকায় সে পরিমাণ কিসমিস জুটিল না। তখন ইউরোপ হইতে দ্রাক্ষাফল এখানে আমদানি করিতে হইত। ৪০ বৎসর পুর্ব্বে আমেরিকায় একটীও কমলা, আপেল বা পিচ ফলের গাছ ছিল না। এই ৪০ বৎসরে মানুষের অধ্যবসায়ে আমেরিকায় কতই যে নূতন ফলের চাষ হইতেছে, তাহারই আভাষ এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিব।

১৮৭৯ সনের পূর্ব্বে আমেরিকায় কেহ কমলা লেবুর গাছ দেখে নাই। ইউরোপ হইতে অতি অল্প সংখ্যক কমলা লেবু আমদানি করা হইত। ধনী ভিন্ন আর কেহ তাহা ভোগ করিতে পারিত না তখন কেবলমাত্র কালিফার্ণিয়ায় কমলার চাষ আরম্ভ হইয়াছে।

১৮৯৯ সনে ব্যবসায়ীগণ ক্যালিফর্ণিয়া হইতেই ১২ হাজার রেলগাড়ী পুর্ণ কমলা আমেরিকার নানাস্থানে প্রেরণ করিয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে এক কালিফর্ণিয়াতেই এত কমলা জন্মিবে, যে সমস্ত পৃথিবীতে অতি সস্তা দরে সে কমলা প্রেরণ করিয়া ব্যবসায়ীগণ লাভ করিতে পারিবে। কেহ কেহ বলিতেছেন, আমেরিকার কমলা লেবু যদি বিনা ট্যাক্সে ভারতে আসিতে পারে, তবে কলিকাতার বাজারে শ্রীহট্টের কমলা অপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রীত হইবে। ১৯০০ সনে কালিফর্ণিয়া হইতে ১৮ হাজার রেলগাড়ী কমলা ভিন্ন স্থানে চালান দেওয়া হইয়াছিল। শীঘ্র আরও ২ লক্ষ গাছ ফলবান হইবে—তখন সমস্ত ইউরোপ আমেরিকার কমলা লেবুতে পূর্ণ হইবে।

কালিফর্ণিয়া আমেরিকার মধ্যে ফলের জন্য প্রসিদ্ধ। ফ্লোরিডা নামক প্রদেশে ৩ লক্ষ কমলা লেবুর গাছে ফল ধরিতেছে। আমেরিকায় এখন কৃষকগণ কমলার চাষ করিয়া ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। ব্যবসায়ীরা ইহার তিন গুণ পাইতেছে। কমলা লেবুর চাষে কৃষকেরা ১২ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে উৎকৃষ্ট কমলা লেবু জন্মে। কিন্তু ইহার চাষে দুই চারি লক্ষ টাকাও ব্যয়িত হয় নাই। সুতরাং ভারতবাসী কৃষকেরা কমলা ফল বিক্রয় করিয়া দুই এক লক্ষ টাকা পায় কি না, তাহাও সন্দেহ। বিধাতা ভারতবর্ষকে সকল ফলের উপযোগী ভূমিই দান করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবাসী এমন অপদার্থ যে, সে ভূমি হইতে রত্ন সংগ্রহ করিতে না পারিয়া উদরান্নের জন্য পরের গলগ্রহ হইয়া রহিয়াছে।

৪০ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় পিচ ফলের গাছ দেখা যাইত না। এখন এক ইণ্ডিয়া প্রদেশেই ৩ লক্ষ পিচের গাছ জন্মিয়াছে। জর্জ্জিয়া প্রদেশে একজন কৃষক ১লক্ষ ২০ হাজার পিচ গাছ জন্মাইয়াছে। মিসিগান প্রদেশের একজন কৃষক প্রতি বৎসর পিচ বিক্রয় করিয়া ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা লাভ করিতেছেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথমে আমেরিকাতে তরমুজ খাইয়া আমেরিকার লোক বড় মুগ্ধ হইয়াছিল। পর বৎসর ১৩৩ রেল গাড়ী তরমুজ জন্মে, অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত তরমুজ বিক্রীত হয়। ১৮৯৮ সনে ১৫ শত গাড়ী তরমুজ জন্মে। ১৯০০ সনে ৭০ হাজার বিঘা জমিতে তরমুজের চাষ হইয়াছে।

১৮৬৩ সনের পূর্ব্বে কেহই এখানে বিক্রয়ের জন্য আঙ্গুরের চাষ করিত না। ১৮৭৩ সনে কেবল মাত্র হাজার বাক্স আঙ্গুর জন্মিয়াছিল। এখন হাজার রেলগাড়ী বোঝাই হইতে পারে, এমন আঙ্গুর এক কালিফর্ণিয়া হইতেই জন্মান হইয়া থাকে।

১৮৯০ সনে ৪,১৮,১৭,০৬ পাউণ্ড কিশমিস বিদেশ হইতে আমেরিকায় আসিয়াছিল, ১৯০০ সনে কেবল মাত্র ১ কোটি পাউণ্ড কিসমিস আমেরিকায় আমদানী করা হইয়াছে। ১০ বৎসরের মধ্যে তিন কোটি পাউণ্ড আমদানী কম হইয়াছে। কালিফর্ণিয়াতে প্রতি বৎসর ১০ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড কিসমিস জন্মে। এই কিসমিস চাষ করিয়া কৃষকেরা প্রায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে।

আমেরিকায় অপর্য্যাপ্ত আপেল ফল জন্মিতেছে। ১৮৯৪ সনে ৬০ কোটি টাকা মূল্যের আপেল ফল বাজারে বিক্রায়ার্থে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৯০০ সনে ৮০ কোটি টাকার ফল বিক্রীত হইয়াছে। ইউরোপের ক্ষুদ্র বড় সমস্ত নগরে আমেরিকার সর্ব্বত্র আপেল ফল চালান হইতেছে।

আপেল ফল বিক্রয়ে বহু অর্থলাভ হয়, ব্যবসায়ীগণ এই ফল বহুদিন অবিকৃতভাবে রক্ষা করিবার উপায়ও উদ্ভাবন করিয়াছে। ঠাণ্ডাতে রাখিলে আপেল ফল বহুদিন ভাল থাকে। ৩২ হইতে ৩৫ ডিগ্রি তাপের মধ্যে রাখিলে ৮ মাস কাল টাটকা থাকে। প্রত্যেক কৃষকের বাড়ীতেই ঠাণ্ডা ঘর আছে, সেখানে সস্তার সময় আপেল সঞ্চয় করিয়া রাখে, মহার্ঘের সময় বাহির করিয়া বিক্রয় করে।

যে সকল ফল পাকিলে দুই চারি দিবসের মধ্যে পচিয়া যায়, আমেরিকার শিক্ষিত কৃষকগণ তাহা রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছে যে, কি পরিমাণ শৈত্যে, কোন্ ফল কতদিন অবিকৃত থাকিতে পারে। তাহারা আপনাদের বাড়ীতে ও জাহাজে সেইরূপ ঠাণ্ডাঘর তৈয়ার করিয়া দূর দূরান্তরে ফল পাঠাইতেছে।

ভারতবর্ষের জমি এমন উর্ব্বরা যে, প্রায় সকল রকম ফলই প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে পারে; কিন্তু ফলের চাষ করিবার উদ্যোগ বা শিক্ষা অল্প লোকেরই আছে। ফলের চাষ পর্য্যাপ্তরূপে হইলে দুর্ভিক্ষ ভয়ও অনেক পরিমাণে কমিতে পারে। বাঙ্গলা দেশে আম ও কাঁঠাল প্রচুর পরিমাণে জন্মে, তখন গরীব লোকেরা এই ফল খাইয়া অনেক সময় কাটায়। আমেরিকায় এক একজন কৃষক ৩০।৪০ হাজার বিঘা জমিতে ফল বৃক্ষ রোপণ করিতেছে এবং ধনৈশ্বর্য্যে তাহাদের গৃহ পূর্ণ হইতেছে। যে সকল ভদ্রলোকেরা পল্লীগ্রামে বাস করেন, তাঁহারা একটু উদ্যোগী হইলে অনায়াসেই ফলের চাষ করিতে পারেন, ইহাতে বিলক্ষণ অর্থলাভের সম্ভাবনা। মুর্শিদাবাদ জেলার কোন ভদ্রলোক অল্পাধিক পরিমাণ আম গাছ জন্মাইয়া দু দশ টাকা লাভ করিতেছেন, আমের পক্ষে মুর্শিদাবাদের জমি বেশ অনুকূল; কিন্তু আমেরিকার কৃষকের ন্যায় কেহই এই ব্যবসায় করিয়া ধনী হইতে পারিতেছেন না। ঠাণ্ডা ঘরের ব্যবস্থা করিতে পারিলে আমের ব্যবসায়ে বেশ লাভ হইতে পারে। উৎকৃষ্ট আমের চাষ করিলে বহু ধন উপার্জ্জন করা যাইতে পারে কিন্তু সে রকম উদ্যোগ কোথায়? বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত বোম্বায়ের আলফন্সো আমেরই চাষ হইল না। আলফন্সো আমের রাজা। আলফান্সো গাছ বঙ্গদেশে কয়টাই বা আছে, বা এই আম বঙ্গদেশে কয়টাই আমদানী হয়। বিদেশে প্রেরণের কথা দূরে থাকুক, ৪৬ ঘণ্টার পথ, অথচ বোম্বাই হইতে এই আম বঙ্গদেশে অতি অল্পই আসিয়া থাকে। উদ্যোগবিহীনতাই আমাদের

সর্ব্বনাশের একমাত্র কারণ। চাকরির লাঞ্ছনা, দুর্ভিক্ষ, দরিদ্রতা সত্বেও ভারতবাসী কতকাল নিশ্চেষ্ট থাকিবেন বলিতে পারি না!

পত্রাদি।

নিম্নভূমিতে কলা ও হলুদ।

বি, সি, চাটার্জ্জি, পুরি গার্ডেন, নলিতবাড়ি।

মহাশয়।

যে জমিতে বর্ষার সময় ২।৩ দিন পার্ব্বতীয় নদীর তলে জল উঠিয়া পরে নামিয়া যায়, ঐ জমিতে কলার চাষ করা যায় কিনা এবং একই জমিতে কলা গাছের নিচে হলুদ রোপণ করা যায় কিনা জানাইবেন। আর হলুদ চাষের রোপণ হইতে সিদ্ধ ও শুখাইবার বিস্তৃত বিবরণ কোন্ পুস্তকে আছে এবং ঐ পুস্তকের মূল্যইবা কত পত্র পাঠ জানাইবেন। আমি এখানে কলা ও হলুদের চাষ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আর, পূর্ব্বোক্ত ঢলের সময় জমিতে ২।৩ দিন জল থাকিয়া একেবারে নামিয়া গেলে হলুদের ক্ষতি হবে কিনা জানাইয়া বাধিত করিবেন।

[যে জমিতে নদীর জল উঠে তাহাতে কলা বাগান করা উচিত নহে কারণ গোড়ায় জল বসিলে চাঁপা, চাটিম, মর্ত্তমান প্রভৃতি ভাল জাতীয় কলার গাছ প্রায়ই মরিয়া যায়। কলাবাগানে কলাগাছ বসাইয়া প্রথম বৎসরে হলুদ চাষ করিয়া লওয়া যাইতে পারে কিন্তু পর বৎসর আর হলুদ রাখা চলে না কারণ তাহাতে গাছের গোড়া কোপাইবার ও মাটি দিবার অসুবিধা হয়। কিন্তু কলা গাছ ৮ হাত অন্তর অন্তর বসাইবার বিধি, সুতরাং ৮ হাতের মধ্যে মধ্যে এক এক ঝাড় হলুদ রাখিতে পারা যায়। এইটুকু কিন্তু বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে যে, একই স্থান হইতে উভয়েই খাদ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিদন্দ্বিতা না করে।

হলুদও জলে নষ্ট হয়। মূলজ খন্দ মাত্রেই গোড়ায় জল বসিলে খারাপ হয়। হলুদের জন্য এক খানি স্বতন্ত্র পুস্তক নাই এবং তাহার আবশ্যকতাও কিছু দেখা যায় না। কৃষকে হলুদ চাষ সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।] কৃঃ সঃ।

নারিকেলের ফল ঝরা।

শ্রীনিতাই চন্দ্র রায়, ২০ রাজা ব্রজেন্দ্র নারায়ণ রায় ষ্ট্রীট, শিকদারপাড়া. কলিকাতা।

আমাদের বাগানে কতকগুলি নারিকেল বৃক্ষ আছে পূর্ব্বে তাহাতে বেশ ফল ফলিত এখনও বেশ ফল হয় কিন্তু প্রায় দেখা যায় ডাব গুলি শুষ্ক ও গাত্রে ছিদ্র হইয়া গাছ তলায় পড়িয়া থাকে, কোন্ প্রকার পোকা বা জন্তুর দ্বারা উহা নষ্ট হয় বলিতে পারি না কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, কাঠবিরালেই উহা নষ্ট করে। এক্ষণে কি প্রকারে উহার হস্ত হইতে ফল রক্ষা পাইতে পারে?

উত্তর:—

[যদি নিশ্চয় জানিতে পারেন যে কাঠবিরালে এই প্রকারে নারিকেল কাটিয়া ফেলিতেছে তবে কাঠবিরাল যাহাতে গাছে উঠিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেঁয়া পাতা বা ঘণ কাঁটা বিশিষ্ট কাঁটার পালা গাছে গোড়ায় বাঁধিয়া দিলে বোধ হয় কাঠবিরাল আর গাছে উঠিতে পারিবে না।

যদি পোকা লাগা সম্ভব হয়, তবে কি পোকা তাহার অনুসন্ধান করিবেন। পোকা ধরিয়া সছিদ্র ছোট কাঠ বা টীনের বাক্সে পুরিয়া আমাদের নিকট পাঠাইলে আমরা কি পোকা বা তাহার প্রতিকার কি বলিয়া দিতে পারি।] কৃঃ সঃ।

কাসাভা।—

শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মতিঝিল, মজঃফরপুর।

১। কাসাভা ইহার বঙ্গলা ও হিন্দি নাম কি?

২। বীজ হইতে ইহার চাষ হয় কিম্বা রাঙা আলুর মত ইহার লতা রোপণ করিতে হয়?

৩। বীজ কোথায় পাওয়া যায়?

৪। কোন সময় রোপণ করিতে হয় এবং কখন আলু তৈয়ারি হয়?

৫। এক বিঘার জন্য কত বীজ লাগে?

৬। চাষের প্রণালি কি প্রকার?

উত্তর:—১। ইহার বাঙ্গলা নাম শিমুল আলু। শিমুল গাছের মত গাছ হয় বলিয়া ইহার এই রূপ নামকরণ হইয়াছে। হিন্দি নাম আমরা জ্ঞাত নহি।

২। বীজ হইতে ইহার চাষ করা হয় না। ডাল কাটিয়া হাপরে কলম করিতে হয়। সেই সকল ডাল হইতে শিকড় বাহির হইলে তাহা স্থানান্তরে রোপণ করা বিধি।

৩। ডাল কটিং ভারতীয় কৃষি সমিতির নিকট পাইবেন।

৪। বর্ষাকালেই ইহার কলম তৈয়ারি করিয়া বর্ষাতেই রোপণ করিতে হয়। শিকড়ে আলু জন্মায়। সম্বৎসর মাঘ ফাল্গুন মাসে আলু পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহা অতি সামান্য। দুই বৎসরের গাছ হইতে অধিক পরিমাণে আলু মিলে।

৫। তিনফুট অন্তর কটিং বসাইলে প্রত্যেক বিঘায় ১৬০০ কলম বসিতে পারে। এ দেশে কেহ উহার সতন্ত্র চাষ কেহ করে না। বাগানে বেড়ার ধারে উহা রোপিত হইয়া থাকে। তাহা হইতে কখন কেহ ইচ্ছামত বা সখ করিয়া আলু তুলিয়া লয়।

৬। কৃষকে শিমুল আলুর চাষ সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। কৃঃ সঃ।

প্রাদেশিক কৃষি-সংবাদ।

বঙ্গে তুলা।—১৯১০। সমগ্র বঙ্গে জলদী তুলা ৩২,২৫৩ একর জমিতে আবাদ হইয়া থাকে, অন্য বৎসর অপেক্ষা আবাদী জমির পরিমাণ কিছু কম। ইতিমধ্যেই ২৮,৩৬৯ একর পরিমাণ জমিতে নাবী তুলার আবাদ হইয়াছে। এখনও আবাদ চলিতেছে। বাঁকুড়া, কটক এবং বালেশ্বরে কার্ত্তিক মাসের মধ্যভাগেও নাবী তুলা বীজ বপন আরম্ভ হয় নাই। বিগত বর্ষে ৩৩,২৮৬ একর জমিতে নাবী তুলার আবাদ হইয়াছিল। এ বৎসর কত দাঁড়ায় বুঝা যাইতেছে না।

জলদী জাতীয় তুলা বীজ বর্ষার পূর্ব্বে বপন করা হয় এবং প্রধানতঃ সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম, মানভূম, আঙ্গুল, রাঁচি এবং সম্বলপুরে জলদী তুলার আবাদ হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে সিংভূম ও উত্তর বিহারে নাবী তুলার চাষ হইয়া থাকে। যদিও পাটনা বিভাগে জলপ্লাবনে নাবী তুলার কিছু ক্ষতি হইয়াছে তথাপি বর্ত্তমান বর্ষে তুলা চাষের বেশ সুবিধা বলিতে হইবে।

পঞ্জাবে তুলা।—১৯১০। কার্ত্তিকমাসের মধ্যেভাগ পর্য্যন্ত এখানেও তুলাচাষের অবস্থা ভাল। সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই ১,২৪৮,৫০০ একর পরিমাণ জমিতে তুলা চাষ হইয়াছে। অত্রস্থ কাঙড়া, ঝিলম এবং মুলতান প্রভৃতি স্থানে তুলা চাষের অবস্থা তত ভাল না হইলেও মধ্যবিত বলিতে হইবে কিন্তু উক্ত বিভাগের পূর্ব্বাংশে অতিবৃষ্টি হওয়ায় তুলার আবাদের ক্ষতিজনক হইয়াছে। সুখের বিষয় এই যে এখনও পর্য্যন্ত কোন প্রকার পোকার উপদ্রব লক্ষণ দেখা যায় নাই। এতদঞ্চলের দেশীয় রাজার রাজ্যে উক্ত সময় মধ্যে ১,২০,৩০০

একর জমিতে তুলার আবাদ হইয়াছে এবং আরও অধিক হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পঞ্জাবে ইক্ষু।—১৫ই কার্ত্তিক ১৩১৭। এখানে ১৮টী জেলায় ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। আবাদী জমির পরিমাণ ৩৮৩,৭০০ একর, অন্য বৎসর অপেক্ষা পরিমাণে অধিক। অনুকূল রকম বর্ষা হইয়াছিল। সুফসলের আশা করা যায়।

পঞ্জাবে নীল।—নীলের চাষ প্রায় উঠিয়া যাইতেছে, তথাপি দেখা যায় যে, বর্ত্তমান বর্ষে ৩৫,৩০০ একর জমিতে নীলের চাষ হইয়াছে। অন্য বৎসর অপেক্ষা আবাদী জমির পরিমাণ কম; মুলতানে জবপ্লাবনই তাহার কারণ। বিগত বর্ষে ৪৩,৪০০ একর পরিমাণ জমিতে নীলের চাষ হইয়াছিল।

বঙ্গে হৈমন্তিক ধান্য।—১৫ই কার্ত্তিক। বর্ত্তমান বর্ষে ২০,৮২১,২০০ একর পরিমাণ জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়াছে। বিগত বর্ষে ২১,২৩২, ৯০০ একর জমিতে আবাদ হইয়াছিল। চাষের অবস্থা ভালই বোধ হইতেছে। কোথাও কোথাও ষোল আনার উপর ফসল হইবে। কোন কোন জেলায় দশ আনা মাত্র ফসল জন্মিবে বলিয়া অনুমান করা যায়। অধিকাংশ স্থলে বার হইতে চৌদ্দ আনা ফসল প্রাপ্তির আশা করা যায়।

বঙ্গে তিল।—১০ই কার্ত্তিক ১৩১৭। সমগ্র বঙ্গের প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ তিল সম্বলপুরে জন্মিয়া থাকে। মানভূম, সিংভূম হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, নদীয়া সাঁওতালপরগণা এবং ভাগলপুরেও তিলের চাষ ভাল রকম হইয়া থাকে। উত্তর বিহার এবং নদীয়ায় জলপ্লাবনে তিল বুনিবার ব্যাঘাত হইয়াছিল। উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর এবং বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় এখন পর্য্যন্ত তিল বোনা শেষ হয় নাই ও এই সময় পর্য্যন্ত আবাদী জমির পরিমাণ ১৫৭,৯০০ একর। গড়ে প্রতি বৎসর ২২০,০০০ একর জমিতে তিলের চাষ হয়। তিল চাষের বেশ সুবিধাই বোধ হইতেছে।

বঙ্গে পাটের আবাদ।—১৯১০। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম বাদে খাস বাঙলাতে কুচবেহার সহিত ৫৮৭,৮০০ একর পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান।

১৯০৬ সাল হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত পাটের আবাদী জমির পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯০৬	...	...	৭৮০,৪০০	একর
১৯০৭	...	...	৯৩১,২০০	”
১৯০৮	...	...	৫৪৮,৭০০	”
১৯০৯	...	...	৫৫৫,৪০০	”
১৯১০	...	...	৫৭৩,৮০০	”

কুচবেহার রাজ্যে যে পাট জন্মে তাহা উক্ত হিসাবের সহিত ধরা হয় নাই, বর্ত্তমান বর্ষে তথায় ১৪,০০০ একর পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে বিগত বর্ষের আবাদী জমির পরিমাণ ২০,০০০ একর। বর্ত্তমান বর্ষে সর্ব্বত্র পাট সমান ভাবে জন্মায় নাই, পূর্ণিয়ায় যেখানে অধিক পাট জন্মায় সেখানেই নয় কিম্বা দশ আনার অধিক ফসলের আশা করা যায় না, অন্যত্র চৌদ্দ পোনর আনা ফসল জন্মিয়াছে। গড় ধরিলে তের আনা ফসলের কম হইবে না এবং এই অনুমানে এই অঞ্চলে ১,৪৪৬,০০০ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর সাহেব অনুমান করেন যে, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে বর্ত্তমান বর্ষে পাটের আবাদী জমির পরিমাণ ২,৩৫০,০০০ একর এবং তথায় পোনের আনা ফসল জন্মিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে সুতরাং দেখা-যাইতেছে যে এতদঞ্চলে প্রায় ৬,৪৮৬,০০০ বেল

পাট উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ১৯০৬ হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত পাটের আবাদী জমির পরিমাণ :—

১৯০৬	—	...	৩,৪৮২,৯০০	একর
১৯০৭	...	...	৩,৯৭৪,৩০০	,,
১৯০৮	...	...	২,৮৫৬,৭০০	,,
১৯০৯	...	...	২,৮৭৬,৬০০	,,
১৯১০	...	...	২,০৩৭,৮০০	,,

সমগ্র বঙ্গে পাটের আবাদী জমির পরিমাণ ২,৯৩৭,৮০০ একর, উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৭,৯৩২,০০০ বেল।

এতদ্ব্যতীত,

নেপাল	...	...	৬৯,৮৮৪	বেল
উত্তর ভারত	...	...	১১,২৬৩	,,
মান্দ্রাজ	...	...	১৫৪	,,
			৮১,৩১২	বেল

পাট উৎপন্ন হইয়াছে।

গত বৎসর বঙ্গীয় বণিক সমিতির রিপোর্টে দেখা যায় যে, ৮,৮৬৪,৭৯২ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ অনুমান করিয়াছিল ৭,২৮৭,৮৮৯ বেল মাত্র। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ আবাদী জমির পরিমাণ ও উৎপন্ন ফসলের হার কম করিয়া ধরায় এত পার্থক্য দাঁড়াইয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে হৈমন্তিক ধান্য।—বর্ত্তমান বর্ষে ১১,৯২৬,৯০০ একর পরিমাণ জমিতে হৈমন্তিক ধানের আবাদ হইয়াছে, বিগত বর্ষ অপেক্ষা ১৫১,৩০০ একর অধিক জমিতে চাষ হইয়াছে। গত বর্ষে এতদঞ্চলে সতেরো আনা ফসল হইয়াছিল বর্ত্তমান বর্ষে পোনর আনা ফসল জন্মিয়াছে বলিয়া আশা করা যায়।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত শস্যের অবস্থা।—আসাম ভেলী এবং রাজসাহীতে কিছু কম বারিপাত হইয়াছে, অন্যত্রে প্রচুর হইয়াছে। চা পাতা তোলা হইতেছে, রবিশস্য শস্যের জন্য জমি প্রস্তুত ও বীজ বপন হইতেছে তুলা, চা, হৈমন্তিক অন্ন ও ইক্ষুর আবাদের অবস্থা ভাল। সিলেট গোয়ালপাড়া নওগাঁও এবং শিবসাগার ফসলে পোকা লাগিয়াছে। মোটা চাউলের দর কিঞ্চিৎ চড়িয়াছে। মালদা গোয়ালপাড়া, দারঙ্গ নওগাঁও, শিবসাগর এবং গারোপর্ব্বতে গবাদি পশুর রোগ হইতেছে।

সার-সংগ্রহ।

ইক্ষু-চাষ।

নানাবিধ ফসলের মধ্যে ইক্ষুও সকলের নিকট আদরণীয়। ইহার চাষ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অতি সাফল্যের সহিত হইয়া থাকে। এক সময়ে ভারতবর্ষ তদুৎপন্ন চিনির জন্য প্রসিদ্ধ ও গৌরবান্বিত ছিল। কিন্তু ইউরোপ হইতে বীটচিনি আমদানি হওয়া অবধি ভারতবর্ষজাত চিনির আদর বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ও বাজারে ইহার প্রচলনও সেই পরিমাণে কমিয়াছে।

ইক্ষু হইতে রস বাহির করিতে হইলে আধুনিক প্রথাই (অর্থাৎ নূতন উদ্ভাবিত যন্ত্রাদির সাহায্য) অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। কারণ আমাদের দেশে যে পুরাতন প্রথা ছিল, তাহা দ্বারা রস অতি অল্প পরিমাণে বাহির হইত, সুতরাং উৎপন্ন চিনির অনুপাত কম হইত ও উৎপন্ন চিনির দ্বারা দেশের অভাব কোন প্রকারেই মোচন হইত না। ভারতে চিনির ব্যবসায়ের অকস্মাৎ অবনতির ইহাই যে একমাত্র কারণ, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এখানকার ধনকুবেরগণ এখনও যে কেন নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন, দেশের উৎপন্ন চিনির দ্বারা ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিতে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন না, তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। ভারতবর্ষে ৯ হইতে ১২ লক্ষ বিঘা জমিতে ইক্ষুর

চাষ হইয়া থাকে। ইহা সত্য হইলে দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে ৬ হইতে ১০ লক্ষ টন অপরিষ্কৃত চিনি উৎপন্ন হইতে পারে!

আমাদের দেশীয় যন্ত্রদ্বারা ইক্ষু পেষণ করিয়া যে রস নির্গত হয়, তাহা এত সামান্য যে, তদুৎপন্ন গুড় হইতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহা শতকরা পঞ্চাশ মণেরও কম। এই জন্যই আমাদের দেশের কৃষকেরা ভূতগত পরিশ্রম করিয়া তাহাদের পারিশ্রমিক স্বরূপ যথোচিত মূল্য পায় না এবং এই জন্যই আমাদের দেশে চিনির ব্যবসার অবনতি অতি শীঘ্রই ঘটিয়াছে। অতএব আমাদের দেশীয় কারখানায় অধুনাতন নূতন আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির দ্বারা যাহাতে অধিক পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা বাজারে বিদেশীয় চিনির সহিত তুলনায় দেশীয় চিনির প্রাধান্য স্থাপন ও বিদেশীয় চিনির পরিবর্ত্তে দেশীয় চিনি দ্বারা জনসাধারণের অভাব মোচন করা দুরাশা মাত্র।

চিনির ব্যবসার আশু অবনতির আরও একটী প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। চিনির ব্যবসায়ীগণের মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, ইক্ষুর রস হইতে একেবারে পরিষ্কৃত শ্বেতবর্ণ চিনি প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। এই প্রকার ধারণা যে নিতান্ত ভ্রমজনক তাহার আর সন্দেহ নাই। অন্যান্য দেশের চিনির ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদিগেরও এরূপ যন্ত্রাদি ব্যবহার করা উচিত, যাহাতে রস হইতে একেবারে নির্ম্মল চিনি প্রস্তুত হয়। ইহাতে কোন ক্ষতি হওয়া দূরে থাকুক, বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে।

ইক্ষু সম্বন্ধে অনেকে বহুতর প্রকার বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন ও এখনও লিখিতেছেন। ইহাতে পাঠকবর্গের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। অতএব এ বিষয়ে আমাদের আর অধিক লেখা অনাবশ্যক। তবে যাঁহারা সখ করিয়া ইক্ষুর চাষ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে এই চাষ সম্বন্ধে কতিপয় সামান্য নিয়মের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব। আমরা আশা করি, এই নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে তাঁহাদের, অধিক না হউক; কতক পরিমাণে সাহায্য হইতে পারে।

পৃথিবীতে নানাজাতীয় ইক্ষু আছে। তাহারা মৃত্তিকা ও জলবায়ুর বিভিন্নতানুসারে ভালমন্দ জন্মিয়া থাকে। "খাড়ি" নামক এক প্রকার ইক্ষু আছে, তাহা পশ্চিম বঙ্গদেশে ও যে দেশের জল হাওয়া আর্দ্র নহে, সেই সকল দেশে অতি উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে অতি সামান্য পরিমাণে জন্মে। আবার "ঢাকা গাণ্ডেরী" নামক ইক্ষু শেষোক্ত প্রদেশ গুলিতে উত্তম জন্মে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রদেশে ভাল হয় না।

উত্তম ইক্ষু উৎপন্ন করিতে হইলে মাটী আল্‌গা হওয়া উচিত। মাটী যত আল্‌গা হইবে ইক্ষুও তত ভাল হইবে। ইক্ষু চাষের জন্য ভাল করিয়া মাটী প্রস্তুত করিতে হইলে জমিতে বেশ গভীর উপর্য্যুপরি লাঙ্গল দিয়া মই দিতে হয়। অন্ততঃ আটবার লাঙ্গল ও চারিবার মই দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ চাষের জন্য "গুজরাটী" বা "হিন্দুস্থানী" লাঙ্গলই সমধিক কার্য্যকর বলিয়া বোধ হয়। আড়াই ফুট প্রস্থ করিয়া আলি তৈয়ারী করিয়া আলির কিনারার ইক্ষুর বীজ বসান আবশ্যক। একটী সমস্ত গাছ বা তাহার খণ্ড আপন আপন সুবিধা অনুসারে জমিতে বসান যাইতে পারে। চৈত্র মাসের শেষে যে সময়ে ইক্ষু কাটা হয়, সেই সময়েই ইক্ষুর বীজ রোপণ করিবার উৎকৃষ্ট সময়। ঐ সময়ে ইক্ষুতে রস অধিক পরিমাণে থাকে। ঐ প্রকার ইক্ষু রোপণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বীজ ইক্ষু বসাইবার পরই জমিতে বিলক্ষণ করিয়া জল সিঞ্চন করিতে হইবে। ইহাতে পিপীলিকা দ্বারা যে অনিষ্ট সম্ভাবনা তাহা নিবারিত হয়। চৈত্র হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত আটবার জমি নিড়াইয়া মাটী দিতে হইবে। বর্ষাকালে জমিতে যাহাতে জল না বসে, তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করা উচিত। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ৩ বার নিড়াইয়া আগাছা পরিষ্কার করিতে হইবে। শ্রাবণ মাসে কোদালী দ্বারা মাটী সমান করিতে হইবে। চৈত্র মাসে একবার, বৈশাখ মাসে দুইবার, জ্যৈষ্ঠ মাসে চারি বার, কার্ত্তিক মাসে একবার অগ্রহায়ণ মাসে একবার ও পৌষ মাসে

একবার জমির অবস্থা বুঝিয়া জমিতে জল সিঞ্চন করিতে হইবে। ইক্ষু বসাইবার পর জমিতে সার দিতে হইবে। প্রতি বিঘা পরিমাণ জমিতে ৫০ মণ গোময়, ১০ মণ বেড়ীর খইল ও ৪ মণ সোরা একত্রে মিশাইয়া সার দিতে হয়। ইহাতে বিঘা প্রতি প্রায় ৫০৲ টাকা খরচ হয়। এতদ্ব্যতীত জমির খাজনা ও জমী তৈয়ার ও জলসিঞ্চনের খরচ আছে। সমস্ত হিসাব করিয়া ধরিতে হইলে বিঘা প্রতি ১০০৲ টাকার অধিক খরচ হওয়া উচিত নহে। জমি উর্ব্বর ও ভালরূপ তৈয়ার হইলে সেই জমিতে বিঘা প্রতি তিন চারি হাত লম্বা এরূপ ১২০৯৯ ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক গাছি ইক্ষু এক পয়সা হিসাবে ধরিলেও অন্ততঃ শতকরা ৮০৲ টাকারও লাভ হইয়া থাকে। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

কইমাছ।

বাঙ্গালা নাম—ঐ, হিন্দী—কবই, সংস্কৃত—কবিকা। এ মৎস্য অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন, কলিকাতা-অঞ্চলে "যশুরে কই" বড় প্রসিদ্ধ। ইহার মাথা মোটা, শরীর কৃশ, দেখিতে অধিক বড় নয়। যশোহর জেলায় অনেক পুকুরে খানা ডোবা আছে, তাহাতে কইমাছ যথেষ্ট, উহা কলিকাতায় আনীত ও বিক্রীত হয়,—রাস্তায় আসিতে আসিতে মৃতপ্রায় ও শুষ্ককায় হইয়া যায় বলিয়াই ঐরূপ দৃষ্ট হয়। কলিকাতায় নূতন বাজারে সময়ে সময়ে খুব বড় বড় কই বিক্রয় হয়, ওজনে একপোয়া দেড়পোয়া। স্রোতের জলে কই থাকে না, প্রায়শঃ স্রোতোহীন জলাশয়ে থাকে, ময়লা জলে অধিক উৎপন্ন হয়। এই মৎস্যের জীবন শীঘ্র বাহির হইতে চাহে না, খণ্ড খণ্ড হইয়া তৈলোপরি নিক্ষিপ্ত হওয়া পর্য্যন্তও নড়িতে থাকে ও হৃদয়বান্ দর্শকের মর্ম্ম স্পর্শ করে।

কবিকা মধুরা স্নিগ্ধা কফঘ্না রুচিকারিণী।
কিঞ্চিৎ পিত্তকরী বাতনাশিনী বহ্নিবর্দ্ধিনী॥

রস মধুর; গুণ—স্নিগ্ধ, কফঘ্ন, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর, বায়ুনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক। "কফঘ্না" এই পাঠস্থানে "নাতিকফকৃৎ" এই মর্ম্মযুক্ত পাঠ হওয়া উচিত। উক্ত পাঠ বোধ হয় লিপিকর প্রমাদে হইয়া থাকিবে। যেহেতু বাস্তব পক্ষে কইমাছ (এমন কি, প্রায় কোনও মাছই) কফঘ্ন নহে, বরং কফজনক, তবে কই মৎস্য ততটা কফজনক নহে। প্রথম পংক্তিটী এইরূপ হইলে ভাল হইত যথা—কবিকা নাতিকফকৃৎ স্বাদুঃ স্নিগ্ধা রুচিপ্রদা। অথবা সোজাসুজি "কফঘ্না" স্থানে "কফদা" করিলে আর গোল থাকে না।

প্রয়োগ—এই মাছ সুমিষ্ট, সুখাদ্য, সুতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে তরকারীর সহিত মিলিত হইয়া পাক-নিষ্পন্ন হয়, তাহাকেই সুমধুর করে; শুধু মাধুর্য্যগুণে প্রসিদ্ধ নয়, ইহার উপকারিতাও যথেষ্ট। এই মৎস্য যেরূপ ক্ষুদ্র, তত্তুলনায় ইহাতে সমধিক পরিমাণে তৈলাংশ আছে। এই তৈলাংশ দেহের পুষ্টিসাধক, ও চক্ষুর জ্যোতিঃবর্দ্ধক। "ফস্ফরস্" নামক তেজস্কর পদার্থ ইহাতে অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান, তজ্জন্য ইহা ক্ষীণমস্তিষ্ক ও ক্ষীণশুক্র ব্যক্তির পক্ষেও উপকারী। রোগীর পথ্য বলিয়া ইহা বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ; যে রোগ হইতেই মুক্তিলাভ হউক, চিকিৎসক কই (ও মাগুর) মৎস্যের ঝোল প্রথমে ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তথাপি ইহার স্নিগ্ধত্ব গুণে অন্যান্য রোগ অপেক্ষা ইহা উদরাময়ের বা অন্য রৌক্ষ্যকারক রোগের পরেই অধিকতর উপযোগী হইয়া থাকে। উদরাময় বা অজীর্ণরোগী ইহার সুস্বাদে প্রলোভিত হইয়া যেন অধিক খাইয়া না ফেলেন, কেননা আভ্যন্তরিক তৈলাংশ বশতঃ ইহা কিঞ্চিৎ গুরুপাক। মৎস্য অপেক্ষা উক্ত মৎস্যের ঝোলই ঐরূপ রোগীর উপকারী। কই মাছের ডিম্ব বড়ই সুকোমল ও সুখাদ্য। ইহা এই মৎস্য অপেক্ষাও লঘুপাক, সুতরাং অজীর্ণরোগীও নির্ভয়ে খাইতে পারেন। দেখা যায়, যাঁহারা বলিষ্ঠ ও ভোজন বিলাসী তাঁহারা প্রায়শঃ এই মৎস্যকে রোগীর পথ্য বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন; কিন্তু বেশ পুষ্ট ও মাংসল মৎস্য পাওয়া গেলে ও নিপুণ পাচকের হাতে পড়িলে ইহা তাঁহাদের নিকটে নিশ্চয়ই আদরণীয় হয়।

জীবদবস্থায় ইহার কাঁটা হইতে যেমন সাবধান থাকা উচিত—(যেহেতু হাতে ফুটিলে তজ্জনিত

ব্যথা বা ক্ষত শীঘ্র সারে না) রন্ধন-প্রস্তুত অবস্থায় ও আহার কালে ইহার কাঁটা সম্বন্ধে স্মরণ রাখা উচিত, ভোজন সময়ে অজ্ঞাতসারে ইহার ভীষণ কণ্টক গলমধ্যে বিদ্ধ হইয়া প্রাণিহিংসা-পাতকের কিয়দংশ প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া দেয়।

তামাক পাতার দহনশীলতা।—তামাক পাতায় আগুণ বেশ ধরিবে এবং ধরিয়া অল্পে অল্পে পুড়িতে থাকিবে অথচ তাহা হইতে শিখা বাহির হইবে না ইহাই তামাক পাতার ভাল মন্দ পরীক্ষা। এ দেশে অনেকে তামাক চাষ করেন, কিন্তু অত ভালমন্দ বিচার বড় কেহ করেন না। আমেরিকায় যুক্তরাজ্যে কৃষি-বিভাগে এই বিষয়ের বহু-বিচার হইয়াছে, তাহাতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে (১) তামাক পাতায় পটাসিয়ম আছে বলিয়া তামাক পাতা ঐ প্রকার অল্পে অল্পে পুড়ে, (২) চূণ থাকাতে আগুণ ধরার কোন বাধা হয় না বরং পুড়িয়া ঈষৎ শুভ্র ভাল ছাই হয়। (৩) অধিক পরিমাণে ম্যাগ্নেসিয়া থাকিলে তামাক উক্ত প্রকারে পুড়ার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। (৪) ক্লোরিণ ও সলফেট দ্বারাও দহন শক্তির ব্যাঘাত হইয়া থাকে। অনেকে অনুমান করেন যে যখন পটাস বেশী পরিমাণে থাকিলে তামাক ভাল পুড়ে, তখন পোটাসিয়ম সলফেট কিম্বা পচাপাতা (যাহাতে পটাসের মাত্রা সমধিক দৃষ্ট হয়) সাররূপে প্রয়োগ করিলে তামাক পাতার উক্ত গুণ বাড়িবে ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় না। মিঃ গার্ণার বলেন যে, তামাকের সারের জন্য সিলিকেট ব্যবহার করিলে ফল সুন্দর দাঁড়ায়।

অরণ্যে আয়।—একটা চলিত কথা আছে যে "যার নাই ধন, সে যাক্ বন"। ইহার দুইটী অর্থ করা যায়,—যাহার পয়সার সচ্ছলতা নাই তাহার সমাজ অপেক্ষা বনবাসই প্রশস্ত, অথবা যাহার সমাজে, সহর, নগরে থাকিয়া পয়সা রোজগার হইল না, তাহার অরণ্য গমনই বিধেয়, তথায় অল্পায়াসে অর্থোপার্জ্জন সুনিশ্চিত। ভারতের গভর্ণমেণ্ট সুরক্ষিত জঙ্গল ২৪৪,০০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত। এতদ্ব্যতীত খণ্ড খণ্ড ছোট জঙ্গল অনেক আছে। এই সমস্ত জঙ্গলে শাল, সেগুণ, দেবদারু, পাইন, আবলুস, আসান, মেহগ্নি, চন্দন, জাড়া, জারুল প্রভৃতি ব্যবহার উপযোগী বিবিধ কাষ্ঠ বিদ্যমান। পর্ণগৃহ নির্ম্মাণোপযোগী ঘাষ বাঁশ প্রচুর আছে—জ্বালানি কাঠ কত রকমের আছে—এক সুন্দরী কাঠে, জ্বালানকার্য্য হয়, কাঁচাঘরের খুঁটি হয়, ছালে চামড়ার কস্ হয়। খাদ্যোপযোগী মানুষের হিতকারী ফলফুলও বিস্তর—মহুয়ার ফুল গবাদিতে খায়, মানুষে খায়, চোলাই করিয়া মদ তৈয়ারি হয়। হরিতকী, আমলকী, বয়ড়া আমাদের দেশে কত কাজে লাগে আবার বিদেশে বহুল রপ্তানি হয়। কুর্চী, শিমুল তুলা লোধ ছাল, কুঁচিলা কত কি পাওয়া যায় তাহার ইয়ত্তা হয় না। গভর্ণমেণ্টের বন বিভাগ হইতে আয় বাৎসরিক ১ কোটী ১॥ কোটী টাকার কম নহে। ইহা ব্যতীত অনেক খণ্ড জঙ্গল স্থানীয় জমিদারের জমিদারী-ভুক্ত। তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের কর দিয়াও যথেষ্ট লাভ করেন। ইহা সমগ্র লাভের শতাংশের একাংশ মাত্র। যিনি জঙ্গলে ঘুরিবেন, যাহা সম্মুখে কুড়াইয়া পাইবেন তাহাতেই তাঁহার লাভ হইবে ; যেটী ধরিবেন, তাহাতেই তিনি অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবেন। অতএব ধন না থাকিলে বনে যাওয়াই কর্ত্তব্য, কারণ এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে গেলে অগাধ মূলধনের আবশ্যক হয় না।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

অগ্রহায়ণ মাস।

সব্জী বাগান।—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চারা বসান শেষ হইয়া গিয়াছে। সীম, মটর, মূলা প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে। যদি কার্ত্তিকের শেষেও মটর, মূলা, বিলাতি সীম বোনার কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাবী জাতীয় উক্ত প্রকারের বীজ এই মাসেও বোনা যাইতে পারে। নাবী আলু অর্থাৎ নৈনিতাল, বোম্বাই প্রভৃতি এই সময় বসান যাইতে পারে। পটল চাষের সময় এখনও যায় নাই। শীত প্রধান দেশে কিম্বা যথায় জমিতে রস অধিক দিন থাকে—যথা উত্তর-আসামে বা হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এই মাস পর্য্যন্ত বাঁধাকপি, ফুলকপি বীজ বোনা যায়। নিম্নবঙ্গে

কপি চারা ক্ষেত্রে বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

দেশী সব্জী।—বেগুন, শাকাদি, তরমুজ, লঙ্কা, ভুঁই শসা, লাউ, কুমড়া, যাহার চৈত্র বৈশাখ মাসে ফল হইবে তাহা এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি আঁশ জমিতে যেখানে অধিক দিন জমিতে রস থাকে তথায় তরমুজ বসাইতে হয়।

ফুলের বাগান।—হলিহক, পিঙ্ক, মিগ্নোনেট, ভার্বিনা, ক্রিসান্থিমম, ফ্লক্স, পিটুনিয়া, স্যাষ্টারসম, সুইটপী ও অন্যান্য মরসুমী ফুল বীজ, বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অগ্রহায়ণের প্রথমে না বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুল হওয়া অসম্ভব হইবে। যে সকল মরসুমী ফুলের বীজের চারা তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার চারা এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হইবে বা টবে বসাইয়া দিতে হইবে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে যে সকল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে তাহাদের গোড়ায় নূতন মাটি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদি না হইয়া থাকে তবে এ মাসে উক্ত কার্য্য আর ফেলিয়া রাখা হইবে না। পাঁক-মাটি চূর্ণ করিয়া তাহাতে পুরাতন গোবর সার মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিলে অধিক ফুল ফল প্রসব করে।

কৃষি-ক্ষেত্র।—মুগ, মুশুর, গম, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ যদি কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া না থাকে, তবে এমাসের প্রথমেই শেষ করা কর্ত্তব্য। একেবারে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া বরং ভাল, তাহাতে ষোল আনা না হউক কতক পরিমাণে হইবেই। পশুখাদ্যের মধ্যে মাঙ্গোল্ড বীটের আবাদ এখনও করা যাইতে পারে। কার্পাস ও বেগুন গাছের গোড়ায় ও নব রোপিত বৃক্ষের নিম্নে আইল বান্ধিয়া দেওয়া এ মাসেও চলিতে পারে। যব যই, মুগ, কলাই, মটর এই সকল রবি শস্যের বীজ বপন এবং পরে গমের বীজ বপন; আলু ও বিলাতি সব্জীর বীজ লাগান এ মাসেও চলিতে পারে; কপির চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাদের তদ্বির করাই এখন কার্য্য। তরমুজ ও খরমুজের বীজ বপন; মূলা, বীট, কুমড়া, লাউ, শসা, ধনে, পেঁয়াজ ও বরবটীর বীজ বপন করা হইয়াছে ঐ সকল ক্ষেত্রে কোদালী দ্বারা ইহাদের গোড়া আল্গা করিয়া দেওয়া; আলুর ক্ষেত্রে জল দেওয়া এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে; বিলাতি সব্জীর ভাঁটিতে জল সিঞ্চন, প্রাতে বেলা ৯টার সময় উহাদের আবরণ দিয়া সন্ধ্যার সময় আবরণ উঠাইয়া লওয়া; বার্ত্তাকু, কার্পাস ও লঙ্কা চয়ন ও বিক্রয়; কচু, সাদা ও রাঙ্গা আলু উঠান ও বিক্রয়; ইক্ষুর ক্ষেত্রে জল সেচন ও কোপান এই সময়ের কার্য্য।

গোলাপের পাইট।—কার্ত্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছাঁটা না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে আর বাকি রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনার সময় কাটিয়াছে। কালী পূজার পর ঐ কার্য্য করিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিম ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক আগে ঐ কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল, "ডাল কাটা" কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাঁটিবার সময় ডাল চিরিয়া না যায় এইটী লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, সেই গুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিতে হয়। টী-গোলাপ খুব ঘেঁসিয়া ছাঁটিতে হয় না। মারসাল নীল প্রভৃতি লতানায়া গোলাপের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত পুরান ডাল বা শুষ্কপ্রায় ডাল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাঁটার সঙ্গে সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যক মত ৪ হইতে ১০ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া সার দিতে হয়। জমি নিরস থাকিলে তরল সার, জমি সরস থাকিলে গুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়। গামলায় গোময় সরিসার খৈল, গোমুত্র ও অল্প পরিমাণে এঁটেল মাটি একত্র পচাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। সার-জল নাতি তরল নাতি ঘন হইবে। গুঁড়া সার, সরিষার খৈল এক ভাগ, পচা গোময় সার এক ভাগ, পোড়া মাটি এক ভাগ এবং এঁটেল মাটি দুই ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে সিকি পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত এ সার দিতে হয়। ঐ মিশ্র সারে একটু ভুসা মিশাইলে মন্দ হয় না, ভুসা কলিকাতার বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি ২০ পাউণ্ড মিশ্র সারে এক পেকেট ভুসা যথেষ্ট, ভুসা দিলে গোলাপের রঙ বেশ ভাল হয়।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

অগ্রহায়ণ, ১৩১৭।

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

একাদশ খণ্ড,—৮ম সংখ্যা।



সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

অগ্রহায়ণ, ১৩১৭।

কলিকাতা: ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

সূচী পত্র।

অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

KRISHAK

Under the Patronage of the Governments of Bengal and E. B. and Assam.

THE ONLY POPULAR PAPER OF BENGAL

Devoted to Gardening and Agriculture Subscribed by Agriculturists, Amateur-gardeners, Native and Government States and has the largest circulation.

It reaches 1000 such people who have ample money to buy goods.

কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ খণ্ড। | অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

মসূর।

শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস লিখিত।

যত প্রকার কলাই আছে, মসূর তন্মধ্যে মিষ্টতা ও পুষ্টিকারিতায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মৎস্য ও মাংস যেরূপ সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য, মসূরও সেইরূপ পুষ্টিকর ও সুমিষ্ট এজন্য ইহাকে আমিষ খাদ্য বলিয়া শাস্ত্রকারেরা গণ্য করিয়া গিয়াছেন। পিতৃকার্য্যে ও দৈবকার্য্যে মসূর ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু প্রেতকার্য্যে, শ্রাদ্ধে, আমিষের পরিবর্ত্তে মসূর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিধবা প্রভৃতি যাঁহারা সাত্ত্বিকভাবে আহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে মসূরের ডাল ভক্ষণ নিষিদ্ধ। মসূর মাংসের ন্যায় পুষ্টিকর বলিয়া চিকিৎসকেরা মাংসের কাথের পরিবর্ত্তে মসূর দালের কাথের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বিধবাদিগের পক্ষে মৎস্য মাংস ভক্ষণ যে কারণে নিষিদ্ধ, মসূর ভক্ষণও সেই কারণে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সকল প্রকার কলাই মধ্যে মসূর সকলের অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। এরূপ প্রয়োজনীয় ও পুষ্টিকর মসূরের চাষ বর্দ্ধমান অঞ্চলে যে প্রণালীতে সম্পন্ন হয়, তাহা কৃষকের পাঠক মহোদয়গণকে জ্ঞাত করিবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

মসূর চাষে জলের আবশ্যক নাই, বরং অধিক বৃষ্টি হইলে মসূর গাছের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। শীতকালের সূর্য্যের মৃদু উত্তাপে এই শস্য উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে রবিশস্য কহে। এই শস্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে জন্মিয়া থাকে, তাহার কারণ শীতকালে বৃষ্টি হইলে হঠাৎ উচ্চ জমিতে জল দাঁড়াইতে পারে না। মসূর দোয়াঁশ মৃত্তিকায় অথবা যে দোয়াঁশ মৃত্তিকায় এঁটেলের অংশ কিছু বেশী আছে, সেই মৃত্তিকাতে উত্তম জন্মিয়া থাকে।

আশু ও কেলেস ধান্য কাটা হইয়া গেলে, যদি জমির মৃত্তিকা সামান্য সরস থাকে, তবে আশ্বিন মাসের শেষে কিম্বা কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই জমিতে একটা চাষ দিয়া কিছু দিন ফেলিয়া রাখিতে হইবে। জমির মৃত্তিকা বেশ শুষ্ক হইলে, জমিতে জল সেচন করিয়া দিতে হয়। ৫।৭ দিন পরে যো পাইলেই জমিতে চাষ দিয়া মসূর বপন করিতে হয়। কার্ত্তিক মাসই মসূর বপনের প্রশস্ত সময়। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেও বপন করিয়া থাকে।

মসূর চাষে জমির মৃত্তিকা উত্তমরূপে গভীর করিয়া কর্ষণ করিতে হয়। ধান গাছের মূলের ন্যায় মসূরের মূল ভাসা নহে। ইহার মূল নিম্ন দিকে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। জমির মৃত্তিকা উত্তম রূপে গভীর করিয়া কর্ষণ করিলে অন্তর্ব্বাহ ও বহির্ব্বাহ ও কৈশিকতা কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা ভূমির নিম্নের মৃত্তিকা বেশ সরস থাকে. সেই সরস মৃত্তিকা হইতে মসূরের মূল রস আকর্ষণ করিয়া আপনাদের পুষ্টি সাধন করে। এতদ্ব্যতীত কর্ষিত মৃত্তিকায় অধিক পরিমাণে শিশির সঞ্চার হইয়া থাকে। দিবাভাগে সকল বস্তুই অল্লাধিক পরিমাণে তাপ গ্রহণ করিয়া থাকে, আবার রাত্রিকালে তাপ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এইরূপ তাপ ত্যাগ করাকে "বিকিরণ শক্তি" কহে। সকল বস্তুর বিকিরণ শক্তি সমান নহে। যাহার বিকিরণ শক্তি অধিক, তাহাতেই অধিক পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হইয়া থাকে। অন্য মৃত্তিকা অপেক্ষা কর্ষিত মৃত্তিকার বিকিরণ শক্তি অধিক এবং কর্ষিত মৃত্তিকায় অধিক পরিমাণে বাষ্প থাকে বলিয়া অধিক শিশির সঞ্চিত হয়। রবিশস্যের পক্ষে শিশির ও কুজ্ঝটিকা বিশেষ উপকারী।

ভিন্ন ভিন্ন জীবের খাদ্যের উপাদান যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন, উদ্ভিদের পক্ষেও সেই রূপ। উদ্ভিদের পোষণের জন্য সোরাজান, ক্ষারজান ও হাড়জান এই তিনটি উপাদান, কৃষককে ভূমিতে প্রদান করিতে হয়। অন্যান্য উপাদান উদ্ভিদ স্বভাবতঃ পাইয়া থাকে, কৃষককে তাহা প্রদান করিতে হয় না। আমরা ভূমিতে সার প্রদান করিয়া থাকি, ঐ সারের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত তিনটি উপাদান থাকে, উদ্ভিদ ভূমি হইতে ঐ উপাদান গ্রহণ করিয়া আপনাদের পুষ্টি সাধন করে। সকল সারেই যে ঐ তিনটি উপাদান বিদ্যমান থাকে, তাহা নহে। গোবর, খইল প্রভৃতি কতকগুলি সারে ঐ তিনটি উপাদানই বিদ্যমান থাকে বলিয়া সকল উদ্ভিদের পক্ষেই বিশেষ উপকারী। সকল উদ্ভিদের পোষণ জন্য ঐ তিনটি উপাদানের প্রয়োজন হয় না। ধান্যের পক্ষে সোরাজান যেরূপ প্রয়োজনীয়, মসূরের পক্ষে সেরূপ নহে। মসূরের পুষ্টি সাধন জন্য সোরাজানের দরকার হয় না, অন্য উপাদানের প্রয়োজন হয়। আশু ও কেলেস ধান বপন বা রোপণের পূর্ব্বে জমিতে গোবরাদি সার প্রদান করিলে, সোরা ব্যয়িত হইলেও অন্যান্য উপাদান জমিতে মজুত থাকে। তজ্জন্য মসূর বপনের পূর্ব্বে জমিতে সার দিবার প্রয়োজন হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ফসলের পুষ্টি সাধন জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের প্রয়োজন হয়। ভূমিতে গোবরাদি অর্থাৎ যে সারে সোরাজান, হাড়জান, ক্ষারজান এই তিনটি উপাদান বিদ্যমান থাকে, সে সার প্রদান করিয়া পর্য্যায় রোপণ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ফসল বপন করিলে বিনা সারেও প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ শিম্বি জাতীয় ফসল ভূমিতে বপন করিলে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বর্দ্ধিত হয়। কারণ শিম্বি জাতীয় ফসল বায়ু হইতে সোরাজান আকর্ষণ করিয়া আপন আপন মূলে সঞ্চয় করিয়া থাকে। সেই মূল জমিতে থাকিয়া গেলে ভূমিতে সোরাজানের অংশ বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং ভূমির উর্ব্বতা শক্তি হ্রাস না হইয়া, বরং বর্দ্ধিত হয়। মসূরও শিম্বি জাতীয় ফসল। মসূরেরও বায়ু হইতে সোরাজান আকর্ষণ করিয়া লইবার শক্তি আছে। তবে ধঞ্চে, অরহর প্রভৃতি শিম্বি জাতীয় ফসলের যেরূপ বায়ু হইতে সোরাজান আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে, মসূর প্রভৃতির তত আছে কিনা সন্দেহ। মসূরের মূলে যে

সোরাজান সঞ্চিত থাকে, মসুর উপড়াইবার সময় সেই মূলের কিয়দংশ জমিতে থাকিয়া যায় বলিয়া ভূমির সোরাজান বৰ্দ্ধিত হয়।

অনেকেই মসুরের সহিত সর্ষপ বপন করিয়া থাকে। প্রতি বিঘায় ।৭ সের মসুর ও ।১ সের সর্ষপ বপন করিতে হয়। মসুর উপড়াইবার অগ্রেই সর্ষপ উপড়াইতে হয়। সর্ষপ পৌষ মাসের শেষ অথবা মাঘ মাসের প্রথমেই পাকিয়া থাকে। মসুর মাঘ মাসের শেষে অথবা ফাল্গুন মাসের প্রথমেই পাকিয়া থাকে। জেটো ও নাবি করিয়া বপনের জন্য পাকিবার অগ্র পশ্চাৎ হইয়া থাকে। সকল ফসলই জেটো করিয়া বপন করিলে ফল বেশী পাওয়া যায়। একারণ সকল ফসলই জেটো করিয়া বপন করা কর্ত্তব্য। মসুর বপনের কিঞ্চিদধিক তিন মাস পরে এবং সর্ষপ কিঞ্চিদধিক দুই মাস পরে পাকিয়া থাকে। যদি কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি মসুর ও সর্ষপ করা যায়, তবে মসুর মাঘ মাসের শেষে এবং সর্ষপ পৌষ মাসের শেষে পাকিয়া থাকে।

জল সেচনের ৫.৭ দিন পরে জমিতে যো পাইলেই খুব গভীর করিয়া ঘন ঘন একটী চাষ দিয়া মসুর ও সর্ষপ বপন করিয়া, পুনরায় আর একটী চাষ দিতে হইবে। ভূমির সকল স্থানেই যেন গভীররূপে কর্ষিত হয়। ভূমিতে ঘাস বা আগাছা না থাকে। তাহার পর উপরি উপরি দুইবার মই দিয়া ভূমির মৃত্তিকা চূর্ণ ও সমতল করিয়া দিতে হইবে। কেহ কেহ মসুর বীজ জলে ভিজাইয়া, তাহাতে ঘুঁটের ছাই চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বপন করিয়া থাকে। ঘুঁটের ছাই চূর্ণ মিশ্রিত করিবার কারণ এই যে, তাহাতে এক স্থানে অল্প এক স্থানে অধিক বীজ পড়িবে না। সকল শস্যের বীজই ভূমিতে সমভাবে বপন করা আবশ্যক। আবার অনেকে শুষ্ক মসুর বীজ বপন করিয়া থাকে। বীজগুলি বেশ পুষ্ট ও পোকা ধরা না হয়। বীজের দোষে গাছ বেশ সতেজ হয় না এবং অনেক বীজই অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হয় না। অতএব বীজের বিষয় খুব সাবধান হওয়া আবশ্যক। মসুর কলাই বেশ পুষ্ট ও সুপক্ক না হইলে, প্রায়ই পোকা ধরিয়া থাকে। সেরূপ অপক্ক, অপুষ্ট পোকাধরা বীজ বপন করিলে চারা বাহির হয় না। যদিও বাহির হয়, তাহাও বেশ সতেজ হয় না। সরস মৃত্তিকায় মসুর বীজ বপন করিলে, সকল বীজ হইতেই চারা বাহির হয়। খুব শুষ্ক মৃত্তিকায় বীজ বপন করিলে অনেক বীজ হইতেই চারা বাহির হয় না। বীজ বপনের পর আর কিছুই পাইট করিতে হয় না।

কেলেস ধান্যাদি কাটিবার পর যদি জল সেচনের সুবিধা না থাকে এবং জমির মৃত্তিকা কর্ষণোপযোগী থাকে, তবে কেলেস ধান কাটিবার পর কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই ২।৩টী গভীর করিয়া চাষ দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে সর্ষপ ও মসুর বীজ বপন করিলেও চলিতে পারে তবে জল সেচনের পর চাষ দিয়া মসুরাদি বীজ বপন করিলে, গাছ যেরূপ সতেজ হয়, ইহাতে সেরূপ হয় না; তবে ফল নিতান্ত মন্দ হয় না। জমি যদি সতেজ হয় এবং জল সেচনের পর কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি মসুর ও সর্ষপ বপন করা যায়, তাহা হইলে প্রচুর পরিমাণে ফল পাওয়া যায়।

শীতকালে যদি প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয় এবং দীর্ঘকাল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিয়া শিশির সঞ্চারের ব্যাঘাত উৎপাদন করে, তাহা হইলে মসুর ভাল জন্মে না। সামান্য বৃষ্টি হইলে ক্ষতি না হইয়া বরং উপকার হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া জমিতে জল দাঁড়াইলে, মসুরের

বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। এমন কি ২।১ দিন জমিতে জল দাঁড়াইয়া থাকিলে মসুর গাছ শীঘ্রই মরিয়া যায়। একারণ জমির আইল কাটিয়া দিয়া শীঘ্রই জল বাহির করিয়া দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে যদিও গাছ মরে না বটে, কিন্তু গাছ নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া যায় এবং ভাল ফলও ধরে না। জমিতে জল দাঁড়াইলে, সেই জল বাহির করিয়া জমির মাটি শুষ্ক হইবার পর মাটি বসিয়া যায় এবং রন্ধ্র শূন্য হয়। জমির মাটি বসিয়া যাওয়া এবং মৃত্তিকা রন্ধ্র শূন্য হওয়া মসুরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। জমিতে জল দাঁড়াইলে মসুরের যেরূপ অনিষ্ট হয়, সর্ষপের সেরূপ অনিষ্ট হয় না।

যদি সতেজ জমিতে ভাল করিয়া আবাদ করা যায়, এবং কোনরূপ দৈব দুর্ঘটনা না ঘটে, তবে প্রচুর পরিমাণে মসুর জন্মিয়া থাকে। মসুর গাছ সতেজ হইলে তাহার বহু শাখা প্রশাখা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া, জমির কোন স্থানে আর কিছুমাত্র ফাঁক থাকে না। জমির মৃত্তিকা মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন সমস্ত জমিটিই যেন একটী হরিদ্বর্ণের ক্ষেত্র। সে দৃশ্য কি সুন্দর! দেখিলে নয়ন মন বিমোহিত হইয়া যায়!

পৌষ মাসে মসুর ও সর্ষপ উভয়েরই ফুল হইয়া থাকে। সর্ষপের ফুল হইবার পর অনেক বিলম্বে ফল হয়। মসুরের ফুল ক্ষুদ্র ও শ্বেতবর্ণের হইয়া থাকে। সর্ষপের ফুল হরিদ্রাবর্ণের থোকা থোকা হইয়া থাকে। মসুর গাছ অপেক্ষা সর্ষপের গাছ অনেক লম্বা, একারণ মসুর গাছ অপেক্ষা অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া থাকে। যখন সর্ষপের হরিদ্রাবর্ণের ফুলগুলি মসুর গাছের উপরিভাগে ফুটিয়া উঠে, তখন নিম্নে হরিৎবর্ণ, ঊর্দ্ধে হরিদ্রাবর্ণের ফুলের কি চমৎকার দৃশ্য!

সর্ষপের ফল সুপক্ক হইলেই, গাছ উপড়াইয়া লইয়া আনা আবশ্যক। নচেৎ ফল পাকিয়া শিম্বিগুলি ফাটিয়া সর্ষপ ভূমিতে পড়িয়া যায়। সর্ষপ ও মসুর গাছের শাখার গোড়ার ফল অগ্রে ও ডগের ফল কিছু পরে পাকিয়া থাকে। ডগের ফল পাকিবার অপেক্ষা করিতে গেলে গোড়ার শিম্বি ফাটিয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়। অতএব শাখার গোড়ার ফল উত্তমরূপে সুপক্ক হইলে, ডগের ফলের সম্পূর্ণ রূপে সুপক্ক করিবার অপেক্ষা না করিয়া উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। উভয় প্রকার গাছকেই উপড়াইয়া আনিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে দিতে হইবে। রৌদ্রে গাছগুলি শুষ্ক হইলে গোড়ার সুপক্ক শিম্বিগুলি আপনা হইতেই ফাটিয়া গিয়া বীজ বাহির হইয়া পড়ে। সেই সুপক্ক ও সুপুষ্ট বীজ বপনের জন্য বেশ শুষ্ক করিয়া স্বতন্ত্র রাখিয়া দিতে হয়। রৌদ্রে শুষ্ক হইলেও ডগের সামান্য অপক্ক শিম্বি সহজে ফাটিয়া ফল বাহির হয় না। তজ্জন্য গাছ খুব অধিক হইলে গরু দ্বারা মাড়াইয়া ফল বাহির করিয়া লইতে হয়। গাছ অল্প হইলে খুব শুষ্ক গাছের উপর কোন ভারি বস্তু পুনঃ পুনঃ আঘাত করিলে ফল বাহির হইয়া পড়ে। ফলের সহিত গাছের শুষ্ক পত্র, শিম্বির ডাঁটা ও গাছ মিলিত হইয়া থাকে। কুলা দ্বারা সেগুলি হইতে ফল পৃথক করিয়া লইবার পর শুষ্ক মসুর গাছের যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতে মসুরের মূল ও গোড়ার শুষ্ক কঠিন অংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট অংশ গরুর আহারের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। ঐগুলি গরুর বেশ পুষ্টিকর ও সুমিষ্ট খাদ্য। খুব আগ্রহের সহিত গরু ঐগুলি খাইয়া থাকে।

প্রতি বিঘায় ভাল জন্মিলে ছয় মণ হইতে আট মণ পর্য্যন্ত মসুর এবং দেড় মণ হইতে দুই মণ পর্য্যন্ত সর্ষপ জন্মিয়া থাকে।

মালদহে তুঁতের চাষ ও রেশমকীট পালন।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত।

বহুকালাবধি মালদহ জেলায় রেশমকীট পালন রেশমের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধলাভ করিয়া আসিতেছে। এককালে মালদহের পট্টবস্ত্র শিল্প নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল, এবং সুদূর ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য বিস্তার দ্বারা অর্থাগমের পথ সুপ্রশস্ত করিয়াছিল। রেশম ও ফজলী আমের প্রসূতি বলিয়া মালদহ জেলা সুবিখ্যাত হইয়াছে। কঠোর কাল প্রভাবে যদিও এখন কিছু নিষ্প্রভ, তথাপি এক্ষণেও মালদহে বিস্তর রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রেশমকীটের আহারই তুঁতপাতা। ইহার চাষ আবাদ যেরূপে হইয়া থাকে, তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইতেছে।

তুঁতের চাষ করিতে হইলে ভূমি সমতল এবং সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠ হইতে অন্ততঃ ২।৩ হাত উচ্চ হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে অধিক মাত্রায় বৃষ্টির জল শোষিত হইয়া চারা সমূহের ক্ষতি জন্মাইতে পারে না। মৃত্তিকাও শুষ্ক থাকে। উত্তমরূপে ৩।৪ বার লাঙ্গল দিয়া জমি চষিয়া অথবা কোদাল দ্বারা জমি এক হাত পরিমাণ খুঁড়িয়া মৃত্তিকা ধূলিবৎ করিতে হয়, তৎপরে দেড়হাত অন্তরে রাখিয়া সমান্তরাল ভাবে উভয় পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা একস্থানস্থ করিয়া আইল বান্ধিয়া যাইতে হয়। এই মৃত্তিকা উত্তোলনের জন্য দুই দিকের যে খাত হয়, সেই খাত ভূমিই তুঁত রোপণের স্থান। এই রূপে জমি প্রস্তুত হইলে, এক দিনে অধিক সংখ্যক লোক লইয়া দলবদ্ধ হইয়া সরস ও সতেজ তুঁত শাখা অর্দ্ধ হস্ত দীর্ঘ খণ্ড খণ্ড করিয়া ঐ সমস্ত আইলের পার্শ্বস্থ খাতে ১০।১২ অঙ্গুলি অন্তরে অন্তরে লম্বা ভাবে প্রোথিত করিয়া ৩।৪ অঙ্গুলি বাহিরে রাখিয়া মৃত্তিকা চাপা দিতে হয়। ইহাতে সমস্ত ক্ষেত্র পুনর্ব্বার সমতল হইয়া যায়। কাটিগুলি ফাটিয়া গেলে তাহার অঙ্কুরোদ্গম শক্তি একেবারে নষ্ট হয়। সুতরাং সাবধান হইয়া কাটিগুলি কাটিতে হয় এবং এইজন্য ডাল কাটা কাঁচি ব্যবহার করা উচিত। এইরূপে রোপিত ক্ষেত্রে প্রথম বৎসর বেশী পত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পত্র ছেদন করিবার সময় ভূমি হইতে ৩।৪ অঙ্গুলি রক্ষা করিয়া শাখা সহ কাটিয়া লইতে হয়; তৎপরে কোদালদ্বারা উত্তমরূপ কোপাইয়া সারবান মৃত্তিকা দ্বারা ঐ সমস্ত চারার মূল বান্ধিয়া দিলেই তখনকার মত চাষের কার্য্য শেষ হয়। অতঃপর পুরাতন গোময়, ছাই, নীলশিঠি প্রভৃতি সারের প্রয়োগ করিতে হয়। কেবলমাত্র এই তুঁত পাতার চাষ করিয়াই অনেকে এখানে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। বরং রেশম কীট পালনে সময়ে সময়ে ক্ষতি হয়, কিন্তু পত্র ব্যবসায়ীর প্রায়ই ক্ষতি হয় না; ইহার কাটি একবার লাগাইলে তিন বৎসর চলিয়া থাকে, তবে কোপান ও মাটী দেওয়া আবশ্যক হয়।

তুঁত বৃক্ষ সকল রাখিয়া দিলে সুবৃহৎ কাণ্ড বিশিষ্ট বৃক্ষ রূপে পরিণত হয়। এই বৃক্ষে অম্লমধুর ফল জন্মিয়া থাকে, অনেকে তাহা ভর্জ্জিত করিয়া খায়। ইহার কৃষ্ণবর্ণ পরিপক্ব ফল বালক বালিকাদিগের অতি প্রিয়। বাজারের তুঁত ফল মিঠাই এই ফলের অনুকরণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রেশম কীট পালনে যেরূপ সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত কার্য্য করিতে হয়, পত্র বিক্রেতাকে তাহার অত্যল্প পরিমাণ নিয়মও পালন করিতে

হয় না। রেশম কীট পালনের নিয়ম সকল বড়ই সন্তর্পণে রক্ষা করিতে হয়। ঘরে মক্ষিকাদি প্রবিষ্ট হইতে না পারে; আলোক বা ঠাণ্ডা বাতাস না যায়। গৃহখানি উত্তপ্ত রাখিবার জন্য শীতকালে তদভ্যন্তরে অগ্নিও প্রজ্জলিত রাখিতে হয়, সেই ঘরে সর্ব্বদা লোক যাতায়াত নিষিদ্ধ। গৃহখানিকে পবিত্র রাখাও অতীব আবশ্যক। এই সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রেশম কীট পালনে উদ্যোগী হইতে হয়। রেশম কীটের পুরুষ ও স্ত্রী দুই জাতি কীট হইয়া থাকে। পুং কীটকে "চকোর" ও স্ত্রী কীটকে "চকোরী" বলে। স্ত্রী কীট যে কোষে থাকে, তাহা পুং কীটের কোষ অপেক্ষা কিছু বড়। এই দুইটী কোষ একত্র করিয়া কিছু দিন রক্ষা করিলে, কীটদ্বয় কোষ গর্ত্ত বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত ও সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়। তৎপরে পুং কীটকে দূরীভূত করিলে দুই তিন দিন পরেও যদি স্ত্রী কীট ডিম্ব প্রসব না করে, তবে তাহার নিকট আলো লইয়া যাইতে হয়। আলোক দেখিলেই স্ত্রী কীট ডিম্ব প্রসব করিতে থাকে। একটী স্ত্রী কীট অন্ততঃ ৭০।৮০টী ডিম্ব প্রসব করিতে পারে। এই ডিম্বগুলি সূর্প সঞ্চালনে অসার হীন করিয়া কোন মৃণ্ময় পাত্রে তুলা বা রেশম দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। অনতি-বিলম্বে ডিম্ব ফুটিয়া পোকা বহির্গত হইলে কোমল ও সূক্ষ্মরূপে কর্ত্তিত তুঁতপত্র খাওয়াইয়া বর্দ্ধিত করিতে হয়। এই অবস্থাকে "মেটেসারা" বলে। অতঃপর ১ম পোকা সমূহের অনাহার নিদ্রা "এক কাল্লা," ২য় "দোকল্লা," ৩য় "তেকল্লা" ও চতুর্থাবস্থায় পোকা অনাহারে নিদ্রাগত হইলে, "সুদরহা" নামে কথিত হয়। এই সময় হইতে কৃষকগণ দিন গণনা আরম্ভ করে, অর্থাৎ ঐ দিন হইতে ৮ দিনের মধ্যে পোকা ঘূর্ণিত হইয়া স্বীয় মুখ নিঃসৃত লালায় আপনাকে জড়িভূত করণান্তর বাসস্থানরূপে রেশম কোষ নির্ম্মাণ করিবে। তবে কোন পোকা অল্প দিনেই কেহ বা সপ্তম দিনেও ঘূর্ণিত হয়। পোকা ঘূর্ণনের দৃশ্য বড়ই মনোহর, দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্বর্ণবর্ণ হইয়া যায়।

কোষাবরণের সমস্তই লালা, সুতরাং কোষটীর সমস্তই সূত্রে পরিণত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তাহা হয় না। শেষে এমন একটী অংশ বাহির হয়, উহা রেশম অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বর্ণ ও কঠিন, যেন একখানি দুশ্ছেদ্য অথচ লঘু ত্বকাবরণ। জীবিত কীটধারী রেশম কোষ শুষ্ক করিয়া কমিয়া গেলেও পূর্ব্ব ওজন ধরা হয়। এইরূপ তুলিত কোষ গুলির একবার সংখ্যা রাখিলেই আর ওজনের আবশ্যক হয় না, কত কাহনে মণ হইল স্থিরীকৃত হয়। যে স্থানে কীট পালনের প্রথা নাই, সে স্থানে শুদ্ধ পত্রের আবাদ করিলে কোন ফল হয় না। এরূপ স্থলে পোকা পালনের আবশ্যক। বৃহৎ তুঁত বৃক্ষের পত্র কীট সকল খায় না, খাইলে কাহারও ব্যারাম হয়, কেহ বা অত্যল্প সূত্র দ্বারা বিকৃতবর্ণ কোষ নির্ম্মাণ করে। আর ইহাতে পত্রও সামান্য হয় এবং তত সতেজ হয় না। রেশম কীট বৎসরে চারিবার কোষ প্রস্তুত করে, সুতরাং পত্রেরও উৎপত্তি ঐ প্রকার, প্রত্যেক বার এক এক খন্দ নামে আখ্যাত হয়। পৌষ, চৈত্র, আষাঢ় ও আশ্বিন, এই চারিবার নূতন পত্রোদ্গম হয়।

মৌমাছি পালন।

শ্রীযুক্ত জি, মুখার্জি M. Sc., Ph. B.
লিখিত।

সকল দেশেই মৌচাক আছে, এবং মৌচাক হইতে মধু সংগ্রহ হয়। কিন্তু আমেরিকায় এখন কৃত্রিম মৌচাক নির্ম্মাণে মধুমক্ষিকা পালিত হইতেছে। আমেরিকাবাসীরা কত শত উপায়ে যে পয়সা রোজগারের পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারে, তাহার ঠিক নাই।

আগে আমেরিকায় বালকেরা খেলার জন্য মৌমাছি পুষিত। মৌমাছি পুষিয়া, তাহাদের গতিবিধি কার্য্য দেখিত—ইহাতেই তাহাদের একটা আমোদ হইত। খেলা করিতে করিতে তাহাদের পয়সা উপায়ের দিকে দৃষ্টি পড়িল এবং মৌচাক হইতে কিছু আয়ের সম্ভাবনা দেখিল। ফিলাডেলফিয়া নিবাসী লোরেঞ্জো লোরেন নামক এক ব্যক্তি যখন বালক ছিলেন তখন এইরূপ খেলা প্রিয় ছিলেন। পিপীলিকার গর্ত্ত দেখিলে তিনি তাহা খুঁড়িয়া, তাহাতে পাউরুটির গুঁড়া ও মরা মাছি প্রভৃতি দিতেন এবং পিপীলিকাগণের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। এই কারণে তাঁহার পিতামাতা তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার যাহাতে ঐ সকল দিকে মন না যায়, কিম্বা কীট পতঙ্গাদি সম্বন্ধীয় কোন পুস্তক যাহাতে তিনি পড়িতে না পান, সে বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ সাবধান হইতেন। কিন্তু যাহার যে দিকে ঝোঁক, তাহাকে সে দিক হইতে নিবৃত্ত করা যায় না। ১৮৩৭ সালে তিনি এক দিন তাঁহার বন্ধুর আলয়ে একটি গেলাসপূর্ণ মধু এবং কৃত্রিম মধুচক্র দেখিয়া উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন এবং মৌমাছি সমেত দুইটি মৌচাক খরিদ করিয়া লইয়া ঘরে ফিরিলেন। মৌমাছির সঙ্গে এই তাঁহার প্রথম সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। এখন আর লোরেঞ্জো লোরেণ বালক নহেন। তিনি গৃহে তাঁহার স্ত্রীর সাহায্যমাত্র লইয়া মৌমাছি সম্বন্ধে নানা পরীক্ষায় মন দিলেন। তাঁহারই যত্নে মধু মক্ষিকা পালনের সমুচিত বিধি ব্যবস্থা দেশময় প্রচারিত হইয়াছে। ইহা আর সুধু খেলা নয়। মক্ষিকা পালন এখন কৃষির অঙ্গ বিশেষ বলিয়া গণ্য। ১৮৫৮ সালে তিনি ইটালি দেশীয় মক্ষিকা পালনে নিযুক্ত হইলেন এবং তিনি তাঁহার কৃত্রিম চাকগুলি হইতে প্রচুর মধু সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং এক বৎসরে তিনি ইহা হইতে প্রায় ৭০০৲ টাকা রোজগার করিলেন। তখন কেহ এইরূপে মধু উৎপাদনের কথা বড় একটা ভাবিত না—সেই সময় এত টাকা রোজগার করা নিতান্ত যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।

এখন সুধু আমেরিকা কিম্বা ক্যানাডায় নয়, ইউরোপের নানাস্থানে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে মধু মক্ষিকার চাষ করা হইতেছে। এখন মধুর আদর যথেষ্ট বড়িয়াছে এবং মোমও বিক্রয়োপযোগী একটা বিশেষ পণ্য মধ্যে গণিত হইয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাজ্যে এক্ষণে ছয় জন কোটীপতি মক্ষিকার চাষে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই প্রকার মৌমাছি পালন করিলে যে কেবল মধু বেচিয়া অর্থ সংগ্রহ হইবে, তাহা নহে—উপযুক্ত রাণী মক্ষিকা, উত্তম মধু সংগ্রহকারী মক্ষিকা ও মোম এ সকলই বেশ দামে বিক্রয় হয়। অনেকে কেবল মৌমাছির বংশোন্নতি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন এবং উন্নতজাতীয় মধুমক্ষিকা বিক্রয়ই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য।

ওয়াসিংটন কৃষি-বিভাগে এক্ষণে মৌমাছি পালনের জন্য একটি উপবিভাগ স্থাপিত হইয়াছে এবং তথায় সুদক্ষ বিজ্ঞানবিদগণ মৌমাছি পালনে নিযুক্ত হইয়াছেন। এইখানকার কর্ত্তা বেনটন্ সাহেব, ১৯০৬ সালে মধুমক্ষিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য পৃথিবীর নানাস্থানে ঘুরিয়া আসেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে বৃহদাকার মক্ষিকা, কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তঃপাতী মধুক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক রাল্‌ফ বেনটন্ সাহেবকে পাঠান। লেখক তথায় সেই সময় উপস্থিত ছিলেন এবং সে গুলি পরীক্ষা করিবার অবসর পান। ভারতীয় মক্ষিকা অপেক্ষাকৃত অধিক মধু উৎপাদন করিতে পারে, ইহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। কালিফর্ণিয়ার মক্ষিকার সহিত এই মক্ষিকার শঙ্কর উৎপাদনেরও চেষ্টা করা হয়। ভারতীয় মক্ষিকা সকলের মৃদু স্বভাব এবং সহজে তাহাদিগকে নাড়াচাড়া করা যায়! এই সকল মক্ষিকা যদি ভারতে গৃহে গৃহে পালিত হয়, তাহা হইলে অনেক পয়সা রোজগার হইতে পারে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আমাদের এই দেশে মধু নিত্য ব্যবহার করা চলে না। আমাদের দেশের জলহাওয়ায় ইহা সহ্য না হইতে পারে। এ ধারণা কিন্তু ঠিক নহে—ইহা আমাদের উপযুক্ত খাদ্য এবং ব্যবহারেই তাহা বেশ বুঝা যায়। পুষ্প সঞ্চিত মধু হইতে এই মধু সংগ্রহ হয়—ইহা উদ্ভিদজাত পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার প্রচলন ভারতবর্ষে এই নূতন নহে; কেবল ভারতবাসী নহে, পুরাকাল হইতে ইহুদীগণ ইহার ব্যবহার জানে। মধু মক্ষিকা মধু উৎপন্ন করে না, মধু সংগ্রহ করে মাত্র, অবশ্য মক্ষিকার মধুথলিতে থাকিবার কালীন মধুর কিছু রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয়। সাধারণ শর্করা—বিশেষ শর্করায় পরিণত হয়। মক্ষিকার অণ্ড নিঃসৃত রস সংযোগেই এই পরিবর্ত্তন ঘটে। এই মধু একটি পুষ্টিকারক খাদ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহাতে শরীরের তেজ বৃদ্ধি করে এবং ইহা বলকারক।

মধু মক্ষিকা প্রতিপালনে পয়সা ও আমোদ দুই আছে। অন্য কর্ম্মে বিতৃষ্ণা জন্মিলে এই কাজ ভাল লাগিবে। অবিশ্রাম পরিশ্রম, সেই কারুকার্য্য, সেই শৃঙ্খলা, সেই গুণ গুণ শব্দ সকল সময়ই বড় মনোহর--বড় মধুর। তাহারাই যথার্থ বলিয়া দেয়--"পরিশ্রমই উন্নতির মূল"।

এই মৌমাছি রক্ষা ও পালনে পরিশ্রম নিতান্ত অল্প নহে। ঘরের ভিতরে বসিয়া সব সময়ে এই কাজ চলে না। ইহার জন্য মাঠে মাঠে ঘুরিতে হয়, রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিতে হয়, খুব সতর্কতার সহিত ঠিক সময় সকল কাজ করিতে পারিলে, তবে পয়সা আসে। দুই চারিটি চাক লইয়া অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে এই কার্য্য করিলে বড় অধিক কিছু আয়াস পাইতে হয় না। কিন্তু বড় রকমের ব্যবসায়ে লাভও যেমন শ্রমও তদ্রূপ। অন্যান্য চাষের ন্যায় এই চাষও জলহাওয়ার উপর অনেকটা নির্ভর করে এবং ভালমন্দ স্থানে চাষে ভালমন্দ ফল হয়।

কয়েকটি মোচাকের সমষ্টি লইয়া মৌমাছির এক একটি উপনিবেশ হয়। এইরূপ একটি উপনিবেশ হইতে বৎসরে ৩৫ হইতে ৪০ পাউণ্ড মধু সংগ্রহ হইতে পারে। উৎকৃষ্ট ভাল মধুর দাম প্রতি পাউণ্ড ভালমন্দ হিসাবে ॥০ আনা হইতে ৸০ আনা ধরিলে, এইরূপ একটি উপনিবেশ হইতে ২০৲ হইতে ৩৫৲ টাকা আয় হইতে পারে। খরচের জন্য ইহার এক তৃতীয়াংশ বাদ গেলেও অনেক আয় হয়।

১০০, ১৫০ শত টাকায় একটি উপনিবেশের উপযুক্ত সমস্ত সাজ সরঞ্জম পাওয়া যাইতে পারে, তাহার পর উহা হইতে ক্রমশঃই বাড়ান চলে। কালিফর্ণিয়ান মক্ষিকা লইয়া চাষ আরম্ভ করা ভাল। নূতন ধরণের মৌচাক ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জম ইউরোপ হইতে আমদানী করা সহজ।

মধুমক্ষিকার চাষ ভারতে এই নূতন নহে। আগে ভারতে এই চাষ প্রচলিত ছিল, * কিন্তু এখন আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনও উত্তর ভারতে কোথাও কোথাও পূর্ব্বতন প্রথামত মৌমাছি পালিত হয়। খুব অন্ধকার ঘরে দড়ি খাটাইয়া, তাহাতে মৌমাছি পোষা হয়। মধু সংগ্রহের প্রথা তত ভাল নহে—ইহা পরিশ্রম সাধ্য। মধুমক্ষিকা প্রতিপালন সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে লেখকের নিকট পত্র লিখিতে পারেন।

"অমৃতবাজার।"

* প্রাচীন অভিধানাদি গ্রন্থে এই মধুমক্ষিকা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন আট প্রকারের মৌমাছির উল্লেখ আছে। মধুমক্ষিকার গুণাগুণও তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে। মধুমক্ষিকার বিশেষ গুণ এই যে, ইহারা কটু, তিক্ত, কষায় এমন কি বিষ-কুসুম হইতেও পুষ্পসার সংগ্রহ করিয়া, তাহা সুস্বাদু মধুত্বে পরিণত করে। প্রাকৃত অভিধানে মধুর মৃদু, স্বাদু, ত্রিদোষ ও ব্রণনাশিত্ব গুণ বর্ণিত হইয়াছে। ভারতে মধু ও মৌমাছি বহুকাল হইতে জানা থাকিলেও অন্যান্য জিনিষের ন্যায় ইহার চাষ আবাদ কালে লয় পাইতে বসিয়াছে। কৃঃ সঃ।

মাটির বাসন।

শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত।

বঙ্গদেশে বহু পূর্ব্ব কাল হইতে মাটির বাসনের আদর আছে এবং উচ্চ অঙ্গের কাঁচা ও পোড়া মাটীর দেবদেবী মূর্ত্তি যে তৈয়ারি হইত, তাহার প্রমাণ সংগ্রহে অধিক আয়াস পাইতে হয় না। এক্ষণে কলিকাতায় চীনামাটির বাসন প্রস্তুত হইতেছে, চীনামাটির ডিস, প্লেট, পেয়ালা ও দেবদেবী মূর্ত্তি বেশ তৈয়ারি হইতেছে।

যেমন বঙ্গদেশে কোন কোন দেবমন্দির পূর্ব্বকালে বিবিধ কারুকার্য্য সমন্বিত পোড়া মাটির ইটে গাঁথা হইত এবং ঐ সকল ইটের উপর হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতি ছাঁচে ঢালা হইত, উত্তর পশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি দেশেও তদ্রূপ মুসলমানদিগের রাজত্বকালে মস্‌জিদাদির মেজে, দেওয়াল, থাম ইত্যাদি সুশোভিত করিবার জন্য বিবিধ বর্ণের ও চিত্রের চিক্কণ (Glazed) টাইল প্রস্তুত করা হইত। এইরূপে মধ্য-ভারত ও পশ্চিম প্রদেশসমূহে যেমন এক সময়ে পাথরের উপর হিন্দু-ভাস্করদিগের কারুকার্য্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সেইরূপ মুসলমানদিগের ধর্ম্মমন্দির, কবর ও কীর্ত্তিস্তম্ভাদিতে বহুবিধ মূল্যবান প্রস্তর-খচিত কারুকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর সুন্দর চিত্রের বার্ণিস করা বা চিক্কণ (Glazed) পোড়ামাটির ইট ও টালিরও সমাবেশ দেখা গিয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, অধুনা উপরি উক্ত উভয়বিধ শিল্পকার্য্যই বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে সেরূপ দেবদেবীর মূর্ত্তিযুক্ত ছাঁচে ঢালা ইট আর প্রস্তুত হয় না এবং উত্তর, পশ্চিম ও মধ্যভারতে

যে সকল রঙীণ টালি প্রস্তুত হইত, তাহা আজকাল অতি অল্প পরিমাণেই হইয়া থাকে।

কথিত আছে যে, পোড়ামাটির রঙীণ টালির চিত্র-শিল্প চীনদেশ হইতে আনীত হয়। এইজন্য পঞ্জাবের যে সকল মুসলমান কারিকর এই কার্য্যে এখনও ব্রতী, তাহাদিগকে "চিনিগর" বলে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহার আদিস্থান সমরকন্দ ও পারশ্যদেশ। শেষোক্ত প্রবাদটী যে মিথ্যা, তাহাও মনে হয় না, কেন না, পারশ্যদেশের কার্পেট জগতে অতুলনীয়। ঐ সকল কার্পেটের মনোহর লতা-পাতার আদর্শেই এই সকল রঙীণ টাইল সম্ভবতঃ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। যাহা হউক পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই শিল্প এক্ষণে ভারতবর্ষের মধ্যে অতি অল্প পরিমাণেই দৃষ্টিগোচর হয়। এখন আর সেরূপ বিবিধ চিত্রের ইট বা টালির আদর নাই। সুতরাং ক্রমেই সে ব্যবসায় বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কালের বিচিত্র লীলা কে বুঝিবে? একদিকে মুসলমান-শাসনের অধঃপতন হইল, অন্যদিকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপালিত শিল্পিকুলের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। দেশবাসীগণের নিকট হইতে শিল্পিগণের অর্থাগমের পথ অবরুদ্ধ হইল। এদিকে ইংরেজ-দিগের রাজত্ব সময়ে উক্ত শিল্পিগণের উপার্জ্জনের এক অভিনব পন্থা উদ্ভূত হইল। ইংরেজগণ দেখিলেন যে, ঐরূপ বিচিত্র বর্ণের বিবিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত লইলে, তাঁহাদিগের গৃহাদি সুসজ্জিত হইতে পারে। সুতরাং ইংরেজদিগের অনুগ্রহে আজকাল বহুবিধ লোটা, থালা, সুরাহি (কুঁজা) প্রভৃতি পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, কচ্ছদেশ, জয়পুর, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও হায়দ্রাবাদে প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল দ্রব্য দেশীয় বড়লোকদিগের ভবনে প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু কলিকাতায় সম্ভ্রান্ত ইংরেজদিগের বাসগৃহমাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কিছুকাল হইতে এই শিল্পের সমাদর বৃদ্ধি হওয়াতে আজকাল দুই একটী শিল্প-বিদ্যালয়েও ইহার সূত্রপাত হইয়াছে। জয়পুর মহারাজের শিল্প-বিদ্যালয়ে বৎসরে বৎসরে অনেক রকম মাটির বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ শিল্প-বিদ্যালয়েও ইহা প্রস্তুত হয়। বোম্বাই শিল্প-বিদ্যালয়ের দ্রব্যগুলি এতই সমাদৃত হয় যে, টেলরী নামক কোন সাহেব এক্ষণে একটী কারখানা খুলিয়া উক্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপে দিল্লী, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত বহুবিধ দ্রব্য ইউরোপের নানাস্থানের অধিবাসিগণের গৃহে শোভা পাইতেছে। সিন্ধুদেশের হালা নামক স্থানের বৃহদাকার মাটির দ্রব্যগুলির কোন কোনটীর মূল্য দুই শত টাকারও অধিক। এগুলি প্রধানতঃ পীত ও ধূসরবর্ণে রঞ্জিত। বোম্বাই সহরের টেলরী সাহেবের কারখানার দ্রব্যগুলিও অধিকাংশ ঐরূপে চিত্রিত ও রঞ্জিত। কিন্তু অন্যান্য জায়গার মাটির বাসনগুলি প্রায়ই ফিকে নীল জমির উপর গাঢ় নীল রঙে প্রস্তুত। পঞ্জাবের মধ্যে মূলতান সহরেই এইরূপ উৎকৃষ্ট নীলরঙের দ্রব্যাদি তৈয়ার হইয়া থাকে। কলিকাতায় ১৮৯৩-৯৪ সালে যে সার্ব্বভৌমিক প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা হয়, তথায় ভারতবর্ষের যে সকল মাটীর বাসন প্রদর্শিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বাছা বাছা দ্রব্যগুলি ভারতগভর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া কলিকাতা যাদুঘরের ইণ্ডষ্ট্রীয়ল বিভাগে সাধারণের দেখিবার জন্য সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা দেখিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষের আর শিল্প যেমন স্মরণাতীত কাল হইতে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, এখানকার সামান্য মাটির বাসনও তদ্রূপ বর্ত্তমান যুগে ইউরোপের অধিবাসীগণের

চিত্তাকর্ষণে কোন অংশে হীন নহে। দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের ধনীগণ, বিশেষতঃ রাজা মহারাজা প্রভৃতি যদ্যপি এই শিল্পিগণকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

এলাহাবাদে কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী।— ১লা ডিসেম্বর ১৯১০ সাল বৃহস্পতিবার প্রদর্শনী খুলিয়াছে। বহুস্থান হইতে কৃষিজাত দ্রব্য আসিয়াছে। নানা দেশজাত কৃষিযন্ত্রাদির সমাবেশ হইয়াছে। হস্ত-শিল্পের আমদানী কিছু কম নহে। প্রদর্শনী সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

প্রয়াগ প্রদর্শনীতে ছোট লাট।— প্রদর্শনী খুলিবার কালে ছোট লাট সাহেব বলিয়াছিলেন,—"In the present stage of civilization in India political questions an nothing compared to economic ones." অর্থ সংস্থানের কথা অগ্রে চাই, তাহার কাছে রাজনীতিক কথা লাগে না। কথাটা খুব ঠিক অন্নের সংস্থান না থাকিলে অন্যদিকে মন দেওয়া শোভা পায় না।

কার্পাস চাষে ল্যাঙ্কাশায়ারের দান।— বিলাতের ল্যাঙ্কাশায়ারের কাউণ্টি কাউন্সিল বা সভা প্রকাশ করিয়াছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভাল কার্পাসের চাষ করিবার জন্য উক্ত সভা দেড় লক্ষ টাকা সাহায্য করিবেন। ইহাকেই বলে উদ্‌যোগ; ব্রিটিশ পুরুষসিংহগণ এই ভাবে উদ্‌যোগ করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্যতা লাভ করিবেন। আমরা বাজার বুঝিতেছি, অভাব বুঝিতেছি, কিন্তু পর্য্যাপ্ত পুরুষকার নাই, সুতরাং পর্য্যাপ্ত অর্থসামর্থ্য নাই বলিয়া কেবল স্থবির জড়পিণ্ডের ন্যায় হা-হুতাশ করিতেছি।

অগ্রহায়ণ—১৩১৭।

কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা।

অনেকে আজকাল কৃষি-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন, অনেক ভদ্রসন্তান একার্য্যে লিপ্ত হইতে ইচ্ছুক কিন্তু ইহাতে সর্ব্বত্র আশানুরূপ ফল ফলিতে দেখা যায় না এবং আশাও করা যায় না; কারণ চাষী ব্যতীত যাঁহারা একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের একান্ত নির্ভরতা নাই, অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমাদের এই সকল ধারণা জন্মিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম কৃষি বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর শ্রীযুৎ ভূপালচন্দ্র বসু মহাশয় আমাদের সহিত কথা প্রসঙ্গে এক সময় বলিয়াছিলেন যে, তিনি জীবিকার্জ্জনের জন্য কৃষি কর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছেন এরূপ শিক্ষিত ভদ্র যুবককে ২০০ শত টাকা পারিতোষিক দিতে প্রস্তুত আছেন এবং আমাদিগকে এই বিষয় বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগকে জানাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে যদ্যপি বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ ঐরূপ দুই বা ততোধিক পারিতোষিক দানে সম্মত হন, তবে আমাদের কৃষি-সমিতি হইতে এই কথা প্রচার করিয়া যুবকগণের উৎসাহ প্রদানে যত্ন করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বর্ষে গভর্ণমেণ্ট সকল

বিষয়েই ব্যয় সংক্ষেপ করিতেছেন এবং এখন ঐ প্রকার আবেদনে কোন ফল হইবে না ইহা আমাদের উক্ত কৃষি-বিভাগ হইতে তত্ত্ব লইয়া আপাততঃ এই খবর প্রচারে বিরত আছি, কিন্তু আমরা এই সম্বন্ধে তত্ত্ব লইতে ত্রুটী করিতেছি না। অনেকে কৃষি কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া সখ মিটাইতেছেন মাত্র, বিশেষ কোন ফল পাইতেছে না। সমৃদ্ধ লোকেরত কথাই নাই, তাঁহারা বর্ত্তমান হুজুগে ইহা একটা প্রকৃত সখের ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন। পরোক্ষভাবে দেশের একটু না একটু উপকার হইলেও ফলতঃ ইহা তাঁহাদের খবরের কাগজে নাম প্রচারের উপায় মাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। দশ, পনর কিম্বা বিশ বিঘা জমি লইয়া কোন যুবক কেবল মাত্র চাষবাস করিয়া তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন ও তাঁহার যাবতীয় দৈনিক ব্যয় সঙ্কুলান বা পোষ্য প্রতিপালনে নিযুক্ত আছেন এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। ভদ্রবংশীয় বা ইতর জাতীয় হউক, প্রকৃত চাষীরা জমি হইতেই তাহাদের ভাত কাপড় ও অনুসঙ্গিক খরচের যোগাড় করিয়া লয়। যেখানে ধান চাষের সুবিধা আছে তথায় এক ধান হইতেই অনেক সংসারের দিন যাপন হয়। যাহারা কিন্তু প্রকৃত চাষী, তাহারা জমির পাট করিতে জানে, নিজে কোদাল ধরিতে পারে, জমির কখন 'যো' হয় বুঝে, কোথায় ভাল বীজ পাওয়া যায় তাহার সন্ধান রাখে, তাহারা চাষের ঘুণ।

শিক্ষিত যুবকদের মজুরের উপর চাষের কাজ নির্ভর, তাঁহাদের তাতবাত বড় সহ্য হয় না। নিজেরা কাস্তে ধরিতে পারেন না। যদি ক্ষেতে দাঁড়াইয়া ধানরোয়া বা ধান কাটায় তত্ত্বাবধান না করেন তবে তাঁহারা কি প্রকারে মজুরদের কাজ বুঝিয়া লইবেন? এইরূপ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যদি একবারে সুন্দরবনে পাঠাইয়া দেওয়া যায় তবে আপাততঃ তাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং পরিণামে চাষে তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণা হইবে না কি!

এরূপ স্থলে আমাদের সৎ যুক্তি এই যে, যাহা রয়, সয়, তাহাই ভাল। শিক্ষিত যুবকবৃন্দের পক্ষে উঁচু জমির চাষই ভাল, অধিক জমি না লইয়া প্রথমতঃ দশ বিঘা মাত্র জমি লইয়া আরম্ভ করা ভাল, অধিক মূল ধন না লইয়া অল্প মূল ধনে কাজ করা ভাল। নিজে না খাটিলে মজুরেরা খাটে না, নিজে কোদাল ধরিতে না পারিলে তাঁহার চাষে নামা উচিত নহে।

কৃষিযন্ত্র অনেক আছে, আবার বিজ্ঞানের উন্নতির কালে কত নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে। কিন্তু সে সব বৃহৎ ব্যাপারের জন্য। সামান্য আরম্ভে কোদালই একমাত্র যন্ত্র—ফুরসৎ পাইলেই, জমির "যো" হইলেই কেবল জমি কোপাও, খুব গভীর করিয়া মাটি উলট পালট করিয়া ফেল এবং সদা সর্ব্বদা জমিতে লাগিয়া পড়িয়া থাক। দেখিবে এক জমি হইতে তিনটা ফসল উঠিবে—এক গুণের জায়গায় তিন গুণ লাভ হইবে।

কৃষি কর্ম্মের জন্য যুবকবৃন্দের শিক্ষা বিধান করিতে হইলে তাঁহাদিগকে জমিতে কোদালপাড়া শিখানই প্রধান কাজ—তাহাতে ক্রমশঃ দম বাড়িবে, তাতবাত সহ্য হইবে এবং মাটির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিবে এবং মাটি মাখিয়া শরীরও সবল ও নিরেট হইয়া উঠিবে। আজকাল সুদূর পল্লিগ্রামেও ফুটবল, ক্রিকেটের অভাব নাই; কেননা ইহা স্থির সিদ্ধান্ত ব্যায়াম চাই—তাহার জন্য চাঁদা—শক্তির বৃথা অপব্যয়, সময়ের অপব্যয়। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে একখণ্ড জমি ঠিক করিয়া তাহাতে কোপান আরম্ভ কর—

কে কত কোপাইতে পারে—কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও—কে হারে, কে জেতে—আপনাদের মধ্যে চাঁদা ফেল—চাঁদার পয়সায় খাও ও কতকটা জমিতে খরচ কর—তাহাতে স্বাস্থ্য ভাল হইবে, অধ্যবসায় বাড়িবে, দম বাড়িবে, ভবিষ্যতে একগুণ ব্যয়ে বিশ গুণ লাভ হইবে—ঘরের পয়সা ঘরে আসিবে। ধনী যুবকদের আমরা এক কার্য্যে লিপ্ত হইতে বলি না—যাঁহার সখ থাকে তিনি করুন—তাহাতে লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই; কিন্তু তাঁহারা যেন প্রত্যেকে ফুটবলের ন্যায় চাঁদা প্রভৃতি দিয়া অপরকে উৎসাহ দেন বরং মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা ও পরীক্ষায় পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিয়া এ কার্য্যে যেন একটা নূতন জীবন দান করেন। যদি স্বাবলম্বনের দ্বারা এতটুকু না হয়, তবে স্বাবলম্বনের অর্থ কি আমরা বুঝি না!

আমরা একজন চাষীর কথা জানি—সে জমিতে কখন লাঙ্গল দেয় না—তাহার কেবল কোপাইবার ব্যবস্থা—সে কোপান জমিতে কাহাকেও পা দিতে দেয় না, পাছে জমি বসিয়া যায়। আবার রাস্তা ঘাটে যেখানে যে সারটুকু পায়, প্রতিদিন—প্রতিনিয়ত জমিতে আনিয়া ফেলিতেছে। জমিই তাহার ধ্যান, জমিই তাহার তপ, যপ, মূলমন্ত্র—সে সেই জন্য এক বিঘা জমিতে শসা লাগাইয়া ২৫০ শত টাকা লাভ করে। বাজারের সেরা বেগুন ফলাইয়া দুই হাতে পয়সা কুড়ায়--তাহার পাশের চাষী কেহ তাহার সমকক্ষ নহে। যে কোন কাজ কর, তাহাতে জেদ থাকা চাই, তাহাই জীবনের মূলমন্ত্র হওয়া আবশ্যক।

শিলঙ পরীক্ষাক্ষেত্রে ফলের চাষ।—সম্প্রতি শিলঙে বাইশ প্রকার বিদেশীয় ফল-বৃক্ষের চাষ হইতেছে। অনেকগুলি গাছই, এ পর্য্যন্ত ফলদায়ক হয় নাই। যে গুলিতে ফল ধরার সময় হইয়াছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে আপ্রিকট, আলুবোখারা, বাদাম ও চেরিময়ারের ফুল হইয়াছে, ফল ধরে নাই। আপেল ও নাশপাতির ফল ঝরিয়া গিয়াছে; পিচ ও চেরীর ফল অন্যান্য বৎসর ভাল হইলেও, গত বৎসর তেমন হয় নাই। আঞ্জীর, লেবু, আঙ্গুর, পাহাড়ে পেঁপে ও গাছ টোমাটো বেশ ফল প্রসব করিতেছে। গুস্‌বেরি, র‍্যাস্পবেরি ও কারাণ্ট মরিয়া যাইতেছে। কিন্তু ষ্ট্র-বেরি উত্তমরূপ জন্মিতেছে। শিলঙে প্রথমতঃ যে স্থানটি ফলোৎপাদনের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, তাহাতে ঝড় বাতাস বড় বেশী হওয়ায়, ফল ধরার সুবিধা হয় নাই। এক্ষণে, কতিপয় গাছ সরাইয়া, ঝড় হইতে সুরক্ষিত অন্য স্থানে বসান হইয়াছে। তাহাতে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ, এই সমুদয় পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ইউরোপ অথবা আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ দেশে যে সমুদয় ফল হয়, সে গুলি ভারতে পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রবর্ত্তন করা। শিলঙে অতিবৃষ্টি ও মৃত্তিকায় অধিক রস থাকায়, কতকগুলি ফল-বৃক্ষের পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু অন্যান্য দেশেও, প্রথম প্রবর্ত্তনের সময় অনেক ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। পরে গাছসমূহ কতকটা জলবায়ুসহ হইয়া যায়, এবং পরীক্ষিত অনেকগুলি বৃক্ষের মধ্যে, কতকগুলি বৃক্ষ নূতন দেশের উপযুক্ত হইয়া পড়ে। শিলং-পরীক্ষা-ক্ষেত্রের অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে, পরীক্ষিত গাছসমূহের কলম ও বীজ প্রভৃতি বিতরণ প্রধানতম কার্য্য। কৃষি-বিবরণীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিগত বৎসরে সর্ব্বসমেত ৫৬০৯টি চারা এবং কিঞ্চিদধিক ।৵৮ সের বীজ বিতরিত হইয়াছে। ভাল গাছ ও বীজ যতই অধিক সংখ্যায় ও পরিমাণে দেশ মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, ততই অপকৃষ্ট জাতিসমূহ বিলুপ্ত হয় এবং তৎসমুদয়ের স্থানে উৎকৃষ্টতর জাতি জন্মাইতে থাকে। এই কারণে শিলঙ-পরীক্ষাক্ষেত্রের কার্য্য বিশেষ প্রশংসাযোগ্য।

পত্রাদি।

কাগজের কারখানা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য, কৈশালি, ঢাকা দক্ষিণ, শ্রীহট্ট।

কাগজের কারখানা স্থাপন করিতে কি কি কল কব্জা আবশ্যক জানিতে চাহিয়াছেন।

[এই সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, অনুসন্ধান ফল তাঁহাকে জানান যাইবে।] কৃঃ সঃ।

চাষ আবাদের উপযুক্ত স্থান।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সরকার, ডিহিরি সিটি, সাহাবাদ।

মহাশয়গণ, এখানকার দক্ষিণ পার্ব্বতীয় প্রদেশের জঙ্গলে আমার সামান্য যৈয়ের চাষ আছে। কিন্তু তথাকার জমি চাষবাসের পক্ষে অতি উত্তম ও জমি খুব সস্তা। জমিদারগণকে ৫৲ টাকা খাজনা দিলে একখানি লাঙ্গলে যত বিঘা জমি চাষ করিতে সক্ষম হইবে দিবেন। জমিদারগণ জঙ্গলী লোক, অতিশয় ধর্ম্মভীরু, কোনরূপ ছলকপট জানে না। তথাকার অধিবাসীরাও ঐরূপ। লোকজন ও হেলেগরু অতি সস্তা, দুই টাকা মাহিনায় একজন কৃষক চাকর পাওয়া যায়, সমস্ত দিন চাষ করিবে, ও সন্ধ্যার সময় আবার বাড়ির ফরমাস খাটিবে। দুধ, ঘি খুব সস্তা। একজন সামান্য লোকের ৩।৪ শত গরু ও মহিষ আছে; জঙ্গলে সমস্ত দিন চরায়, যেখানে সন্ধ্যা হয়, সেইখানেই থাকে ও রাত্রের মধ্যে সমস্তকে দোহন করিয়া, জঙ্গলে কাঠকুটো লইয়া সমস্ত দুগ্ধ জাল দিবে, ও একটু বেলা হইতে না হইতে, মাখম ঘৃত বাহির করিয়া, আবার গরু, মহিষম লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। খাঁটি মধু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ঘৃত, মধু প্রভৃতি অনেক প্রকার জঙ্গলী জিনিষ কলিকাতায় চালান দিলে বেশ লাভ হইতে পারে। জলবায়ু খুব ভাল কিন্তু বাঘ, ভালুক বিস্তর। মহাশয়গণ, যদি তথায় রীতিমত চাষ বাস ও ঘৃতাদির ব্যবসা চালান, তাহা হইলে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। আমি সমস্ত যোগাড়যন্ত্র করিয়া দিতে পারিব, কোন বিষয়ে ত্রুটী হইবে না। কিন্তু আমাকে লাভের উপর চারি আনা অংশ দিতে হইবে। এ বিষয় খুব ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য হয়, জ্ঞাপন করিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি।

[উক্ত স্থানে যাইয়া সাক্ষাত সম্বন্ধে চাষের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে আমাদের ইচ্ছা নাই, তবে কৃষকের গ্রাহকগণের মধ্যে কেহ উক্ত স্থানে চাষ আরম্ভ করিলে, আমরা তাঁহাকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব এবং সময় মত স্থানটি দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা আমাদের রহিল।] কৃঃ সঃ।

প্রাদেশিক কৃষি-সংবাদ।

বুড়িরহাট কৃষিক্ষেত্রে তামাক পরীক্ষা।—এতদ্দেশে চুরুট ও সিগারেটের উপযুক্ত তামাক উৎপাদন উদ্দেশ্যে, অন্যূন ২৪ সংখ্যক দেশীয় ও বিদেশীয় তামাক, বিগত বৎসর ক্ষেত্রে উৎপাদিত হয়। তন্মধ্যে সুমাত্রাজাতীয় চারিটি, হাভানা দুইটি, মার্কিন চারিটি, তুর্কি তিনটি, অন্যান্য বিদেশীয় দুইটি, স্থানীয় রঙ্গপুর পাঁচটি, জলপাইগুড়ি তিনটি এবং চট্টগ্রাম জাতীয় একটী। অনাবৃষ্টি ও জমির অপকর্ষতার জন্য, মোটের মাথায়, কোন জাতীয় তামাকই উত্তমরূপ জন্মায় নাই। বিলাতে দরের জন্য যে সমুদয় তামাকের নমুনা পাঠান হইয়াছিল, তাহার একটীও বিলাতী ব্যবসাদারেরা পছন্দ করেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে, রঙ্গপুরের স্থানীয় কৃষকেরা নিকৃষ্ট জাতীয় তামাক চাষ করে। বিঘা প্রতি ৫ মণ হইতে ৬॥• মণ তামাক উৎপাদিত হয় এবং ঐ তামাক মণ প্রতি ১০৲ হইতে ২৫৲ টাকা দরে বিক্রীত হয়। এইরূপ অবস্থায়, বিদেশীয় উচ্চশ্রেণীর তামাকের চাষে আদৌ লাভ নাই। কারণ, বিদেশীয় তামাক হইতে লাভ করিতে হইলে, বিদেশীয় তামাকের উৎপাদনের মাত্রা অন্ততঃ দেশীয় তামাকের সমান হওয়া আবশ্যক এবং মুল্য দ্বিগুণ হওয়া দরকার। কিন্তু বিগত পাঁচ বৎসরের পরীক্ষায়, ক্ষেত্রজাত বিদেশীয় তামাকের দর, দেশীয় তামাকের সর্ব্বোচ্চ দরেরও সমান হয় নাই। আমাদের বোধ হয়, বিদেশীয় তামাক রঙ্গপুরে তাদৃশ ফলোপধায়ক হইবে না।

রাজসাহী ক্ষেত্রে আখের চাষ।—ঢাকাই গেণ্ডেরি, স্থানীয় খাগড়ি ও সামসাড়া—এই তিন জাতীয় ইক্ষু লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। উৎপন্ন গুড়ের পরিমাণে, গেণ্ডেরিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে; কিন্তু স্থানীয় খাগড়িরও কয়েকটী গুণ আছে। ইহার রোগ কম হয় এবং ইহার চোক্ সহজে উৎপাদিত হয়। সারের হিসাবে, বিঘা প্রতি ১০০/ মণ গোবর-সারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। রেড়ীর খৈল, সোরা কিম্বা সুপারফসফেট, খরচের অনুপাতে, লাভ হয় নাই।

জোড়হাট-ক্ষেত্রে ইক্ষুর বিভিন্ন জাতির তারতম্য ও সারসম্বন্ধীয় পরীক্ষা করা হয়। এই ক্ষেত্রের ইক্ষু দুইটী প্রণালীতে উৎপাদিত হইয়াছিল—১ম সাধারণ ভ বে কাটীং দ্বারা এবং ২য় আকের গোড়া ক্ষেত্রে রাখিয়া দিয়া, তদ্দ্বারা উৎপাদিত নূতন চারা দ্বারা। পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে, গোড়ার চারায় অধিক পরিমাণ ইক্ষু জন্মিয়া থাকে; কিন্তু কাটিঙের রসে শর্করার মাত্রা অধিক। মরিচদ্বীপের ডোরাকাটা, ভেলী, সামসাড়া, পৌণ্ড্র, খেড়ী ও মাজেরা—এই কয়প্রকার ইক্ষু গোড়ার চারার দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছিল। দুই বৎসর উপর্য্যুপরি পরীক্ষায়, মাজেরা অনুপযুক্ত বোধ হওয়ায়, উহা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট জাতিসমুহের মধ্যে, মরিচ-দ্বীপের ডোরাকাটা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। তন্নিম্নে পৌণ্ড্র ও মাগী। খেড়ীর রস যদিও কম, তথাপি উহার ফসল অধিক হওয়ায়, বিঘা প্রতি অধিক পরিমাণ গুড় পাওয়া গিয়াছে। মরিচ-দ্বীপের ডোরাকাটা, পৌণ্ড্র, খেড়ী, সামসাড়া, মাগী, ভেলী, চারি জাতীয় বারবোডাস্, রঙ্গপুরের বাঁধামুখি, ঢাকাই গেণ্ডেরী, ডিব্রুগড়ের পৌণ্ড্র ও বোগাপুরা—এই কয়েক জাতি ইক্ষু কাটিং হইতে উৎপাদিত হয়। ওয়েষ্টইণ্ডিজ হইতে, ১৯০৭ সালে, চারি জাতি ইক্ষু আমদানী হয়। এই সকলের কাটিং বসান হইয়াছিল এবং সেই কাটিংএর গোড়ার চারা হইতে বিগত বৎসরের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।

যে স্থানে ইক্ষু লাগান হইয়াছিল, সেই স্থানের মৃত্তিকা এত বিভিন্ন প্রকারের যে, বিভিন্ন জাতীয় ইক্ষুর গুড় উৎপাদনের মাত্রা তুলনা করা অসঙ্গত।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অগ্রহায়ণ মাসে শস্যের অবস্থা।—দক্ষিণ দিকস্থ জেলা সমূহে সামান্য বারিপাত হইয়াছে, পরিমাণ গড়ে অর্দ্ধ ইঞ্চির অধিক হইবে না। ক্ষেত্রস্থ শস্যের অবস্থা ভাল এবং পর্য্যাপ্ত ফলের আশা আছে। আশুশস্য আহৃত হইয়াছে। গম, যব এবং অফিমের বুনানি চলিতেছে। অপেক্ষাকৃত অধিক জমিতেই উক্ত ফসলের আবাদ হইবে বলিয়া অনুমান হয়। আখমাড়াই হইতেছে, গবাদির খাদ্য ও জলের কোথাও অভাব নাই।

পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসাম অগ্রহায়ণ মাসে চাষের অবস্থা।—আবহাওয়া শুষ্ক ও সুখপ্রদ, চায়ের পাতা উঠানকার্য্য শেষ হইয়াছে, রবিশস্যের বুনানি হইতেছে, হৈমন্তিক ধান্য আহরণ হইতেছে। ক্ষেত্রস্থ শস্যের অবস্থা ভাল। কোথাও কোথাও শস্যে পোকা লাগিতেছে।

বঙ্গদেশ।—আশু ধান্য ও উচ্চ জমির হৈমন্তিক ধান্য আহরণ শেষ হইয়াছে। নিম্ন জমির ধান কাটা হইতেছে। রবিশস্য বোনা ও আলু বসান প্রায় শেষ হইয়াছে, আবহাওয়া শুষ্ক, কোথাও কোথাও বৃষ্টির আবশ্যক হইয়াছে।

সার-সংগ্রহ।

সহযোগীতা ও পরজীবিতা।

দুই পৃথক জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদ জীবনরক্ষার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করিতেছে, এ প্রকার ঘটনা হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ে না। কিন্তু ইতর জীবের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে, ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ব্যাপারটিকে Symbiosis বলেন। ইহার বাংলা পরিভাষা ঠিক কি হওয়া উচিত, জানি না। সহযোগীতাই বলা যাউক।

খঞ্জ যখন বলবান অন্ধের স্কন্ধে চাপিয়া ভিক্ষার জন্য দাতার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদের মধ্যে তখন বেশ একটা সহযোগীতা থাকে। অন্ধ পথ চলে, খঞ্জ তাহার ঘাড়ে বসিয়া পথ নির্দ্দেশ করে। তার পর ভিক্ষালব্ধ অর্থ দুইজনে সমান ভাগ করিয়া লয়। এই ব্যবস্থায় একের অসম্পূর্ণতা অপরে পূরণ করিয়া, শেষে দুজনেই লাভবান হইয়া পড়ে। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এই ব্যাপারটিকে Symbiosis বা সহযোগীতা বলেন না। ভিন্ন জাতীয় জীবের মধ্যে যে স্বাভাবিক আদানপ্রদান তাহাই সহযোগীতা। গরুটিকে ঘাসজল খাওয়াইয়া পুষ্ট করিলে, সে যখন দুগ্ধধারা দান করিয়া ঘাসের ঋণ পরিশোধ করে, তখনো ইহাকে সহযোগিতা বলা যায় না। এই ব্যাপারে পূর্ণ মাত্রায় দোকানদারী বর্ত্তমান। ইহার আগাগোড়া কেবল মানুষের চতুরতাতেই পূর্ণ। পৃথিবীতে ঘাসজলের অভাব নাই। মানুষ যদি কৃত্রিম উপায়ে গো-জাতিকে পরাবলম্বী না করিত, তবে তাহারা কখনই গো-শালায় আশ্রয় গ্রহণ করিত না। প্রকৃতিদত্ত তৃণমুষ্টি আহার করিয়া এবং দুগ্ধধারায়

নিজের সন্তানগুলিকে পুষ্ট করিয়া, বেশ নির্ব্বিবাদে দিন কাটাইত।

উদ্ভিদ ও মধুমক্ষিকার কার্য্যে সহযোগীতার একটি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়।

ফুলের পরাগগুলি গর্ভকেশরের (Pistils) উপরকার আঠালো অংশে আসিয়া লাগিলে, ফলের উৎপত্তি সুরু হয়। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, একই ফুলের পরাগ যদি তাহারি গর্ভকেশরে আসিয়া লাগে, তবে ফল ভাল হয় না। এই প্রকারে ফল উৎপন্ন করিতে থাকিলে, চারি পাঁচ পুরুষের মধ্যে গাছের বিশেষ অবনতি দেখা যায়। এক গাছের ফুলের পরাগ যদি সেই জাতীয় অপর কোন গাছের গর্ভকেশরে গিয়া পড়ে, তবেই ফল ভাল হয়; এবং তাহারি বীজ হইতে যে সকল গাছ হয়, সেগুলির পুষ্প, পত্রে ও ফলে উন্নতির সকল লক্ষণগুলি প্রকাশ হইয়া পড়ে। কাজেই বলিতে হয়, পরাগের আদান প্রদান ক্রমোন্নতির চলিবার একটা প্রধান অবলম্বন। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় উদ্ভিদ্ মাত্রই হস্তপদহীন এবং একবারে চলচ্ছক্তিরহিত। মাটি হইতে উঠিয়া, দুইপদ দূরবর্ত্তী গাছের ফুল হইতে পরাগ আনিয়া যে নিজের ফুলে দিবে, এমন সামর্থ্য কোন উদ্ভিদেরই নাই। প্রকৃতির বিধানে মাটি হইতেই ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করে, এবং মাটিতে মূল প্রোথিত করিয়া নিশ্চল থাকিলেই ইহাদের জীবনরক্ষা হয়।

মধু-মক্ষিকার প্রকৃতি উদ্ভিদের ঠিক্ বিপরীত। ইহারা সর্ব্বদাই চঞ্চল। কাজেই জীবনরক্ষার জন্য ইহাদের অধিক খাদ্যের আবশ্যক হয়, এবং খাদ্যটুকুকে নিজেদেরই খুঁজিয়া-পাতিয়া বাহির করিতে হয়। অচল উদ্ভিদ, তাহাদের পুষ্পগুলিতে সচল মক্ষিকার জন্য প্রচুর মধুসঞ্চিত রাখে। মক্ষিকা মধুর প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না। সেই সযত্ন সঞ্চিত মধু আকণ্ঠ পান করিয়া এবং পুষ্পের পরাগ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ইহারাই অপর পুষ্পের গর্ভকেশরে তাহা লাগাইয়া আসে। এই ব্যবস্থায় মধুমক্ষিকা এবং উদ্ভিদ্ উভয়েরই উপকার হয়। মক্ষিকা মধুপান করিয়া তুষ্ট হয় এবং উদ্ভিদ্ মক্ষিকারই সাহায্যে পরাগের আদানপ্রদান করিয়া বংশের উন্নতিসাধন করিতে থাকে। প্রকৃতির নির্দ্দেশে জীবনের ধারাকে বিচিত্র পথে চালাইয়া দুইটি পৃথক জীব ঘটনাক্রমে মিলিত হইয়া যখন এইপ্রকার পরস্পরের উপকার করিতে থাকে, তখনি তাহারা সহযোগী হয়।

বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা এবং কাণ্ডাদিতে বর্ষার শেষে যে এক প্রকার সবুজ ও সাদায় মিশানো ছাতা (Lichens) দেখা যায়, তাহার জীবনের ইতিহাস খুঁজিলে, দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় উদ্ভিদের সহযোগীতার অদ্ভুত কার্য্য ধরা পড়ে।

শৈবাল (Algae) এবং ব্যাঙের ছাতা (Fungi) উভয়েই উদ্ভিদ্‌শ্রেণীভুক্ত হইলেও জাতিতে উহারা সম্পূর্ণ পৃথক। শৈবাল উদ্ভিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহাদের অনেকেরই দেহখানি এক কোষময়। এই কোষটিকেই দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ইহারা বংশ বিস্তার করে। অগভীর আবদ্ধ জলে যে সবুজ সর পড়ে, তাহা এই শ্রেণীরই কোটি কোটি উদ্ভিদের সমষ্টি। পুষ্করিণীর জলে সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় যে সকল উদ্ভিদকে ভাসিতে দেখা যায়, তাহারাও এই শ্রেণীভুক্ত। তবে ইহারা অপরের তুলনায় কতকটা উন্নত। এই শৈবাল-গুলির জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, জীবনরক্ষার জন্য যেটুকু আকরিক পদার্থের আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য ইহারা অপর উদ্ভিদের ন্যায় মৃত্তিকার গভীর প্রদেশে মূল চালনা করে না। আর্দ্র স্থানই

শৈবালের আবাস। এইসকল স্থানে জলের সহিত যে আকরিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহাই উহাদের জীবনরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। মৃত্তিকার সহিত ইহাদের অতি অল্পই সম্বন্ধ থাকে। জীবনের কার্য্য চালাইতে গেলে যে সকল জৈব পদার্থের আবশ্যক, তাহা এই শ্রেণীর উদ্ভিদ্‌গণ দেহের হরিৎ-কণার (Chlorophyll) সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া লয়।

ব্যাঙের ছাতা যে উদ্ভিদ্‌শ্রেণীভুক্ত তাহাও শৈবালের ন্যায় অপুষ্পক, কিন্তু মূলহীন নয়। উদ্ভিদমাত্রেই মূলদ্বারা আকরিক খাদ্য সংগ্রহ করে। উহারাও মূলের সাহায্যে হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন্, ফস্‌ফরস্, পটাসিয়ম্, ম্যাগ্‌নেসিয়ম্ প্রভৃতি পদার্থ দেহস্থ করিতে থাকে। কিন্তু দেহে হরিৎ-কণা না থাকায়, সাধারণ উদ্ভিদের ন্যায় ইহারা জৈব পদার্থ নিজে নিজে প্রস্তুত করিতে পারে না। কাজেই যে সকল স্থলে পচা জৈব পদার্থ থাকে, তাহার উপরে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সেই পচা খাদ্য দেহস্থ করিয়া ইহারা জীবন কাটাইয়া দেয়। এই কারণেই গলিত গোময়-গোমূত্রযুক্ত স্থান এবং পচা পাতা এবং ডালই ব্যাঙের ছাতার প্রধান জন্মক্ষেত্র। উদ্ভিদ্ মৃত্তিকায় যে সকল খাদ্য পায়, তাহা সকল সময় ঠিক খাদ্যের আকারে থাকে না। মূল হইতে এক প্রকার দ্রাবক (Acid) নির্গত করিয়া এবং তাহারি সাহায্যে কঠিনকে দ্রব করিয়া উহারা অখাদ্যকে খাদ্যে পরিণত করে। ব্যাঙের ছাতার যে সকল ছোট ছোট মূল আছে, সেগুলি হইতে ঐ দ্রাবক প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়, কাজেই আকরিক খাদ্য সংগ্রহে ইহাদিগকে একটুও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

এখন মনে করা যাউক ব্যাঙের ছাতা এবং শৈবাল ঠিক্ পাশাপাশি থাকিয়া বৃক্ষত্বক্ শৈবাল-খণ্ডের উপর আশ্রয় লইয়াছে। বৃক্ষত্বকে জৈব বস্তু এবং আকরিক পদার্থ উভয়ই মিশ্রিত থাকে বটে, কিন্তু কোনটিই উদ্ভিদের খাদ্যরূপে থাকে না। শিলাখণ্ডে আবার জৈব বস্তু একটুও মিলে না, ইহার আগাগোড়া কেবল আকরিক পদার্থ দিয়াই গঠিত এই অবস্থায় ব্যাঙের ছাতা ও শৈবাল পৃথক জাতীয় উদ্ভিদ হইয়াও, পরম সখ্যতায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে, দেহের হরিৎ-কণার সাহায্যে বায়ুর অঙ্গারক-বাষ্প (Carbonic Acid Gas) টানিয়া শৈবাল জৈব বস্তু প্রস্তুত করে, তাহার সমস্তটা গ্রাস না করিয়া সে একটা ভাগ ব্যাঙের ছাতাকে দিতে থাকে। ব্যাঙের ছাতা এই দানের কথা ভুলে না। সে যখন মূল-নিঃসৃত দ্রাবকের সাহায্যে বৃক্ষত্বক্ বা শিলার আকরিক পদার্থগুলিকে খাদ্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করে, তখন প্রস্তুত খাদ্যের একটা ভাগ ব্যাঙের ছাতার জন্য রাখিয়া দেয়। এই ব্যবস্থায় কাহারো খাদ্যের অভাব হয় না। উভয় উদ্ভিদই পরিতুষ্ট হইয়া বংশবিস্তার দ্বারা এক একটি ছোটখাটো উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। বৃক্ষত্বক্ শিলাখণ্ড বা পুরাতন প্রাচীরের গায়ে যে সাদা ও সবুজে মিশানো ছাতা দেখা যায়, তাহা শৈবাল এবং ক্ষুদ্র জাতীয় ব্যাঙের ছাতারই উপনিবেশ। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরস্পরের সাহায্য করিয়াই উহারা জীবিত থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহই একা বৃক্ষত্বক বা শিলাখণ্ডের ন্যায় স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না।

মটর, কড়াই, সিম প্রভৃতি শিম্বীপ্রধান (Leguminous) উদ্ভিদের জীবনের ইতিহাসেও সহযোগীতার কার্য্য দেখা যায়। অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে জন্মিলে এই সকল উদ্ভিদ নাইট্রোজেনের অভাবে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় এক প্রকার

জীবাণু (Bacillus) উহাদের মূলে বাসা বাঁধিয়া নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করিতে থাকে। বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা এই জীবাণু গুলিতে দেখা যায়। উদ্ভিদ-গুলিও তাহাদের মূলাশ্রিত অতিথি সম্প্রদায়ের যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে ভুলে না। অঙ্গার ও হাইড্রোজেন ঘটিত অনেক সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া জীবাণুগুলিকে খাওয়াইতে আরম্ভ করে। এই আদানপ্রদানে উদ্ভিদ্ ও জীবাণু উভয়েই পরম লাভবান্ হয়।

মনুষ্যসমাজে যেমন দস্যু, তস্কর আছে, উদ্ভিদ-রাজ্যেও সে প্রকার নির্ম্মম জীব যথেষ্ট দেখা যায়। সদুপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দেহ প্রাণ একত্র রাখার অভ্যাস ইহাদের মোটেই নাই। পরের ঘাড়ে চাপিয়া এবং আশ্রয়দাতার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া উদরপূর্ত্তি করাই ইহাদের কাজ। পরজীবী উদ্ভিদ অর্থাৎ পরগাছা (Parasite) এই দস্যু-সম্প্রদায়ভুক্ত। সুস্থ গাছের উপর জন্মিয়া নিজেদের মূলের সাহায্যে এগুলি এমন নির্ম্মম ভাবে আশ্রয়-দাতার রস শোষণ করিতে থাকে, যে অল্প দিনের মধ্যেই তাহার জীবনান্ত ঘটে। পরজীবী উদ্ভিদের বীজাদি মৃত্তিকায় বপন করিলে অঙ্কুরিত হয় না। মৃত্তিকা হইতে খাদ্য সংগ্রহের শক্তি হইতে ইহারা একবারে বঞ্চিত। পরজীবী উদ্ভিদের ন্যায় পরজীবী প্রাণীরও অস্তিত্ব আছে। প্রাণীর অন্ত্রে (Intestine) যে সকল কৃমি জন্মায় তাহারা সম্পূর্ণ পরজীবী। দেহের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এবং ভুক্ত খাদ্যে ভাগ বসাইয়া ইহারা প্রাণ ধারণ করে। দদ্রু-উৎপাদক জীব, উকুন এবং এঁটোলি প্রভৃতিকেও এই দলে ফেলা যাইতে পারে। ইহারা সকলেই আশ্রয়দাতার শোণিত শোষণ করিয়া জীবনরক্ষা করে। কিন্তু কেহই উপকার-টুকুর বিনিময়ে আশ্রয়দাতাকে কিছুই দান করে না বরং নানা প্রকার পীড়ার উৎপত্তি করিয়া উপকারীর জীবনান্তের চেষ্টা দেখে।

আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতের পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ গুলিকে কোনক্রমে সহযোগীতা বলা যায় না বরং উহাতে কতকটা প্রতিযোগীতার ভাবই বর্ত্তমান। কিন্তু প্রাণীর অন্ত্রে যে সকল জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আশ্রয়দাতার সহিত সহযোগীতা করে বলিয়া আধুনিক জীবতত্ত্ব-বিদ্‌গণ মনে করিতেছেন। ইহারা উদরস্থ অঙ্গার ও হাইড্রোজেন ঘটিত খাদ্য গুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, অঙ্গারক বাষ্প এবং মিথেন্ (Methane) প্রভৃতি বায়ু উৎপন্ন করিতে থাকে। বলা বাহুল্য ইহাতে আশ্রয়দাতার কোনই উপকার হয় না, বরং পেট-ফাঁপা ইত্যাদি পীড়া দেখা দেয়। কিন্তু ইহারি সঙ্গে জীবাণুগুলি আমোনিয়া (Ammonia) প্রভৃতির দ্বারা পাকযন্ত্রে আলবুমেন্ ইত্যাদি যে পরম পুষ্টিকর পদার্থের গঠন করে, তাহাতে আশ্রয়দাতার অশেষ উপকার হয়।

মনুষ্যসমাজে খাঁটি সহযোগীতা (Symbiosis) বা খাঁটি পরজীবিতা (Parasitism) কোনটারই উদাহরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে, যাহাকে সহযোগীতা বলিব, কি পরজীবিতা বলিব, স্থির করা দায় হয়। ইউরোপের সোসিয়ালিষ্ট সম্প্রদায়, ধনী, মহাজন, কণ্ট্রাক্টর ও বড় বড় কলকারখানার চালকদিগকে পরজীবী আখ্যা দিয়া থাকেন। সঙ্কটের সময় এই লোকগুলিই কি প্রকারে ক্ষুধার্ত্তের শূন্য উদর পূর্ণ করে, তাহা সোসিয়ালিষ্টগণ ভুলিয়া যান। আবার যখন ধনী এবং মহাজনগণ অর্থ-সঞ্চয়ের আকাঙ্খায় নিজেদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া দরিদ্র সমাজের ভাত অন্ন বন্ধ করেন তখন তাঁহাদের পরজীবী-মূর্ত্তিখানিই প্রকাশ পায়।

স্তন্যপায়ী মানব-শিশুকে এবং ইতর প্রাণীর নিঃসহায় শাবকগুলিকে অনেকে পরজীবী প্রাণীর দলে ফেলিতে চাহেন। খাঁটি প্রাণীতত্ত্বের দিক দিয়া লাভ ক্ষতির হিসাব করিতে বসিলে, ইতর স্তন্যপায়ীদিগের সন্তানগুলিতে পরজীবীর লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু যাঁহারা মানবশিশুকে পরজীবী বলিতে চাহেন, তাঁহাদের যুক্তি তর্কের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। জীবতত্ত্বের মানদণ্ড দিয়া মানবের সুখ দুঃখ আনন্দকে কখনই মাপা চলে না। জননী যখন হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ সন্তানের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন যে আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহাই বোধ হয় সেই দুগ্ধধারার ঋণ পরিশোধ করে। এই আনন্দ মানুষের মনগড়া কৃত্রিম আনন্দ নয়। যে আনন্দের সাগরে বিশ্বনাথ এই ব্রহ্মাণ্ডটীকে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন, পুত্রের স্বাস্থ্যে জননীর আনন্দ তাহারি অংশ। ইহা সহজ সংস্কারজাত অতি পবিত্র আনন্দ। বাহিরের বৈরিতার অন্তরালে তলায় তলায় প্রাণীতে উদ্ভিদে, জড়ে ও জীবে যে চিরন্তন সখ্যতা আছে, মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধকে সেই সখ্যতাই সরস করিয়া রাখিয়াছে। ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে মাতা ও সন্তানে, যে সে সম্বন্ধ নাই, তাহা কেহই বলিতে পারেন না; বরং থাকারই সম্ভাবনা অধিক। সুতরাং বিদেশীয় পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, আমরা শিশুকে কখনই পরজীবী বলিতে পারিব না।

সহযোগীতা ও পরজীবিতার পূর্ব্বোক্ত বিবরণগুলি আলোচনা করিয়া আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ একটা বৃহৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইঁহারা বলিতেছেন, উচ্চশ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহগুলি কোটি কোটি সহযোগী কোষেরই এক একটা বৃহৎ উপনিবেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পৃথক গুণসম্পন্ন কোষগুলি বহুকাল সহযোগীতা করিয়া এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে এখন একের অভাবে অপরগুলি টিকিয়া থাকিতে পারে না। বহুকালের সহযোগিতার এই প্রকার সম্বন্ধ অপর জীবের মধ্যেও দেখা যায়। যে সকল পিপীলিকা আপ্‌হাইড্‌ নামক কীট (পিপীলিকাধেনু) পালন করিয়া কীটদেহ নিঃসৃত রসপানে জীবন ধারণ করে, দীর্ঘ সহযোগিতায় তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা এ প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে এখন উহারা আপ্‌হইড্‌ কীটের সাহায্য ব্যতীত বাঁচে না এবং কীটগুলিও পিপীলিকার যত্ন ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারে না। সুতরাং জীবদেহকে যদি কতকগুলি সহযোগী কোষের সমষ্টি বলা যায়, তবে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। জীবনের অনেক কার্য্যে আজ কাল সহযোগিতার যে সকল পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটিকে পোষণই করিতেছে। রক্তের শ্বেত-কণিকা গুলির (White Corpuscles) কার্য্য প্রাচীন শরীরবিদ্‌গণ জানিতেন না। এমন দেখা গিয়াছে, অনিষ্টকর জীবাণু রক্তে আশ্রয় গ্রহণ করিলেই, ঐ শ্বেত-কণিকাগুলিই সেগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলে। তা'ছাড়া পিপ্‌টন্ (Peptones) হইতে আলবুমেনয়ডের (Albumenoids) উদ্ধার এবং ক্ষত-স্থানের আরোগ্যবিধান প্রভৃতি আরো অনেক কাজে শ্বেত-কণিকার সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শ্রীজগদানন্দ রায়।

শিমলায় মধুমক্ষিকা পালন।

(Bulletin No. 2 of 1910—Department of Agriculture, Punjab.)

মধুমক্ষিকার পালন করিতে দ্রব্যের আবশ্যক এবং এই সম্বন্ধে কতিপয় প্রয়োজনীয় কথার এস্থলে উল্লেখ আছে—

দ্রব্যাদি ঃ—

(ক) আটটি চাকবিশিষ্ট একটা কাঠের ফ্রেম—দাম ১০৲ টাকা।

(খ) এক ঝাঁক মৌমাছি, রাণী মক্ষিকা সমেত—দাম ৩৲ হইতে ৫৲ টাকা।

(গ) আচ্ছাদন করিবার বস্ত্র—দাম ।০ আনা।

(ঘ) চাক বাঁধিবার আদর্শ চাদর ৮টী—দাম ৬৲ টাকা।

এই দ্রব্য কোথায় পাওয়া যায়, শিমলাতে নিম্ন ঠিকানায় লিখিলে জানা যায় ঃ—The Secretray, Bee Keepers' Association, Simla.

(৬) ধোঁয়া দিবার যন্ত্র ভাল—দাম ৬৲ টাকা মাঝারি ৪৲ টাকা। এই যন্ত্র Messrs. Plomer & Co., Simla, এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত পুস্তকে মৌমাছি চাষ সম্বন্ধে খবর জানা যায়। প্রথম পুস্তকখানি সরল ভাষায় লিখিত, প্রায় সকল খবর ইহাতে আছে এবং খবরগুলি সঠিক।

১। "Modern Bee-keeping Hand-book for Cottagers" by T. W. Cowan. Price six pence.

২। "Bee keepers' Record" লণ্ডনের এক খানি মাসিকপত্র বার্ষিক মূল্য দুই শিলিং ছয় পেনী।

মৌমাছির আবাদ করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। শিমলাতে এপ্রিল, মে, মাসেই মৌমাছির চাষের উপযুক্ত সময়। মে মাসে তথায় মধু আহরণ হয় এবং সেই সময় তাহারা মাছি বেচে।

[দার্জ্জিলিঙ, শিলঙ প্রভৃতি স্থানে বোধ হয় ঐ সময় চাষ আরম্ভ হইতে পারে, কিন্তু নিম্নবঙ্গে বোধ হয় বসন্তকালই উপযুক্ত। কৃঃ সঃ।]

২। মাছির ঝাঁক কিনিয়া যতক্ষণ না তাহারা নূতন চাকে ঠিক হইয়া বসে ও কার্য্য আরম্ভ করে, ততক্ষণ দাম দেওয়া উচিত নহে, কারণ রাণী মক্ষিকা না থাকিলে কখন ঠিক হইয়া বসিবে না, বা কাজ করিবে না।

৩। প্রথমে একটী ফ্রেম লইয়া আরম্ভ করা ভাল। ছটা চাক বিশিষ্ট একটা ফ্রেমের জন্য তিন ঝাঁক মাছিই যথেষ্ট।

৪। মিঠাইয়ের দোকানের নিকট মৌমাছি পালন ভাল নহে, কারণ তাহা হইলে তাহারা মিষ্টান্ন হইতে মধু সংগ্রহ করিবে, ফুলের মধুর সন্ধান করিবে না। ফুলের মধুর তুলনায় এ মধু কিছুই নহে।

৫। কিম্বা চাকের নিকট চিনি, মিষ্টান্ন কিম্বা মধু রাখা উচিত নহে।

৬। চাকের ফ্রেমটির পায়ার তলায় জলের খুরা দেওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে অন্ত কীটাদিতে মধুমক্ষিকার অনিষ্ট করিতে পারে।

৭। চাকের চতুঃপার্শ্ব বেশ পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য।

৮। যখন ফুলের মধু পাওয়া না যায়, তখন মাছি রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের চিনির রস খাইতে দিতে হয়; কিন্তু বীট চিনির রস খাইতে দেওয়া বিধেয় নহে, বীট চিনির রস পান করিলে তাহাতে মাছির পেটের অসুখ হয়।

৯। চাকের নিকট জলপাত্র রাখা আবশ্যক এবং সেই জলপাত্রে কর্কের টুকরা ভাসাইয়া রাখিতে হয়। সেই কর্কের উপর মাছি আসিয়া বসে।

১০। চাকের ফ্রেমে এমন গর্ত্ত রাখিতে হইবে যে, যাহাতে এক একটি মৌমাছি পর পর প্রবেশ করিতে পারে। বড় বা অধিক ছিদ্র হইলে অনিষ্টকারী পোকা প্রবেশ করিতে পারে।

১১। ফ্রেমটি টেরা বাঁকা করিয়া বসান উচিত নহে, সমানভাবে না বসাইলে মধু আহরণের অসুবিধা হয়, এবং মৌমাছি পরিদর্শনের গোলযোগ ঘটে।

১২। মাছিগুলি দেখিবার সময় আচ্ছাদনটি আস্তে আস্তে সরাইতে হইবে। যদি মাছি বেশ সুখে আছে বুঝা যায়, তবে আচ্ছাদনটি সরাইয়া একে একে সাবধানে ফ্রেমগুলি উঠাইতে হয়। অধিক নাড়াচাড়া না পায়, এরূপ সতর্কভাবে ধীরে কাজ করিতে হয়। মাছিরা শীঘ্র তাহার প্রতিপালককে চিনিয়া লয় এবং বিশেষ খোঁচা খুঁচি না করিলে তাহাকে কামড়ায় না। যদি মাছিগুলি খুব চঞ্চল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবে একবার ধোঁয়া ছাড়িয়া দিলেই ঠাণ্ডা হয়। প্রথম যাঁহাদের ভয় করে, তাঁহারা একটি মুখাবরণ ও দস্তানা ব্যবহার করিতে পারেন এবং সঙ্গে ধোঁয়ার যন্ত্রটি রাখিবেন। পরে অভ্যস্থ হইলে আর এ গুলির আবশ্যক হইবে না।

১৩। মৌমাছিগুলিকে কদাচ খোঁচাখুঁচি করা উচিত নহে।

১৪। প্রত্যেক দিন চাকগুলি দেখা উচিত। কোন কিছু হইলে তখনি তাহার প্রতিকার করা বিধেয়। সর্ব্বদা খুলিতে হইবে না—দেখিলেই বুঝা যায় মাছিগুলি স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে কি না এবং নিরাপদে কাজ করিতেছে কি না।

গোলাজাত শস্যের পোকা।

(Leaflet No. 3 of 1910 Dept. of Agriculture, E. B & Assam.)

গত বৎসর ধুবড়ী প্রদর্শনীর জন্য কলাই সরিষা প্রভৃতি সংগ্রহ করা হইয়াছিল। প্রত্যেক শস্যের নমুনা কাঁচের বোতোলে রাখা হইয়াছিল এবং সেগুলি কাঁচের ছিপি দ্বারা বন্ধ করা হইয়াছিল, কিন্তু প্রদর্শণীর পর কীটতত্ত্ববিদ সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে শস্যগুলিতে পোকা ধরিয়াছে। এতদঞ্চলের সমুদয় জেলায় ঐ সকল পোকা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সরুই পোকা।—(Grain moth Caterpillar) ঘরে বা গোলাতে ধান গমাদি শস্য রাখিলে তাহাতে একপ্রকার পোকা লাগে তাহাকে সরুই পোকা বলে। ইহা এক রকম প্রজাপতি। ইহারা ধানের উপর ডিম পাড়ে; ডিম ফুটিয়া কীড়া হইলে ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং চাউল খাইয়া জীবন ধারণ করে। পরে ধানের ভিতর পুটলি হইয়া পুনরায় ছিদ্র করিয়া বাহির হয়। ইহারা যব ধান প্রভৃতি শস্য নষ্ট করে।

চেলে পোকা।—(Rice Weevil) ইহা কালরঙের এক জাতীয় পোকা। ইহাদের বাঁকান শুঁড় আছে। শুঁড় দিয়া কুরিয়া কুরিয়া চাউল খায়। গোলাজাত চাউল ধানের ইহা অতিশয় অনিষ্টকারী পোকা। ইহারা ভুট্টা, যব, গম, জোয়ার প্রভৃতি শস্যের অনিষ্ট করে।

মটর পোকা।—(Pulse Beetles) নানা জাতীয় কঠিণ পক্ষধারী পোকা কলাই শস্য আক্রমন করে। ঐ জাতীয় পোকা প্রায় সকল গুলিই এক রকম আকৃতি। ইহাদের ফুটকি ফুটকি দাগ, পৃষ্ঠদেশ গোল ও পাটল রঙের। ইহারা মুগ মাটিকলাই, খেসারি, মুশুরী, মটর, ছোলা প্রভৃতি শস্যে লাগে, বস্তুতঃ যাবতীয় কলাই শস্য ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাহারা ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং ভিতরের শস্য খাইয়া জীবণ ধারণ করে।

প্রতিকার ও উপায়।—

১। শস্য আহরণ করিয়া ভালরূপে রৌদ্রে শুকাইতে হইবে এবং পরে বায়ুবদ্ধ পাত্রে রাখিয়া দিতে হয়।

২। মধ্যে মধ্যে সঞ্চিত শস্য দেখিতে হয় যদি কোন দানায় ছিদ্র দেখা যায় তবে বুঝিতে হইবে যে তাহাতে পোকা লাগিয়াছে। কার্ব্বন বাই সালফাইডের ধোঁয়া দিলে পোকা মরে। বায়ুবদ্ধ বাক্সে বা অধিক শস্য হইলে কোন ঘরে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। আড়াই তোলা কার্ব্বন বাই সলফাইডে ১মণ বীজে ধোঁয়া দেওয়া চলে। বাইসলফাইডের ধোঁয়া ভারি বলিয়া উহা নিম্নস্থ বীজে প্রবেশ করিবে এবং পোকা নষ্ট করিবে।

ধোঁয়া দিবার পর ২৪ ঘণ্টা কাল বাক্স বা ঘর খুলিয়া রাখিতে হইবে এবং কার্ব্বন বাই সলফাইডের ধোঁয়া সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গেলে শস্য গুলি পুনরায় রৌদ্রে শুকাইয়া বায়ুবদ্ধ করিয়া রখিতে হইবে।

কার্ব্বন বাই সলফাইডের ধুম খুব দহনশীল সুতরাং তাহার নিকট কোন প্রকার আলো লইয়া গেলে বিশেষ বিপদের আশঙ্কা আছে। কলিকাতার বাজারে দুই টাকা সের মূল্যে উহা কিনিতে পাওয়া যায়।

রায়ত দিগের মধ্যে প্রচলিত উপায়।—

যে কোন বীজ তাহারা বালুকা কিম্বা পাঁশ মিশাইয়া রাখে। বালি কিম্বা পাঁশ স্তরে স্তরে মিশাইয়া রাখিলে এবং বীজের পাত্রের মুখটি বালি কিম্বা পাঁশ দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে পোকা পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে তাহারা রৌদ্র ও হাওয়া লাগাইয়া লয় এবং পুনরায় ঐ ভাবে বীজ রক্ষা করে। কেহ কেহ বীজ সহিত নিমপাতা মিশ্রিত করিয়া রাখে, নিম পাতার গন্ধ বা তাহার তিক্ত স্বাদ পোকাদের প্রীতিকর নহে। সাধারণতঃ চাষীরা মাটির কলসিতে বীজ রাখে।

[আমরা ন্যাপথালিনের গুঁড়া দিয়া বীজ রাখিয়া দেখিয়াছি তাহাতে সহজে পোকা লাগে না। যে ঘরে বা আলমারিতে বীজ রাখা যায় বর্ষাকালে বায়ু শুষ্ক রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে ন্যাকড়ার পুটুলি করিয়া গুড়া চুণ রাখা ভাল। আর্দ্র বাতাসে পোকা সহজে জন্মে।] কৃঃ সঃ

রামকৃষ্ণপুরের চাউলের কাজ।

কলিকাতা ও কলিকাতার সন্নিহিত চেতলা ও রামকৃষ্ণপুরে ধান চাউল বিক্রয়। চেতলায় চাউল অপেক্ষা ধান অধিক আমদানী হয়। চেতলায় রেঙ্গুন চাউলের ও দক্ষিণ দেশের আতপ চাউলের আমদানী অধিক। কলিকাতার মধ্যে বেলেঘাটায় বালাম চাউল এবং গঙ্গাধারে কুলপী ঘাটে দেশী ও রেঙ্গুন চাউল সমধিক পরিমাণে আসিয়া থাকে। এই সমস্ত স্থান অপেক্ষা রামকৃষ্ণপুরে চাউলের কারবার খুব বড়। এখানে ই, আই, আর, বেঙ্গল নাগপুর রেল যোগে ও গঙ্গায় কিস্তি ও জাহাজে চাউল আমদানীর সুবিধা আছে।

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদিগের নিকট একপ্রকার ভারতের ম্যাপ আছে। তাহাতে কোন্ জেলায় কোন্ কোন্ স্থানে কি কি দ্রব্য বেশী পাওয়া যায়, তাহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রঙ দিয়া দেখান হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই চাউল পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বঙ্গের প্রত্যেক মঠেই ধান্ত রোপিত হয়। অতএব চাউলের মোকাম বঙ্গের সর্ব্বত্রই। যখন বঙ্গের সর্ব্বত্রই চাউল পাওয়া যায়, তখন কত মোকামের নাম করিব? এই সমুদয় মোকামগুলিকে আমরা রেলের লাইন ধরিয়া মোটামুটি একটা এই বুঝি যে, বেঙ্গল নাগপুর লাইনের চাউলকে "কাজলা" সাটের চাউল বা কটকী সাটের চাউল বলা হয়। ইহার মধ্যে জলেশ্বর, বালেশ্বর, ময়ুরভঞ্জ, ভদ্রক, সোরো, কটক, জট্নি ইত্যাদি স্থান হইতে অধিক চাউল আইসে। তৎপরে লুপলাইনের চাউলকে "রাঢ়ী" চাউল বলা হয়। ইহার মধ্যে বর্দ্ধমান, বোলপুর, সিউড়ী, রামপুরহাট প্রভৃতি স্থান হইতে এই চাউল অধিক আমদানী হয়। সিয়ালদহ রেলের চাউলকে "পূরবী" (অর্থাৎ পূর্ব্বদেশের) চাউল বলা হয়; রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থান হইতে পূরবী চাউল আইসে। এই সমুদয় চাউল রামকৃষ্ণপুরে আনীত হইয়া জাহাজে বিক্রীত হয়। ইহার ভিতর রাঢ়ী ও পূরবী চাউলের কাজই রামকৃষ্ণপুরে বেশী। বেঙ্গল-নাগপুর রেলের চাউল যথেষ্ট আইসে বটে, কিন্তু ইহা কমদরের চাউল বলিয়া ইহা ফলনে তত বেশী নহে। তবে যেমন ফলন, সেই মত কাট্তি। কোন জাহাজে যদি ৯৬ হাজার বস্তা চাউল রপ্তানী হয়, তন্মধ্যে পূরবী, রাঢ়ী এবং অন্যান্য দেশী চাউল যাইবে ৭৬ হাজার বস্তা, এবং কটকী সাটের যাইবে ২০ হাজার বস্তা। ঐ সকল স্থানের যে কোন স্থানে মোকাম করিয়া চাউল আনিয়া রামকৃষ্ণপুরে বিক্রয় করিলে তাহাকে "কোরার কাজ" বলা হয়। কোরার কাজ ভিন্ন রামকৃষ্ণপুরে আরও দ্বিবিধ চাউলের কাজ আছে; ছাটা ও বিলি।

বিলির কাজ,—একাজ কেবল বঙ্গদেশের লোকে করে। মঙ্গলঘাট পরগণার লোকের হস্তেই একাজ একচেটিয়া বলিলে হয়। হাওড়া এবং হুগলী জেলার মধ্যেই ইহাদের অনেকের বাস। ইহারা মগ্রাহাট প্রভৃতি স্থান হইতে ধান্ত ক্রয় করিয়া কিস্তি বোঝাই করিয়া স্ব স্ব গ্রামে লইয়া যায়। ধান্ত ধারে ক্রয় করে। এই ধান্ত স্বগ্রামের দুঃখী স্ত্রীলোকদিগকে দুই মণ, দশ মণ হিসাবে বিলি করে। তাহারা ধান সিদ্ধ করিয়া চাউল করিয়া দেয় এবং মজুরী পায়। এই কাজকে উহারা বাণীর কাজ বলে। বাণীওয়ালা ব্যাপারী চাউল পাইয়া, তাহা তথাকার অন্য কিস্তিওয়ালাকে বিক্রয় করে। এই সকল কিস্তিওয়ালা সেই চাউল আনিয়া রামকৃষ্ণপুরে আড়তদারদিগকে দেয়। ইহাদের কাজকে "হেটো" কাজ বলে। অর্থাৎ ইহারা হাট হইতে বাণীর চাউল ক্রয় করিয়া আনিয়া আড়তদারকে দেয়। আড়তদারের নিকট ইহারা দাদন লয়। যাহার যত মণ কিস্তি, তাহাকে তত টাকা দাদন দিবার নিয়ম। বাণীওয়ালারাও দাদন লয়। দাদন লয় না, এরূপ ব্যাপারী রামকৃষ্ণপুরে নাই বলিলেই হয়। বাণীওয়ালারা ইহাদের মধ্যে ধনবান্। কিস্তি ইহাদের বড় জোর মাসে দুই খানা আসে। কিন্তু "হেটো" কিস্তি ৫।৭ দিন অন্তর ক্ষেপ দেয়। ক্ষেপ বেশী হইলেই আড়তদারের সুবিধা। অনেকের বাণী ও হেটো দুই কাজই আছে। ইহাদের চাউলকে দেশী চাউল বলে। বাঁকতুলসী, সরবতি, পেশু, নাগরা ইত্যাদি এই শ্রেণীর চাউলের নাম। দুই এক বৎসর পূর্ব্বে রামকৃষ্ণপুর হইতে ইহারা ধান্ত ক্রয় করিত। এক্ষণে ধান্তের কাজ এস্থানে কমিয়াছে।

ইহারা এখন মগরাঘাট প্রভৃতি স্থান হইতে ধান্য ক্রয় করিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়া তথায় বাণীতে দিয়া চাউল করিয়া রামকৃষ্ণপুরে আনিয়া সেই চাউল বিক্রয় করেন। ইহাদের চাউল কাঁটায় বিক্রয় হয়। লাখোদা, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি গ্রাহকেরা এই চাউল লইয়া মরিশস্ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে জাহাজে চালান দেন। এ চাউল কলিকাতার মুদী গ্রাহকেও লইয়া থাকে। ইহাদের যেমন দাদন আছে, তেমনিই অনেক বাবে ইহাদের খরচা আছে, আড়ত এক আনা (মুদী গ্রাহক লইলে), কাঁটায় বিক্রয় হইলে আড়ত ৵১০ অর্দ্ধ আনা। কাঁটায় বা বাজারে, আড়তদারেরা অধিক লয়েন, এজন্য আড়ত কম। কটকী, রাঢ়ী এবং পুরবী চাউলের আড়ত ৵১০ দুই পয়সা। টাকা অগ্রিম লইলে ৵১৫ আড়ত, অথবা ৵১০ পয়সা আড়ত দিলে, টাকায় ব্যাজ দিতে হয়। ব্যাজের সেরেস্তা শতকরা মাসিক এক টাকা।

তাম্রেরখনি।—বারণ কোম্পানী সিকিম প্রদেশে তাম্রের খনি হইতে উৎকৃষ্ট তামা প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনেকেরই ধারণা এই হিমালয়ের পাদদেশে লৌহ, তাম্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি আছে; খনি বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ চেষ্টা করিলেই এই সকল আবিষ্কার করিতে পারেন এবং নুতন নূতন কোম্পানী গঠিত হইলে প্রচুর পরিমাণে ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। নেপালে খুব উৎকৃষ্ট তাম্র পাওয়া যায়। সে তাম্র জাপানের তাম্র হইতে উৎকৃষ্ট। নেপালে যাইয়া এই সকল খনি হইতে তাম্র উদ্ধার করিলে দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে পারে। মধ্য ভারতবর্ষে লৌহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; সেখানে এই সকল পদার্থ তুলিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য এক কোম্পানী ও গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে নানাপ্রকার ধাতু লুক্কায়িত আছে। কেবল উদ্যমের অভাবে তাহা অন্ধকারেই রহিল। বর্ত্তমানে অনেক লোকের খনিজ বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক। তাঁহারা আসিয়া যদি কোথায় কোন ধাতুর খনি আছে তাহা পরীক্ষা করেন এবং দেশের ধনীগণ যদি অর্থ দ্বারা সাহায্য করেন তবে দেশের ভাণ্ডার ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হইতে পারে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

পৌষ—ডিসেম্বর মাস।

সব্জী বাগান।—বিলাতি শাক-সব্জী বীজবপনকার্য্য গত মাসেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন উদ্যানপালক এমাসেও পারস্লী (Parsley) বপন করিয়া সফলকাম হইয়াছে। কেবল বীজ বোনা কেন, কপি প্রভৃতি চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহাদেরে গোড়ায় মাটি দেওয়া ও আবশ্যক মত জল দিবার জন্য মালিকের সতর্ক থাকিতে হইবে। সালগম, গাজর, বীট, ওলকপি প্রভৃতি মূলজ ফসল যদি ঘন হইয়া থাকে, তবে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেত্র পাতলা করিয়া দিতে হইবে। আগে বসান জলদি জাতীয় কপির গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হইবে। ইহাতে কপি বড় হয়।

কৃষি-ক্ষেত্র।—আলুর গাছে মাটি দিয়া গোড়া আর একবার বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটনাই আলুর ফসল প্রায় তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। এই সময় কিন্তু ফসল কোদালি দ্বারা উঠাইয়া না ফেলিয়া যতদিন গাছ বাঁচিয়াথাকে ততদিন অপেক্ষা করা ভাল। ইতিমধ্যে নিড়ানি দ্বারা খুঁড়িয়া কতক পরিমাণ আলু খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে ঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাতে মটরের মত আলু গুলি রাখিয়া বাকি গুলি তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। আলু তুলিয়া পরে গোড়া বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে গাছ গুলি পুনরায় সতেজে বাড়িতে থাকে। আলু ক্ষেত্রে এমাসে দুই একবার আবশ্যক মত জল দেওয়া আবশ্যক। মটর, মসুর, মুগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষ কোন পাইট নাই। টেঁপারি ক্ষেতেও জল দেওয়া এই সময় আবশ্যক।

তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুন, চৈতে শসা, লাউ, কুমড়া ও উচ্ছে চাষের এই উপযুক্ত সময়।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

পৌষ, ১৩১৭।

সুলভে সেগুণ কাষ্ঠের ফার্ণিচার ও ইমারতি গড়ন প্রভৃতি।



আমরা মৌলমিন্ হইতে উৎকৃষ্ট সেগুণ কাষ্ঠ আমদানী করিয়া মফঃস্বলের গ্রাহক-বর্গকে সর্ব্বপ্রকার আল-মারী, টেবিল, চেয়ার, পানিল, খড়খড়ি, সার্সী প্রভৃতি অর্ডার মত প্রস্তুত করাইয়া অতি সামান্য মুনফা রাখিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। করোগেট আয়রণ, ষ্টীল জয়েষ্ট, টী আয়রণ, বোল্টনাট, বেড়ার কাঁটাওয়ালা তার প্রভৃতি এবং ফার্ণিচার ও ইমারতি গড়নের জন্য কল, কব্জা, ছিটকিনি, বল্ট, পরকলা, রঙ্গ প্রভৃতি আমাদিগের নিকট উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট অফিসার, মিউনিসিপালিটী ও অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আমাদিগের ফার্ম্ম হইতে সর্ব্বদাই দ্রব্যাদি লইয়া থাকেন। ঠিক জিনিষ উচিত মূল্য, প্রতারিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

বিস্তারিত বিবরণসহ জিনিষের লিষ্ট পাঠাইলে দর দিয়া থাকি : পত্র লিখিলে আমাদিগের সচিত্র ইংরাজী ক্যাটালগ (মূল্য নিরূপণ তালিকা) বিনা মূল্যে পাঠাইয়া থাকি ; পরীক্ষা প্রার্থনীয়।---

এ, টী, দে এণ্ড কোং।

১৬১।১৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা।

স্ত্রী পুরুষের রজঃ ও শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় দোষ ও তজ্জনিত ব্যাধিসমূহ নির্ম্মূল করণক্ষম এবং স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চারক। মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা এক টাকা মাত্র।

যিনি আমার নিম্নলিখিত ঠিকানায় আপনার নাম ধাম পাঠাইবেন, তাঁহাকে কলিকাতা পুলিশ কোর্টের মোকদ্দমা হইতে নির্ম্মুক্ত ও উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া পরিগণিত

কামশাস্ত্র

নামক একখানি উপযোগী পুস্তক বিনামূল্যে বিনা ডাকমাশুলে পাঠান যাইবে।

কবিরাজ শ্রীমনিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজুমদার এণ্ড কোং।

পেণ্টস্ ফটোগ্রাফার্স আর্টিষ্টস্ এণ্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

২২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আমাদের কারখানায় থিয়েটারের ষ্টেজ সম্বন্ধীয় সকল প্রকার সিন্ ডপসিন্ প্রভৃতি এবং সকল প্রকার অয়েল পেণ্টিং প্রতিমূর্ত্তি সুচারুরূপে অল্পমূল্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গ-দেশীয় অধিকাংশ রাজা, জমিদার প্রভৃতি মহোদয়-গণের বাড়ীর কার্য্যই আমাদের প্রমাণ। সিনের মূল্য তালিকার জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন। আর সকল প্রকার দেশী বোম্বাই ছবি ও ফটো বাঁধাই এবং বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ম্যানেজার,

শ্রীবরদাপ্রসন্ন মজুমদার।

কিং এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

৮৩, হ্যারিসন রোড.

ব্রাঞ্চ---৪৫, ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের জন্য উপরোক্ত ঠিকানায় লিখুন।

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



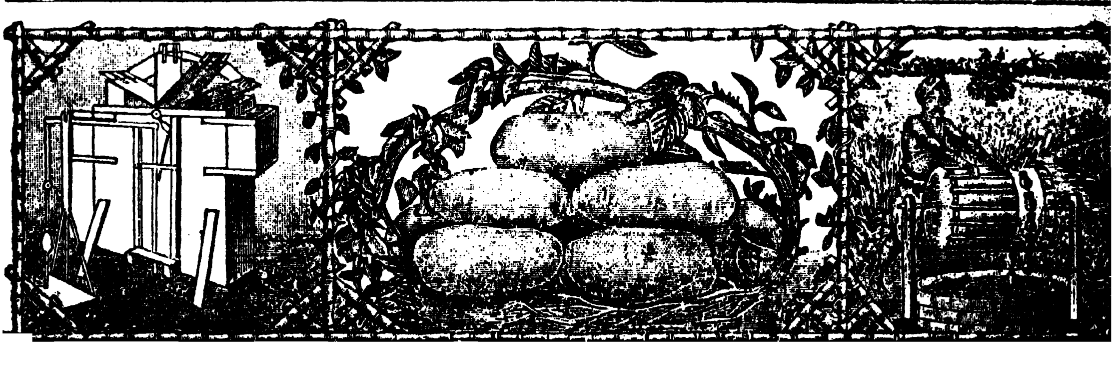
একাদশ খণ্ড,—৯ম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

পৌষ, ১৩১৭।

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদিত।



কৃষক।

সূচী পত্র।

পৌষ, ১৩১৭ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

KEATING'S

INSECT POWDER.

কিটিংসের কীটনাশক মহৌষধ।



অনেক কষ্টে গাছ প্রস্তুত হইয়া উঠিলেও তাহার পরে গাছের অনেক বিপদ হয়। গাছের গোড়ায় পিপীলিকা ও একপ্রকার পোকা হইয়া গাছ নষ্ট করিয়া ফেলে, তখন অতিশয় মনস্তাপ হয়। বেগুন গাছে পোকা ও পিপীলিকা হইয়া গাছের মূল কাটিয়া দেয়। কখন কখনও বীজ বপন করিলে পিপীলিকা শ্রেণী সেই বীজ বহন করিয়া লইয়া যাইয়া নিজেদের গর্ত্তে প্রবেশ করে, সুতরাং বীজ হইতে চারা হইতে পারে না। যাঁহাদের কৃষিকার্য্যে সখ আছে তাঁহারা যেন সর্ব্বদাই এই দ্রব্য নিকটে রাখেন, তাহা হইলে এ মনোকষ্ট সহ্য করিতে হইবে না। বিলাতে টমাস কিটিং নামক জনৈক রসায়নবিদ্ এক প্রকার পাউডার প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা সমগ্র ভারতে "Keating's Insect Powder" বা কিটিংসের কীট নাশক ঔষধ বলিয়া বিখ্যাত। ইহা দ্বারা সমস্ত প্রকার কীট, পিপীলিকা, উই মরিয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত ঔষধ।

মূল্য ১ কৌটা ॥৵০ আনা, মাঝারী ।৵০ আনা, নমুনা কৌটা ।০ আনা।

কলিকাতা

মেসার্স বিহারীলাল দাঁ কোম্পানী—ভারতের এজেণ্টস্।

৫২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে ক্রয় করিতে পারিবেন।

ইহা দ্বারা ছারপোকাও মরিবে।—পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ খণ্ড। | পৌষ, ১৩১৭ সাল। | ৯ম সংখ্যা।

খাসিয়া পাহাড়ে কমলার চাষ

(Orange Cultivation in the Khasia Hills.)

শ্রীকৃষ্ণমোহন রায় লিখিত।

খাসিয়া পাহাড়ের নিম্নস্থিত শ্রীহট্ট জেলার সীমান্তবর্ত্তী নিতান্ত অপ্রশস্থ ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডই কমলা লেবু চাষের কেন্দ্রস্থল। এই স্থানটী পূর্ব্বে "নংজিরি" হইতে পশ্চিমে "মাউডন" পর্য্যন্ত প্রায় কুড়ি বর্গ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। তথা হইতে কমলা লেবু চাষের কার্য্য আরম্ভ হইয়া সমুদ্র হইতে প্রায় ১৫০০ ফুট উচ্চ শৈলমালার উপরিভাগ পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই শৈল শ্রেণীর অনতিদূরেই চেরাপুঞ্জীর ৪৪৫৫ ফুট উচ্চ অধিত্যকা ভূমি বিদ্যমান। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য চেরাপুঞ্জী পৃথিবীর মধ্যেই বিখ্যাত। খাসিয়া পাহাড় জেলায় অন্যান্য স্থানেও প্রচুর পরিমাণে কমলা লেবুর চাষ হইয়া থাকে। শিলং সহরের অধীনেও প্রায় ৫০০০ ফুট উচ্চ ভূমিতে কমলা বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চ ভূমি অপেক্ষা পাহাড়ের নিম্নপ্রদেশ অত্যধিক কুয়াশাচ্ছাদিত। সুনির্ম্মল জলবায়ুর মধ্যেই কমলা লেবু প্রচুর পরিমাণে ফলিয়া থাকে। উচ্চ ভূমিতে উৎপন্ন বৃক্ষে কমলা ফলিতে বিলম্ব হয় ও কমলা গুলিও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হইতে দেখা যায়।

২। খাসিয়া পাহাড়ে উৎকৃষ্ট কমলা চাষের উপযুক্ত স্থান প্রায় একশত বর্গ মাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইবে। ইহার অধিকাংশই অন্যবিধ চাষাদি কার্য্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এই সামান্য ভূমিখণ্ড হইতে সমগ্র আসামে, বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অধিকাংশ স্থলে কমলা লেবু রপ্তানি হইয়া থাকে। খাসিয়া পাহাড়ের অধিবাসী-গণ বাঙ্গালার বাজারে কমলা লেবুর ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে খাসিয়া পাহাড়ই কমলার উৎপত্তি স্থান হইলেও শ্রীহট্ট নিকটবর্ত্তী স্থল বলিয়া বঙ্গদেশীয় লোকের নিকট "শ্রীহট্টের কমলা" বলিয়াই প্রসিদ্ধ। প্রধানতঃ শ্রীহট্টবাসীই, সর্ব্বদা বিভিন্ন প্রদেশের লোকের কমলার কারবার চালাইয়া আসিতেছে। শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত "ছাতক" নামক স্থান হইতেই, বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবসায়ী-গণ, কমলা লেবু রপ্তানি করিয়া থাকে।

৩। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের ভূমিকম্পে বহুসংখ্যক কমলার বাগান বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ

সকল বাগান বর্ত্তমানে পার্ব্বত্য নদীর চরভূমি রূপে পরিণত হইয়া বর্ষার স্রোতবিক্ষিপ্ত পলিমাটি হইতে উৎপাদিকা শক্তি গ্রহণ করিতেছে। উল্লিখিত ভূমিকম্পের পর হইতে খাসিয়াগণ পাহাড়ের পার্শ্বদেশে কমলা লেবুর চাষ করিয়া থাকে।

৪। খাসিয়া পাহাড়স্থিত কমলা বাগানে কোন কোন স্থলে পান, সুপারি, গোল. আলু, তেজপত্র প্রভৃতি বহুবিধ কৃষিজাত দ্রব্যাদিও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এই সকল স্থানে, বর্ত্তমান সময় গোলমরিচ, কাফি, এরারুট প্রভৃতির চাষও আরম্ভ হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড দ্বারা বর্ষার জল আবদ্ধ থাকায় চুনা মিশ্রিত জমিতে উৎকৃষ্ট কমলা জন্মে। টারনার (Tyrna) চুনা ভূমিতে উৎপন্ন কমলা, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়। ডাক্তার বোনাভিয়া (Dr. Bonavia) পরীক্ষার দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, খাসিয়া পাহাড়ের মাটীতে দশমিক ১৯ অংশ চুনা আছে।

৫। খাসিয়া পাহাড়ের কমলার মধ্যে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন গাছের ফলের খোসা পুরু—আবার কোন কোনও গাছের খোসা অপেক্ষাকৃত পাতলা, এবং শাঁস অত্যন্ত রসাল। শেষোক্ত কমলা গুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু এই গুলি দীর্ঘকাল রাখার পক্ষে উপযোগী নহে। কাজেই ইহার অতি অল্প সংখ্যা বিদেশে নীত হইয়া থাকে। কলিকাতা প্রভৃতি দূরস্থানে, এই জাতীয় কমলা রপ্তানি করা কঠিন।

৬। খাসিয়া পাহাড়ে সাধারণতঃই কমলার গাছ, বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, কারণ তথাকার লোক কলম করিবার প্রণালী অদ্যাপিও অবগত নহে। তাহারা অতি সতর্কতার সহিত ভাল ভাল গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ করে। কমলা গুলি সম্যক পাকিলে, তুলিয়া আনা হয়; তৎপর ঐ কমলার শাঁস হইতে বীজগুলি বাহির করতঃ জলে ভিজাইয়া, যে গুলি জলে ডুবিয়া যায়, সেইগুলি রাখিয়া, অন্যগুলি পরিত্যাগ করে। এইরূপ পরীক্ষিত বীজগুলি জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, ৩।৪ দিন রৌদ্রে শুকাইয়া লয়, এবং ইহার কিছুদিন পরে, বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিবার নিয়ম অবলম্বন করে। ডিসেম্বর কিম্বা জানুয়ারী মাসই ইহার উপযুক্ত সময়। এই সময়ে সাময়িক কাজের উপযোগী বাঁশের মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তদুপরি মাটী চূর্ণ বিছাইয়া দেয় এবং তন্মধ্যে পাতলা পাতলা করিয়া বীজগুলি বপন করে। তাহা প্রত্যহ কলাপাতার দ্বারা আবৃত রাখিয়া (বীজগুলি অঙ্কুরিত না হওয়া পর্য্যন্ত) প্রতি সন্ধ্যায় জল সিঞ্চন দ্বারা ঐ মাটী সিক্ত করিয়া দেয়। প্রায় পনর হইতে একুশ দিনের মধ্যে বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়। ঐ চারা গুলি মে কি জুন মাস পর্য্যন্ত তদবস্থায় রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করার পূর্ব্বে, অন্য একটী স্থানে (নর্শরীতে) কিছুকাল লইয়া রাখে। নর্শরী সাধারণতঃ ছায়াযুক্ত স্থানেই নির্ম্মিত হয়। নর্শরীতে চারাগুলি পরস্পর প্রায় নয় ইঞ্চি অন্তর রোপণ করে। তথায় মাঝে মাঝে কেবল জঙ্গল পরিষ্কার করা ব্যতীত অন্য কোনরূপ যত্ন অথবা সতর্কতার প্রয়োজন হয় না। নর্শরীতে দুই তিন বৎসর কাল রাখিয়া, পরে উপযুক্ত স্থানে, রীতিমত রোপণ করে। রোপণের সময় মে ও জুন মাস প্রশস্ত। গর্ত্ত খনন করিয়া, ক্রমে হেলান ভাবে চারাগুলি রোপণ করিতে হয়। কোন রকম সার দেওয়ার প্রয়োজন করে না। চারা রোপণেরও কোন নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব নাই। প্রস্তরপূর্ণ ভূমিতে এই নিয়ম সংরক্ষণ করাও অসম্ভব, তবে

সাধারণতঃ আট কিম্বা দশ ফুট অন্তর এক একটী চারা রোপণ করা হয়। তথায় দুই তিন বৎসর চারাগুলি ছায়াতে রাখিবার উদ্দেশ্যে কদলী বৃক্ষ প্রভৃতি রোপণ করিবারও ব্যবস্থা আছে।

৭। খাসিয়া পাহাড়ে, উল্লিখিত নিয়মে উৎপন্ন চারাগুলি কদাচিৎ অকর্ম্মণ্য বা অনুৎকৃষ্ট ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। খাসিয়াদিগের নিকটে ঐ কমলা গুলি নানা নামে অভিহিত হয়। উৎকৃষ্টগুলি Usoh Niamtra (উছ অর্থ ফল—নিয়ান্ত্রা জাতি বিশেষ) নামে কথিত। Usoh Siem "উছ ছিম্" এবং Usoh Mangniang "উছ মাঙ্গনিয়াঙ্গ" নামে অভিহিত আরও দুই জাতীয় কমলা আছে। এই দুই জাতীয় কমলার মধ্যে প্রথমটীর আকার ক্ষুদ্র, খোসা শক্ত এবং শাঁস অত্যন্ত তিক্ত। "উছ মাঙ্গনিয়াঙ্গ" আকার সাধারণতঃ কমলার ন্যায়, কিন্তু খোসা ভারি এবং তিক্ত। অন্য এক জাতীয় কমলা Usoh Moyridong "উছ মাইরিডঙ্গ বলিয়া কথিত--তাহাও প্রায় পূর্ব্বানুরূপ। ক্ষুদ্রাকৃতি উছছিম" জাতীয় কমলা "Prince of fruits" বলিয়া অভিহিত হয়। এই জাতীয় কমলা অনুৎ-কৃষ্ট হইলেও দেখিতে বড়ই সুন্দর। কাজেই "ফলরাজ" বলিয়া বাঙ্গলা ভাষায়ও উপাধী লাভ করিবার সুযোগ লইয়া বসিয়াছে।

৮। প্রতি বৎসরই খাসিয়াগণ শীতের প্রারম্ভেই সাধারণতঃ কমলা বাগানের জঙ্গল পরি-ষ্কার করে। মাত্র বড় বড় কয়েকটী গাছ রাখিয়া অন্যান্য গাছগুলি ছাঁটিয়া দেয়। মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভে যখন বৃষ্টি পড়িতে থাকে, তখন ঘাস ও অন্যান্য আগাছাগুলি বাছিয়া তুলিয়া ফেলে। এতদ্ব্যতীত আর বেশী কিছু করিতে হয় না। অন্য কোনরূপ চাষেরও আবশ্যক করে না। তবে আবার মে ও অক্টোবর মাসে জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হয়। যে সমস্ত বাগানের মুখ উত্তরদিকে, তাহাতে রৌদ্র কম লাগে এবং সেই জন্য ফল বিলম্বে পক্ক হয় এবং গাছেও দীর্ঘকাল থাকে। কিন্তু দক্ষিণ মুখ বাগানের ফল যত মিষ্ট হয়, এগুলি তেমন হয় না। ফল বিলম্বে পক্ক হওয়া লাভজনক বটে, তাহাতে মূল্যও অধিক দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বাগান প্রস্তুতের সময় কদাচিৎ এই বিষয় বিবেচনা করা হয়।

৯। বৃষ্টির সময় শেষ হইলে, ঐ সমস্ত গাছের নীচে হইতে বড় বড় শিকড় বাহির হয়। ঐ শিকড়গুলি গাছের মুল অপেক্ষা অনেক শক্ত ও বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং প্রধান মূলটী ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়। দুই তিন বৎসর পরে মূল ও অন্যান্য শিকড়গুলি কাটিয়া দেওয়া হয়, এবং কেবল মাত্র প্রধান শিকড়গুলি যত্নের সহিত রক্ষিত হয়। তদবস্থায় গাছগুলি অনেক সময় বহুদূর ব্যাপিয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া থাকে। উহাদিগকে ছাঁটিয়া দেওয়া প্রয়োজন করে না। ফল পড়িবার সময়, সুধু শুষ্ক ডালগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। প্রতি বৎসরই কমলা বৃক্ষ, পোকায় কিছু না কিছু অনিষ্ট করে, কিন্তু ইহাও দূর করিবার জন্য খাসিয়াদিগের যথেষ্ট যত্ন থাকে। চারা রোপণ করার আট দশ বৎসর মধ্যেই কমলা ধরিতে আরম্ভ হয়। অপেক্ষাকৃত খারাপ স্থলে ফল ধরিতে বার কি ততোধিক বৎসরকাল অতি-বাহিত হইতে দেখা যায়।

আকন্দ গাছ।

[শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত।]

শুনিয়াছি যে সেকালে জীব জন্তুরা কথা কহিতে পারিত। বিহঙ্গম বিহঙ্গমী, বিশেষতঃ শুকসারী, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ দেখিত। আরব্য উপন্যাসের সওদাগর, ঘোড়া ও গাধার কথা বার্ত্তা শুনিয়া ঘোড়ার দণ্ড করিয়াছিল। গজনির সুলতান মামুদের উজির, পেচকের কথা শুনিয়া বাদশাহকে ভর্ৎসনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই গেল পশুর পক্ষীর কথা। গাছ পালারাও কি কথা বলিতে পারে? তাহারা নিজে নাই পারুক, তাহাদের হইয়া আমি দুইটা কথা বলিতে পারি। তবে বিষ্ণু শর্ম্মা অপেক্ষা এক কাটি সরস হইতে আমি ইচ্ছা করি না।

আমি এখন যে স্থানে থাকি, তাহার নিকটে অনেক ধান ক্ষেত আছে। ধানক্ষেত্র নিম্ন ভূমিতে হয়। একটী ক্ষেত্রের উপরে সামান্য একটু কঙ্কর ও বালুকাময় উচ্চ স্থান আছে। তাহাতে এক আকন্দ গাছ নধর শাখাপল্লব ছাড়িয়া সতেজে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

আশ্বিন মাস—ধানে থোড় হইয়াছে—রাত্রি দুই প্রহর—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন--নিবিড় অন্ধকার, পৃথিবী নীরব—কেবল দূরে মাঝে মাঝে এক আধবার শৃগালের কোলাহল হইতেছে—কেবল যুথচ্যুত বাদুড় শন শন শব্দে উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে—ঘাসের ভিতর একটী ঝিঁ ঝিঁ পোকা একাধারে গান করিয়া তাহার সহধর্ম্মিণীকে ডাকিতেছে।

সেই সময় নিকটের এক ধান গাছ আকন্দর প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবজ্ঞা স্বরে বলিল,—"দেখ, আকন্দ গাছ, জগতের আমরা কত উপকার করি! অল্প দিন পরে আমাদের ফুল ও ফল হইবে, সেই ফল খাইয়া কোটি কোটি মানুষ জীবন ধারণ করে। আমাদের মৃতদেহও গো জাতি সাদরে ভক্ষণ করে। কিন্তু তোমাদের জন্ম বৃথা। তোমাদের দ্বারা বিশেষ কাহারও উপকার হয় না। ছি ছি! এমন অকর্ম্মণ্য জীবনে প্রয়োজন কি?"

সে রাত্রি আকন্দ কোন উত্তর করিল না। কিছু দিন পরে, গভীর রাত্রিতে ঠিক সেই সময়ে আকন্দ বলিল,—"সে দিন তুমি আমাকে চ্যাটাং চ্যাটাং গোটা কত কথা বলিয়া ছিলে। রাগে আমার সর্ব্ব শরীর প্রজ্বলিত হইয়াছিল। কিন্তু আমি চুপ করিয়াছিলাম। কারণ তুমি, ও যব, ও গম, এ সব ঘাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। মনে করিলাম যে,—নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে। কিন্তু আর শুনিয়াছ,—আমার নাম গেজেটে ছাপা হইয়াছে"।

বিস্মিত হইয়া ধান্য জিজ্ঞাসা করিল,—"গেজেটে ছাপা হইয়াছে! কেন?"

আকন্দ বলিল,—"এই বঙ্গ দেশে ডাক্তার চন্দ্র নামে এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। উইলে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, ঔষধাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যে লোক নূতন কিছু বাহির করিতে পারিবে সে পুরস্কার পাইবে। এ বৎসর আমার বিষয়ে পুরস্কার পদক হইবে। তবেই বুঝিয়া দেখ যে শর্ম্মা সামান্য ব্যক্তি নহেন।"

ধান গাছ বলিল,—"বটে!"

আকন্দ বলিল,—"আমি সামান্য বক্তি নই। তুমি অবোধ, না বুঝিয়া সে দিন তুমি আমার নিন্দা

করিয়াছিলে। সে জন্য আমার বিষয়ে তোমাকে লেক্‌চার দিব। একদিনে হইবে না। ক্রমে ক্রমে তোমাকে আমার পরিচয় সংক্ষেপে প্রদান করিব। মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিবে।”

আকন্দ বলিতে লাগিল,—সাধু ভাষায় আমার নাম অর্ক, যাহার মানে সূর্য্য। এই পৃথিবীতে আমি সূর্য্যের অবতার। আমার আরও অনেক নাম আছে, যথা—সদাপুষ্প, গণরূপ, ক্ষীরদল, খর্জ্জুর, ইত্যাদি। বাঙ্গলা ভাষায় আমাকে আকন্দ আক বা আকন বলে, হিন্দিতে মাদার, তেলুগু ভাষায়, ইয়েক্কা, তামিল ভাষায় জিল্লেড়ু ; মারহাটী, আকাদো ; গুজরাটি, বিক্ক এলোষা, ইত্যাদি। আমারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করি। হিমালয় পর্ব্বতে দুই হাজার হাত উচ্চতা পর্য্যন্ত আমরা উঠিতে পারি। তাহার উপর আমাদের শীত করে সে জন্য তাহার উপর আমরা যাই না।

তোমরা যেরূপ মনুষ্যের দাস ও পরমুখাপেক্ষী হইয়াছ আমরা সে রূপ নই। ভাল ভূমি না হইলে তোমাদের চলে না। তোমাদের জন্য ভূমিকর্ষণ করিতে হয়, তাহাতে সার দিতে হয়, সাবধানে তোমাদিগকে বপন অথবা রোপণ করিতে হয়, তোমাদের আশ-পাশ হইতে ঘাস ও আগাছা বাছিয়া ফেলিতে হয়, তোমাদের মূলে জল না থাকিলে জল সেচন করিতে হয়। এত কাণ্ড করিয়া মানুষ তোমাদিগকে জীবিত রাখে। তাহাও অধিক দিন নহে। ছয় সাত মাসের মধ্যেই তোমরা ফুল ফল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হও। সন্তান প্রতিপালনের নিমিত্ত বীজে তোমরা যে শুক্র পদার্থ অর্থাৎ শ্বেতসার সঞ্চয় করিয়া রাখ তাহার লোভেই মানুষ তোমাদিগকে এত যত্ন করে। তোমাদের বীজ যাহাকে ধান্য বলে, পাঁঠার ন্যায় তাহার ছাল ছাড়াইয়া মানুষ চাউল প্রস্তুত করে। ছাল ছাড়াইলেই চাউল নিহিত তোমাদের সন্তানগুলির প্রাণ বিনষ্ট হয়। তাহার পর তাহাকে সিদ্ধ করিয়া তোমাদের সন্তানের জন্য যে খাবার রাখ, মানুষ তাহা ভক্ষণ করে।

আমাদের সহিত এরূপ ব্যবহার কেহ করিতে পারে না। জন্তুদিগের মধ্যে যেরূপ বাঘ, উদ্ভিদ্‌-দিগের মধ্যে আমরা সেইরূপ। পাঁচ ছয় হাত অপেক্ষা আমরা বড় হই না। তথাপি উদ্ভিদ্ শাস্ত্রকারেরা আমাদের নাম দিয়াছেন—কালো-ট্রপিস জাইগ্যানটিয়া (calotropis gigantea) জাইগ্যানটিয়া মানে অতি বৃহৎ। আমরা অতি বৃহৎ। উদ্ভিদ্ শাস্ত্রকারদের চক্ষে শাল গাছ কতক পরিমাণে এইরূপ মর্য্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কারণ শাল গাছের নাম তাঁহারা শোরীয়া রোবষ্টা রাখিয়াছেন। রোবাষ্টা মানে মোটা মোটা সবল। ইচ্ছা করিয়া আমরা বড় গাছ হই না। বড় হইলে নানা গোল। হয় তো লোকে করাতে চিরিয়া কড়ি বরগা তক্তা করিবে, তানয় কাটিয়া পোড়াইবে। কাজ কি বাপু বড় হইয়া! আমরা দুই ভাই—এক ভাইয়ের ফুল শ্বেতবর্ণ, তাহাকে শ্বেত আকন্দ বলে। আমাদের এ ভাই ব্রহ্মদেশেই অধিক। আমার ফুল ঈষৎ রক্তবর্ণের হয়, সে জন্য আমাকে কখন কখন লোক রূপিকা, আদিত্য-পুষ্পিকা বা দিব্যপুষ্পিকা বলে।

ভাল ভূমি আমরা চাই না। কঙ্করময় বালুকাময় ভূমিতে আমরা পরম সুখে বাস করি, পতিত ভূমি পাইলে আমাদের আনন্দ হয়। ফাঁক পাইলে লোকের বাগানের কোণও আমরা অধিকার করিয়া লই। ভূমি কর্ষণ, বপন, সেচন প্রভৃতি কোনরূপ যত্ন আমাদিগকে করিতে হয় না।

আমাদের শাখা পল্লব দেখিতে রসাল বটে, কিন্তু তাহার ভিতর এমনি বিষময় পদার্থ আমরা সঞ্চয় করিয়া রাখি যে গরু বাছুর তাহার নিকটে যাইতে সাহস করে না। একবার এক অবোধ শিশু ছাগল আমার পাতা সামান্য মাত্র আস্বাদন করিয়াছিল। এমনি পাতা সুস্বাদু যে সে তৎক্ষণাৎ পুকুরে গিয়া দশবার কুলকুচা করিয়া ফেলিল। তাহার পর বাড়ী গিয়া সে মাকে বলিল,—"মা দাল চিনি ছোট এলাচি দিয়া শীঘ্র আমাকে একটা পাণ সাজিয়া দাও।"

বৃদ্ধা ছাগলী জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন বাছা! কি হইয়াছে? কি খাইয়াছ?"

সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অবশেষে ছাগলী শিশুকে সাবধান করিয়া দিল, "বাছা! সে আকন্দ গাছ, তাহার কাছে আর কখন যাইও না।"

কিন্তু আমার পাতা যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য তাহা ভাবিও না। দয়া করিয়া কখন কখন একটু আধটু আমরা মানুষের উপকার করি। বাতবেদনায় আমাদের পাতা জড়াইলে উপকার হয়। তাহার পর আমাদের পত্রের সহায়তায় মানুষের সাত জন্মের পাপ দুর হয়। মাঘ মাসে মাকরী সপ্তমীতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গঙ্গাস্নান করিবার সময় আমাদের পত্র মাথায় না দিলে চলে না। যথা—

সপ্ত বদরপত্রাণি সপ্তার্কপত্রাণি চ শিরসি নিধায়—
যদ্‌যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মমু।
তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্ত সপ্তমী॥

পারস্য প্রভৃতি দেশের বালুকা প্রান্তরে আমাদের যে কুটুম্বগণ বাস করেন, তাঁহাদের পত্র হইতে এক প্রকার শুভ্রবর্ণের মিষ্ট পদার্থ বাহির হয়। কখন কখন লোকে তাহা সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। পারস্য ভাষায় ইহার নাম শকর-ই উষর।

আমাদের শরীরে দুধের ন্যায় এক প্রকার উগ্র পদার্থ আমরা সঞ্চিত করি। সেই পদার্থই গরু বাছুরের মুখ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করে। তুমি ধান্য, তোমার পরমায়ু অতি অল্প। মহাভারত পড়িবার তোমার সময় নাই। তা না হইলে তুমি জানিতে পারিতে যে, এক মণিপুত্র গুরুর নিকট বিদ্যাধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত গুরু তাঁহাকে দিন কয়েক আহার প্রদান করেন নাই। পেটের জ্বালায় শিষ্য আমাদের দুগ্ধ ভক্ষণ করিয়াছিল। চরাচরে গুরু শ্রীশ্রীমহাদেবও উপমাচ্ছলে আমাদের দুধের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। কলিকালের মানুষের হিতের নিমিত্ত সকল শাস্ত্রে সার সংগ্রহ করিয়া তিনি যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন,—

মদ্বক্ত্রাদুদিতং ধর্ম্মং হিত্বান্যদ্ধর্ম্মমীহতে।
অমৃত স্বগৃহে ত্যক্ত্বা ক্ষীরমার্কং সাঞ্ছতি॥

আমার দ্বারা কথিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় লয় সে সেই লোকের মত মূঢ় যে, ঘরে অমৃত থাকিতে আকন্দের আটা খাইতে বাসনা করে।

আমার দুধ লইয়া অনেকে অনেকরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে রিডেল সাহেব ইহা হইতে গটাপারচা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গটাপারচা শিঙ্গাপুর অঞ্চলে আর এক প্রকার গাছের আটা হইতে লোকে প্রস্তুত করে। গভীর সমুদ্র তলে সাহেবেরা যে তার ফেলিয়া দুরদেশে স বাদ প্রেরণ করেন, সেই তার গটাপারচা দ্বারা মুড়িতে হয়। তাহা না করিলে তার হইতে তড়িৎ শক্তি বাহির হইয়া যায়। প্রধানতঃ এই কার্য্যেই গটাপারচা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু আমি বুদ্ধিমান লোক। আমার দুধ আমি এমনি ভাবে

করি যে তাহার ভিতর দিয়া তড়িৎ শক্তি বাহির হইয়া যায়। সে জন্য সাহেবেরা আর আমার দুধ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করেন না। কিন্তু মানুষের হাত হইতে তবুও সম্পূর্ণভাবে আমি নিষ্কৃতি পাই না। কোন কোন স্থানে আমার দুধ দিয়া লোকে কাঁচা চামড়া পাকা করে। মদের বাকড়েও লোক আমার দুগ্ধ প্রদান করে। ঔষধার্থেও আমার দুধ মানুষে সেবন করে ও গায়ে লাগায়। কুষ্ঠব্যাধি, মৃগি, উদরি প্রভৃতি রোগে উপকার হয়। তুমি যদি কখনও তীর্থ দর্শনে অযোধ্যা গমন কর, তাহা হইলে দেখিবে যে প্রাতঃকালে লোক সব কিরূপ আমার নবীন পল্লবগুলি ভাঙ্গিয়া, তাহা হইতে আটা লইয়া খোস পাচড়ায় লাগায়। কিন্তু সুস্থ দেহে আমার দুধ লাগাইলে ঘা হয়। অধিক পরিমাণে আমার দুধ সেবন করিলে বিষের ন্যায় কার্য্য করে।

কিন্তু আমার শিকড়ের ছালই লোকে ঔষধ রূপে অধিক ব্যবহার করে। বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহা কটু, উষ্ণ ও আগ্নেয় গুণবিশিষ্ট; বাত, শোথ, ব্রণ, অর্শ, কুষ্ঠ, কৃমি প্রভৃতি পীড়ায় অল্প পরিমাণে চিকিৎসকগণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ডাক্তারি মতে ইহা বমনকর, ঘর্ম্মকর, ধাতুপরিবর্ত্তক এবং বিরেচক। তাঁহারা বলেন যে, রক্ত আমাশয় রোগে মূলের ছাল দশ রতি সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। আমেরিকা হইতে ইপিকাকুয়ানা নামক যে ঔষধ আসিয়াছে, ইহার গুণ সেইরূপ। আমার মূলের ছাল, ডালের ছাল, পাতা, আটা এবং ফুল সমভাবে লইয়া উত্তমরূপে বাটিয়া, মটরের ন্যায় ছোট ছোট বড়ী লোকে প্রস্তুত করে। প্রত্যহ প্রাতে এক একটী বড়ী সেবন করিলে চর্ম্মরোগ ভাল হয়। ক্ষুধাবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত আমার ফুল শুষ্ক করিয়া লোকে প্রতিদিন দুই তিন রতি সেবন করে। তাহারা বলে যে, ইহাতে সর্দ্দি ও হাঁপানি কাসি ভাল হয়। ঘুটের ছাইয়ের সহিত আমার আটা মিশাইয়া নাস লইলে হাঁচি হয়। কেহ কেহ বলে যে, শ্বেত ভায়া অর্থাৎ শ্বেত আকন্দর মূল মরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে সর্পদংষ্ট্র লোক আরোগ্য লাভ করে। মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ ডাক্তার মুদীন শরীফ মহাশয় আমাকে লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বন্দা তোমাদের মত গোলাম নহেন।

যিনি আমাদের এই কথাবার্ত্তা লিখিতেছেন, তিনি বলেন, "আকন্দ! তুমি বড় শঠ।"

আমার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া তামাসা করিয়া তিনি আমার নিন্দা করেন। তাহার কারণ কি জান, প্রথম দেখ আমার পাতা শাঁসালো, পাতাগুলি দেখিয়া বোধ হয় যে, গোটা কত খাইলেই, গরু বাছুরের পেট ভরিয়া যাইবে। কিন্তু সে পাতার কাছে যায় কাহার সাধ্য! তাহার পর আমার ছাল, ইহার ভিতর সুন্দর উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণের শক্তিশালী আঁশ আছে। কিন্তু বাহির করা বড় কঠিন, তাহার পর আমার ফুল, তাহাতে সুগন্ধ নাই। এক মহাদেব ভিন্ন কাহারও পূজায় লাগে না, আর হনুমানজী ইহার মালা গলায় পরিতে ভাল বাসেন। তাহার পর আমার ফল দেখিলে বোধ হয় যে, অমৃত ফল। কিন্তু ইহার ভিতর যাহা আছে, ধান ভায়া! তাহা একবার চাখিয়া দেখিও। এই সকল কারণে লেখক আমাকে প্রতারক বলেন।

আমি আমার আঁশের কথা বলিতেছিলাম। একশত বৎসরের অধিক সাহেবেরা তাহা বাহির করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। নানারূপ কল দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছেন। রাসায়নিক দ্রব্য সমূহদ্বারা আমার ছালকে ভিজাইয়া ও সিদ্ধ করিয়া

দেখিয়াছেন। কিন্তু সহজে আমার আঁশ আমি কাহাকেও প্রদান করিব না, ইহাই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আমার আঁশ দেখিতে রেশমের মত এবং ইহাতে বিলক্ষণ শক্তি আছে, সেই জন্য লোকের এত লোভ। ডাক্তার ওয়াইট্ নামক একজন সাহেব নানা দ্রব্যের সমরূপ স্থূল দড়ি প্রস্তুত করিয়া তাহাদের বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আমার দড়ি ২৭৬ সের ভার বহন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, শণের দড়ি ২০৩ সের, ছোবড়ার দড়ি ১১২ সের। পাটের দড়ি অতি তুচ্ছ পদার্থ। সে জন্য তাহার নাম আমি করিলাম না। যিনি আমার এই সব কথা লিখিতেছেন, তিনিও অনেকবার আমার আঁশ বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া একটা লোক কেবল এক ছটাক আঁশ বাহির করিতে পারে, তাহা হইলে খরচ পোষায় না।

ফল দেখিলেই কেমন একটা মানুষের লোভ হয়। তোমার ফল খাইয়া মানুষেরা জীবন ধারণ করিতে পারে, সে জন্য তোমার দাসত্ব দশা হইয়াছে। আম কাঁটালকে মানুষ বাগানে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু কি জন্য যে আমরা ফল প্রসব করি, মানুষ তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখে না। যাহাতে আমাদের বংশ বৃদ্ধি হয়, সেই জন্য আমরা ফল উৎপাদন করি। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাদের বীজ রক্ষার নিমিত্ত শিমুল ও আমরা কয়েকজাতি উদ্ভিদ্ এক উপায় বাহির করিয়াছি। আমাদের বীজের সহিত আমরা উড়োকল জুড়িয়া দিয়াছি। আমাদের উড়োকলে মোটর নাই। সখা বায়ু, মোটরের কার্য্য করেন। বীজদিগকে উড়োকলে সুসজ্জিত করিয়া আমরা বলি,—"বাছা সকল! আমাদের তলায় স্থান নাই। যাও দেশ বিদেশে উড়িয়া যাও। আশীর্ব্বাদ করি, যেন বালুকাময় পতিত ভূমিতে তোমাদের পতন হয়।" আমাদের সন্তানগণ এইরূপে দূরদেশে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করে।

আমাদের বীজে আমরা যে পক্ষযুক্ত উড়োকল সংযুক্ত করি, মানুষে তাহাকে আকন্দর তুলা বলে। ইহাকেও ভালরূপে কাজে লাগাইবার নিমিত্ত, মানুষ অনেক চেষ্টা করিয়াছে। শিশুদিগের নিমিত্ত লোকে ইহা দিয়া বালিশ পূর্ণ করে। কফপ্রবল ধাতুবিশিষ্ট লোকেও এই বালিশ ব্যবহার করে। মান্দ্রাজ অঞ্চলে অতি কষ্টে কেহ কেহ এই তুলা কাটিয়া সূতা প্রস্তুত করে। মাঝে মাঝে এক আধ জন বায়ুগ্রস্ত লোক এই সূতা রঙাইয়া গালিচা প্রস্তুত করে। কিন্তু তাহাতে ছয় বুড়ির দায়ে নয় বুড়ি খরচ হয়। বিলাতেও এই তুলা কাটিয়া কাপড় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। ম্যাঞ্চেষ্টার, যে স্থান হইতে বিলাতি কাপড় আমদানি হয়, সে স্থানের একজন কাপড়ের কলওয়ালা সাহেব আমাদের তুলা দিয়া কাপড় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে তুলা যোগাইবার নিমিত্ত এই প্রদেশে একজন আমাদের চাষ করিয়াছিল। লণ্ডন নগরে কলিয়ার কোম্পানি নামক এক বণিক সম্প্রদায় প্রতি সের দশ আনা মূল্য দিয়া আমাদের তুলা ক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সমুদয় চেষ্টা বিফল হইল। আমাদের প্রতিজ্ঞা যে, সহজে আমরা মানুষের বশ্যতা স্বীকার করিব না।

আমাদের কেবল ভয় এই যে, পাছে বাঙ্গালীরা সাহেবদের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আখ-মাড়া কলের ন্যায় কোনরূপ যন্ত্রে ফেলিয়া আমাদের দেহ ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া আঁশ বাহির করে,

অথবা কলের টাকুরে ফেলিয়া পাক দিয়া আমাদের তুলাকে সূতায় পরিণত করে। অথবা রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা আমাদের মূল, পত্র, বল্কল, দুগ্ধ প্রভৃতি হইতে কোনরূপ নূতন ঔষধ প্রস্তুত করে। তবে এক ভরসা এই যে, যতদিন বাঙ্গালী সম্পূর্ণভাবে সত্য ও কর্ত্তব্যপরায়ণ না হইবে, ততদিন কোন কাজে সফলতা লাভ করিতে পারিবে না।

এক রাত্রি নহে, অনেক রাত্রিতে আকন্দ ও ধান গাছে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল। ক্রমে কার্ত্তিক মাস পড়িল, ধান্যের শিষ বাহির হইল। ধান্যের ভিতর যে দুধ থাকে, কঠিন হইয়া তাহা চাউলে পরিণত হইল। আকন্দ গাছের বক্তৃতা শুনিয়া ধান্য ঘাড় হেঁট করিয়া মনে মনে ভাবিল, যে, ইনি জীবের উপকার করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু আমার মত এই যে, জীবের মঙ্গলার্থে যে প্রাণ ও সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা সাধু আর পৃথিবীতে নাই। আমি শুনিয়াছি যে,—

গবার্থে ব্রাহ্মণার্থে চ প্রাণত্যাগং করোতি যঃ।
সূর্য্যস্য মণ্ডপং ভিত্বা স যাতি পরমাং গতিম্॥

গো এবং ব্রাহ্মণের জন্য যে প্রাণত্যাগ করে, সে সূর্য্যমণ্ডলপারে পরমগতি লাভ করে।—সমাপ্ত।

পৌষ—১৩১৭।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ।

বিগত ১৯১০ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কার্য্য বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই বৎসরে কৃষি-বিভাগ কৃষি-সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কৃষি-শিক্ষা বিধানের জন্য সাবোরে কৃষি-কলেজ খোলা হইতেছে। বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে। পরীক্ষা গৃহের সাজ সরঞ্জম সমস্ত যোগাড় হইয়াছে। কৃতবিদ্য অধ্যাপকগণ নিযুক্ত হইয়া বিদ্যালয় গৃহে অবস্থান করিতেছেন। উদ্ভিদ্-বিদ্যা, কীটতত্ব, ছত্রকতত্ব, ব্যবহারিক উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, সাধারণ কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রসায়নতত্ব, বিজ্ঞান এবং অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য বন্দোবস্ত করা হইবে। আগামী বর্ষের নভেম্বর মাস হইতে এখানে অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ হইবে। আপাততঃ ২০টি ছাত্র লওয়া হইবে; এই ২০ জনের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম হইতে ৬ জনকে লওয়া হইবে। ছাত্রদিগের পাঠ্য পুস্তক আজিও স্থির হয় নাই। ছাত্র সংগ্রহ হইলে তৎপরে

তাহাদের আবশ্যকানুযায়ী বিধান হইবে। জেলায় জেলায় বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষার কিছু কিছু বিধান করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা যথোপযুক্ত বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। কটক, গয়া, ডুমরাঁও, হাজারিবাগ ও বর্দ্ধমান স্কুলে কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে—তাহা কিন্তু নামে মাত্র। গয়া জিলা স্কুলে বিগতবর্ষে ৪৮৪ জন ছাত্র কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ২২৫ জনের হাতে হাতিয়ারে শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ডুমরাঁও হাইস্কুলেও ৬৯ জন ছাত্র কৃষি-শিক্ষায় নিযুক্ত ছিল; এই সকল ছাত্রদের মধ্যে চাষার ছেলেই অধিক। ইহারা কিন্তু বাগানে হাতে হাতিয়ারে কাজ করিতে অগ্রসর হইত না। ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-গণকে পরীক্ষা করিবার জন্য কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর, ডেপুটী ডিরেক্টর, এবং সাবোর কলেজের প্রধান অধ্যাপক পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সাতজন বালক পরীক্ষা প্রদান করিয়াছে। তন্মধ্যে চারিজন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কৃষি-শিক্ষা বিধান জন্য গভর্ণমেণ্টের অন্যতম কার্য্য বিদেশে ছাত্র পাঠান। যে সকল ছাত্রগণকে আমেরিকায় কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুই জন শিক্ষাকার্য্য সমাপন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যাগত ছাত্র মিঃ বি, এম, চট্টোপাধ্যায় এক্ষণে সাবর পরীক্ষা-ক্ষেত্রের তত্বাবধারক হইয়াছেন। এখন হইতে আর কোন ছাত্রকে এইরূপ কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থে বিদেশে পাঠান হইবে না। পুষা হইতে ছাত্রগণ ছত্রকতত্ব ও কীটতত্ব শিক্ষা করিয়া সাবরের পরীক্ষাগারের ভার প্রাপ্ত হইবেন। আপাততঃ যে প্রকার কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহা আমাদের অতীব অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়, গভর্ণমেণ্ট কিন্তু কৃষি-শিক্ষার বিস্তারার্থ যত্নবান হইয়াছেন। আমরাও ভবিষ্যতের আশায় নির্ভর করিয়া আছি।

কৃষি-বিভাগের কৃষি-রসায়নবিদ্ মৃত্তিকা, সার, ও খাদ্যশস্য বিশ্লেষণে ব্যাপৃত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত কোন জাতীয় ইক্ষু কখন পরিণত হয় এবং কোন জাতীয় ইক্ষু হইতে অধিক মাত্রায় শর্করা পাওয়া যায়, ইহারও তত্বানুসন্ধান করিয়াছিলেন। অনু-সন্ধান ফল কিন্তু আজিও প্রকাশিত হয় নাই। বিষয়টি জানিবার বটে।

ব্যবহারিক উদ্ভিদ্‌তত্ববিদ কলাই আদি শস্য লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। তিনি উপরন্ত শস্য-জাতীয় ২৮৮ প্রকার ফল এবং ৪৫ রমক কাসাভা বা শিমুল আলু জন্মাইয়া তাহার তত্ব সংগ্রহ করিতেছেন।

কটক কৃষি-ক্ষেত্রে পাট চাষের কথাও এখানে উল্লেখ যোগ্য। অনুসন্ধানে স্থির হইয়াছে ১০০ মণ গোময়, ৪ মণ সুপার ফস্‌ফেট, ৩ মণ কাইনাইট, ২ মণ সলফেট অব এমোনিয়া এবং ১ মণ ম্যাগ্নেসিয়া প্রতি একরে প্রয়োগ করিলে পাটের ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাঁড়ায়। আমরা কিন্তু বলি এই সার প্রয়োগ করা খুবই ব্যয় সাপেক্ষ এবং সাধারণ চাষীর পক্ষে এই ব্যয় বহন করা অসম্ভব। চাইবাসা ক্ষেত্রে তুলার চাষের পরীক্ষা হইয়াছিল এবং তথা হইতে ১৩½ বীজ অন্যত্র চাষের জন্য বিতরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক কৃষি-সমিতিও স্থানে স্থানে তুলা চাষের চেষ্টা করিয়াছেন। বুড়ী কাপাস, ধারওয়ার ও অন্য ভালজাতীয় আমেরিকেন তুলা চাষ করিয়া দেখা হইয়াছে। বঙ্গের তুলা চাষ কোথাও আশানুরূপ হইতেছে না।

আমরা ইতিপূর্ব্বে কাঁটাশূন্য মনসাগাছের কথা লিখিয়াছিলাম। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ আমেরিকান কাঁটাশূন্য মনসাগাছ আমদানী করিয়া, নানাস্থানে

ইহার চাষ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছেন। সকল স্থানেই ইহা জন্মে নাই, কেবল রাঁচী জেলার পলাণ্ডুতে গাছ জন্মিয়াছে এবং তাহা হইতে ডাল কাটীয়া বসাইয়া নূতন গাছ উৎপন্ন হইতে পারিবে। ইহা কিন্তু স্থির যে, ছোটনাগপুর ব্যতীত অন্যত্র এই মনসাগাছ দুর্ভিক্ষ সময়ের খাদ্য বলিয়া গণ্য হইবে না।

প্রাদেশিক কৃষি-সমিতির চেষ্টায় এখন নানা স্থানে মধ্যপ্রদেশের সরু আউসের চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ইহার ফলনও অন্যত্র মন্দ হইতেছে না। এক্ষণে বীরভূম, ২৪ পরগণা, হুগলী, পাটনা পূর্ণিয়া, বালেশ্বর, এবং কটকের মধুপুরে নৈনিতাল আলুর চাষ প্রচলিত হইয়াছে। নৈনিতাল আলু ঐ সকল স্থানে বেশ ভাল রকম জন্মিতেছে। বীরভূম, ২৪ পরগণা হুগলি এবং ছোটনাগপুরে পাটনা আলু বেশ জন্মিতেছে।

নরম জাতীয় মজঃফরপুর গমের এখন অনেক স্থানে বেশ ফসল হইতেছে। এই গম খুব উৎকৃষ্ট জাতীয়, কিন্তু আজকাল শক্ত গমের দিন পড়িয়াছে সুতরাং শক্ত গম চাষেই সকলের আগ্রহ। সেই কারণে কৃষি-বিভাগ বকসার গম চাষ করিতে সকলকে পরামর্শ দেন।

প্রাদেশিক কৃষি-সমিতি বুঝিয়াছেন যে জৌনপুর ভুট্টাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কিন্তু প্রতি বৎসর নূতন বীজ না আনাইলে চলে না; সরু আউসের মত, জৌনভুট্টার স্থানীয় বীজে ফসল খারাপ হইতে দেখা যায়। এ বিষয় আমরাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

বঙ্গের ইক্ষুর মধ্যে খড়ি ইক্ষু এবং শামসাড়া ও লাল বোম্বাই ভাল। সাহাবাদ বীরভূম এবং বালেশ্বরে খুব বহুল পরিমাণে খড়ির চাষ হইতেছে। শামসাড়া ও লাল বোম্বাই আখের চাষ বাঁকুড়া ও বীরভূমে যথেষ্ট। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের চেষ্টায় এখন বঙ্গের নানা স্থানে মাটবাদামের চাষ হইতেছে অনেকই এক্ষণে এই চাষ লাভজনক বলিয়া মনে করিতেছেন। চাষে নিশ্চয়ই লাভ আছে আমরা জানি, কিন্তু ২৪ পরগণায় দুই এক স্থানে শিয়ালের উৎপাতে ইহার চাষ চাষীরা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যেখানে এই উৎপাত নাই তথায় এই চাষ নিঃসন্দেহে করা যাইতে পারে। সুন্দর বনের লোণা জমিতে বিনা সারে প্রতি একরে ২৪ মণ বাদাম উৎপন্ন হইয়াছে। মুর্শীদাবাদ, যশহর, খুলনা, বাঁকীপুর, কটক, সম্বলপুর এবং ছোটনাগপুরে ইহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে।

কৃষি-বিভাগের উদ্যোগে বঙ্গে এই নূতন কাবুলী ছোলার চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতীয় কৃষি-সমিতি হইতে ৪ বৎসর পূর্ব্বে ইহার চাষ করা হইয়াছিল কিন্তু নানা কারণে ফসল নষ্ট হইয়া যায়। এখন ইহা ২৪ পরগণা, নদীয়া, বাঁকুড়া, হুগলি, এবং বেহারের বিভিন্ন স্থানে ইহার প্রচুর চাষ হইতেছে। জৈ চাষ কিন্তু বঙ্গে ভাল হইল না। দ্বারবঙ্গেও কাণপুরে যব জন্মিতেছে এবং এই যব স্থানীয় যব অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট।

পাটে সার প্রয়োগ সম্বন্ধে যেমন একটী পরীক্ষা হইয়াছে ইক্ষুতেও ডুমরাঁও ক্ষেত্রে সার প্রয়োগের পরীক্ষা দ্বারা স্থির হয় যে, রেড়ীর খৈলের সহিত সলফেট অব এমোনিয়া বা রেড়ীর খৈলের সহিত সোরা প্রয়োগ করিলে আখের ফলন অধিক হয়।

রেশম চাষের উন্নতি বিধানার্থ বঙ্গে কতিপয় রেশম গুটি উৎপাদনার্থ নর্শারি স্থাপিত হইয়াছে। বরহামপুর ইহার কেন্দ্র। কার্য্য তত্ত্বাবধারণের ভার কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর, মুর্শীদাবাদের কলেক্টর এবং চারি জন প্রধান রেশম ব্যবসায়ী মহাজন লইয়া গঠিত কমিটির উপর ন্যস্ত আছে।

এইখান হইতে ভাল রেশম কীট বীজের জন্য অনেক স্থানে প্রেরিত হইতেছে। সুখের বিষয় এই যে, উক্ত কমিটি বরহামপুর নর্শারিতে রেশম চাষীদিগের পুত্রগণকে শিক্ষা দিবেন। এমন ১২টি ছাত্র লওয়া হইবে এবং তাহাদের ৬ জনকে মাসিক ৮৲ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া হইবে। তাহাদের শিক্ষা বিধানার্থ ২৫৲ টাকা বেতনে একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

কৃষি-বিভাগে মৎস্য পালনের ব্যবস্থা।

কৃষি-কর্ম্ম সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ মৎস্য কুলের বংশবৃদ্ধির জন্য মনোযোগী হইয়াছেন। বঙ্গদেশে আগে মৎস্যের অভাব ছিল না। তখন বঙ্গে বড় বড় পুকুর, খাল, বিল ছিল কিন্তু এখন অনেক খাল বিল পুকুর বুজিয়া গিয়াছে এবং অনেক বিল এখন চাষের জমিতে পরিণত হইয়াছে। নদীর মাছ ডিমের সময় ধরিয়া খাওয়াতে এবং পোণা ধরিয়া যথেচ্ছা নষ্ট করাতে এখন মাছের যোগান ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। সকলেই জানেন রোহিত, কাতলা, মিরগেল এবং কালবোস প্রভৃতি পোনা মাছ পুকুরে বা বিলের বাঁধা জলে ডিম ছাড়ে না। নদীর জলে তাহারা স্রোতের বিপরীত দিকে যাইতে যাইতে ডিম প্রসব করে এবং পুংজাতীয় মৎস্য গুলি সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার লালা দ্বারা সেই ডিম গুলি সঞ্জীবিত করিতে করিতে অগ্রসর হয়। এক্ষণে বাঁধা পুকুরে পুং এবং স্ত্রীজাতীয় মৎস্য রক্ষা করিয়া ডিম ফুটাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। আমেরিকাতে এই প্রকারে মাছের ডিম ফুটাইবার ব্যবস্থা আছে। মিঃ বি, দাস আমেরিকা হইতে এই প্রকার ডিম ফুটাইবার ব্যবস্থা শিখিয়া আসিয়াছেন। তিনি এবং মিঃ এস, এম, দাস নামক জনৈক এনজিনিয়ার শ্রীপুরে পুনর্ব্বার ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। মিঃ মেকেঞ্জি তাঁহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিবেন। কলিকাতা ও ভাগলপুরে মিঃ আমেদের তত্ত্বাবধারণে তাঁহারা উক্ত কার্য্যে সফলকাম হইতে পারেন নাই।

ইলিস্ মাছকে আমরা মিটা জলের মাছ বলিয়া মনে করি কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহারা লোণায় সমুদ্রের উপকূলে থাকে কিন্তু ডিম ছাড়িবার সময় নদীর স্রোতে উঠিয়া আসে এবং ডিম ছাড়ে। এই জন্যই ইহাদিগকে শ্রাবণ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত নদীতে দেখা যায়। আমাদের দেশের ইলিস এবং আমেরিকার সাদ মাছ প্রায় একই প্রকার। সেই মাছের বংশবৃদ্ধি হ্রাস হওয়ায় আমেরিকা বাসীরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন এবং তাঁহারা পরে তথায় ডিম ফুটাইবার কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখানেও সেইরূপ চেষ্টার কারণ উপস্থিত হইয়াছে এবং মিঃ দাস এবং মিঃ মসিন উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

সাধারণ ভেড়ী বাঁধিয়াও মাছ রক্ষার চেষ্টা হইতেছে। একটি বড় ভেড়ী ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া তাহাতে ভিন্নজাতীয় মৎস্য রক্ষা করিয়া তাহাদের জীবনবৃত্তান্ত আলেচনা করা হইতেছে। মৎস্যও বাঙালীর একটা প্রধান আহার সুতরাং মাছের বংশবৃদ্ধির বাঙালীর বংশবৃদ্ধির সম্বন্ধ আছে।

কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীতে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর খুব পক্ষপাতী। বঙ্গের যেখানেই কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী হউক না কেন তথায় উক্ত বিভাগ হইতে কর্ম্মকুশল কর্ম্মচারীগণ প্রেরিত হন এবং নূতন ধরণের কর্ম্মে প্রযোগী কৃষি-যন্ত্র প্রদর্শন, উপযুক্ত বীজাদি, ফসল নষ্টকারী ফসলের পোকা, ধান মাড়া, আখ মাড়া প্রভৃতি কল, জল সেচন যন্ত্র ইত্যাদি প্রেরণ করিতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়

এই যে, সকল প্রদর্শনীতে যন্ত্রাদির ব্যবহার বুঝাইয়া দিবার লোক উপস্থিত থাকিলেও তাহার ব্যবহার বিধি বুঝাইবার কেনে ব্যবস্থাই সকল স্থানে করা হয় না। বিগত বর্ষে সমগ্র বঙ্গে ২৬টি জায়গায় প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল এবং এই সকল প্রদর্শনীতে সর্ব্বসমেত ৬,৯৭৮ টাকা অর্থ সাহার্য্য করা হইয়াছে। অধিকাংশ প্রবর্শনীতে মিঃ উডহাউস, মিঃ টেলার এবং ডেপুটী ডিরেক্টর মিঃ স্মীথ উপস্থিত ছিলেন। প্রদর্শনী গুলির উদ্দেশ্য মহৎ এবং বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের যেরূপ উদ্যোগ আছে যদি একটু সুবন্দোবস্ত করা যায়, তাহা হইলে চাষী মাত্রেরই উপকার হয় এবং বঙ্গে কৃষিরও উন্নতি হয়।

কতিপয় প্রদর্শনীতে উক্ত বিভাগ হইতে বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত থাকিয়া যথাসম্ভব দর্শকদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের চেষ্টা সম্যক-রূপে সফল হয় নাই বলিয়া, আমাদের বিশ্বাস। উক্ত প্রদর্শনী গুলিতে কৃষকগণের জন্য এবং কৃষি-কার্য্যানুরাগী জনগণের জন্য এক একটি বিশেষ দিন নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। সেই দিন নূতন ধরণের বীজ, গাছ বা সার সম্বন্ধে, কর্ম্মোপযোগী অথচ এদেশের চাষীরা সহজে খরিদ করিতে পারে এরূপ বিশেষ বিশেষ যন্ত্র সম্বন্ধ বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। চাষীগণের অনুরাগ জন্মাইবার জন্য যন্ত্র-গুলি খাটাইয়া এবং চালাইয়া দেখান বিশেষ আবশ্যক। চাষীগণকে প্রবেশের মূল্য না লইয়া মেলাস্থলে আসিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এমন কি দূর হইতে তাহাদের আসিবার এবং থাকিবার ব্যয়ভার পর্য্যন্ত বহন করিলে ভাল হয়। গভর্ণমেণ্ট দুই এক ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের সাহায্য লইয়া এরূপ করিয়াছেন। আমাদের দেশের চাষীরা প্রায়ই নিঃস্ব সুতরাং তাহাদের অবস্থার অতিরিক্ত কোন ব্যয় বহন করিতে সহজেই ভয় পায় এবং নূতন কিছু করিতে হইলেই লোকসানের ভয়টা তাহাদের আগে হয়, কিন্তু লাভজনক হইলে এবং তাহাদের সামর্থে কুলাইলে, সে কার্য্য তাহারা সহজেই করিবে। এই কারণে তাহাদের জন্য এত উদ্যোগ আয়োজনের প্রয়োজন।

কৃষি-কার্য্যামোদী ধনীগণের জন্য এদেশের মাটি ও জলহাওয়ার উপযুক্ত অধিক মূল্যের যন্ত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা মন্দ নহে। চারিদিকে যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাল পড়িয়াছে, তাহাতে সময় ও ব্যয়ের মিতব্যবহার না করিতে পারিলে আর উপায়ন্তর নাই।

ভাল আলুবীজ রক্ষার উপায় অনুসন্ধান।

বিগত দুই বৎসর হইতে পাটনা আলুতে পোকা লাগায়, পাটনা আলু চাষ সম্বন্ধে ব্যাঘাত জন্মি-তেছে। আমরা সেই জন্য দার্জ্জিলিং ও অন্যত্র হইতে বীজ আলু আনাইতে বাধ্য হইয়াছি। কি প্রকারে আলুর বীজ রক্ষা করিলে তাহাতে পোকা লাগে না, এই বিষয়টি বিগত বর্ষের কৃষি-বিভাগের একটি অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া-ছিল। কৃষি-বিভাগ দুইটা উপায়ে বীজ আলু রক্ষা করিয়াছিলেন। (১) ন্যাপথালিন মিশ্রিত বালুকা চাপা দিয়া আলু রক্ষা; (২) ক্রুড অয়িল

ইমলসনে আলুগুলি ধুইয়া লইয়া, তারপর বালি চাপা দিয়া রাখা। দ্বিতীয় উপায়টি পোকা নিবারণের খুব ভাল ব্যবস্থা হইলেও সকল চাষী এই উপায়ে আলু রক্ষা করিতে পারে না। প্রথম উপায়টি সাধারণ চাষীতেও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। ইহাতেও আলু বেশ ভাল থাকে। আমরা তুঁতের জলে বীজ আলুগুলি ধুইয়া বালি চাপা দিয়া রাখিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছি।

রাস্তার ধারে গাছ বসান।

বিগতবর্ষের বিবরণী পাঠে বুঝা যায় যে, কৃষি-বিভাগ উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি ব্যতীত কৃষি সংক্রান্ত আরও অনেক বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। কিরূপ সুন্দরভাবে রাস্তার ধারে গাছ বসান যাইতে পারে এবং কি প্রকারেই বা সেগুলি বর্দ্ধিত হয় এবং সুন্দর দেখায়, ইহার জন্য বন্দোবস্ত হইতেছে। এই কার্য্য তত্ত্বাবধারণ জন্য পারিদর্শকগণের শিক্ষা বিধান করা হইয়াছে। শিবপুর বোটানিক বাগানে ১০ই আগষ্ট হইতে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শিক্ষাকাল নিরূপিত ছিল। বঙ্গের ১৩টি জেলার জন্য ১৪ জন পরিদর্শককে শিখান হইয়াছে। কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর স্বয়ং ঐ পরিদর্শকগণের কার্য্য তত্ত্বাবধান করিলেন। যদিও এই বিভাগের কার্য্যের এখনও কোন সুবন্দোবস্ত হয় নাই, তথাপি যখন কৃষি-বিভাগের এদিকে নজর পড়িয়াছে, তখন কালে ইহার উন্নতি বিধান হইতে পারিবে।

সেচন জলের নিমিত্ত কূপ।

কৃষিকার্য্য নিমিত্ত সেচন জলের সুবিধা বিধানার্থ কৃষি-বিভাগ অনেকস্থলে কূপ খননের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ৩৮টি কূপ খোদা হইয়াছে;—গয়ায় ১২টি, ভাগলপুরে ১০টি, পাটনায় ৮টি, সাহাবাদে ৩টি এবং মতিহারিতে ২টি। কূপ খননের ও উক্ত কার্য্য পরিদর্শন জন্যও শিক্ষিত লোকের বন্দোবস্ত হইয়াছে। এক্ষণে কার্য্যের যেরূপ বিধি ব্যবস্থা, তাহা সম্পূর্ণ ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। ইহার সুবন্দোবস্তের চেষ্টা হইতেছে।

কৃষি যন্ত্র।

এতাবৎকাল কৃষি-বিভাগ যতপ্রকার কৃষিযন্ত্র প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ গুলিই সাধারণ চাষীগণের ব্যবহার সম্ভব নহে। শস্য কাটা বা শস্য মাড়া যন্ত্র, শস্য পরিষ্কার করিবার যন্ত্র, গবাদির খাদ্যের জন্য বিচালি কাটা যন্ত্রাদি অধিক মূল্যের সুতরাং এইগুলি বড় বড় কারখানা ব্যতীত এদেশে অন্যত্র ব্যবহার হয় না। ভুট্টা ছাড়ান যন্ত্র খুব দাম বেশী না হইলেও চাষীরা বড় ব্যবহার করিতে চায় না—স্থানীয় প্রথায় তাহারা উক্ত কার্য্য সাধন করে। কমদামী বিচালী কাটা যন্ত্র নগর ও উপনগর সমূহে, যেখানে কাটা বিচালি বিক্রয় হয়, তথায় সামান্য সামান্য ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু সাধারণ চাষীদের মধ্যে ইহার প্রচলন খুব কম। শিবপুর লাঙ্গল, মেষ্টন লাঙ্গল, হিন্দুস্থান লাঙ্গল, প্রভৃতি দেশী স্থানীয় লাঙ্গল অপেক্ষা উন্নত প্রণালীর ও গভীর চাষের উপযুক্ত হইলেও বঙ্গীয় কৃষকগণ এই সকল অল্পই

ব্যবহার করে। এতদবস্থায় আমরা দেখিয়াছি যে স্থানীয় লাঙ্গলের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও উন্নতি করিয়া, তাহাদিগকে ব্যবহার করিতে দিলে তাহারা বিশেষ পরিতৃপ্ত হয় এবং লোহার অপেক্ষা কাঠের লাঙ্গলই বেশী পসন্দ করে; কারণ ইহা সহজে মেরামত করা যায়।

কৃষিযন্ত্রের মধ্যে আখমাড়া কলই সাধারণে খুব প্রচলিত। আখের রস জ্বাল দিবার কটাহের দাম ৬০৲ টাকা হইলেও, অনেকে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে। ছোট বড় অনেক প্রকার জলোত্তলন যন্ত্র ব্যবহার করিতে কৃষি-বিভাগ পরামর্শ দেন, কিন্তু চাষীদের মধ্যে তাহার প্রচলন খুব কম। তাহারা সর্ব্বদাই সিউনি দ্বারা কাজ সারিবার চেষ্টা করে, এমন কি লোহার দোন, যাহার মূল্য ৭৲ টাকারও অধিক নহে, তাহাও ব্যবহার করিতে চায় না। লোহার পরিবর্ত্তে তালের ডোঙ্গারই অনেক স্থলে চলিত আছে। তাহা দামেও সস্তা এবং সহজে মেরামত হয়। কমদামী জল তুলিবার যন্ত্র পাইলে অনেকে খরিদ করিতে রাজী। ১২৲ টাকা মূল্যের পম্পও আছে, কিন্তু খারাপ হইয়া গেলে সহরে বা নগরে ভিন্ন মেরামতের উপায় নাই। এইজন্য অনেকে উহা খরিদ করিতে বিরত।

কৃষি-বিভাগের সকল দিকেই উদ্যোগ আরম্ভ বেশ, সূচনাও ভাল এবং এদেশের লোক উদ্যোগী হইলে ভারতীয় কৃষির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয়।

প্রাদেশিক কৃষি-সংবাদ।

বঙ্গে তুলা চাষ—ডিসেম্বর, ১৯১০।

সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংভূম, আন্দুল, রাঁচি এবং সম্বলপুর, এই কয়স্থানে সর্ব্বসমেত ৩২,৪৯৮ একর পরিমাণ জমিতে জলদি জাতীয় তুলার আবাদ হইয়াছে। ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত নাবী তুলা চাষের জমির পরিমাণ ৩৩,২৮৬ একর। উত্তর বিহার এবং সিংভূমে নাবী তুলার বুনানি শেষ হইয়াছে, কিন্তু কটকে এখনও আরম্ভ হয় নাই বলিলেও হয়।

অনুমান হয় যে, বিগত বৎসর অপেক্ষা অধিক তুলা উৎপন্ন হইবে। বিগত বর্ষে ৬,৯৯২ বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল, বর্ত্তমান বর্ষে ৭,৫৯৮ বেল উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

বঙ্গে নীলের আবাদ।—১৯১০।

বিগত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বর্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক জমিতে নীলের চাষ হইয়াছে। বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ১০০,৪০০ একর, বর্ত্তমান বর্ষের জমির পরিমাণ ১১৪,৯০০ একর। অনুকূল আবহাওয়ার গুণে উত্তর বিহারে অধিক নীলের আবাদ হইয়াছে।

জেলার কর্ত্তাগণ অনুমান করেন যে, ২০,৩১১ ফ্যাক্টরি মণ নীল উৎপন্ন হইবে। বিগত বর্ষের উৎপন্ন নীলের পরিমাণ ১৭,০০৭ মণ হয়াছিল। মেঃ মোরাণ কোম্পানি অনুমান করেন যে, এ বৎসর ২০,০০০ ফ্যাক্টরি মণ নীল পাওয়া যাইবে।

পঞ্জাবে গমের চাস।—বিগত বৎসর অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত কম জমিতে গম বোনা হইয়াছে। বিগত ১৯০৯-১০ সালের 'আবাদী জমির পরিমাণ ৮,১৬৮,৭০০ একর। ১৯১০ সালের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত গমের জমি ৭,৯৮৮,১০০ একর মাত্র। অম্বালা. দিল্লি, হোসিয়ারপুর প্রভৃতি স্থানে গম চাষ অধিক মাত্রায় হইলেও অনেক জায়গায় সুবৃষ্টি অভাবে গমের আবাদ কম হইয়াছে। ক্ষেত্রে শস্যের অবস্থা কিন্তু এখন ভাল।

পঞ্জাবে রবি তৈল্যশস্য।—ইহার চাষের অবস্থা গমেরই অনুরূপ। শতকরা ১ ভাগ কম জমিতে আবাদ হইয়াছে। শস্যের বর্ত্তমান অবস্থা ভাল।

প্রতাপগড়ে পাটের চাষ।—যুক্ত-প্রদেশের প্রতাপগড়ে গভর্ণমেন্টের একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র আছে। তথায় পাট চাষের চেষ্টা করা হইয়াছিল। এখানে শণের চাষই হইয়া থাকে, পাট আদৌ হয় না। প্রথম বারি পতনের পরই দুইটি ক্ষেত্র রচনা করিয়া পাট বীজ বোনা হয়, কিন্তু বীজ ভাল কুটিল না এবং পুনরায় বীজ বপনের আবশ্যক হয় এবং এই বারে বীজ সুন্দর অঙ্কুরিত হইয়াছিল। কিন্তু চারাগুলি একটু বড় হইতে না হইতে অধিক বৃষ্টিপাত হেতু চারা পাতলা করিয়া দেওয়া এবং ক্ষেত নিড়াইবার বিশেষ অসুবিধা ঘটে; এই কারণে পাট বাড়িতে পায় নাই। সুতরাং পাটের রঙ, দৈর্ঘ্য, টানসহনত্ব কিম্বা চকচকে আঁশ কিছুই আশানুরূপ হয় নাই। বিঘাপ্রতি ফলনও খুব কম হইয়াছিল। এ বৎসর তথায় শণের চাষও ভাল হয় নাই; অতিবৃষ্টিই তাহার কারণ। আবার গাছ একফুট দেড়ফুট বড় হইতে না হইতে তাহাতে পোকা লাগিয়াছিল। এই পোকার স্থানীয় নাম বোঁদী। যে শণ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা খুব কম দরের। আগামী বর্ষে পুনরায় পাট চাষের পরীক্ষা করা হইবে।

বঙ্গের সাধারণ শস্য সংবাদ—সমস্ত পৌষমাস কোথায়ও বারিপাতের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। হৈমন্তিক ধান্য আহরণ কার্য্য সুশৃঙ্খলে চলিয়াছে। বেহারে ও উড়িষ্যায় আখমাড়া চলিয়াছে। রবিশস্য ও তরিতরকারি বেশ হই-তেছে। বৃষ্টির অভাবে স্থানে স্থানে মটর, মসুর প্রভৃতি কলাইয়ের কিছু ক্ষতি হইল।

বাঁকুড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশহর, গয়া, সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ, রাঁচি এবং সিংভূমে চাউলের দর কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে, কিন্তু বর্দ্ধমান মেদিনীপুর, খুলনা, দ্বারবঙ্গ, মানভূম, কুচবিহার, বালেশ্বর ও পূর্ণিয়ায় চাউলের দর কমিয়াছে।

গবাদির খাদ্য শস্য ও পানীয় জল সর্ব্বত্রই এখন পর্য্যন্ত সুপ্রশস্থ। কিন্তু পাটনা, মজঃফরপুর, পুরী ও হাজারিবাগে গবাদির রোগের কথা শুনা যাইতেছে।

পত্রাদি।

ধানের পোকা।

শ্রীবরদাসুন্দর পাল, ম্যানেজার ষ্টেট এস. এইচ, হাইদার, কে, ই, ১ নং কান্দিরপার, কমিল্লা।

মহাশয়,

পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার দক্ষিণাংশে ও নওয়াখালী জেলার উত্তরাংশে সহস্র সহস্র বিঘা হৈমন্তিক ধান্য শুষ্ক হইয়া তৃণ ক্ষেতের আকৃতি ধারণ করিয়াছে। জলাভাবে যে ঐরূপ হইয়াছে তাহা নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও বর্ষার জল শুষ্ক হয় নাই। কোন স্থানে এক চাপে বহু শত বিঘা শুকাইয়া গিয়াছে, কোন স্থানে বা মধ্যে মধ্যে এক এক খণ্ড ভূমির ধান্য জ্বলিয়া গিয়াছে, কোন স্থানে বা এক খণ্ড জমির এক অংশের ধান শুকাইয়া গিয়াছে, অপর অংশ ভাল আছে। আবার এমনও দেখা যায় যে, এক ক্ষেতের বার আনা ধান জ্বলিয়া গিয়াছে, চার আনা ভাল আছে। নিম্ন ভূমি, উচ্চ ভূমি সকল রকম ক্ষেতের ধান্যই এই মহামারিতে আক্রান্ত হয়। কোন ক্ষেত্রের ধানের শিষ বাহির হইয়াছিল এই অবস্থায় আক্রান্ত হইয়া শিষগুলি শুকাইয়া চিটা হইয়া যায়, কোন ক্ষেত্রে থোড় অবস্থায় আক্রান্ত হয়, থোড় আর বাহির হইতে পারে নাই, ঐ অবস্থায়ই শুকাইয়া যায়। কোন ক্ষেত্র থোড় হওয়ার পূর্ব্বেই আক্রান্ত হয়, ঐ অবস্থায়ই ধান প্রথমে লাল হয়, তৎপরে শুকাইয়া উঠে। এই সকল আক্রান্ত ধান গরুতেও খায় না। এই দেশে এই ধান্যের দাবানল বা মহামারিকে "উব্রা" বলে। ধানে উব্রা ধরিলে মাঠের ধানগাছগুলি যেন আগুনের তাপে মরিয়া গিয়াছে এইরূপ দেখা যায়। যে বৎসর ভাদ্র আশ্বিন মাসে মেঘ গর্জ্জন বেশী হয়, সেই বৎসরে "উব্রা" দেখা দেয় বলিয়া এদেশের কৃষকেরা বলে। ধান্যের এই মহামারির নিদান কিম্বা চিকিৎসা কেহ জানে না। এইরূপে ধান জ্বলিয়া যাওয়ার কারণ কি এবং ইহা প্রতিকারের কোন উপায় আছে কি না, অনুগ্রহপূর্ব্বক উপদেশ দিলে নিতান্ত উপকৃত হইব এবং সহস্র সহস্র কৃষকের উপকার হইবে এই বৎসরও লক্ষ টাকার অধিক মূল্য হইত, এত ধান্য উব্রাতে নষ্ট হইয়াছে। ইতি—

উঃ। বোধ হয় ধসা লাগিয়া ধানের এরূপ ক্ষতি করিয়াছে। কি পোকা লাগিয়াছে, অনুসন্ধান করা বিশেষ আবশ্যক। মহামারির সময় কোন বিশেষজ্ঞকে ক্ষেত্রগুলি দেখাইয়া তাঁহার উপদেশ মত প্রতিকার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। ফসলের পোকা নামক পুস্তকে ধানের পোকা সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা আছে। একখানা পুস্তক কাছে রাখিতে পারেন, দাম ১৷৹ টাকা মাত্র। কৃষক অফিসে পাওয়া যায়। কৃঃ সঃ।

আমের পোকা।

শ্রীমোহিনীনাথ ধিশী, জোয়াড়ী পোঃ, রাজসাহী।

মহাশয়,

আমার বাগানের একটি আম গাছে প্রতি বৎসর সর্ব্ব প্রথমে মুকুল আইসে, গাছটিও বেশ সতেজ, কিন্তু মুকুল হওয়ার পনর কুড়ি দিন পরে মুকুলগুলি আস্তে আস্তে ঝরিয়া পড়িয়া যায়। যে সময় ঐরূপ ঝরিয়া পড়িতে থাকে, তখন দুই একটি মুকুলের ডাঁটা পাড়িয়া দেখা গিয়াছে যে, মুকুলের গায় কাল কাল দাগ আছে ও ঐ ডাঁটার অগ্রভাগ অল্প পরিমাণে শুষ্ক। সামান্য পরিমাণ পানা গাছের গোড়ায় দিয়াও বিশেষ ফল লক্ষিত হয়

নাই। যে দুই একটি আম পাওয়া যায়, তাহা বেশ সুমিষ্ট।

আর একটি ভাদুরে আম গাছে আম যখন বড় হয়, (পাকিবার দশ পনর দিন পূর্ব্বে) তখন আমের বোঁটার দিক শুকাইয়া আম গাছ হইতে পড়িয়া যায়। এ পর্য্যন্ত কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয় নাই। মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দুইটি আম গাছ কি উপায় অবলম্বন করিলে এবং কি প্রতিকার করিলে রোগ হইতে মুক্ত হইবে, তাহা লিখিয়া জানাইলে বাধিত হইব। নিবেদন ইতি—

উঃ। দুই কারণে আমের মুকুলগুলি ঝরিয়া পড়া সম্ভব। প্রথমতঃ গাছে রসের অভাব হইলে মুকুলগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতে পারে। দ্বিতীয়তঃ পোকা লাগিয়া মুকুলের ডাঁটার রস চুষিয়া খাইলে মুকুলগুলি ঝরিয়া পড়া সম্ভব। আম গাছে একপ্রকার মাছি পোকা লাগে, তাহাদের দ্বারা এইরূপ অনিষ্ট হওয়া সম্ভব। অনুসন্ধানে জানিতে পারিবেন যে, কোন না কোন প্রকার পোকায় এই প্রকার ক্ষতি করিতেছে। মুকুলের মূলের নিকট কাল দাগ তাহারই নিদর্শন। পোকা ধরিবার চেষ্টা করিবেন। মুকুল ধরিবার পূর্ব্বে আম পাতা একত্র করিয়া গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া ভাল কিম্বা ফিনাইল জলে গুলিয়া পিচকারি দ্বারা গাছে ছিটাইলেও উপকার হয়। কৃঃ সঃ।

গিনি ঘাস।

ডি, ওয়াটসন, প্রয়াগ চিনির কারখানা, নাইনি।

[দুই পাউণ্ড গিনি ঘাসের বীজ এক বিঘা জমিতে চাষ করিতে দরকার হয়। এক পাউণ্ড বীজের মূল্য ২৲ টাকা। বীজ এখানে এখন সহজে মিলে না। সাহারাণপুর গভর্ণমেণ্টের বাগানে চাষের জন্য মুল পাওয়া যাইতে পারে। এক মণ মূল আনাইয়া পাতলা করিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়, পরে ঘাসের ঝাড় বাড়িয়া উঠিলে বর্ষাকালে তাহা হইতে মূল উঠাইয়া লইয়া নূতন ঝাড় তৈয়ারি করিতে পারিলেই, যেখানে যত ফাঁক আছে তাহা পূর্ণ করিয়া লইতে পারা যায়।] কৃঃ সঃ।

রেশম গুটি।

শ্রীশ্যামাচরণ দেব, মুরপুর, পোঃ গোকর্ণ, ত্রিপুরা।

[আপনি যে পোকার গুটির আবরণের নমুনা স্বরূপ পাঠাইয়াছেন, তাহা আমরা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, কীটতত্ত্ববিদেরা বলেন, যে, ইহা নিশ্চয়ই কোন পোকার গুটি। কি পোকার গুটি, তাহা গুটি দেখিয়া বলা কঠিন। ইহার সূত্র রেশমী, কিন্তু গুটিটি অত্যন্ত পাতলা, খুব কমই সূত্র আছে। সূত্র খরিদ করিবার লোক অনেক আছে। সূত্র তৈয়ারি করিয়া নমুনা পাঠাইলে তবে তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ হইবে। কিন্তু এত অল্প সূত্রের গুটি লইয়া কার্য্য চালাইলে খরচে পোষাইবে কিনা সন্দেহ। কোন গাছে এই পোকার উৎপত্তি এবং এই পোকার বিবরণ আপনার জানা আছে কিনা লিখিবেন, এবং নমুনা স্বরূপ জীয়ন্ত পোকা ছিদ্রযুক্ত টিনের কৌটায় পাঠাইতে চেষ্টা করিবেন। আপনার যদি রেশম সংগ্রহের ইচ্ছা থাকে, তবে আপনি এড়ি রেশম পোকা বা বহরমপুর গুটি পোকার আবাদ করিতে পারেন এবং পলু পোকা প্রতিপালন জন্য এড়ি বা তুঁতের আবাদ সহজে করিতে পারিবেন।]

কৃঃ সঃ।

সার-সংগ্রহ।

একটা বীজে ৩০০০ গম।

জেনারল লেভিটস্কি রুষিয়ার একজন প্রসিদ্ধ কৃষিতত্ত্ববিদ পণ্ডিত। তিনি গমের চাষ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি একবার একটা গমের বীজ বপন করিয়া তাহা হইতে ২০,০০০ গম জন্মাইয়াছিলেন। কিরূপে তিনি এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

তিনি ১ হাত গভীর গোলাকার গর্ত্ত করিয়াছিলেন। গর্ত্ত নিম্নদেশে ক্রমশঃ সরু হইয়া শেষে সূচ্যগ্রের ন্যায় হইয়াছিল। গর্ত্তের তলায় একটা বীজ বুনিয়া তাহা পাতলা মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দিয়াছিলেন। যখন বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়াছিল, তখন তাহা আবার অল্প মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেন। কয়েকদিন পরে দেখা গেল, মাটি ভেদ করিয়া অনেকগুলি চারা বাহির হইয়াছে। এই সমস্ত চারা অল্প মাটি দ্বারা আবার ঢাকিয়া দেওয়া হইল। এই রূপে মাটি ভেদ করিয়া যতবার চারা বাহির হইল, ততবার তাহা মাটিদ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। যখন ক্রমে গর্ত্ত মাটিতে পূরিয়া গেল, তখন সেই মাটির ভিতর হইতে ২০,০০০ চারা বাহির হইয়াছিল। একটা বীজ হইতে গমের ২০,০০০ চারা কি অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়?

ইংলণ্ডের এসেক্স পরগণায় অস্তহরণ চার্চ্চ নামক গ্রামে শ্রীমতী জেন্টি বাস করেন। কৃষিকার্য্যে তাঁহার পরম অনুরাগ। তিনি অল্পদিন হইল, একটা গম হইতে জেনারল লেভিটস্কির অনুকরণ করিয়া ৩ হাজার গম জন্মাইয়াছেন। তিনি দুই হাত ব্যাসের একটা গোলাকার গর্ত্ত খুঁড়িয়াছিলেন। গর্ত্তটা উপরে চওড়া কিন্তু নিম্নদিকে ক্রমশঃ সরু। তিনি গত ১৯০৯ সালের মার্চ্চ মাসে গর্ত্তের নীচে একটা গমে বীজ পুঁতিয়া তাহা পাতলা এক স্তর মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৩ সপ্তাহ পরে তাহা হইতে ৬টা অঙ্কুর বাহির হইয়াছিল। অঙ্কুর বাহির হইবামাত্র তাহা আবার মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে চারাগুলি যতদিন গর্ত্তের বাহিরে না উঠিয়াছিল, ততদিন পুনঃ পুনঃ মাটি দিয়া আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অবশেষে একটা বীজ হইতে এত অঙ্কুর হইয়াছিল যে গর্ত্তের সমস্ত উপরিভাগ তাহাতে ঢাকিয়া গিয়াছিল। ১৯১০, সালের গ্রীষ্মকালে গম পাকিয়াছিল। শ্রীমতী জেন্টি তখন তাহা কাটিয়া গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, একটা বীজ হইতে ৮১টা শীষ হইয়াছিল। ২০টা শীষ হইতে খুব বড় এবং ৫০টা শীষ হইতে মধ্যমাকারের গম জন্মিয়াছিল। ১৫টা শীষ এখনও পাকে নাই। ৭০ শীষ হইতে ৩০০০ গম পাওয়া গিয়াছে।

১টা বীজ হইতে ৩০০০ গম পাওয়া সহজ কথা নয়। আমরা আশা করি আমাদের শিক্ষিত কৃষকগণ এই পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

এলাহাবাদ প্রদর্শনী।

বিগত ১লা ডিসেম্বর প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। এসোসিয়েসনের অনেক মেম্বর এবং কৃষকের অনেক গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণ উক্ত প্রদর্শনীতে বিশেষ দ্রষ্টব্য কি এবং ইহার বিশেষত্বই বা কি জানিতে উৎসুক হইয়াছেন।

এলাহাবাদ প্রদর্শনীর বিশেষত্ব এমন কিছুই আমরা দেখিতে পাই না—অন্যান্য প্রদর্শনীতে ছিল না এখানে আছে, অন্য প্রদর্শনীতে কোন প্রদর্শিত দ্রব্য অসম্পূর্ণ ছিল, এখানে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়াছে, এমন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে সম্পূর্ণ নূতন জিনিষের মধ্যে কেবল মাত্র বিমানযন্ত্র বা উড়োকলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কলে উঠিয়া লোক ইচ্ছামত বিমান বিহার করিয়া ইচ্ছামত নামিয়া আসিতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিষ অনেকই আছে এবং বিশদ করিয়া ঐ সকল দ্রব্য দেখানই প্রধান উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ সকলটা ঠিক ঘটিয়া উঠিতেছে না।

এখানে কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য ও তাহার প্রস্তুত প্রণালী, এড়ি রেশম কীট, তাহার পালন এবং সূত্র প্রস্তুত, ক্ষুদ্র গাছ পালন, ফল রক্ষা প্রভৃতি দেখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, দেশীয় প্রথায় মাখন ও ঘৃত প্রস্তুত প্রণালী দেখান হইতেছে। মুসলমানগণের প্রথায় গ্রাম্যমাখনাদি প্রস্তুতের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একটি কৃত্রিম হ্রদ রচিত হইয়াছে, হ্রদের চারিদিকে জল উত্তোলন যন্ত্র সজ্জিত আছে। হ্রদে পূর্ত্ত বিভাগের প্রদর্শনী অপেক্ষা এই ক্ষেত্রে জল সেচন যন্ত্রগুলি একই প্রদর্শনীর বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছে।

এখানে পশু চিকিৎসালয়ও প্রদর্শিত হইয়াছে। ধান কাটা, ছাটা, জমি চাষ ও আবাদ দেখান হইতেছে। উদ্যোগ, আয়োজনে বিশেষত্ব খুবই আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কার্য্যতঃ সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলে হইলে এই প্রদর্শনীটি বড়ই চিত্তাকর্ষক হইত।

বর্ত্তমানকালে রেলপথসমূহে যে যে প্রণালীতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, সে সমুদয়ই এই কলকারখানার প্রাঙ্গণে প্রদর্শিত হইতেছে। সন্ধিস্থল সকল জুড়িবার বিবিধ উপায়, গাড়ী নির্ম্মাণের কৌশল, আলোক জ্বালিবার বন্দোবস্ত, ভ্যাকম ব্রেকের ব্যবহার এ সমুদয়ই কলকারখানার প্রাঙ্গণে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রাচীন পদ্ধতির তাঁত ও বর্ত্তমান উন্নত প্রণালীর তাঁত পাশাপাশি সন্নিবেশিত থাকাতে দর্শকগণ একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই উভয়ের পার্থক্য অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হিউয়েট বিদ্যালয়ের বয়ন-প্রণালীতে কার্য্য অল্প ব্যয়ে অথচ বেশ শীঘ্র সম্পন্ন হইতেছে।

প্রদর্শনীক্ষেত্রে যাত্রীগণ বিমানযোগে আকাশ বিহার করিবার সুযোগ পাইবেন। যাত্রীদিগকে শ্রীযুত ক্যাপ্টেন উইণ্ডহামের সহিত পূর্ব্বাহ্নে এই বিহারের বন্দোবস্ত করিতে হয়। ক্যাপ্টেন বিমান-পরিচালন শিখাইতেছেন। কেহ ইচ্ছা করিলে ইহাঁর নিকট বিমান ক্রয়ও করিতে পারিবেন।

বন-বিভাগের প্রদর্শিত দ্রব্যসমূহ বিশেষরূপ শিক্ষাপ্রদ। শাল, শিশু, সেগুন, বাগাদুরী প্রভৃতি বহুতর কাষ্ঠের গুঁড়ি আছে। কাষ্ঠগুলি বেশ মসৃণ ও নানা রঙে রঞ্জিত। খেড়ি ও গাড়োবাল হইতে বিবিধ কাষ্ঠ আনীত হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের অনেক নির্জ্জন বনভূমির ছবি ও ফোটোগ্রাফ প্রদর্শিত হইতেছে।

বোম্বাইয়ে মুরে ব্রাদার্স একটী আদর্শ বনভূমি প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধারণতঃ জঙ্গল কিরূপ হইয়া থাকে, ইহাঁরা তাহার একটা নমুনা দেখাইয়াছেন। ইহাঁদের এই আদর্শ বনভূমির স্থানে স্থানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি বিবিধ বন্যজন্তুর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। গাছের ডালে ডালে অনেক পক্ষীর প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন ইহা প্রকৃতই শিকারের

স্থান, নির্জ্জন অরণ্য। শিকারের জন্য অস্ত্র শস্ত্রও সজ্জিত আছে। প্রয়াগের প্রদর্শনীর এই দৃশ্যটি বড়ই মনোহর। অন্য কোথাও এই দৃশ্য এত সুন্দর করিয়া দেখাইবার ব্যবস্থা হয় নাই।

সামুদ্রিক মৎস্য বা পুষ্করিণীতে মৎস্যের চাষ।

গুপ্ত সাহেবের প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় যে, কলিকাতার ন্যায় বৃহৎ নগরে মৎস্য যোগাইবার জন্য কেবলমাত্র নদী, খাল, বিল প্রভৃতি হইতেই মৎস্য ধরিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কাট্‌তি আধিক্য হওয়ায় এবং মৎস্য সংরক্ষণ ও মৎস্য জনন পালন সম্বন্ধে সরকারী কোন আইন না থাকায় ক্রমে খাল, বিলের মৎস্য সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিতেছে। হয়ত পরিণামে মৎস্য বিশেষ একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিবে। কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে প্রচুর পরিমাণে মৎস্যের আমদানী করিতে হইলে কেবল নদী, পুষ্করিণী, খাল, বিলের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। সমুদ্র হইতে মৎস্য ধরিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমুদ্রে মৎস্য ধরা ব্যবসা যে বিশেষ লাভজনক তাহার কোন সন্দেহই নাই।

এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপকরণগুলির বিশেষ প্রয়োজন।

(১) এমন বাষ্পপোত ও জেলেডিঙ্গী প্রস্তুত করাইতে হইবে, যাহা সকল সময়ে দুর্যোগ ও অদুর্যোগেও সমুদ্রে যাইয়া মৎস্য ধরিতে পারে।

(২) মৎস্য ধরিবার জন্য আধুনিক যন্ত্র সকল প্রস্তুত করাইতে হইবে ও তাহার ব্যবহার শিখিতে হইবে।

(৩) সমুদ্রে ধৃত মৎস্য যথাসময়ে বাজারে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

(৪) মৎস্য পচিয়া না যায়, এজন্য বরফ সংযোগে ও লবণাদির সাহায্যে তাহা তাজা রাখিবার ব্যবস্থা বা জাওয়াইয়া আনিবার উপায় করিয়া দিতে হইবে। মৎস্য-সংগ্রহ স্থলের সন্নিকটই বরফের কল করা, বরফের দাম কমান ও লবণের কর উঠাইবার প্রয়োজন হইবে।

(৫) ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে সুশিক্ষিত জালজীবী আনাইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। ক্রমে দেশীয় ধীবরেরা কল কৌশল শিখিয়া লইলে অনায়াসে কার্য্য চলিবে।

এক্ষণে আমরা বঙ্গদেশের নদ নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় হইতে কি প্রকারে মৎস্যের ব্যবসায়ে লাভবান হওয়া যায়, তাহা প্রকাশ করিব।

তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত ভল্লমে যখন মাননীয় টমাস সাহেব বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার বাসার নিকটস্থ একটী পুকুরে, দুই টাকায় এক সের আন্দাজ মৎস্যের পোনা ক্রয় করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। দেড় বৎসর পরে মৎস্য ধরিয়া হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন, উক্ত এক সের মৎস্যের পোনায় দুই সহস্র সের (প্রায় ৫০ মণ) মৎস্য প্রদান করিয়াছিল এবং পর পর বৎসরে ইহা অপেক্ষা আরও বেশী হইয়াছিল। পাঠকগণ এখন হিসাব করিয়া দেখুন, যদি ন্যূনকল্পে দশ টাকা প্রত্যেক মণ বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলে উক্ত পঞ্চাশ মণ মৎস্যের মূল্য পাঁচ শত টাকা। যৎসামান্য দুই টাকা মূলধনে দেড় বৎসর পরে যদি ৫০০৲ টাকা উৎপন্ন হইল, তবে ইহা অপেক্ষা আর অধিক লাভের আশা কি করা যাইতে পারে? মৎস্য ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায়ে এত টাকা লাভ হইতে পারে কি না তাহা শোনা যায় নাই। কপর্দ্দক শূন্য জেলেগণ অল্পকাল মৎস্যের কারবার করিয়া কলিকাতায় কিরূপ অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহা যাঁহারা কলিকাতায় কোন বাজারে একবারও গিয়াছেন এবং মাছ কিনিবার সময় ধীবর রমণীগণের স্বর্ণালঙ্কার পূর্ণ হস্তের দিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমরা এই বিষয়ে যতদূর জানি তাহাতে উক্ত টমাস সাহেবের পরীক্ষার ফলও নিতান্ত কম বলিয়া বোধ হয়। পুকুরে মৎস্যের পোনা না ছাড়িয়া যদি পূর্ব্বোক্ত দুই টাকা মূল্যের ভাল ভাল সুখাদ্য মৎস্যের ডিম্বাণু ছাড়িয়া যত্ন সহকারে যথা সময়ে ফুটান যাইত, তাহা হইলে মৎস্যের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইত। যাহা হউক মৎস্যের ব্যবসা

আরম্ভ করিতে যে বেশী মূলধনের আবশ্যক করে না এবং সামান্য পরিশ্রমেই অল্প দিনে খুব লাভবান হওয়া যায়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যদি আমাদের সুশিক্ষিত ধীবর জাতীয় পাঠকের মধ্যে কেহ এই কার্য্যে ব্রতী হইতে ইচ্ছা করেন, তবে একটী পুকুরের সংস্থান করা চাই। যদি নিজের পুকুর থাকে তো ভালই, নতুবা ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে একটী পুষ্করিণী জমা লউন। ঐ পুকুরে মৎস্যের ডিম ফুটাইতে হইবে। পূর্ব্বেই ঐ পুকুর হইতে হিংস্রজাতীয় মৎস্যগুলিকে, যথা শোল, বোয়াল প্রভৃতি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। পরে আষাঢ় মাসের প্রথমে পুকুরে ডিম ছাড়িবার পূর্ব্বে পুকুরটিকে পুনরায় পরিষ্কার করাইতে হইবে। তৎপরে রুই, মিরগেল, কাৎলা প্রভৃতি সুখাদ্য মৎস্যের ডিম্ব মূলধন অনুসারে ক্রয় করিয়া ছাড়িতে হইবে। এই মাছের এক এক ভার ডিম ৬৲ কিম্বা ৭৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। এক সপ্তাহ পরে এই ডিম ফুটিলে, আর এক সপ্তাহকাল রীতিমত খাদ্য প্রদান করিয়া একটু বৃদ্ধি করতঃ অনায়াসে বিক্রয় করা যাইতে পারে। যাঁহারা অন্ততঃ ১০০৲ টাকা লইয়া মৎস্যের চাষ করিতে আরম্ভ করিবেন তাঁহাদিগের পক্ষে এই সময়ে বিক্রয় না করাই যুক্তিসঙ্গত। রীতিমত মৎস্যের চাষ করতঃ ভোঁদড় ও অন্যান্য হিংস্রজন্তুর গ্রাস হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিয়া এক বৎসর অন্তে বিক্রয়ে যে অধিক লাভের সম্ভাবনা, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। যাঁহাদিগের মূলধন নিতান্ত কম, এমন কি এক ভার ডিমের অধিক ক্রয় করিবার সুবিধা হয় না এবং নিজের ২।১টী পুকুর ব্যতীত আর পুকুর নাই, তাঁহারাই উল্লিখিত রূপে বিক্রয় করিয়া মূলধন বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারেন। এইরূপ আষাঢ় মাসের প্রথম হইতে ভাদ্র মাসের শেষ পুকুরে ৪।৫ বার ডিম ফুটাইয়া অনায়াসে বিক্রয় করা যাইতে পারে এবং শেষের বারে যে সকল ডিম ফুটান যাইবে, তাহার কিছু বিক্রয় করিয়া অবশিষ্ট চাষের জন্য রাখা যাইতে পারে। সমুদ্রে মৎস্য ধরা বৃহৎব্যাপার, কিন্তু পুষ্করিণীতে মৎস্যের আবাদ অল্প মূলধনে হইতে পারে। যে কোন উপায়েই হউক মৎস্যবংশের বৃদ্ধি করা আবশ্যক। সার কথা, জেলেরা মৎস্য আবাদ করিয়া যে পরিমাণ কৃতকার্য্য হইতে পারে, ভদ্রলোকের পক্ষে ততদূর সম্ভব নহে। মৎস্য জন্মাইবার অনেক অন্তরায়ও আছে, ভাল পুকুর চাই, মৎস্য প্রতিপালনের কৌশল জানা চাই, ভাল জাল, ভাল জেলে চাই, অনেক বিঘ্ন বিপদে মৎস্য মরিয়া যাইতে পারে। ব্যবসা লাভের বটে, কিন্তু যতদূর লাভ দেখান হইয়াছে তত লাভ কদাচিৎ ঘটে। কৌশল জানা না থাকিলে লোকসান পদে পদে।

গো-বংশ বৃদ্ধি।

ইহা এখন একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—আহারে অনাহারে গো-বংশ ত ধ্বংসমুখে। একদিকে মানুষের আহারের জন্য কত গরু মরিতেছে আবার ধর্ম্মের ষাঁড় আর বড় দেখা যায় না; ইহার উপর এখন মানুষেরই খাদ্যাভাব, সুতরাং ধর্ম্মের ষাঁড় প্রতিপালন করিবার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ত অনেকেরই নাই; কাজেই গো-বংশের বৃদ্ধি ত দূরের কথা, ক্রমে লোপই পাইতেছে। অনেকে শুনিয়া সুখী হইবেন, এই সদুদ্দেশ্যে পঞ্জাবের মণ্টগোমারি জেলার পাকপাওন নামক স্থানে দুই জন জমিদারকে ৬ হাজার ৯ শত বিঘা জমি জমা দেওয়া হইতেছে। ইহার কার্য্য কিরূপ চলিতেছে, কৃষি-বিভাগের ডাইরেক্টর তাহার পরিদর্শন করিবেন। উত্তম ব্যবস্থা, সর্ব্বত্রই এইরূপ হওয়া উচিত।

গো-খাদ্যের উপায়।—গো-খাদ্যের অভাবানুভবে মাদ্রাজের একজন লেখক ব্যথিত হইয়া, হিন্দু-পত্রিকায় একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে সূর্য্যমুখী ফুলের চাষ গো-খাদ্যের অভাব কমিতে পারে, এ বাক্য বস্তুত সত্য। এখানে সূর্য্যমুখী ফুল আছে বটে, কিন্তু তাহা গো-খাদ্যের উপায়-স্বরূপে ব্যবহৃত হয় না। রুষিয়ায় এ ফুলের দস্তর মত চাষ হয়। ইহা সেথায় মানুষের ও গো-মহিষাদির খাদ্য। আমেরিকার মেক্সিকো এবং পেরু প্রদেশে সূর্য্যমুখী ফুল জন্মিয়া থাকে। চীন তুর্কস্থানে ইহার প্রচুর আবাদ হয়। সেথায়

ইহার ফুল বারমাস ফুটে না; তবে যখন ফুটে, তখন ইহাতে প্রচুর বীজ হইয়া থাকে। সেই বীজ সেখানকার লোক কাঁচাও খাইয়া থাকে। চুর্ণ বীজ হইতে খৈল হয়, পরে সেই তৈলের খৈল গো-মহিষাদির খাদ্য। তাহাতে ঘোড়ার খাদ্যও চলে। পাতায় ডাটায় সুচারু খাদ্য মিলে। শুকনো ডাটায় জ্বালানির কাজ হয়। গো-খাদ্য-রূপে কি, আর মনুষ্য খাদ্যরূপে কি, ইহা বলকারক। রুষিয়ায় সূর্য্যমুখী ফুলের বীজেতে মানুষের খোরাক চলে। নেটালে সূর্য্যমুখী ফুলের বীজেতে সাবান হয়, তৈলও হইয়া থাকে। ইহার তৈল সুগন্ধ। পাতা-ডাঁটা জমির সারে লাগে; পরন্তু গো-মহিষাদির খোরাকি চলে। গো-বংশকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে যবের, গমের, জৈয়ের চাষের সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার, ভুট্টার, মটর, ফল ফুলের প্রচুর আবাদ প্রয়োজনীয়। এই সবই ত কাজের কথা।

গো-খাদ্যের অভাব।—খাদ্যাভাব কেন? বনজঙ্গলের যেরূপ আটঘাট বাঁধা কড়াকড়ি বিধান, তাহাতে গো-মহিষাদির আহার-সংগ্রহ দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তদুপরি অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ফলে গ্রামের ভিতরে বা পার্শ্বে ঘাস নষ্ট হইয়া যায়। দেখিতে গেলে দোষ আমাদেরই ত। আমরা শাস্ত্র কথা ভুলিতেছি, ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছি। অগ্নিপুরাণে আছে, নিজের অন্নসংস্থানের জন্য লোকের যেরূপ চেষ্টা থাকা উচিত, গো-মহিষাদির খাদ্য-সঞ্চয় জন্য সেইরূও চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের অন্নসংস্থানের জন্য যেমন জমি জমা রাখিতে হয়, গো-মহিষাদির খাদ্য-সংস্থান জন্য তেমনই জমি জমা রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। না রাখিলে মৃত্যু দণ্ড। গো-মহিষাদি যদি সূর্য্যাকর-তপ্ত শস্য-শূন্য ভূমিতে বিচরণ করে, আর মানুষ যদি তাহা দেখে, তাহা হইলে মানুষের পাপ হয়, ইহা ত শাস্ত্রের বাণী। আজ কাল অনেকেই শাস্ত্র-বাণীর অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তবে এখনও কোন কোন স্থানে মানুষ ধর্ম্ম মানিয়া চলে, তাই এখনও গো-মহিষাদির সমূলে বংশ ধ্বংস হয় নাই। এ সম্বন্ধে মাদ্রাজের কোয়ম্বটুর জেলার কৃষককুল পূর্ণ আদর্শ। তাহারা অগ্রে গো-মহিষাদির খাদ্য-শস্যের জন্য জমি জমার ব্যবস্থা করিয়া, তবে নিজের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে। সর্ব্বত্রই ত এইরূপ হওয়া উচিত। নহিলে গো-মহিষাদি বাঁচিবে না, শিশুগণকে বাঁচান দায় হইবে।

জর্ম্মণের কাগজ।—এখন জার্ম্মণ রাজ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যে পুরুষকারের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। বাণিজ্যে রাজার লক্ষ্য আছে। রাজ-সাহায্যে, এত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জর্ম্মাণের বিট চিনি আজ বিশ্ববিজয়ী। কাগজের ব্যবসায়ে জর্ম্মণী ক্রমে জগজ্জয়ী হইবার উপক্রম করিতেছে। সেখানে কাগজ প্রস্তুত করিবার নিত্য কত উপকরণের উদ্ভাবনা হইতেছে। কাঠের গুড়ায় সুন্দর কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদিন জর্ম্মণীর নিজস্ব কলে কাঠের গুড়া হইত, এখন ক্রমে কাঠ ফুরাইয়া আসিতেছে। অন্যত্র কাঠের গুড়া সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। সে জন্য লক্ষ্য আপাততঃ আফ্রিকায়। ভারতে বনেরও অভাব নাই, কাঠেরও অভাব নাই। ভারতে কাগজ প্রস্তুত করিবার কাঠ ব্যতীত আরও অনেক উপকরণ পুঞ্জে পুঞ্জে স্তূপীকৃত। শণে, খড়ে, বাঁশে, কাঠে কিসে না গুঁড়া হয়, কোন গুঁড়ায় না কাগজ হয়? আমাদের দেশে কি বা নাই। তা আছে সবই, নাই কেবল দৃষ্টি আর প্রবৃত্তি। সে দৃষ্টি আর প্রবৃত্তি থাকিলে কি বিলাত কিম্বা জর্ম্মণীকে আমাদের কাগজ যোগাইতে হইত? আমাদের এখানে উপকরণও আছে, আমাদের দেশে মজুরিও সস্তা। চেষ্টায় না হয় কি?

বৈদ্যুতিক লাঙ্গল।—শুনিলাম এক বাঙ্গালী কোম্পানী পূর্ণিয়া জেলার কাটিহার ষ্টেশনের কাছে কতকটা ভূমি লইয়া ক্যানেডার বৈদ্যুতিক লাঙ্গল চালাইয়া চাষ আবাদের কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। এক সঙ্গে ছয়খানা লাঙ্গল চলিতেছে। এ লাঙ্গল শুষ্ক ও কঠিন জমী হইলে ভাল কাজ করে। সবিশেষ খবর এখনও আমরা পাই নাই।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

মাঘ মাস।

সব্জীক্ষেত্র।--বিলাতী সব্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যে গুলি এখন ক্ষেত্রে আছে, তাহাতে

মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া, সেই ক্ষেত্রে চৈতে বেগুন ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

ভূঁয়ে শশা, করলা, খরমুজ, ঝিঙ্গা প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারি করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা উচিত। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের ফুল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফুল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমাণে ধরিবে ও ফল ঝরিয়া যাইবে না। আনারসের গাছের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। গোবর ছাই মাটি আনারসের পক্ষে প্রকৃষ্ট সার। আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতি-পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তবে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফলের বাগানের অনতিদূরে তৃণ, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আগুন দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে, ফলে পোকা লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল ঝরা নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে, কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহত ভাবে লাগিতে পায়, এরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড রচনা করিবে।

বর্ষাকালে যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ পুতিবে, সেই সকল স্থান প্রায় দুই হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই গর্ত্ত খোঁড়া মাটিগুলি কিছু দিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সারমাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে করিয়া, খোঁড়া মাটি দ্বারা গর্ত্ত ভরাট করিবে।

পুরান ডালের কুল ও পিয়ারা ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পুরাণ ডাল প্রতি বৎসর ছাঁটা উচিত।

কৃষিক্ষেত্র।—সম্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে জল হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে, তাহাতে এই মাসে সার দিবে। আলু ও কপির জন্য পলিমাটি দিয়া জমি তৈয়ারি করিয়া রাখিবে। এই মাস হইতেই ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মূলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে, তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরি-বার আগে মূলার আগার দিকে চারি অঙ্গুলি রাখিয়া, তাহার মধ্যে খোল করিবে এবং ঐ খোলে জল দিয়া নিচের দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পুরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীষ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়েও উত্তম বীজ উৎপন্ন হইবে। এই মাসের প্রথম পনের দিনের পর, হলুদ ও আদা তুলিতে আরম্ভ করিবে। হলুদের ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ, গোবর মিশ্রিত জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। একবার উৎলাইয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুক্‌না হইলেই হলুদগুলি রোজ একবার ডলিয়া দিবে। ডলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরি-ষ্কার হয়। চীনা বাদাম এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান।—ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সমস্ত ফুটিয়াছে। গোলাপ এখন প্রচুর ফুটিতেছে। গোলাপ ক্ষেতে এখন যেন জলের অভাব না হ । গোলাপের কলম বাঁধা শেষ হইয়াছে। বেল, মল্লিকা, যুথিকা ইত্যাদির ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাঁটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্যপ্রদেশে এখন এষ্টার, হাটিজ, লর্কস্পর, পিঙ্কস, ফ্লাক্স, ডেজি, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হইবে এবং শীত-কালের সজী যথা,—গাজর, সালগম, লেটুস, বাঁধা-কপি, ফুলকপি, মূল্যবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

এই মাসের শেষে বেল, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছগুলির তদ্বির না করিয়া জল্‌দি ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

বিজ্ঞাপন।

"শক্তি শিকড়।"

ইহা প্রক্রিয়া বিশেষে ধারণ করিতে হয় মাত্র, কোন কঠিন নিয়মাদি পালন করিতে হয় না। ইহাতে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, পুংশক্তি হ্রাস প্রভৃতি যাবতীয় ধাতু রোগ দূরীভূত হইয়া অচিরেই শরীরে বলবীর্য্য ও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করতঃ হৃষ্টপুষ্ট করিবে। বহু পরীক্ষিত ও প্রত্যক্ষ ফলদায়ক, অতি যৎসামান্য ব্যয়ে এমন মহদুপকারী জিনিস লউন, যে কেহ পত্র মধ্যে ।৵০ পাঁচ আনার টিকিট পাঠ মাত্র পাঠাইলেই শিকড় ও ব্যবস্থা পাইবেন, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। অব্যর্থ ফল হয় কিনা।

জি, রক্ষিত,
কুশিদা, তুলসীহাটা পোঃ, মালদহ।

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল।

৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

সভাপতি—মহারাজ স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাদুর কে, টী।

জেনারেল ক্লাস ঃ—এখানে ড্রয়িং পেন্টিং, ফটো-এন্‌গ্রেভিং, ফটোগ্রাফি, লিথোগ্রাফি, ড্রাফট্‌সমান, ড্রয়িং ও প্রিন্টিং ইত্যাদি বিষয় প্রসিদ্ধ শিল্পীগণ দ্বারা নিয়মিতরূপে শিক্ষা দেওয়া হয় ও ঐ সকল কার্য্য সুলভে সম্পন্ন হয়। বিশেষ বিবরণের জন্য অর্দ্ধ আনার ষ্ট্যাম্পসহ আবেদন করুন।

"শিল্প ও সাহিত্য"

সচিত্র মাসিক পত্র। ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ দ্বারা সম্পাদিত। অগ্রিম ২৲ টাকা মাত্র। ৵১০ ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে নমুনা পাইবেন।

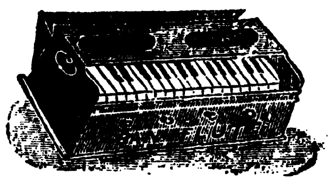
শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, অধ্যক্ষ।
৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যদি সুগায়ক হইতে চান

তবে একটী

"বাণী ফ্লুট"

ক্রয় করুন।



কারণ ইহার মাল-মসলা সমস্ত বিশুদ্ধ ও ভারতীয় জল-বায়ুর উপযোগী। আমাদের নিজ তত্ত্বাবধানে সুদক্ষ কারিকরের নির্ম্মিত। ইহার 'রীড' ফ্রান্সে প্রস্তুত ও স্বর অতি সুমধুর। অল্প মূল্যে সুন্দর, স্থায়ী ও নির্দ্দোষ যন্ত্র ক্রয় করিতে হইলে ইহাই আপনার ক্রয় করা উচিত।

মূল্য ২০৲ টাকা ও তদূর্দ্ধ।

অন্যত্র ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দোষ কি?

পত্র লিখিলে সচিত্র মূল্য-তালিকা পাঠান যায়। মেরামতের কার্য্য অতি যত্নের সহিত করিয়া থাকি।

দি বাণী ট্রেডিং এজেন্সী—

৬৯ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা কার্য্যালয়—

৬৯১, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।



কেশরঞ্জন নূতন নহে। এ নবযুগে, গত শতাব্দীতে যখন দেশে কোন স্বদেশী সুগন্ধি কেশ-তৈলের প্রচলন ছিল না—কেশরঞ্জন তখন আবির্ভূত হইয়া, দীর্ঘকাল ধরিয়া—আজও পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে, সমগ্র ভারতবাসীর সেবা করিয়া আসিতেছে। নিত্য নব নব বিজ্ঞাপন-রঙ্গে রঞ্জিত কত কেশতৈল বাহির হইতেছে; কিন্তু কেশরঞ্জনের প্রতাপ প্রতিপত্তি সুযশঃ এখনও অক্ষুণ্ণ।

প্রকৃত সুন্দর কে ?

এ প্রশ্নের উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যিনি নিত্য **কেশরঞ্জন** ব্যবহারে স্নান করেন। স্নানান্তে মুখে যে মধুর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, তাহা দর্পণ-সাক্ষাতেই প্রথম প্রমাণিত হয়। রমণীর মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী কে?—যিনি স্বীয় আগুলফ-লম্বিত কেশগুচ্ছ নিত্য কেশরঞ্জনপরিসিক্ত করিয়া বেণীরচনা করেন। ইহাতে যে কেবল বেণীর সৌন্দর্য্য বাড়ে এরূপ নহে—মুখের কমনীয়তাও বৃদ্ধি পায়· "কেশরঞ্জন" শুধু বিলাসভোগের উপকরণ নহে,—মস্তিষ্কের উষ্ণতা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, বিষণ্ণতা, নিদ্রাহীনতা দুরীকরণের ইহাই একমাত্র শক্তিসম্পন্ন কেশতৈল।

এক শিশি ১৲ টাকা; মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা।
তিন শিশি ২।০ নয় সিকা; মাশুলাদি ॥৵০ আনা।
ডজন ৯৲ নয় টাকা; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

শ্বাসারিষ্ট।

ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শ্বাস, কাস এবং তজ্জন্য শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, বক্ষোমধ্যে ভার ও আকর্ষণ-বোধ, মুখমণ্ডল ফিকা ও ধূম্রবর্ণ, সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম, হস্তপদাদির শীতলতা, শ্লেষ্মসহ রক্তদর্শন প্রভৃতি যাবতীয় উপদ্রব সকল নিশ্চয়রূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। শ্বাসের প্রবল বেগকালে একবার মাত্র সেবন করিলেই তৎক্ষণাৎ সকল যন্ত্রণার উপশম হয়।

এক শিশি ঔষধ ও এক কৌটা বটিকার মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল ।৵০।

কর্ণরোগান্তক তৈল।

আমাদের "কর্ণরোগান্তক তৈল" ব্যবহার করিলে, কর্ণশূল (কটকটানি,) কাণে পুঁজ পড়া ও কর্ণপ্রদাহ প্রভৃতি যাবতীয় কর্ণরোগ আরোগ্য হয়। শ্রবণ-যন্ত্রের পীড়ায় নানা কারণে অসুবিধা-ভোগ করিতে হয়। অনেকে যাতনায় হয় ত দিন রাত ছটফট করিয়া কাটান। অনেক স্থলে এই সমস্ত কর্ণরোগের পরিণামে অনেকে বাধির্য্য (কালা) রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। আমাদের "কর্ণ-রোগান্তক তৈল" বাধির্য্যরোগেও মহোপকারী। কর্ণরোগের প্রথম অবস্থায় ইহা অল্পদিন ব্যবহার করিলেই ফল পাওয়া যায়। জটিল অবস্থায় কিছু দিন ধরিয়া ব্যবহার করিতে হয়! প্রয়োগকালে কোন প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভূত হয় না· কর্ণ যেন শীতল হইয়া যায়। এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ।৵০ পাঁচ আনা।

প্রমেহবিন্দু।

আমাদের "প্রমেহবিন্দু" সর্ব্ববিধ মেহঘটিত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। সাধারণের অনায়াসলব্ধ করিবার জন্য অনেক দেখিয়া শুনিয়া, আমরা এই অব্যর্থফলপ্রদ, আশুমন্ত্রশক্তিসম্পন্ন "প্রমেহবিন্দু" আবিষ্কার করিয়াছি। নূতন ও পুরাতন—উভয়বিধ অবস্থাতেই ইহার ব্যবহার চলিতে পারে। মূল্য এক শিশি প্রমেহবিন্দু ও এক কৌটা বটিকা ১॥০ দেড় টাকা। ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ।৵০ সাত আনা।

গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস কেমিক্যাল সোসাইটি, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এণ্ড সোসাইটি ও লণ্ডন সোসাইটি অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কা

Telegrams—KESHRANJAN, CALCUTTA.

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

মাঘ, ১৩১৭।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



একাদশ খণ্ড,—১০ম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস।

মাঘ, ১৩১৭।

কলিকাতা ; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা ; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

সূচী পত্র।

মাঘ, ১৩১৭ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
কৃষি-প্রবাদ ...	... ২১৭
শুণ্ঠি (শুঁঠ) আদা ...	... ২২০
পালা শসা ...	... ২২৩
গোধূম ...	... ২২৬
জল-নির্ণায়ক যন্ত্র ...	... ২২৮
পত্রাদি ...	... ২৩১
প্রাদেশিক কৃষি-সংবাদ	... ২৩৩
সার-সংগ্রহ ...	... ২৩৪
বাগানের মাসিক কার্য্য	... ২৪০

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ খণ্ড। | মাঘ, ১৩১৭ সাল। | ১০ম সংখ্যা।

কৃষি-প্রবাদ।

শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস লিখিত।

শস্য বপনের সময় ও প্রণালী।

"ভাদরের চারি আশ্বিনের চারি।
কলাই রোব যত পারি॥"

ভাদ্রের শেষ চারি দিন এবং আশ্বিন মাসের প্রথম চারি দিন এই আট দিন কলাই বপনের মুখ্য সময়। সুতরাং ঐ সময়েই কলাই বপন করা উচিত।

"সরিষা বনে কলাই মুগ।
বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক॥"

এক জমিতে সরিষা ও কলাই এবং সরিষা ও মুগ এক সঙ্গে বপন করিলে একই জমিতে দুইটী ফসল পাওয়া যায়। সুতরাং কৃষক বুক চাপড়াইয়া আনন্দ করিয়া বেড়াইতে পারে।

"খনা বলে চাষার পো।
শরতের শেষে সরিষা রো॥"

খনা কৃষকপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। শরতের শেষে অর্থাৎ আশ্বিন মাসের শেষে সরিষা বপন কর।

"ফাগুনের আট, চৈতের আট
সেই তিল দায়ে কাট॥"

ফাল্গুন মাসের শেষ আট দিন এবং চৈত্র মাসের প্রথম আট দিন তিল বপনের মুখ্য সময়। ঐ সময়ে তিল বপন করিলে, তিল গাছ তেজস্বী হইয়া প্রচুর ফল প্রসব করে। সেই গাছ এত মোটা, বড় ও বিস্তৃত হয় যে, হস্ত দ্বারা উপড়াইতে পারা যায় না। কাটারি করিয়া গাছগুলি কাটিতে হয়।

"দুহাত অন্তর পুতিলে বেগুণ।
তাতে ফল পাবে দ্বিগুণ॥"

দুই হাত অন্তর বেগুণ গাছ রোপণ করিলে দ্বিগুণ ফল পাওয়া যায়, দুই হাত অপেক্ষা কম অন্তর বেগুণ গাছ রোপণ করিলে গাছগুলি লম্বা হইয়া উর্দ্ধদিকে উঠিয়া থাকে। শাখা প্রশাখা প্রায় কিছুমাত্র হয় না। শুদ্ধ বেগুণ গাছ কেন, যে কোন গাছ ঘন করিয়া রোপণ করিলে ঐরূপ লম্বা হইয়া উর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে, শাখা প্রশাখা হয় না। তজ্জন্য ফল খুব কম হইয়া থাকে।

বেগুণ গাছ দুই হাত অন্তর রোপণ করিলে চারিদিকে বহু শাখা প্রশাখা বিস্তারিত করিয়া বহুসংখ্যক ফল প্রসব করে।

"আশ্বিনের উনিশ।
কার্ত্তিকের উনিশ॥
বাদ দিয়া যত পারিস।
মটর কলাই বুনিস॥"

আশ্বিন মাসের শেষ উনিশ দিন এবং কার্ত্তিক মাসের প্রথম উনিশ দিন বাদ দিয়া, তার পরে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের ২০শে'র পর হইতে মটর কলাই বপন করিতে হইবে।

"যদি থাকে কড়ির গোঁ।
চৈত্র মাসে ভুট্টা রো॥"

যদি চৈত্র মাসে ভূট্টা রোপণ করা যায়, তাহা হইলে প্রচুর পরিমাণে ভূট্টা উৎপন্ন হয়। তাহা বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করা যাইতে পারে।

"খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি॥"

যে কৃষক নিজে জন মজুর ও চাকরদের সহিত একত্র কৃষিকার্য্যে পরিশ্রম করে, সে পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারে; কারণ কৃষক আপন জমিতে যথোচিত পরিশ্রম করিয়া চাষের কার্য্য সম্পন্ন করে। যে সকল জনমজুর ও চাকর সেই কৃষকের সহিত চাষের কার্য্য করে, তাহাদিগকেও সেই কৃষকের ন্যায় সমান পরিশ্রম করিতে হয়; সুতরাং কৃষকের যথোচিত ফল লাভ হয়। যে জন মজুর ও চাকরদের খাটাইবার জন্য নিজে ছাতা মাথায় দিয়া মাঠে বসিয়া থাকে, সে অর্দ্ধেক ফল লাভ করে। যে জন মজুর ও চাকরদের খাটাইবার জন্য মাঠে না গিয়া ঘরে বসিয়া তাহাদিগকে কার্য্য করিবার জন্য অনুমতি করে, তাহার—এ বৎসর যেমন তেমন করিয়া চলিলেও তৎপরবর্ত্তী বৎসর অন্নের জন্য লালায়িত হইতে হয়।

কৃষি পুরাণজ্ঞ ঋষি পরাসর যথার্থই বলিয়াছেন।

ফলত্যবেক্ষিতা স্বর্ণং দৈন্যং সৈবানবেক্ষিতা।
কৃষিঃ কৃষি-পুরাণজ্ঞ ইত্যুবাচ পরাশরঃ॥

কৃষিকার্য্যের উত্তমরূপ তত্ত্বাবধান করিলে উহা হইতে সোণা ফলে, পক্ষান্তরে কৃষিকার্য্য উপেক্ষিত হইলে উহা দৈন্য আনয়ন করে।

কৃষি পর্য্যবেক্ষণ সম্বন্ধে অন্যান্য ঋষিগণের অনুশাসন এই যে,—

পিতুরন্তঃ পুরং দদ্যান্মাতুর্দদ্যান্মহানসম্।
গোবুচাত্মসমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষি ব্রজেৎ॥

পরন্তু ঋষিগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে কৃষক গোরক্ষণে তৎপর, নিজে ক্ষেত্রে গমন করে, কালজ্ঞানে অভিজ্ঞ, উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহে তৎপর ও আলস্য রহিত সে সর্ব্বশস্য উৎপাদন করে এবং কখনও ব্যর্থমনোরথ হইয়া অবসর প্রাপ্ত হয় না।

"ফাগুনে আগুণ চৈত্রে মাটি।
বাঁশকে রেখে, বাঁশের পিতামহকে কাটি।"

বাঁশের পাতা মাঘ ফাল্গুন মাসে ঝরিয়া পড়ে। ঐ সকল পাতা বাঁশ ঝাড়ের গোড়ায় থাকে। ঐ বাঁশ পাতায় ফাল্গুন মাসে আগুণ লাগাইয়া দিলে, বাঁশের গোড়াগুলি সামান্য দগ্ধ হয়। তৎপরে চৈত্র মাসে বাঁশের গোড়ায় মাটি দিতে হয়। সেই মাটি পুরাতন পুকুরের পাঁক হইলে ভাল হয়। বাঁশ ৩।৪ বৎসরের না হইলে কাটা উচিত নহে। এইরূপ নিয়মে চলিলে প্রচুর বাঁশ জন্মিয়া থাকে।

"বার বছরে ফলে তাল।
যদি না লাগে গরুর নাল॥"

তালের আঁটি বপন করিবার পর তাল গাছের চারার কোমল পাতা গরুতে না খাইলে বার বৎসরেই তাল ফলিয়া থাকে।

"হাত বিশে করি ফাঁক।
আম কাঁটাল পুঁতে রাখ॥
গাছ গাছালি ঘন সার না।
গাছ হবে তায় ফল হবে না।"

কুড়ি হাত অন্তর করিয়া আম কাঁটাল বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়। ঘন করিয়া গাছ রোপণ করিলে গাছ বলবান হয় না এবং লম্বা হইয়া উর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে। শাখা প্রশাখা খুব কম হয়। ফল প্রায় হয় না।

"সাত হাত অন্তর এক হাত বাই।
কলা রুয়ে খেও ভাই॥
রুয়ে কলা না কেটো পাত।
তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত॥"

আট হাত অন্তর কলা গাছ রোপণ করিতে হয়। এক হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া কলা গাছ পুতিতে হয়। কম গর্ত্তে কলা গাছ বসাইলে কলা গাছ ঝড়ে সহজে উপাড়িয়া যায়। কলার পাত না কাটিলে কলা গাছে প্রচুর কলা উৎপন্ন হয়। এত অধিক ও উত্তম জন্মে যে, তাহতেই অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়।

"ডাক দিয়ে বলে রাবণ।
কলা রোবে আষাঢ় শ্রাবণ॥
তিনশ ষাট ঝাড় কলা রুয়ে।
থাকগে চাষী খাটে শুয়ে॥
রুয়ে কলা না কাটিস্ পাত।
তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত॥"

আষাঢ় শ্রাবণ মাসেই কলা গাছ রোপণ করা উচিত। ঐ সময় বর্ষাকালের প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায়, শীঘ্রই কলা গাছ লাগিয়া যায়। ভাদ্র মাসে কলা গাছ রোপণ নিষিদ্ধ। তিনশত ষাইট ঝাড় কলা গাছ রোপণ করিলে চাষীর আর অন্ন বস্ত্রের কষ্ট থাকে না। ঐ তিনশত ষাইট ঝাড় কলা গাছের আবাদ করিয়া কৃষক আর পরিশ্রম না করিলে তাহার কোন ক্ষতি হয় না। সে কলা ইত্যাদি বেচিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। তাহার পক্ষে খাট খরিদ ও তাহার উপর শয়ন করা বিচিত্র নহে। ফলতঃ কলার চাষে প্রচুর লাভ হইয়া থাকে।

"পেটের বাছা।
বাড়ীর গাছা॥"

পেটের ছেলের দ্বারা যেরূপ উপকার পাওয়া যায়, বাড়ীতে গাছ পালা থাকিলে, তাহার ফল ইত্যাদিতেও বিস্তর উপকার পাওয়া যায়। ফলতঃ বাড়ীতে বা বাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থানে আম কাঁটাল প্রভৃতি ফলের গাছ এবং তরিতরকারীর গাছ রোপণ করিলে বিস্তর উপকার পাওয়া যায়।

"ফাগুনে এঁটে।
দাও কেটে॥
বেধে যাবে ঝাড়।
কলা বহিতে ভাংবে ঘাড়॥"

যদি ফাগুন মাসে কলা গাছের এঁটে কাটিয়া এবং ২।১টী কলা চারা রাখিয়া অবশিষ্ট চারা তুলিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে কলার ঝাড় খুব বৃহৎ হয় এবং কলা ও কলার কাঁদি এত বড় হয় যে তাহা বহন করিতে ঘাড় ভাঙ্গিয়া যায়।

(ক্রমশঃ।)

শুণ্ঠি (শুঁঠ), আদা।

শুষ্ক আদারই নামান্তর শুণ্ঠি। আয়ুর্ব্বেদে ইহার পর্য্যায়ে বিশ্বভেষজ, মহৌষধ, শৃঙ্গবের, প্রভৃতি নাম দেখা যায়; বস্তুতঃ ইহার গুণকারিতা এত অধিক যে অধিকাংশ ঔষধে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। এলোপ্যাথিক ও হাকিমীতেও ইহার প্রচুর ব্যবহার হয়। ফারসী ও আরবীতে ইহার নাম জিঞ্জিবিল, সম্ভবতঃ ইহা শৃঙ্গবের শব্দেরই অপভ্রংশ। এসিয়া মহাদেশের সর্ব্বত্র ইহা জন্মিয়া থাকে। হিমালয়ের ৪।৫ হাজার ফিট উচ্চ ভূভাগ হইতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই অল্প-বিস্তর উৎপন্ন হয়; বঙ্গদেশের মধ্যে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, ২৪ পরগণা, হুগলী, যশোহর প্রভৃতি জিলায় ইহার বিস্তর চাষ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজের শার্ণদ (Shernaad) জিলাজাত শুঁঠ অতি উৎকৃষ্ট ও অধিকতর মূল্যে বিক্রয় হয়। ইহার আদি জন্মস্থান কোথায় নির্দ্দেশ করা কঠিন, কাহারও মতে চীন দেশ ইহার জন্মস্থান; শুনা যায় যবদ্বীপে (আধুনিক নাম জাভা Java) শৃঙ্গবেরপুর নামে এক পুরাতন নগর আছে সম্ভবতঃ ইহা হইতে শৃঙ্গবের নাম উৎপন্ন হইয়া থাকিবে এবং জাভাই ইহার জন্মস্থান। কেহ কেহ মালয় উপদ্বীপের রাজধানী শিঙ্গারপুর (Singapure) হইতে শৃঙ্গবের নাম উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ মত প্রকাশ করেন। যাহা হউক এ সকল প্রমাণ দৃষ্টে ভারতবর্ষ ইহার জন্মস্থান নয় বলিয়াই বোধ হয়। কথিত আছে ফ্রানসিস্কো ডি মেণ্ডোজা "Francisco de Mendoga" নামক জনৈক স্পেনীয়, পূর্ব্বাঞ্চল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আমেরিকা ও জ্যামেকাতে সর্ব্বপ্রথম চাষ প্রবর্ত্তিত করেন। পঞ্জাবে ও উত্তরপশ্চিমের স্থানে স্থানে আট হইতে বার আনা পর্য্যন্ত সের দরে শুষ্ক আদাই বিক্রয় হয়, সুতরাং মূল্যবান ও ইহার প্রভূত প্রয়োজনীয়তা বলিয়া ইহার চাষ বিশেষ লাভজনক। পাটের চাষে লাভ আছে সত্য, কিন্তু পরিশ্রম অত্যন্ত অধিক; শুঁঠ পিপুল প্রভৃতির চাষে পরিশ্রম অল্প অথচ লাভ প্রচুর। বিলাতের বাজারে ১ হন্দর (প্রায় ৫৬ সের) জ্যামেকা শুঁঠের মূল্য ৫০।৬০ শিলিং; পূর্ব্বে ইহা ১৮০ শিলিং পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হইত। জ্যামেকার শুঁঠ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য হইলেও পরিমাণে অধিক উৎপন্ন হয় না, এজন্য বিলাতের বাজারে ভারতবর্ষীয় শুঁঠের আদর ও আমদানী অধিক।

নিম্নভূমি, জলা, কঙ্করময় বা নিতান্ত এঁটেল মৃত্তিকাতে শুঁঠ আদৌ জন্মে না, তদ্ব্যতীত সকল প্রকার ভূমিতে উৎপন্ন হইলেও, কিছু এঁটেল, অধিক উচ্চ ও সরস দোঁয়াশ মৃত্তিকা ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী; জঙ্গল কাটিয়া যে ভূমির নূতন পত্তন হইতেছে তাহাতেও ইহা সুন্দর জন্মে। ইহার চাষে প্রভূত জলের আবশ্যক হয়, এজন্য ভূমি সরস ও সচ্ছিদ্র (well drained) মনোনীত করিতে হইবে। চৈত্র বৈশাখ মাসে হলদ্বারা ভূমি ৫।৬ বার গভীর কর্ষণ ও চূর্ণ করতঃ তদবস্থায় রাখিয়া বৈশাখের শেষ বরাবর আর একটী বৃষ্টিপাত হইলে, পুনরায় কর্ষণ ও মই দিয়া সমতল করিতে হইবে. ইহার পর আর কর্ষণের আবশ্যক করে না, আদার ভূমি ১ হস্ত তিন পোয়া গভীর কর্ষিত ও সূক্ষ্ম চূর্ণিত হওয়া বিধেয়। দোঁয়াশ মৃত্তিকায় ইহার চাষে অধিক সার দেওয়া আবশ্যক হয় না। মাত্র হলদ্বারা মৃত্তিকা উত্তমরূপ বিপর্য্যস্ত হইলেই হইল, কিন্তু তাহার ফলন অল্প হয়, এজন্য বিঘা প্রতি ৩০।৪০ মণ শুষ্ক ও পচা গোময় সার দিতে হইবে। ভূমিতে প্রথম বার হল কর্ষণ করতঃ সার ছিটাইয়া পুনঃ পুনঃ কর্ষণ করিলে সার মৃত্তিকার সহিত উত্তম-

রূপ মিশ্রিত হইয়া উদ্ভিদের সদ্য পোষণোপযোগী হইয়া থাকে। বর্ষার অতিরিক্ত জল নির্গমনের জন্য ক্ষেত্রটী একদিকে উচ্চ অপরদিকে কিছু নিম্ন এরূপ ঢালুভাবে প্রস্তত করিতে হইবে, নতুবা অধিক জল সঞ্চিত হইলে আদা পচিয়া যায় বা গাছ বিশেষ জোর করে না।

যে আদা ৫।৬ মাস কাল মৃত্তিকা মধ্যে নিহিত আছে, বীজের নিমিত্ত তাহাই ব্যবহার করা উচিত; পুর্ব্ব হইতে উত্তোলিত বাজারে বাত শুষ্ক আদার ভাল কলা (bulb) বাহির হয় না। বীজের নিমিত্ত সংগৃহীত বাজারে আদা ২।৩ ইঞ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কাটিয়া রোপণের ১৫।২০ দিবস পূর্ব্বে আর্দ্র অথচ অন্ধকারময় স্থানে পোয়াল চাপা দিয়া রাখিতে হইবে বা কেবল স্বচ্ছ গভীর খাদ মধ্যে দুই ইঞ্চ আন্দাজ ছাই ছিটাইয়া তদুপরি ৩ ইঞ্চি স্থূলভাবে আদা খণ্ড সকল রাখিয়া পুনরায় ছাই ও পোয়াল চাপা দিয়া, উপর্য্যুপরি যতক্ষণ না খাদ পূর্ণ হয় এইভাবে সাজাইয়া সর্ব্বোপরি পোয়াল চাপা দিয়া কোন আবরণ দিতে হইবে। ১০।১৫ দিবসের মধ্যে আদার গুল্ম সমুহ হইতে ১ বা অর্দ্ধ ইঞ্চ পরিমাণ নূতন কলা বাহির হইলেই ক্ষেত্রে রোপণ করা উচিত। ক্ষেত্র হইতে সদ্য উত্তোলিত আদায় এ সকল প্রক্রিয়া করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অনেক সময় রোপণের জন্য পৃথকভাবে সংগৃহীত বীজ আদা ব্যবহার করাই বিধেয়।

জ্যৈষ্ঠ মাস বরাবর একটী বৃষ্টি হইলে সমস্ত ক্ষেত্রে কোদাল দ্বারা দীর্ঘ পংক্তিবদ্ধভাবে ১ হস্ত অন্তর ৫।৬ ইঞ্চ গভীর নালা কাটিয়া তন্মধ্যে ১ বিঘত অন্তর আদা খণ্ড বসাইয়া মৃত্তিকা চাপা দিতে হইবে, অনেকে অর্দ্ধ হস্ত বা তিন পোয়া অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে বায়ু চলাচল রোধবশতঃ ফলন অল্প হয়। গাছ বাহির হইয়া যেমন তেজ করিতে থাকিবে, তেমনি হরিদ্রার দাঁড়া বাঁধার মত উভয় পংক্তি মধ্যস্থ মৃত্তিকা কোদাল দ্বারা কাটিয়া গাছের গোড়ায় আলি বাঁধিয়া দিতে হইবে, ইহাতে বর্ষার অতিরিক্ত জল নির্গমেরও সুবিধা হয়। বর্ষায় বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব অল্প হইলে নালার মুখগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত, কারণ এই মুলজ উদ্ভিদ অতিরিক্ত জলে যেমন পচিয়া যায়, আবার অল্প জলেও সেইরূপ আদৌ বৃদ্ধি পায় না। কোথায়ও কোথায়ও এজন্য দীর্ঘখণ্ডে আলি না বাঁধিয়া ভূমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভাগ করতঃ আলি বাঁধিয়া দেয়, ইহাতে ক্ষেত্রের সমস্ত জল খণ্ডে খণ্ডে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় একেবারে বাহির হইবার সুবিধা পায় না, শোষিত হইয়া বহু বিলম্বে অতিরিক্ত জল বহির্গত হয়। হরিদ্রা সাধারণতঃ এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডেই রোপিত হইতে দেখা যায়। এই প্রণালীমত আদা অতি সুন্দর ও অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে। বর্ষার জলে গাছ সতেজে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এ সময়ে মধ্যে মধ্যে নিড়ানী দ্বারা খুড়িয়া মৃত্তিকা শিথিল ও জঙ্গল পরিষ্কার করা এবং ভাঙ্গা দাঁড়া বাঁধিয়া গাছের গোড়ায় মাটী ধরান ভিন্ন অন্য কোন পাইটের আবশ্যক হয় না।

ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বর ও উত্তমরূপ প্রস্তত হইলে ভাদ্র আশ্বিনের মধ্যেই সমস্ত ক্ষেত্রটী ১॥০।২ হস্ত উচ্চ গাছে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, মৃত্তিকা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সময়ে আর একবার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নিড়াইয়া দিতে পারিলে আদার নূতন ও কোমল কন্দগুলি (Rhizomes) মৃত্তিকার শিথিলতা ও অভ্যন্তরে বায়ু প্রবেশ নিবন্ধন আকারে বৃহত্তর ও সুপুষ্ট হইয়া থাকে। আদা সুপুষ্ট ও পরিমাণে অধিক জন্মিলে অনেক সময় ক্ষেত্রের দাঁড়ার মৃত্তিকা অল্পবিস্তর ফাটিয়া যায়। পৌষ মাঘ বরাবর শীতের

প্রকোপে গাছ শুষ্ক হইয়া আইসে, এ সময়ে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ পাতাগুলি ঝরিয়া যাইবার ১০।২০ দিবস পরে কোদাল দ্বারা দাড়াগুলি ভাঙ্গিয়া আদা বাহির করিয়া লইতে হইবে।

মাদ্রাজের অন্তর্গত শার্ণদ জিলায় ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শুঁঠ উৎপন্ন হয়, এই জিলার ভূমি স্বভাবতঃ আদার চাষের উপযোগী ও অত্যল্প রসা। এখানকার মপলারা চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রস্তুত করিয়া পশ্চাৎ তাহাকে দীর্ঘে ৮ ও প্রস্থে ২।২॥ হস্ত এরূপ খণ্ডশঃ করতঃ তন্মধ্যে ৯ ইঞ্চ অন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর কাটিয়া সার মিশাইয়া দেয়, পরে জ্যৈষ্ঠের প্রথম বরাবর বর্ষণ হইলে ভূমি হইতে মূল সকল উঠাইয়া দুই ইঞ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্দে কর্ষণ করতঃ এক একটি গহ্বরে রোপণ করিয়া মৃত্তিকা চাপা দিয়া তদুপরি গাছবিশেষের কাঁচা পাতা স্থূলভাবে আবরণ দিয়া থাকে ইহাতে পাতাগুলি অল্পদিনের মধ্যে পচিয়া সারের কার্য্য করে। এই বিশেষজাতীয় বৃক্ষপত্র ঐ জিলাতেই পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বৃক্ষ সারের জন্য ব্যবহার করিলে কীট জন্মিয়া ক্ষেত্রের ফসল নষ্ট করিতে পারে বলিয়া ব্যবহার হয় না। শার্ণদের আদার এইটুকুই বিশেষত্ব, অবশেষে শুঁঠ প্রস্তুত পর্য্যন্ত অপরাপর সমস্ত পাইট ও প্রণালী পূর্ব্ববৎ।

শুঁঠ প্রস্তুত—উত্তোলিত আদা জলে ধৌত করতঃ ছুরিকা দ্বারা শিকড় ও ত্বকভাগ উত্তমরূপ চাঁচিয়া পুনরায় একখানি শণনির্ম্মিত চটের উপর মাজিয়া ঘসিয়া অবশেষে নির্ম্মল জলে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া প্রখর রৌদ্রে উত্তমরূপ শুষ্ক করিতে হইবে। শুঁঠের অভ্যন্তর ভাগে শ্বেতবর্ণ চূর্ণ পদার্থে (fecula) পরিপূর্ণ থাকে; একটু যত্ন পূর্ব্বক সুপুষ্ট আদার উপরকার ত্বকভাগ সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া ফেলিলে উহা দিব্য শ্বেতবর্ণ ধারণ করে ও ত্বক কুঞ্চিত হইবার অবকাশ পায় না। বিশেষতঃ জল যত নির্ম্মল হইবে এবং পুনঃ পুনঃ যত পরিষ্কাররূপে ধৌত করা যাইবে, শুঁঠ ততই শুভ্রবর্ণ হইয়া থাকে। মেঘাবৃত দিবসে বা রাত্রে অনাবৃত অবস্থায় শিশিরে ফেলিয়া রাখিলে শুঁঠ খারাপ হয় ও বর্ণের মালিন্য ঘটে, এজন্য দিবাভাগে প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ রাত্রে উঠাইয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে সপ্তাহকাল মধ্যে শুষ্ক হইয়া সুন্দর শুঁঠ প্রস্তুত হয়। শুষ্ক হইবার পর ইহাকে আর একবার খোরার উপর মাজিয়া ঘসিয়া ধৌত, পরিষ্কৃত ও শুষ্ক করিয়া লওয়া আবশ্যক। অতঃপর বস্তাবন্দী দুই মাসকাল ঘরে রাখিয়া পরে বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা যাইতে পারে। শুঁঠের মধ্যে যে গুলি অপুষ্ট ও হালকা এবং যাহা অনেক দিবস অযত্নে রক্ষিত হয়, তাহা শীঘ্রই কীটাক্রান্ত হইয়া পড়ে, এ জন্য বিশেষ যত্নের সহিত শুঁঠ বস্তাবন্দী করিতে হইবে। শুঁঠ যত ভাল, শুষ্ক, মসৃণ ও পরিষ্কার শ্বেতবর্ণ হইবে মূল্যও তদনুযায়ী অধিক হইবে। দেখাও যায় মৃত্তিকা ও চাষের তদ্বিরের অপেক্ষা এই প্রস্তুত প্রণালীর তারতম্যে শুঁঠের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিঘাপ্রতি চারি হইতে ছয় মণ পর্য্যন্ত শুঁঠ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। জামেকাতে বিশেষ যত্নে রোপিত ক্ষেত্রে একর প্রতি ২০০০ পাউণ্ড ফলন হয় এরূপ শুনা গিয়াছে।

সুপক্ক আদা ভূমি হইতে উঠাইয়া উষ্ণজলে সিদ্ধ করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিলে উহা কৃষ্ণবর্ণ এবং

উপরকার ত্বকভাগ চাঁচিয়া জলে ধৌত করতঃ শুষ্ক করিলে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, ইহাই যুক্তিযুক্ত; কারণ অনেক উদ্ভিদবিৎ শ্বেত ও কৃষ্ণভেদে আদা দুই জাতীয় উল্লেখ করিয়াছেন। এদেশে যে শুঁঠ উৎপন্ন হয় তাহা প্রায়ই মেটে, সাদাটে বর্ণের, কর্কশ ও কুঞ্চিতামাত্র অর্থাৎ ত্বকভাগ ভালরূপ পরিষ্কৃত না হওয়ায় এবড়ো খেবড়ো এবং চূর্ণ করিলে অতি তীব্র অথচ মনোহর ঔষধিগন্ধি ঈষৎ পীত শ্বেতবর্ণ চূর্ণ পদার্থ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বাজারে ইহা ১৫ হইতে ২৫ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়। নেপালের অন্তর্গত তৈলিহা, বুটোল, তানসেন এবং গোরখপুরের বাহাদুরগঞ্জ, তুলসীপুর, নেপালগঞ্জ, ব্রিজম্যানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে হিমালয়জাত এক প্রকার জর্দ্দা (brown) বর্ণের শুঁঠের আমদানী দেখা যায়, ইহা অত্যন্ত মলিন, কুঞ্চিতগাত্র, কর্কশ ও অপেক্ষাকৃত হীনগুণবিশিষ্ট, বাজারে ইহা ৬।৮৲ মণ দরে বিক্রয় হয়।

ক্রমশঃ।

পালা শসা।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত।

শসা সচরাচর দুই প্রকার হয়; এক প্রকার পালা শসা ও অপর চৈতে বা ভুঁয়ে শসা। চৈতে শসাকে এদিকে খিরা বলে। ফলতঃ চৈতে শসা অপেক্ষা পালা শসাই এতদঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। শসাকে ইংরাজিতে কিউকম্বর (Cucumber) বলে। পালা শসার গাছ বড় ও লম্বা হয়। ইহার জন্য মাচান প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। আর চৈতে শসার গাছ ছোট হয় ও অল্প লতানে রকমের হইয়া মাটীতেই ফল প্রসব করে। চৈতে শসার ফল গোল, আর পালা শসার ফল লম্বা লম্বা হয়। পালা শসা বর্ষাতি ফল, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার বীজ রোপণ করিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হয়। চৈতে শসার বীজ অগ্রহায়ণ কি পৌষ মাসে রোপণ করা হয়। পালা শসা আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ও চৈতে শসা চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ফল দেয়। আশ্বিন মাসের শেষে শিশির পড়িতে আরম্ভ হইলে, পালা শসার গাছ শুকাইয়া মরিয়া যায়। যে কোন প্রকার শসাই হউক না কেন, অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলেই গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ায় ফল কম ধরে। যে বৎসর বর্ষা বেশী হয়, সে বৎসর পালা শসা অধিক ফল ধরে না, প্রায়ই গাছ মরিয়া যায়। উভয় প্রকার শসাই, যে কোন সময় যত্ন করিয়া আবাদ করিলে অল্পাধিক ফল পাওয়া যাইতে পারে।

আবাদ প্রণালী চৈতে ও পালা শসা উভয়েরই এক প্রকার। যে কোন প্রকার শসাই হউক না কেন, ৪।৫ হাত অন্তর এক একটী মাদা প্রস্তুত

করিয়া তাহাতে ১০।১২ অঙ্গুলি ব্যবধানে ৫।৬টী করিয়া বীজ রোপণ করিতে হয়। মাদাগুলি গোলাকার ও উহাদের ব্যাস অন্ততঃ এক হাত হওয়া চাই। প্রত্যেক মাদায় ১০।১২টী বীজ দিলেও দেওয়া যায়। কারণ অনেক স্থলে সকল বীজ অঙ্কুরিত হয় না; হইলেও যে গুলি দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সেই গাছ গুলি তুলিয়া ফেলিয়া প্রত্যেক মাদায় ৪।৫টী গাছ থাকিলেই হয়। আর যদি সমস্ত চারাগুলি সতেজ হইয়া উঠে, তবে সাবধানে কতকগুলি চারা মাটী সমেত তুলিয়া অন্যত্র রোপণ করিলেই হইতে পারে। টবে চারা প্রস্তুত করিয়া তুলিয়া লাগাইলেও হয়, কিন্তু টবের চারা অপেক্ষা মাটীতে বীজ রোপণ করিলেই চারাগুলি বেশী সতেজ হইয়া উঠে। রৌদ্রের তেজ অধিক হইলে প্রথম প্রথম চারাগুলি মধ্যাহ্ন সময়ে ঢাকিয়া রাখিলে ভাল হয়। শসার বীজ রোপণ করিবার সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে, বীজগুলি উল্টা করিয়া অর্থাৎ মুখ নীচে করিয়া পুঁতিলে ফল ছোট ও পরিমাণ অল্প, শোয়াইয়া রোপণ করিলে ফল মধ্যমাকার এবং আড়ভাবে মুখ উপর করিয়া রোপণ করিলে ফল বড় বড় ও যথেষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। ছায়াযুক্ত স্থানে শসার আবাদ হয় না, ইহার জন্য রৌদ্রপীঠ স্থান আবশ্যক। পুরাতন গোময়, বাটীর আবর্জ্জনা পচিয়া যে সার হয়, তাহা আবশ্যক মত প্রত্যেক মাদায় দিয়া মৃত্তিকার সহিত বেশ করিয়া মিশ্রিত করিয়া তাহাতে বীজ রোপণ করিতে হয়, ইহা শসার পক্ষে উত্তম সার। বীজ রোপণ করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ ১০।১২ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া লইয়া মাদায় রোপণ করিলে ও সন্ধ্যাকালে অল্প অল্প জল সেচন করিলে ৪।৫ দিনের মধ্যেই বীজগুলি অঙ্কুরিত হইয়া উঠে।

এই সময় লাল রঙের একপ্রকার পোকা ও ফড়িঙ প্রভৃতিতে কচি পাতাগুলি খাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহাতে গাছগুলি সাদা সাদা বিবর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া অনেক মরিয়া যায়। রাত্রিকালেই ইহার উৎপাত বেশী হয়, দিবাভাগে প্রায়ই দেখা যায় না। পোকা ইত্যাদিতে নষ্ট করিয়া ফেলিতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতার আবশ্যক। হুঁকার জল, তামাকের জল, বাসি ছাই, হরিদ্রার গুঁড়া প্রভৃতি প্রয়োগ দ্বারা অনেক উপকার হয়।

শসা গাছের পাতায় ও ডালে একপ্রকার ছোট ছোট কাঁটা জন্মে। উহাতে জল লাগিলে গাছগুলি মরিয়া যাইতে পারে, এজন্য সাবধানে গাছের গোড়ায় জল দিতে হয়। চারাগুলি কিছু বড় হইলে প্রত্যেক মাদায় নিড়ানী দ্বারা মাটী আলগা করিয়া দিতে হয়, এবং বেশী দিনের বহু পুরাতন সার থাকিলে প্রত্যেক মাদায় মাটীর সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে গাছের তেজ খুব বৃদ্ধি হয়। জমিতে তৃণ বা বন জঙ্গলাদি হইতে দেওয়া উচিত নয়। গাছের গোড়ায় জল জমিবার আশঙ্কা হইলে কিছু বেশী মাটী দিয়া মাদাগুলি উচ্চ করিয়া দিতে হয়, কারণ গোড়ায় জল বসিলে গাছ মরিয়া যায়। পালা শসার গাছের গাঁইট গুলি হইতে সুতার ন্যায় সরু ও কোঁকড়ান এক প্রকার লতা বাহির হয়। গাছ বড় হইলেও সুত্রের ন্যায় লতাগুলি বাহির হইলে, কঞ্চি পুঁতিয়া দিতে হয়। লতাগুলি ঐ সকল কঞ্চি জড়াইয়া ধরিয়া মাচানে উঠে। বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া আবশ্যকমত লম্বা চওড়া মাচান প্রস্তুত করিতে হয়, এবং উচ্চ অন্ততঃ তিন হাতের কম না হয়, কারণ শৃগাল পালা শসার পরম শত্রু। মাচানের নীচে ঝুলিতে দেখিলেই খাইয়া ফেলে। উপরেও

কাকের উৎপাত কম নহে। এই সকল দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য একটী টীনের ভিতরে আঘাত লাগিয়া বাজিবার জন্য খা অন্য কিছু বান্ধিয়া দিতে হয় ও দূর হইতে দড়ি ধরিয়া টানিতে হয়। একখণ্ড মোটা বাঁশ পুঁতিয়া দুই ভাগে ফাটাইয়া, তাহাতে দড়ি বান্ধিয়া টানিলেও চলিতে পারে। কেহ কেহ কাকের উৎপাত নিবারণ জন্য হস্তে ধনুর্ব্বাণ দিয়া খড়ের কিম্ভূত কিমাকার মানুষ প্রস্তুত করিয়া উচ্চ করিয়া টাঙ্গাইয়া দেয়। এক একটী গাছে অনেক গুলি করিয়া ফল ধরে। অতিরিক্ত ফল ধরিলে বড় হইবার পূর্ব্বে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিলে, অবশিষ্টগুলি বেশ বড় বড় হয়। ফল অধিক থাকিলেই আকারে ছোট হয়। গাছ মাচানের উপর উঠিতে আরম্ভ করিলে নীচের পাতাগুলি একেবারে শুকাইয়া যায়। পালা শসা এক হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইতে পারে। কাঁচা খাওয়ার জন্য অৰ্দ্ধ হস্ত লম্বা শসাই ভাল। বেশী বড় হইলে শক্ত ও আস্বাদনের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। অল্প অল্প অম্ল বোধ হয়। তখন কাঁচা না খাইয়া তরকারী খাওয়াই ভাল। কচি শসা প্রথমে সবুজ বর্ণ হইয়া ক্রমশঃ একটু কাল রঙ হয়। আরও বড় হইলে গায়ে শাদা শাদা লম্বা দাগ হয়। বর্ষাকালে কাঁচা ও তরকারী উভয় প্রকারেই পালা শসা দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায়।

অনন্তর বীজের জন্য নীরোগ ও সুপক্ক শসা নির্ব্বাচন করিতে হইবেক। প্রথম বা দ্বিতীয় বারের ২।৪টী ফল বীজের জন্য রাখিয়া দিতে হয়। গাছে শসাটী যখন বেশ সুপক্ক হইয়া হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছে দেখিবে, তখন তুলিয়া আনিয়া সেই দিনেই বা ২।১ দিন রাখিয়া কাটিয়া ভিতরের অংশ বাহির করিলে বীজ বাহির হয়; পরে উত্তমরূপে জলদ্বারা বারম্বার ধৌত করিলেই বীজগুলি পরিষ্কার হইবে। যে বীজগুলি জলে ভাসিয়া উঠে, তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বীজগুলি রৌদ্রে ভাল করিয়া শুকাইয়া পরিষ্কার শিশিতে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া ফেলিতে হয়। বীজের সহিত ছাই মাখাইয়া রাখিলে বীজগুলি ভাল থাকে এবং পোকা ধরে না। আমাদের এ অঞ্চলে অনেকে বীজে ছাই মাখাইয়া রাখে। ছাইগুলি জল দিয়া ভিজাইয়া, তাহাতে বীজগুলি মাখাইয়া কোনও মেটে শুষ্ক দেওয়ালে লাগাইয়া রাখিয়া থাকে। যে দেওয়াল বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে ভিজিয়া সেঁতসেঁতে হইয়া আছে, তাহাতে লাগাইয়া রাখিলে বীজ পচিয়া নষ্ট হইতে পারে। আর পুনরায় রোপণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাহাতে ঐ স্থান বৃষ্টির জলে ভিজিতে না পারে, এমন স্থানে লাগাইয়া রাখিতে হইবে। শিশিতে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলেও মধ্যে মধ্যে বাহির করিয়া একটু একটু রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিলে ভাল হয়। বাঙ্গালার প্রায় সকল জেলাতেই পালা শসা হইতে পারে। বিদেশী বীজ অপেক্ষা যত্ন করিলে দেশী বীজেই আশানুরূপ ফল হইতে পারে। বিদেশী বীজ অনেক সময় অঙ্কুরিতই হয় না; হইলেও তত সুবিধা জনক ফলবান করিতে পারা যায় নাই।

গোধূম

(ভারতীয় কৃষি বিবরণী সকল অবলম্বনে)

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র লিখিত।

পৃথিবীর যত স্থানে গোধূম চাষ হয়, ভারতবর্ষ তাহার মধ্যে অন্যতম, ও প্রধানতম না হইলেও একটী প্রধান স্থান। ভারতবর্ষে যে গোধূম চাষ হয় তাহা স্থানীয় লোকের খাদ্যরূপে কতক ব্যবহৃত হয়, কতক ইংলণ্ড ও ইউরোপে রপ্তানী হইয়া থাকে।

আজকাল যেমন চারিদিকে ভারতবর্ষে ময়দার কল দেখিতে পাওয়া যায় বিশবৎসর পূর্ব্বে সেরূপ পাওয়া যাইত না। আগেকার গম প্রায় যাঁতায় গুঁড়াইয়া ময়দা করা যাইত। অপিচ ২০ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে যে সমস্ত ময়দার কল ছিল তাহাতে খুব উৎকৃষ্ট ময়দাও তৈয়ার হইতে পারিত না। কিন্তু আজকাল রোলার মিলের দিন। এখন কলের গুণে অনেক উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্ম পেসাই সম্ভব হইতেছে, কাজেই আজকালের ময়দার রকম (Quality) পূর্ব্বের হইতে অনেক উৎকৃষ্ট হইতেছে।

পূর্ব্বে কলের উৎকর্ষতা না থাকায় বেশী শক্ত গম পেষাইয়ের পক্ষে অসুবিধা ছিল সেইজন্য অপেক্ষাকৃত নরম দানার চাষ ও আবশ্যকতা বেশী ছিল। আজকাল কিন্তু শক্ত দানারও পেষাইয়ের যথেষ্ট সুবিধা। কিন্তু ভারতীয় কৃষকবৃন্দ সেই পূর্ব্ব রীতিমত চাষ করিয়া থাকে বলিয়া সেই পুর্ব্বের ন্যায় নরম ও আধানরম, আধাশক্ত গোধূম দানাই এদেশে উৎপন্ন হইতেছে।

বিশেষ করিয়া ধরিতে গেলে পূর্ব্বে ইউরোপীয় ময়দার ব্যবসায়ীরা নরম ও শক্ত দানার পার্থক্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। যাহা শীঘ্র পেষাই হইত বা যাহাতে বেশ শাদা ময়দা ও বড় রুটি পাওয়া যাইবে সেই গোধূমই এত দিন ইউরোপীয় খরিদার ক্রয় করিতেন। কিন্তু আজকাল বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও বিশ্লেষণের যুগে সে পুরাতন ও মামুলী প্রথা আর বোধ হয় টেঁকিতেছে না। আজকাল (Stronger) বা শক্ত গোধূমের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই শক্ত গোধূম কি তাহা আমরা নিম্নে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শক্ত গোধূম বা গমের শক্তির অর্থ এই যে গোধূমে বেশী সোরাজান আছে ; আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে গোধূমে সোরাজান যত বেশী তাহার ময়দায় তত বড় রুটি হয়। এতদ্ভিন্ন শক্ত গোধূমে খুব (Fine) বা সূক্ষ্ম ময়দা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইউরোপীয় মহাজনদিগের এত দিন ধারণ ছিল যে ভারতীয় গোধূম মাত্রেই নরম এবং উহার পেষাই হইতে খুব (Fine) ময়দা হইবে না। ভারতবর্ষের মধ্যে পঞ্জাবেই গোধূম চাষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং এক পঞ্জাব হইতেই প্রতি বৎসর ১১ লক্ষ টন বা ৭৩ কোটী মণ গম বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। সুতরাং যদি মণ প্রতি ৵০ হিঃ দর বেশী পাওয়া যায় তাহা হইলে এত পাঞ্জাবী গোধূম বেচিয়া বিদেশ হইতে কমবেশ ১৮ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইতে পারে। অথচ বিদেশে ভারতীয় গোধূম অপেক্ষা আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ার গোধূম অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। এই বিষয়ে প্রকৃত কারণ কি ইহা নির্দ্ধারণের জন্য গত ১৯০৯ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে পঞ্জাব প্রদেশের কৃষি-বিভাগের (Director) ডাইরেক্টর মহোদয় ইংলণ্ড ও আয়ারলণ্ডীয় কল ওয়ালাদের সম্মিলনীর নিকট এই তত্ত্ব নির্দ্ধারণের জন্য এক পত্র লিখেন। ঐ পত্রের

উত্তর ১৯০৯ সালের ২৭শে এপ্রেল তারিখে তাঁহারা পঞ্জাবের (Director) কে লিখিয়াছেন। গত ১৯০৯ সালের ২৩শে এপ্রেল তারিখে উক্ত সম্মিলনী যে সভা আহ্বান করেন তাহাতে ভারতীয় গোধুম সম্বন্ধে (Mr. A. E. Humphries) এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রত্যুত্তর খানিতে ঐ প্রবন্ধেরই সারাংশ ও সভাপতির দুই একটী টিপ্পনী আছে। হামফ্রি সাহেব বলেন যে, তিনি ভারতীয় যে সকল গোধুমের নমুনা পাইয়াছেন তাহার মধ্যে যে গুলির পেষণ কার্য্যে উত্তম চূর্ণ না হইয়া রেশমী সূত্রবৎ ময়দা উৎপাদন করে তাহা উত্তম শ্রেণীর গোধুম হইতে পারে না। যে গোধুম উত্তম চূর্ণ হয় ও উজ্জল শ্বেত ও সুক্ষ্ম ময়দা উৎপাদন করে এবং যাহাতে সোরাজানের অংশ অপেক্ষাকৃত যথেষ্ট অধিক সেই গোধুমই উৎকৃষ্ট। ভারতবর্ষে এখন যে সকল লাল গোধুম উৎপন্ন হয় এবং জাভা দেশের লোকেরা নিজেদের আহার্য্য রূপে ব্যবহার করে তাহা প্রায় সমস্তই (Strong) বা শক্ত গোধুম। অবশ্য লাল গোধুম অপেক্ষা শ্বেত গোধুমের দাম বাজারে বেশী সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি নরম শ্বেত গোধুম অপেক্ষা লাল শক্ত গোধুমও উৎকৃষ্ট। সুতরাং বর্ত্তমানে ভারতীয় গোধুম চাষের এইটি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হওয়া উচিত যে, কি প্রকারে শ্বেত, উত্তম ও শক্ত গোধুম পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। যেহেতু উৎপন্ন গমের মুল্যের আধিক্যই যখন প্রথম লক্ষ্যের বিষয় তখন যদি কোন জমিতে গোধুম চাষ করিয়া দেখা যায় যে, ঐ জমিতে সাধারণ গোধুম পর্য্যাপ্ত জন্মে কিন্তু শক্ত বা উৎকৃষ্ট গোধুম অল্প জন্মে সে ক্ষেতে, শক্ত গোধুম চাষ ছাড়িয়া ঐ সাধারণ গোধুম চাষই শ্রেয়ঃ; কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। যদি গোধুম চাষী ও ব্যবসায়ীর শক্ত গোধুমের প্রাচুর্য্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকে তবে ভারতে বিশেষতঃ পঞ্জাবে এমন সমস্ত জমি পাওয়া যাইবে যাহাদের রাসায়নিক প্রকৃতি শক্ত গোধুম প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিবার উপযোগী দৃষ্ট হইবে।

হামফ্রি সাহেবের এই অতি যুক্তি ও গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ পাইবার পর হইতে সমস্ত ভারতীয় কৃষি-বিভাগের দৃষ্টি এই উৎকৃষ্ট গোধুম প্রস্তুতের প্রণালীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং এই বিষয়ে পুষা কৃষি-বিদ্যালয়ে ও কৃষিক্ষেত্রে রীতিমত পরীক্ষা ও গবেষণা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যেই পুষাতে এমন কয়েক প্রকার গোধুম উৎপাদন করা হইয়াছে, যাহার দানা সুন্দর পুষ্ট, ও আগাগোড়া সমান, অধিকন্তু শক্ত বা (Strong) জাতীয়। এই প্রকারের কয়েকটী নমুনা গত ১৯০৯ সালের মে মাহায় হামফ্রি সাহেবের নিকট পরীক্ষার্থ পাঠান হয়। ইহাদের নম্বর অনুযায়ী নাম হইয়াছে, যথা পুষা ৬ ক, পুষা ৭, পুষা ৮, পুষা ১০, পুষা ১১, ও পুষা ১২। ইহাদের মধ্যে পুষা ৮ নং সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোধুম বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ইহা শক্ত, ইহার ময়দা অতি উৎকৃষ্ট; ইহা হইতে যে রুটী প্রস্তুত হয় তাহা সুন্দর শাদা। ফলতঃ ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট গোধুম এবং প্রায় আমেরিকার উৎকৃষ্ট গোধুমের সমান। তাহার পর পুষা ১২, তাহার পর পুষা ১০, ও পুষা ১১।

এক্ষণে ভারতের গোধুম চাষ ও চাষীর নিকট এই কয়েকটী ভাবিবার কথা হইয়া উঠিয়াছে; প্রথমতঃ বিদেশীয় উৎকৃষ্ট গোধুম এদেশে চাষ করা যায় কি না। দুর্ভাগ্যবশতঃ জমির জলীয়াংশের পরিমাণের অল্পাধিক্যে স্থানীয় ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বীজ বপনের সময়ের পরিবর্ত্তনের ফেরফারে ও জমির রাসায়নিক প্রকৃতির তারতম্যে অর্থাৎ জমির সোরাজান

অংশের ইতরবিশেষে বেশির ভাগ স্থলে উৎকৃষ্ট বিদেশীয় গোধূম এদেশে বীজ ধরিবার পূর্ব্বেই শুকাইয়া যায়। দু একটা যদি বা বীজ দেয়, তাহা অনেক অংশের উপ্তবীজ হইতে নিকৃষ্ট। কাজে কাজেই বিদেশীয় উত্তম গোধূম এদেশে সুন্দররূপে লাগাইয়া সন্তোষজনক ফল পাওয়া সম্বন্ধে এখন অনেক সন্দেহ ও শিক্ষার কথা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যে গোধূম যত অধিক দিনে পাকে, তাহার বীজও তত গোটা, আগাগোড়া সমান ও বা উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ গোধূম চাষীর ঠিক একটি এমন সময় আছে, যে সময়ে গোধূম উপ্ত না হইলে ও বর্ষা আগাগোড়া সমান না হইলে এমনটি হইতে পারে না। কাজেই এ বিষয়েও এখনও অনেক শিখিবার ও দেখিবার রহিল। তৃতীয়তঃ কোন জমির সোরাজান ভাগ বেশী ও অল্প সোরাজানের জমিকে অধিক সোরাজানযুক্ত করিবার সুলভ ও সর্ব্বজনসাধ্য উপায় কি, তাহাও এখন ঠিক জানিতে পারা যায় নাই।

এই সকল ভাবিলে বুঝিতে পারা যায় যে ভারতীয় গোধূম চাষের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল হইলেও কতকটা সুদূরপরাহত বটে এবং অন্ততঃ আরও দশ বার বৎসর এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদিগের চেষ্টা ও দৃষ্টি থাকিলে, তবে সুফল ফলিতে পারিবে।

মাঘ—১৩১৭।

জল-নির্ণায়ক যন্ত্র।

কৃষি-কার্য্যের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় দ্রব্য জল। কৃষি-বিজ্ঞানের আজকাল অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত এই অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য কৃষককে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি করাইবার পরীক্ষাদি এখনও পর্য্যন্ত শৈশবাবস্থা ছাড়াইয়া উঠে নাই। কিন্তু মৃত্তিকার অভ্যন্তরে জলের পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে। বৃষ্টি হইয়া গেলে অনেক পরিমাণ জল নদ নদী তড়াগ প্রভৃতিতে আসিয়া পড়ে এবং অবশেষে সমুদ্রের মহান জলরাশির সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। কিন্তু আবার কতক পরিমাণ জল ভূপৃষ্ঠের রন্ধ্রাদি দ্বারা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গমন করে এবং এই প্রকারে সঞ্চিত জল হইতে ঝরনা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। ভূমধ্যস্থিত জলস্রোতের অবস্থান নির্ণয় করিতে পারিলে কূপাদি খনন দ্বারা কৃষি-কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে জল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উহার অবস্থান নির্ণয় করাই শক্ত। সম্প্রতি দাক্ষিণাত্যে একটি জল নির্ণায়ক যন্ত্রে পরীক্ষা

হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহারই গুণাগুণ বিবৃত করিব।

এতদিন পর্য্যন্ত এক শ্রেণীর লোকের সাহায্যে সাধারণ কৃষক জলের অবস্থান নির্ণয় করিয়া কূপাদি খনন করিত। বলা বাহুল্য যে, অনেক সময় জলের রোজার অনুমান অমূলক হইত এবং কৃষকের অর্থ ও পরিশ্রম অকারণ নষ্ট হইত। এই সকল জলের রোজা প্রধানতঃ তিনটী বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া কূপ খননের পরামর্শ দিত, যথা (১) গাছের ডাল কোনদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহা দেখিয়া, (২) জমির সাধারণ অবস্থা ও (৩) অশ্বত্থ, বট ও ডুমুর প্রভৃতি বৃক্ষের প্রাচুর্য্য দেখিয়া। এ সমস্তের মধ্যে কোনটিই বিজ্ঞান সম্মত নহে এবং কোনটির দ্বারা জলের অবস্থান নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

আমরা যে কলের বিষয় বলিতেছি, উহা লিভারপুলের সুপ্রসিদ্ধ কারিগর কোম্পানি মেসর্স ম্যানস্‌ফিল্ড এণ্ড কোং দ্বারা নির্ম্মিত। মোটামুটি হিসাবে বলিতে গেলে, যন্ত্রটি একটী বড় কাঠের বাক্স। বাক্সটি দুই কামরায় বিভক্ত। নিচের কামরায় একটি কাটিমে কিয়ৎপরিমাণ তার জড়ান আছে। উপরের বাক্সের মধ্যস্থলে একটি দণ্ডের উপর একটি চুম্বকের গুণযুক্ত শলাকা আছে। এই চুম্বক শলাকার গতির দ্বারা ভূমধ্যস্থিত জলের অবস্থান বুঝিতে পারা যায়। যন্ত্রের সহিত একটী ত্রিপদ ও একটী টেবল্ আছে। টেবলের উপর একটী শাদা রেখা আছে, উহা সকল সময়েই চৌম্বকের উত্তরদিকে রাখা আবশ্যক।

বোম্বাই প্রদেশের থানা জেলায় কেলয়া মাহিম একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই স্থানে জলের অবস্থা বড় খারাপ। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবও অত্যন্ত অধিক। এই স্থানেই নূতন কূপ খননের জন্য ম্যানস্‌ফিল্ড কোম্পানির যন্ত্র প্রথম ব্যবহৃত হয়। প্রায় এক মাস এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয় এবং সর্ব্ব সমেত ইহ দ্বারা ১৫০টি পরীক্ষা (Observation) লওয়া হয়। পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যে সমস্ত কূপ রহিয়াছে, তৎসমুদয়ে কোন্ ঝরণা হইতে জল আসে, তাহা নির্দ্ধারণ করা। পরীক্ষার ফলে জানিতে পারা যায় যে মূল ঝরণা কূপ হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত এবং উক্ত ঝরণা হইতে আরও নয়টি কূপে জল আসিয়া থাকে। ঝরণার অবস্থান নির্দ্ধারণ করিবার সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন সময় চৌম্বক-শলাকা অতি বেগে নড়িতেছে, কখনও অল্প অল্প নড়ে এবং আবার কখনও একবারেই নড়ে না। যে সময়ে যন্ত্রটি ঠিক ঝরণার উপর আসে, সেই সময়েই শলাকার গতি অধিক এবং ঝরণার নিকটবর্ত্তী স্থানে গতি কম হয়। যে সময় যন্ত্র ঝরণা হইতে দূরে গিয়া পড়ে, তখন গতি একবারেই বন্ধ হইয়া যায়। যন্ত্র হইতে ভূমধ্যে প্রায় ত্রিশ ফুট দূর পর্য্যন্ত ঝরণা থাকিলে যন্ত্রের দ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহা দ্বারা জলের অবস্থান যে নির্ণয় করিতে পারা যায়, তাহার অন্যতম প্রমাণ এই যে, কূপ প্রভৃতির নিকটে রাখিলে শলাকা দ্রুতবেগে চলিতে থাকে।

ফলতঃ এই যন্ত্র দ্বারা যে সমুদয় পরীক্ষা হইয়াছে, তদ্দারা বুঝিতে পারা যায় যে, কৃষকের পক্ষে এই যন্ত্র বিশেষ উপকারী। প্রথমতঃ প্রায় ১৬টি কূপের নিকট যন্ত্র বসাইয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত স্থানে শলাকা বেগে নড়িতে থাকে এবং যে দিক হইতে স্রোত আসিয়া কূপে পড়িয়াছে, সেই দিকে শলাকা ঢুলিয়া থাকে। যে সমুদয় কূপ বিফল হইয়াছে. সে স্থানে শলাকাএকবারেই নড়েনা, কিম্বা নড়িলেও তদ্দারা বুঝিতে পারা যায় যে, স্রোত

পাশ দিয়া গিয়াছে। যে স্থানে শলাকার গতি হঠাৎ মন্দ হইতে দ্রুত হইয়া যায়, সে স্থলে বুঝিতে পারা যায় সন্নিকটে ভূমধ্যে জলের প্রবল স্রোত আছে। যতদূর হইতে যন্ত্রদ্বারা জলের অবস্থান বুঝিতে পারা যায়, তাহার একটা সীমা আছে। অর্থাৎ যন্ত্র হইতে ২।১ মাইলের মধ্যে ঝরণা থাকিলে যন্ত্র তাহা ধরিতে পারে। ১০।১২ মাইল দুর হইলে যন্ত্র দ্বারা তাহা ধরিতে পারা যায় না। ইহা একটি বিশেষ সুবিধার বিষয়। কারণ যদি অধিক দুরবর্ত্তী স্রোতদ্বারা যন্ত্রের শলাকা চালিত হইত তাহা হইলে কোন বিশেষ স্রোতের অবস্থান ও গতি নির্ণয় করা দুরূহ হইয়া পড়িত। কোন কোন স্রোতের জলের গভীরতা ও বেগ এই যন্ত্রের দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। বেগ ও গভীরতা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে কোন জানিত স্রোতের উপর শলাকার গতি অজানিত স্রোতের উপর যন্ত্রের গতির সহিত তুলনা করা আবশ্যক।

যন্ত্র দ্বারা কার্য্য করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা আবশ্যক।

(১) যে স্থানে যন্ত্র বসান হইবে, যদি সেই স্থানে ভূমধ্যে জলস্রোত থাকে, তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণ পরে শলাকা নড়িতে থাকিবে।

(২) শলাকার গতি স্রোতের অবস্থান ও উহার বেগ ও গভীরতার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ যদি যন্ত্র ঠিক স্রোতের উপরে থাকে, তাহা হইলে গতি অধিক ও স্রোতের ঠিক উপরে না থাকিলে গতি কম হইবে।

(৩) যন্ত্রের ঠিক নিম্নস্থান দিয়া স্রোত প্রবাহিত হইলে শলাকার গতি দোলনের ন্যায় হইবে।

(৪) স্রোতের দূরত্ব, গভীরতা ও বেগের হিসাবে দোলনের সময়ের তারতম্য হইয়া থাকে। যদি স্রোত মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অনেক নিম্নে থাকে ও বিশেষ বেগশালী না হয়, তাহা হইলে শলাকা অৰ্দ্ধ ঘণ্টাও এমন কি এক ঘণ্টা অন্তর দুলিতে পারে। পক্ষান্তরে যদি স্রোত বেগশালী ও অপেক্ষাকৃত জমির উপরিভাগের নিকটবর্ত্তী হয় তাহা হইলে শলাকার গতি অত্যন্ত দ্রুত হইবে।

(৫) যতদুর হইতে যন্ত্র দ্বারা জল নির্ণয় করিতে পারা যায়, তাহাও স্রোতের গভীরতা ও বেগের উপর নির্ভর করে। স্রোত যদি জমির উপরিভাগের নিকটবর্ত্তী ও বেগশালী হয়, তাহা হইলে এমন কি ৩০ ফিটের মধ্যে উহা নির্ণয় করিতে পারা যায়। তাহার বিপরীত হইলে ৭।৮ ফিটের মধ্যে যন্ত্র উহার অবস্থান নির্ণয় করিতে পারে।

যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক:—(১) যন্ত্রের উপর সূর্য্যালোক সাক্ষাতভাবে পড়িতে দেওয়া উচিত নয়। এতদ্বারা তার গরম হইয়া শলাকা পার্শ্বের দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া যাইতে পারে। (২) গৃহের নিকট, গাছের নিচে কিম্বা কোন লৌহ নির্ম্মিত বাড়ীর নিকট যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত নয়। (৩) বৃষ্টি হইয়া মাটি যখন আর্দ্র থাকে সে সময় যন্ত্র ব্যবহার করিলে কোন ফল পাওয়া যাইবে না।

আমরা এতদুর পর্য্যন্ত যন্ত্রের সুবিধার বিষয় বলিলাম। কিন্তু যন্ত্রের কিছু অসুবিধাও আছে। কিন্তু অসুবিধার কথা কিছুই বলা হয় নাই। প্রথমতঃ যন্ত্রের দাম অত্যন্ত অধিক—৭৫০৲ টাকা। ইহা ব্যবহার করিতেও বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। যে ব্যক্তি যন্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, তাহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিলেই ভাল হয়। এতদ্ভিন্ন ইহা দ্বারা অতি সত্বরে ফল পাওয়া যায় না। একটি ছোট ক্ষেত্রে জলের অবস্থান নির্ণয় করিতে হইলেও এক সপ্তাহ লাগে। কিন্তু এ সকল

অসুবিধা সত্বেও যন্ত্রটি পরীক্ষার উপযুক্ত। আমাদের দেশে নানা স্থানে কূপে সুবিধামত জল পাওয়া যায় না। সেরূপ অবস্থায় এই যন্ত্রের সাহায্যে ঝরণা নির্দ্ধারণ করা বিশেষ লাভজনক হইতে পারে।

আমের চোক কলম।—এক জোড় কলম ছাড়া আমের অন্য কোন কলম এ দেশে বড় সুবিধা হয় না। এক ধরণের বোম্বাই আমের গুল কলম হইতে দেখা যায়। কৃষকের কোন পত্র প্রেরক লিখিতেছেন যে তিনি আমের চোখ কলম (Budding) করিয়াছেন। কলম ঠিক মত হইয়াছে এবং গাছ গুলি দুই বৎসর কাল বাঁচিয়া আছে কিন্তু অদ্যাপি তাহাতে ফল ধরে নাই।

তিনি বলেন, যে গাছে চোখ বসাইতে হইবে তাহা খুব পুরাতন হইলে চলিবেনা গাছটি পূর্ণ বয়স্ক হইলেই তাহাতে চোখ বসান চলিবে অর্থাৎ যে সকল ডালে চোখ বসান হইবে তাহাতে বেশ রস চলাচল হওয়া চাই। সেই শাখা প্রশাখার ছাল অতি সহজে কাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় এমন অবস্থা হওয়া আবশ্যক। যে গাছ হইতে চোখ তুলিয়া লওয়া হইবে তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের বৃক্ষ হইলেই ভাল হয়। গম্বির নিকট যে খানে চোখ আছে অথচ চোখগুলি ফুটিয়া বাহির হয় নাই এমন অবস্থায় চোখ তুলিয়া লইতে হইবে। ১॥ বা ২ বর্গইঞ্চ পরিমাণ ছাল সমেত চোখটি তুলিতে হইবে। পরে ধারগুলি বেশ করিয়া ছাটিয়া কাটিয়া নির্দ্দিষ্ট গাছে বসাইতে হইবে। যেখানে বসান হইবে তাহার চারিধারের গাছের গাত্র সংলগ্ন ছাল অপেক্ষা চোখসংলগ্ন ছাল কিছু উঁচু হইয়া থাকিলে ক্ষতি নাই বরং ভাল হয়। এইরূপ চোখ কলম করিবার সুবিধা হইলে একটি গাছে অনেক রকম আম ফলান যাইতে পারে। আমরা কৃষকের পাঠক মাত্রকেই এই বিষয়ের পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। আমরাও এবিষয় পরীক্ষা করিব।

খাঁটি মধু।—মধুমক্ষিকা পুষিয়া, অর্থাৎ মধুমক্ষিকার চাষ করিয়া মধু উৎপাদন করা এদেশে বড় দেখা যায় না। বনে যথেষ্ট মধু মিলিত তাই এ কার্য্যে কেহ হাত দিত না। ক্রমে অরণ্যজাত মধুর আমদানী কমিয়া যাইতেছে তাই বাজারে খাঁটি মধু মিলে না। নানা রকমের ভেজাল মধু বাজারে যথেষ্ট। "নাই ঘরে, খাঁই অধিক" সুতরাং ভেঁজাল, ভেঁজালই চলিয়া যাইতেছে। এখানে দুই এক জায়গায় মক্ষিকা চাষের সুচনা হইয়াছে। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় কিন্তু ইহার চাষ বহুল। কৃত্রিম চাক তৈয়ারি করিয়া তাহাতে রাণী মক্ষিকা ছাড়িয়া দিলে অন্য মক্ষিকারা আপনা আপনি আসিয়া জুটিবে ও সন্নিহিত নানা ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মধু সঞ্চয় করিবে আমাদের দেশে ক্ষেতে, বাগ বাগিচায় ফুলের অভাব নাই। যাহাতে বারমাস ফুলের যোগান থাকে একটা না একটা ফুল বারমাস ফুটিতেছে, মক্ষিকা চাষ করিতে গেলে এ ব্যবস্থা আগে করিতে হয়। যেখানে বারমাস ফুল পাওয়া যায় তথায়ই মক্ষিকা চাষ বিধেয়। ফুল বিরল হইয়া পড়িলে গুড়ের জল, চিনির জল দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে মক্ষিকা পোষণ করা হয়। যাঁহারা ঘরের ভিতর মক্ষিকার চাষ করেন তাঁহাদিগকে অনেক সময় আহার যোগাইবার জন্য এই কার্য্য করিতে হয়। ইয়ুরোপে অনেক দেশেই এই প্রথায় মক্ষিকার চাষ হয়। এই চাষে লাভ শুনিলে অবাক হইতে হয়। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে প্রতি বৎসর ৩,০০,০০০ টন (১টন =২৭ মণ) মধু উৎপন্ন হয়। এই মধু বিক্রয় হইয়া বার্ষিক ৬ কোটী টাকা এবং মোম হইতে ৬০ লক্ষ টাকা আয় হয়। সেখানে মক্ষিকা চাষ শিখাইবার জন্য অনেক বিদ্যালয় আছে। এখানেও ছাত্র জুটিলে শিখাইবার লোক জুটিতে পারে। অনেকে হাতে হাতিয়ারে মক্ষিকার চাষ করিতেছে। তাহাদের দ্বারাই প্রাথমিক শিক্ষা হইতে পারে। পরে বিজ্ঞান সম্মত চাষে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে।

মধু আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ এবং বিশেষ উপকারী। ইহার ব্যবসায়ে যখন এত

লাভ তখন ইহাতে মূলধন খাটান কি উচিত নহে! প্রাচীন গ্রন্থাদিতে মক্ষিকা চাষের উল্লেখ দেখা যায়, সুতরাং অনুমান হয় পুরাকালে মধুমক্ষিকার চাষ ভালরূপ চলিত। মধ্যে ইহা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। খাঁটি মধুর যখন এত অভাব অনুভূত হইতেছে তখন নষ্ট প্রায় ব্যবসায়ের পুনরুদ্ধার করিতে ক্ষতি কি!

পত্রাদি।

হরিতকী।

শ্রীরমেশচন্দ্র গুহ, পোঃ বিন্যাফৈর, টাঙ্গাইল।

মহাশয়,

ভারত-আদর্শ 'কৃষকের' কোন এক সংখ্যাতে হরিতকী সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ দেখিয়াছিলাম। প্রবন্ধটী পড়িয়া পুলকিত হইয়াছি।

এতদঞ্চলে বহু হরিতকী বৃক্ষ গৃহস্থের বাটীতে দেখা যায়। এগুলি পাটনাই হরিতকী হইতে আকারে ছোট হইলেও ফলন বেশী। এই প্রকারের হরিতকী বিক্রয় হইবে কি? হরিতকী কি দরে বিক্রয় হয়? কি মাসে বা কি প্রকারে হরিতকী সংগ্রহ পূর্ব্বক বিক্রয়ের উপযুক্ত করা যায়?

উত্তর। বড়বাজারের কতিপয় আড়তদার হরিতকী, আমলকী, বয়ড়া প্রভৃতি বনজাত ফলের ব্যবসায় লিপ্ত আছেন। তাঁহারা এই সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকেন। আপনি তাঁহাদের নিকট হরিতকীর নমুনা পাঠাইতে পারেন, অথবা আমাদের নিকট নমুনা পাঠাইলে আমরা অনুসন্ধান লইতে পারি।

মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে যে হরিতকী জন্মায় তাহা মাঘ ফাল্গুন মাসে সংগ্রহ করিতে হয়। হরিতকী পাকিলেই সংগ্রহ করা উচিত। আপনাদের ঐ খানে হরিতকী কখন পাকে তাহা আপনারাই স্থির করিতে পারেন। হরিতকী আহরণ করা হইলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া বস্তাবন্দী করা ছাড়া ইহার আর অন্য কোন পাইট নাই।

হরিতকী বৎসরে এক গাছে দুইবার হয়। দোফলা হরিতকী আষাঢ় শ্রাবণ মাসে সংগ্রহ করিতে হয়। কৃঃ সঃ।

নারিকেল ছোবড়া।

শ্রীমহাম্মাদ খাজারমণ খান, ইহারপুর,
পোঃ রঙ্গিলাবাদ, জেলা ২৪ পরগণা।

মহাশয়,

এ অঞ্চলে বহুল পরিমাণে নারিকেলের ছোবড়া পাওয়া যায়, সেই কারণ আমি একটী নারিকেল দড়ির কারখানা করিবার ইচ্ছা করিতেছি। নারিকেলের ছোবড়া হইতে আঁশ (সূত্র) বাহির করিবার এবং তাহা হইতে দড়ি কাছি প্রস্তুত করিবার কোন প্রকার যন্ত্র আছে কি না এবং তাহার মূল্য ও প্রাপ্তি স্থান প্রভৃতি সমুদয় স্পষ্টরূপে জানাইলে আমি চিরবাধিত হইব। কলিকাতার মধ্যে যদি কোথাও এরূপ কারখানা থাকে, তাহাও জানিতে ইচ্ছা করি, যেহেতু একবার দেখিলেও অনেকটা জ্ঞান হইতে পারে।

উত্তর। নারিকেল ছোবড়ার দড়ির কারখানা স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ কোন যন্ত্রাদির প্রয়োজন নাই। দুই চারি খানা দাঁতওয়ালা চাকা বিশিষ্ট ঘূর্ণীযন্ত্র এবং পেরেক, কয়েকখানি কাষ্ঠ দড়ির কারখানার সাজ সরঞ্জম। কতকগুলি খুঁটি ও তেকাটা চাই। সমুদয় সাজ সরঞ্জমের মূল্য ২৫০৲ টাকার অধিক নহে। কলিকাতায় দুই চারিটি

কারখানা আছে। আপনি দেখিতে চাহিলে দেখিবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। কলিকাতার বরণ কোম্পানি বা লেস ল বা অন্য কোন লৌহ কারখানায় ঐ চাকা গুলি তৈয়ারি করিয়া লওয়া যায়। কৃঃ সঃ।

ধানভানা কল।

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

সুরেন্দ্র বাবু প্রমুখ প্রায় পনর ষোল জন ব্যক্তি সুরপতি ঘটকের ধানভানা কল সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছেন। আমরা তাঁহার ধানভানা ও চাউল ছাঁটা কল দেখিয়াছি। হস্ত কিম্বা বলদ চালিত ৬০৲ টাকা দামের কল হইতে এঞ্জিন চালিত ২০০৲ কিম্বা ৪০০৲ টাকার কল এবং কলের কার্য্য আমরা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি। সকলগুলিই কার্য্যোপযোগী। ইহার বিশেষ বিবরণ বারান্তরে কৃষকে প্রকাশ করা যাইবে। কৃঃ সঃ।

প্রাদেশিক কৃষি-সংবাদ।

বঙ্গদেশের হৈমন্তিক ধান্য।—বর্ত্তমান বর্ষে সর্ব্বত্র সুচারু ফসল জন্মিয়াছে। অধিকাংশ স্থানে ষোল আনার উপর ফসল জন্মিয়াছে, কুত্রাপি চৌদ্দ আনার কম ফসল জন্মে নাই। গড়ে সতেরো আনা ফসল জন্মিয়াছে। অনুমান করিয়া লইলে বর্ত্তমান বর্ষে ২৫৫,৯০৯,৪০০ হন্দর চাউল পাওয়া যাইবে।

বঙ্গে নীলের আবাদ। ১৯১০।—বিহারে প্রধানতঃ উত্তর বিহার ও পূর্ণিয়ায় নীলের আবাদ হইয়া থাকে।

নীল বীজ বপনের সময় আবহাওয়ার অবস্থা অনুকুল ছিল, কিন্তু চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় নীল সুবিধা মত জন্মায় নাই। আবার শ্রাবণ ভাদ্র মাসে অতিবৃষ্টি ও জলপ্লাবনে নীলের আবাদের ক্ষতি হইল। তার উপর সারণ ও মজঃফরপুরে পোকার উপদ্রব হইয়াছিল।

বিগত বর্ষে নীলের আবাদের জমির পরিমাণ ১১৪,৯০০ একর; তৎপূর্ব্ব বর্ষের জমির পরিমাণ ১০৭,৪০০ একর মাত্র। উত্তর বিহারে অনুকুল আবহাওয়ার গুণে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ জমিতে নীলের আবাদ হইয়াছে।

মোটের উপর উত্তর বিহার ও মুঙ্গেরে এগার আনা ফসল উৎপন্ন হইয়াছে। অন্যত্রও নীলের আবাদ তাদৃশ অধিক নহে, আট আনা আন্দাজ নীল উৎপন্ন হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ২০,৩১১ ফ্যাক্টরি মণ নীল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু মেঃ মোরাণ কোম্পানির অনুমান ২০,০০০ ফ্যাক্টরি মণ মাত্র।

বঙ্গদেশের তুলা—ডিসেম্বর ১৯১০।—উক্ত সময় পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গে ৩১,৪৯৮ একর জমিতে জলদি তুলা আবাদ হইয়াছে এবং নাবী তুলার জমির পরিমাণ ৩০,৪৯০ একর। এখন নাবী তুলার আবাদ শেষ হয় নাই, এমন কি ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত কটকে নাবী তুলা বপন আরম্ভ হয় নাই।

উৎপন্ন জলদি তুলার পরিমাণ ৭,৫৯৮ বেল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বিগত পূর্ব্ব বর্ষের উৎপন্ন জলদি তুলার পরিমাণ ৬,৯৯২ বেল হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে নাবী তুলার পরিমাণ ৮,৪২৭ বেল এবং দেশীয় রাজার রাজ্যে উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ইহার সহিত যোগ করিলে একুনে ৭,৯৭৮ বেল জলদি এবং ৮,৮৪৮ বেল নাবী তুলা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সার-সংগ্রহ।

আমেরিকায় চাষের উন্নতি।

এখানকার মত সেখানেও বহু মানবের জীবন-ধারণের উপায় কৃষিকর্ম্ম। উদ্যম ও অধ্যবসায়ের বলে আমেরিকাবাসী কত বিষয়ে কত উন্নতি সাধন করিয়াছে তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আমেরিকায় কতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে যে জমিতে যথেষ্ট ফসল জন্মিত না সেই স্থলে এখন চতুর্গুণ পরিপুষ্ট ফসল ফলিতেছে। গবাদি কৃষি-সহায়ক পশু দুর্ব্বল, কৃশ, অল্প সংখ্যক ও অল্পজীবী ছিল; এখন তাহারা সুপুষ্ট, সুস্থাবয়ব, বলিষ্ঠ, বহুসংখ্যক ও সহজলভ্য হইয়াছে; তাহাতে কৃষির অনেক সুবিধা হইয়াছে! পূর্ব্বে ঋণের পেষণে কৃষিজীবীর জীবন দুর্ব্বহ ছিল, সেই ঋণ বৎসরে বৎসরে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া তাহার নিজের ও পরিজনের জীবন ভারবহ করিয়া তুলিত; আর আজ তাহাদের স্থাপিত কৃষি-ব্যাঙ্কে মজুদ তহবিল জমিয়া উঠিতেছে। গৃহে যথেষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য ছিল না, অর্থের অভাবে সামান্য অপরিষ্কার গৃহে নিরানন্দে নিরুৎসাহে জীবন অতিবাহিত হইত; এখন কৃষকের ঘরে ঘরে প্রফুল্লতা বিরাজ করিতেছে। কুটীরের স্থানে অট্টালিকা হইয়াছে, অবসরের সময় পুস্তকাদি পাঠে গীতবাদ্যে ও অন্য প্রকার মানসিক উৎকর্ষ সাধনে অতিবাহিত হইতেছে। কৃষির অসুবিধা সকল তিরোহিত হইয়াছে এবং দিন দিন নূতন নূতন সুবিধার ও সহায়ের সৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব্বে তথায়ও এখানকার মত কৃষি ঘৃণ্য, জঘন্য, সামান্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত; এখন আর সে ভাব নাই। সেখানে এখন কৃষি-জীবীকে সকলে আদর ও ভক্তি করে এবং কৃষি-কর্ম্ম করিয়া সকলে গর্ব্ব অনুভব করে। পরিবর্ত্তন অত্যাশ্চর্য্য এই পরিবর্ত্তনের মূলে নিশ্চয়ই উদ্যম চেষ্টা চিন্তাশিলতা নিহিত।

ভূমিকে কিরূপে সতেজ রাখিতে হয়, কিরূপে ভূমির উপযুক্ত আহার যোগাইতে হয়, জীবনীশক্তি কিরূপে পুনরুদ্দীবিত করিতে হয়, ইহার কি উপকরণ, উপকরণভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাটীর উৎপাদিকা শক্তির কি প্রভেদ, সুখ দুঃখ প্রকাশ করিতে ভূমিও প্রাণীর ন্যায় যে ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে সেই ভাষার কিরূপে অর্থবোধ হয়; এই সকল প্রশ্ন তথাকার চাষীর মনে সর্ব্বদাই উঠে এবং এই সকল সমস্যার মীমাংসা দ্বারাই তথায় কৃষি-কর্ম্মের উন্নতিসাধন হইতেছে। জমির সহিত ভালরূপ পরিচয়ের দ্বারা এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্তির জন্য কত বিজ্ঞানবিৎ ব্যস্ত রহিয়াছেন।

কৃষি-রাসায়নিক (Agricultural chemist), কীটাণুবিৎ (Bacteriologist) ভূতত্ত্ববিৎ (Geologist), কৃষিবিদ্ (Agronomist) প্রভৃতি ক্রমাগত পরীক্ষা করিতেছেন এবং পরীক্ষার ফল চাষীদিগকে জানাইতেছেন। জমীতে ভাল ফসল হইতেছে না, চাষী মাটীর নমুনা সামান্য পরিমাণে কৃষিরাসায়নিককে পাঠাইলেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা জানিয়া বলিয়া দিলেন মাটীতে অমুক উপকরণের অভাব বা প্রাচুর্য্য হইয়াছে, তাহা নিবারণ করিবার জন্য এত পরিমাণে অমুক সার বা দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত, কিম্বা অন্য কোন উপায় যাহাতে অন্যত্র সুফল ফলিয়াছে তাহা অবলম্বন করা উচিত।

ভিন্ন ভিন্ন উর্ব্বর ও অনুর্ব্বর মাটীর পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে উর্ব্বর জমিতে পরমাণুর (particles) সংখ্যা অধিক। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে হইলে, এইরূপ বলা যায়—দুই চারিটী চাল বা যবের দানার পাশে সেই কয়টী দানাকে পিষিয়া গুঁড়া করিয়া রাখিলে এই দেখা যায় যে চারিটী দানার পরিবর্ত্তে হয়ত চার লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সৃষ্টি হইয়াছে। আদত দানাগুলির সহিত অনুর্ব্বর মাটীর এবং গুঁড়ার সহিত উর্ব্বর মাটীর তুলনা করা যাইতে পারে। বহু অংশবিশিষ্ট উর্ব্বর জমিতে সহজে প্রচুর জল আকর্ষণ করিয়া অনেকক্ষণ রাখিতে পারে। অপর প্রকার জমিতে সেরূপ পারে না। সব ফসলেই যথেষ্ট পরিমাণে জলের আবশ্যক হয়। অতএব যে জমিতে প্রচুর পরিমাণে জল অনেকক্ষণ রক্ষা করিতে পারা যায় তাহাতে যে ফসল বেশী ফলিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি।

অনুর্ব্বর জমিতে অধিক পরিমাণে জল দিলেও অল্প ক্ষণের মধ্যেই তিরোহিত হইয়া যাইবে, মাটীর ভিতর আবদ্ধ থাকিবে না। কাজেই সে জমিতে ভাল ফসল হইতে পারে না। প্রচুর ফসল উৎপন্ন করিতে হইলে কত জলের প্রয়োজন হয় তাহার সামান্য সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। এক বিঘা জমিতে ভাল আলু বা মটর, ছোলা বা কলাই যথেষ্ট পরিমাণে ফলাইতে হইলে সাড়ে তিন হাজার হইতে চার হাজার মণ জলের প্রয়োজন হয়। এক সের ফসল উৎপন্ন করিতে মোটামুটী হিসাবে প্রায় ৮ মণ জল দরকার হয়। এত জল সবই যে ফসলের মধ্যে থাকিয়া যায় তাহা নয়। কতক জল মাটীতে প্রবেশ করিয়া হাওয়ায় শুকাইয়া যায়। গাছ পালায় যে জলটুকু শিকড় দিয়া আকর্ষণ করিয়া লয় তাহার কতক অংশে নিজের অবয়ব পুষ্ট করে আর কতক অংশ ডাল পালা ও পাতার মধ্য দিয়া গ্যাস ও বাষ্পরূপে শূন্যে উড়িয়া যায়।

কৃষি-রাসায়নিক এই সকল শিক্ষা দেন। তাঁহাকে আরও অনেক বিষয় ভাবিয়া পরীক্ষা করিয়া স্থির করিতে হয়। কত রকম ও কি কি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ মাটীর উপকরণ, কোন প্রকার মাটী কোন কোন বিশেষ রকম ফসলের উপযোগী, যদি কোন মাটীতে কোন একপ্রকার ফসল যথেষ্ট পরিমাণে না ফলে তাহা হইলে তাহাতে কোন উপকরণের অভাব হইয়াছে, সেই উপকরণ অল্প খরচে কি উপায়ে মাটীতে দেওয়া যায় এবং কিরূপেই বা তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী করা যায়, কি কারণে মাটীর উর্ব্বরতা কমিয়া যায়, উর্ব্বরতা কমিলে কি উপায়ে তাহা বাড়াইতে হয় এবং কোন পন্থা অবলম্বন করিলেই বা উর্ব্বরতার হ্রাস রোধ করিতে পারা যায়,—এইরূপ নানা বিষয় লইয়া তাঁহাকে মাথা ঘামাইতে হয়।

পরীক্ষায় জানা গিয়াছে মাটীতে সত্তর প্রকার বিভিন্ন পদার্থ আছে। ইহার মধ্যে বার প্রকার চাষের জন্য প্রয়োজন হয়। ইহার মধ্যে আবার চারিটী বিশেষ প্রয়োজনীয়—নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস, পোটাশিয়ম ও চূণ (ক্যালশিয়ম)। এই চারিটীর মধ্যে কোন একটীর পরিমাণ কম হইলেই ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয়। অতএব কৃষি-রাসায়নিককে, কোন মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতে হইলে বিশেষণের দ্বারা স্থির করিতে হয়, মাটীর গঠন কিরূপ অর্থাৎ তাহাতে পরমাণুর সংখ্যা অধিক বা অল্প, বিশেষ আবশ্যকীয় কোন পদার্থের আতিশয্য বা অল্পতা কিম্বা কোন অনিষ্টকারী উপকরণ তাহাতে আছে কি না, যথা কোন প্রকার অতিরিক্ত অম্ল বা ক্ষার পদার্থ আছে কি না। এইরূপ পরীক্ষা করিতে হইলে মাটীর সহিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করিয়া তাহার ফল লক্ষ্য করিতে হয়; ধুইয়া, শুকাইয়া, পুড়াইয়া দেখিতে হয় এবং নিক্তিতে ওজন করিতে হয়। এক একটী নিক্তি এত সূক্ষ্ম যে খুব পাতলা কাগজে সরু পেনসিলের আঁচড় দিলে সেই আঁচড়ে যে ভুষার গুঁড়াটুকু থাকে তাহাও ওজন করা যায়।

জমির পুষ্টির জন্য চারিটী পদার্থের প্রয়োজন হয় বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে নাইট্রোজেন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ইহার অভাবে ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয়। বোধ হয় অনেকেই জানেন যে এক জমিতে এক ফসলের চাষ প্রতি বৎসর করিলে জমি অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে এবং প্রতিবৎসর ফসল কম হইতে থাকে। এক কৃষি-রাসায়নিক জমিতে বৎসর বৎসর ফসল বদলাইবার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিতে গিয়া পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, কোন এক স্থানে কোন জমিতে উপর্য্যুপরি পাঁচ বৎসর গমের চাষ করিয়া পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিঘা প্রতি ত্রিশ সের নাইট্রোজেন ক্ষয় হইয়াছে। সেই স্থানের জমিতে বৎসর বৎসর ফসল বদলাইয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাতে জমির উর্ব্বরতা কিছুই কমে নাই বরং পাঁচ বৎসরে বিঘা প্রতি প্রায় দশ সের করিয়া নাইট্রোজেন বাড়িয়াছে। এইরূপ পরীক্ষা এই দেশে করিলে এবং ভাল করিয়া হিসাব রাখিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে এদেশে বৎসর বৎসর যে জমিতে একই চাষ হইয়া থাকে সে জমির প্রভূত ক্ষতি হইতেছে। শুধু ক্ষতি হইতেছে জানিলেই যথেষ্ট হইবে না। ক্ষতি নিবারণ করিতে হইলে ঠিক কিকি করিতে হইবে তাহা নিরাকরণ করা আবশ্যক এবং চাষীকে চোখে আঙুল দিয়া দেখান আবশ্যক। কৃত্রিম উপায়ে

ফসল উৎপন্ন করিয়া এই বিষয়টী স্থির করিতে হয়। খানিক মাটী হইতে উর্ব্বরতার সকল উপাদান একে একে সরাইতে হয়। ইহার উপায় রাসায়নিকের পরিচিত। তারপর যে ফসল লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে জলে বা গরম বালিতে তাহার গাছ-কতক চারাগাছ জন্মাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রস্তুত করা মাটীতে তাহাদের আজ্ঞাইতে হয়। কয়েক ঘণ্টা এইরূপ মাটীতে থাকিলেই চারাগাছগুলি অবসন্ন হইয়া পড়িবে এবং মরিয়া যাইবে। কিন্তু রাসায়নিক মহাশয় মাটীর খাদ্য লইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন। গাছ যখন মর মর হইয়া আসিয়াছে তখন কোন একটী চারায় একটী, কোনটীতে অপর একটী, কোনটীতে বা দুটী পদার্থ দিলেন এবং প্রত্যেকটীর ফল লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। এইরূপ নানা রকমে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরীক্ষা করিলে চাষী চাষের সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল অবগত হইয়া লাভবান হইতে পারেন।

মানুষের রক্তের সহিত কোন উপায়ে অতীব সূক্ষ্ম কীটাণু (Bacteria) মিশ্রিত হইয়া অনেক প্রকার মহামারী রোগের উৎপত্তি করে শুনা যায়। কখনও বা সুস্থ শরীরে রক্তের সহিত সেই সব কীটাণু মিশ্রিত করিয়া মড়কের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় উদ্ভাবন করা হয়। আমেরিকাবাসী পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে এই সকল নানা প্রকার কীটাণু—যাহাদের ব্যাকৃটিরিয়া বলা হয় তাহারা—চাষের অনেক সহায়তা করিয়া থাকে। কীটাণু সকল সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে—মাটীতে, জলে, হাওয়ায়, কোথাও তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। কীটাণু নাম শুনিলে মনে হয় যেন প্রাণ-বিশিষ্ট কোন প্রকার জীব, কিন্তু পণ্ডিতগণ ইহাদের এক প্রকার উদ্ভিদ পদার্থ বলিয়াই স্থির করিয়াছেন।

কীটাণু বহুজাতীয়। এক সহস্র প্রকারেরও অধিক বিভিন্ন জাতীয় কীটাণুর অস্তিত্ব স্থির হইয়াছে। এবং দিন দিন আরও নূতন নূতন জাতির আবিষ্কার হইতেছে। অনেকগুলি জাতির এক প্রকার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই একটী কীটাণুর দেহ দুই ভাগে আপনা আপনি বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই ভাগ দুইটী তখন পূর্ব্বের কীটাণুটীর মত এক একটী স্বাধীন কীটাণু হয়। তাহারা প্রত্যেকই আবার অল্পক্ষণের মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন কীটাণু হইয়া বিরাজ করে। এই রূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদেয় আশ্চর্য্যরূপ, সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। আকারে কতকগুলি গোলাকার, কতকগুলি ডিম্বাকার, কতকগুলি সূতার মত লম্বা ও সরু, কতকগুলি গাছের ডালের মত, কতকগুলি আবার কাটির মত। প্রত্যেক কীটাণুর এক একটী (Centre life-point) জীবনীশক্তির কেন্দ্রস্থল আছে। ইহাকে Cell বা কোষ বলে। যখন কীটাণু দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে তখন প্রত্যেক অংশে একটী পৃথক কোষ অর্থাৎ জীবনীশক্তির কেন্দ্রস্থলের উৎপত্তি হয়।

এই সকল কীটাণুর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন জমিতে কম বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও বা ইহাদের মোটেই পাওয়া যায় না এবং জমির উপরি ভাগে যত সংখ্যক কীটাণু থাকে নীচে নীচে তদপেক্ষা কম কম হইয়া যায় এবং অনেক নীচে মোটেই থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির বহুসংখ্যক ব্যাকটিরিয়া জমিতে বাস করে। ইহারা জমিকে বিশ্লেষণ করিয়া উদ্ভিদের আহারের উপযোগী করিতে সহায়তা করে এবং আকাশ হইতে উদ্ভিদের অনেক খাদ্যসামগ্রী আকর্ষণ করে। বায়ুর বার আনা অংশ নাইট্রোজেন। ইহাই উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য। এই খাদ্য প্রতি বিঘা জমির উপর ৩ লক্ষ মণ পরিমাণ সর্ব্বদা মজুত রহিয়াছে। অধিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভগবান এইরূপই সহজলভ্য করিয়াছেন! এই নাইট্রোজেন খাদ্য দ্বারা উদ্ভিদ-দেহ পুষ্ট করিতে হইলে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য আকারে পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। ব্যাকটিরিয়া সকল এইরূপ পরিবর্ত্তনের সহায়তা করে। কি উপায়ে এই সকল তথ্য আবিষ্কার করা হইয়াছে জানিতে হইলে রাসায়নিকের পরীক্ষা-গৃহ দেখিয়া আসিতে হয়। সেখানে হয়ত দেখিবেন মাটীর টবে করিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট গাছ সাজান রহিয়াছে। যে জমিতে ভাল ফসল হয় না সেই স্থানের মাটী একটী টবে দিয়া তাহাতে গাছ আজ্ঞান হইয়াছে, দেখিবেন গাছ অতীব শীর্ণ ও

নিস্তেজ। পাশের অন্য একটী টবে দেখিবেন সুস্থ সতেজ সবল চারাগাছ রহিয়াছে। এই দুটী টবে বীজের বা মাটীর কোনই প্রভেদ নাই। কিন্তু যে মাটীতে বহুসংখ্যক ব্যাকটিরিয়ার আবাস সেই মাটী হইতে অল্প একটু গুঁড়া মাটী লইয়া, চারা অঙ্কুরাইবার সময় বীজের চারিদিকে দ্বিতীয় টবটীতে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে কোন প্রকার সার বা উদ্ভিদের আহার দেওয়া হয় নাই। কেবল ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা এই প্রভূত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এইরূপ পরীক্ষা বড় বড় আবাদেও অনেক রকম করিয়া করা হয়।

কোন কোন উদ্ভিদের শিকড়ে আবের বা খুব ছোট আলুর মত গোছা গোছা ছোট ছোট দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি থাকিলে সুপুষ্ট ফসল প্রচুর পরিমাণে হয় জানিয়া এই বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করা হইয়াছিল। শেষে প্রতিপন্ন হইল যে ঐ আব ব্যাকটিরিয়া-সমষ্টি। ইহারা বায়ু হইতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন আকর্ষণ করিয়া শিকড়ে উদ্ভিদের আহারোপযোগী করিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখে। যে জমীতে এইরূপ শিকড় জন্মায় সেখান হইতে মাটী লইয়া অন্য জমিতে বীজ রুইবার সময় তাহার চারি ধারে ছড়াইয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে পূর্ব্বে যেখানে শিকড়ে আব (nodule, tubercles) থাকিত না, সেখানে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে। এবং ফলে ফসল খুব ভাল ও প্রচুর জন্মিয়াছে। এই ব্যাকটিরিয়া সম্বন্ধে অনেক তথ্য এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

অনেক জমিতে ব্যাকটিরিয়া মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সকল জমিতে অন্য জমির ব্যাকটিরিয়া আনা হয়। এইরূপ করিলে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয় তাহাও পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে। যে জমিতে ব্যাকটিরিয়া একবার আনা হয় সেখানে বরাবরই থাকিয়া যায়। এবং সেই জমির মাটী লইয়া অন্য জমিতে দিলে সেখানেও ব্যাকটিরিয়ার উপনিবেশ হয়। মাটী লইয়া জমির উপর উপর ছড়াইয়া দিলে ফল হয় না। বীজ পুঁতিয়া তাহার গায়ে ব্যাকটিরিয়া-সংযুক্ত মাটী লাগাইয়া দিলে অধিক ফল হয়। কোন জমিতে ব্যাকটিরিয়া-মিশ্রিত মাটী ফেলিয়া পরীক্ষা করা হয়। তিন রকম উপায়ে সে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। প্রথমে ব্যাকটিরিয়া-সংযুক্ত মাটী জমির উপরে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত পাশের এক খণ্ড জমীতে বীজ পুঁতিয়া তাহার চারিদিকে মাটীর সহিত ব্যাকটিরিয়া-সংযুক্ত মাটী মিশাইয়া দেওয়া হয়। এবং তৃতীয় পরীক্ষাতে বীজ পুঁতিবার জন্য যে গর্ত্ত করা হয় তাহার নীচে একটু বেশি করিয়া ব্যাকটিরিয়া-সংযুক্ত মাটী দিয়া তাহার উপরে বীজ এমন ভাবে রাখা হইল যেন বীজ বেশ করিয়া সেই মাটীর সহিত লাগিয়া থাকে।

প্রথম পরীক্ষায় তিন বিঘা জমিতে সাড়ে বার মণ ব্যাকটিরিয়া-মিশ্রিত মাটী ছড়াইয়া দেওয়াতে দেখা গেল এক কুড়ি চারার শিকড়ে ৭টা করিয়া আব জন্মাইয়াছে। দ্বিতীয় পরীক্ষাতে দেখা গেল যে তিন বিঘা জমীতে সাড়ে চার মণ মাটী বীজের পাশে পাশে দেওয়াতে এক এক কুড়ি চারার শিকড়ে ৩৫টা করিয়া আব জন্মাইয়াছে। তৃতীয় পরীক্ষাতে দেখা গেল বীজের ঠিক নীচে একটু বেশি করিয়া মাটী দেওয়াতে এক কুড়ি চারার শিকড়ে ৫০৯টি আব জন্মাইয়াছে। এবং কোন কোন শিকড়ে ৬৯ ৭০টা আব জন্মাইয়াছে।

গাছে শিকড়ে এই সকল যে আব জন্মায় তাহাতে জমীর উর্ব্বরতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। উপরি উপরি কয়েক বৎসর ধরিয়া জমিতে একই ফসল জন্মাইলে ক্রমে ক্রমে জমির মধ্যে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে তাহা কমিয়া যায়। ফসলের উপযুক্ত আহার এই নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম হইয়া গেলে জমির উর্ব্বরতা কমিয়া যায় এবং ফসল ভাল হয় না। যেসকল জমিতে ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে ফসলের শিকড়ে আব জন্মায় তথায় নাইট্রোজেন কমিতে পায় না, কারণ উহারা আকাশের মুক্ত নাইট্রোজেনকে ফসলের উপযোগী করিয়া প্রচুর পরিমাণে মাটীতে আনিয়া দেয়। আমেরিকার অনেক স্থানে এরূপ দেখা গিয়াছে, যে জমিতে বৎসর বৎসর উর্ব্বরতা কমিয়া যাইতেছিল সেখানে নাইট্রোজেন-উৎপাদক ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে উর্ব্বরতার হ্রাস বন্ধ হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই

যে, সব জমিতে ও সব ফসলে একরকম ব্যাকটিরিয়া বাসা করে না। উপযুক্ত ব্যাকটিরিয়া সন্ধান করিয়া জমিতে প্রয়োগ করা কঠিন ব্যাপার কিন্তু আমেরিকার সকল কাজই প্রণালীবদ্ধ হওয়াতে ইহাও এখন তত কঠিন ব্যাপার নয়।

জমিকে ফসলের উপযোগী করিবার এই সকল উপায় বলা গেল। কি উপায়ে ফসলকে জমির উপযোগী করা যাইতে পারে তাহাও এই পরীক্ষা দ্বারা আমেরিকাবাসী স্থির করিয়াছেন। পরে এই বিষয়ে বলা যাইবে।

শ্রীম—প্রবাসী।

এলাহাবাদে কৃষি-সমিতি।

এলাহাবাদে কৃষি-সমিতির একটি অধিবেশন হইয়াছিল। আমাদের বিবেচনায় অন্যান্য সমিতির অধিবেশন অপেক্ষা এইটিই শ্রেষ্ঠ।

লর্ড কর্জ্জন বিদায়কালে বোম্বাই সহরে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যথার্থই বলিয়াছিলেন, ভারতের শতকরা যে ৮০ জন লোক কৃষিজীবী, তাহারাই প্রকৃত ভারতবাসী। সকলেই তাহাদিগের কথা মনে করিতে কুণ্ঠিত। অথচ তাহারাই দেশের মেরুদণ্ড, তাহারা স্বেদসিক্ত করিয়া ভূমিকর্ষণ করে—দেশের রাজস্বের এক চতুর্থাংশ তাহাদের শ্রমে উৎপাদিত। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে ব্যবসায় ও শিল্প সংস্থাপিত করিয়া দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান জন্য যে সাধু চেষ্টা হইতেছে, তাহার উদ্গতপ্রায় অঙ্কুরমাত্র দেখিয়া আশান্বিত ও আনন্দিত হইতে পারি; কিন্তু বিদেশের সহিত প্রবল প্রতিযোগীতার ঝঞ্ঝাবাত, করকাপাত সহ্য করিয়া সে আশা কত দিনে ফলবতী হইতে পারিবে, তাহা বলা যায় না; সুতরাং সে আশায় ভারতের শতকরা ৮০ জন লোকের জীবনোপায় কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া সুবুদ্ধির কার্য্য হইবে না। আবার যদি সেই সকল শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেও—তাহাদিগের জন্য কাঁচা মাল যোগাইতে কৃষিকার্য্যের প্রয়োজন হইবে। উৎপাদনের উপাদান ত্রিবিধ—ভূমি, শ্রম ও মূলধন। ভূমি সর্ব্বপ্রধান। কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইলে—ভূমিতে অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হইলে—কাঁচা মালের দাম সস্তা হইবে, ফলে জিনিসের দামও কম হইবে। দাম কম না হইলে বিদেশের সহিত প্রতিযোগীতায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। দেশের পনের আনা লোক দরিদ্র—তাহারা সস্তা মালই কিনিবে। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে এ কথা বেশ বুঝা গিয়াছে। ইংলণ্ডের লোকের কথায় উইলিয়মস্ বলিয়াছেন,—"That people buy German goods because of their cheapness is sufficiently palpable; and the mass of the people must buy in a cheap market." সুতরাং বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যাহাতে কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হয়, সে বিষয়ে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

আলোচ্য সমিতিতে সার জন হিউয়েট বলিয়াছেন,—"It is beyond doubt that if the wealth of the agricultural interest is to increase, or even if it is to be maintained at its present level, owners and cultivators of land must be alive to the possibilities of great and perhaps sudden changes in the world's demand for produce. They must be prepared to adapt their practices more rapidly than hitherto to the fluctuations in market values as well as in the expenses of production."

যদি কৃষি-সম্পদ বর্দ্ধিত করিতে বা বর্ত্তমান অবস্থায় সংরক্ষিত করিতে হয়, তাহা হইলে জমীদার ও কৃষক উভয়কেই দ্রব্যের দরকার বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। সংস্কার বিষয়েও তাঁহাদিগের অধিক মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

সার জনের এই উক্তি বিষয়ে মতভেদের সম্ভাবনা নাই। দেশের জলবায়ুর, দেশের নদনদীর, দেশের পথঘাটের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু আজও পরিচিত পুরাতন পথ পরিত্যাগ করি নাই। বৎসরের পর বৎসর একই প্রকার শস্য উৎপন্ন করিয়া জমী সারশূন্য হইতেছে। আবশ্যক সার দিয়া জমীর নষ্ট উর্ব্বরতা পুনর্জ্জীবিত

করিবার উপায় হইতেছে না—ফসলের পরিবর্ত্ত চাষের ব্যবস্থা (Rotation of croops) হইতেছে না; শুষ্ক ও অনুর্ব্বর উষর জমী গভীর করিয়া খনন করিবার উপযোগী লাঙ্গল ও বলীষ্ঠ বলীবর্দ্দ ব্যবহৃত হইতেছে না। এ সকল কথা কে অস্বীকার করিবে?

ফেমিন কমিশনের বিবরণে ও মিষ্টার হিউমের কৃষি-সংস্কার বিষয়ক পুস্তকে এ কথা স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে যে, জমীতে সার প্রদানের বা ফসলের পরিবর্ত্ত চাষের উপযোগীতা সম্বন্ধে ভারতীয় কৃষক অজ্ঞ নহে। তাহার দারিদ্র্যই তাহার পক্ষে সংস্কার প্রবর্ত্তনের অন্তরায়। এ কথা যে কতক পরিমাণে সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু উপায় কি?

উপায় যে নাই এমন নহে। এ সম্বন্ধে আমাদিগকে অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে হইবে। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও আমেরিকায় কৃষিতত্ত্বের আলোচনার ফলে যেরূপ উন্নতি সম্ভব হইয়াছে, ভারতেও সেরূপ উন্নতি সহজসাধ্য। কিছুদিন পূর্ব্বে New Earth—নূতন ধরণী নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসরণ করিলে অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে। যেরূপ জীবদেহে টীকা দিয়া রোগবীজাণু প্রবিষ্ট করান যায়, তেমনই জমীতে টীকা দিয়া তাহাকে শস্যবিশেষ উৎপাদনক্ষম করা যাইতে পারে। আমেরিকায় এই প্রথার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

বহুবিধ বিজ্ঞান-সম্মত উন্নতির ফলে ইউরোপে ও আমেষিকায় এক্ষণে জমীতে পূর্ব্বের দ্বিগুণ ফসল ফলান যাইতেছে। এতদ্ভিন্ন বীজ বাছাই করিয়া ক্রমে বাতাতপ সহিষ্ণু ফসল উৎপন্ন করা হইতেছে।

অন্যান্য দেশে যাহা সম্ভব হইয়াছে, ভারতে তাহা অসম্ভব নহে। তবে সে পক্ষে যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ধনবানগণ কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলে এ সকল উন্নতির আশা নাই এ কথা আমরা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতেছি। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টেরও বিশেষ সাহায্য আবশ্যক। নানা স্থানে কৃষি-শিক্ষা দেওয়া ও আদর্শ ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় কৃষির উন্নতির বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তথাপি গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা সম্পূর্ণ নহে বলিলে অন্যায় কথা বলা হয় না। যখন আমরা দেখিতে পাই যে, গভর্ণমেণ্ট সিরেসিষ্টার কলেজ উত্তীর্ণ বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিগণকে অকুণ্ঠিতভাবে ডেপুটীগিরি বা কৃষিসম্পর্ক বিরহিত কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন, তখন আমরা চিন্তিত হই। ভারতের জমি নিস্তেজ হইতে দেখিয়াও যখন গভর্ণমেণ্ট ভারত হইতে জীবাস্থি বা জীবাস্থির সার অবাধে রপ্তানি হইতে দেন, তখন আমরা আশ্চর্য্য হই। সে দিনও বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় মিষ্টার দাদাভাই দেশের জীবাস্থির ও তৈল-শস্যের রাপ্তনি বন্ধ করিবার কথা বলিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের কৃষির উন্নতি গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। গভর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ে যত্নবান হইলে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তাহা হইলে তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে দেশের জনসাধারণ—কৃষকগণও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের কৃষি বিষয়ে উন্নতি সাধনে সফল হইবে।

টাটার কীর্ত্তি।

বোম্বাই সহরের পরলোকগত পার্শী ধনকুবের জামসেদজী টাটার নাম এ ভারতে সকলেই জানে। সম্প্রতি তাঁহারই কল্পিত দুইটী দেশহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে। মার্কিন দেশের নায়েগ্রা জলপ্রপাতের জলের তেজ অনর্থক অপব্যয় হইতে না দিয়া মার্কিন ধনকুবেরগণের উদ্যোগে তাহার সদ্ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। এতদর্থে বিস্তর অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। জলের তেজ ধরিয়া রাখিয়া তাহা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তির সৃষ্টি ও নানা কল কারখানার ইঞ্জিন চালাইবার উপায় করা হয়। টাটা ভারতের পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার জলপ্রপাত সমূহ হইতে এইরূপে তেজ সঞ্চয় করিয়া বোম্বাই সহরের রেল, ট্রাম, বন্দর ও কল কারখানার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প বহুদিন হইতে হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। এতদর্থে তিনি দেশের

সামন্ত নৃপতিবর্গ ও ধনকুবেরগণের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও ইহাতে বিস্তর অর্থ দিয়াছিলেন। ইহাতেও তিনি যেরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা মনুষ্য-মাত্রেরই অনুকরণযোগ্য। টাটা আরও একটি কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিলেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশের শ্রমশিল্প ও কৃষির উৎকর্ষ সাধন মানসে দেশে একটী উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়,—ইহাই টাটার আন্তরিক কামনা ছিল। সম্প্রতি বোম্বাই লাট স্যার জর্জ্জ সিডেনহাম ক্লার্ক বাহাদুর টাটার সঙ্কল্পিত এই দুইটি অনুষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। বক্তৃতাকালে লাট বাহাদুর বলেন, এই যথার্থ "স্বদেশী" অনুষ্ঠানে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। ঘাটের জলপ্রপাতের তেজে জাত বৈদ্যুতিক শক্তি বাষ্পীয় কলে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি অপেক্ষা কম খরচায় সঞ্জাত হইবে। ইহা টাটার পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। আগামী জুলাই মাসে টাটার বাঙ্গালোর বিজ্ঞান-শিক্ষালয়ের প্রথম অধিবেশন হইবার কথাও স্থির হইয়া গিয়াছে। টাটা পরলোকে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম ভারতবাসীর অন্তরে বংশানুক্রমে জাগরূক থাকিবে। মানুষ যায়, কিন্তু মানুষ মানুষের মত কার্য্য করিলে, মানুষের নাম যায় না।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

ফাল্গুন মাস।

সব্জী বাগান।—তরমুজ, খরমুজ, শসা, ঝিঙ্গা, প্রভৃতি যে সকল দেশী সব্জী চাষ মাঘ মাসে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই মাসে প্রায় শেষ করিতে হইবে। সব্জীক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। চাঁপানটে বীজ এই সময় বপন করিলে ও জল দিতে পারিলে অতি সত্বর নটে শাক পাওয়া যায়।

কৃষি-ক্ষেত্র। ছোলা, মটর, যব, শরিষা, ধনে প্রভৃতি সমুদয় এত দিনে ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া গোলাজাত করা হইয়াছে। এই সময় ক্ষেত্র সকল চষিয়া ভবিষ্যতে পাট, ধান প্রভৃতি শস্যের জন্য তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। ইক্ষু এই সময় বসান হইয়া থাকে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে আম, লিচু, লকেট, পিচ প্রভৃতি ফলবৃক্ষে জল দিবার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কার্য্য নাই।

ফুলের বাগান।—এখন বেল, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছ গুলির তদ্বির না করিলে জলদি ফুল ফুটিবে না। জলদি ফুল না ফুটিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

এই সময় টবে রক্ষিত পাতাবাহার, পাম প্রভৃতি ও মূলজ ফুল ও বাহারি গাছ সকলের টব বদলাইয়া দিতে হয়।

পান চাষ করিবার ইচ্ছা থাকিলে এই সময় পানের ডগা রোপণ করিতে হয়।

বাঁশ ঝাড়ের তলায় পাতা পড়িয়া সঞ্চিত হইয়া আছে, সেই পাতায় এই সময় আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই ছাই বাঁশের গোড়ায় সারের কার্য্য করে, এবং নিম্ন-বঙ্গে যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক, সেইখানে এই প্রকার বহুদূরব্যাপী অগ্নি জ্বালিলে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

ঝাড়ের গোড়া হইতে পুরাতন গোড়া ও শিকড় উঠাইয়া না ফেলিলে ঝাড় খারাপ হয়। আগুন দ্বারা পোড়াইলে এই কার্য্যের সহায়তা হয়। পুকুরের পাঁক মাটিতে বাঁশের খুব বৃদ্ধি হয়।

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

ফাল্গুন, ১৩১৭।

কৃষক।

সূচী পত্র।

ফাল্গুন, ১৩১৭ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

'কৃষকে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ খণ্ড। | ফাল্গুন, ১৩১৭ সাল। | ১১শ সংখ্যা।

ঈতি।

শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস লিখিত।

"অতিবৃষ্টি রনাবৃষ্টি শলভা মূষিকা খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজান ষড়তে ঈতয়াঃ স্মৃতাঃ॥"

উপরি উক্ত বচনে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ, মূষিক, পক্ষী, নিকটস্থশত্রু রাজা এই ছয়টী শস্যের অনিষ্টকারী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাস্তবিকই এই ছয়টী শস্যের অনিষ্টকারী বটে, কিন্তু স্থান ভেদে, শস্য ভেদে, সময় ভেদে ইহাদের অনিষ্টকারিতার তারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের অনিষ্ট বিষয়ে বিচার করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবের অবতারণা করা হইল। আশাকরি কৃষক পত্রের এক পার্শ্বে স্থান দান করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

অতি বৃষ্টি শস্যের বিশেষ অনিষ্টকর বটে, কিন্তু স্থান ভেদে, শস্য ভেদে ও সময় ভেদে যে ইহার অনিষ্টকারিতার তারতম্য হইয়া থাকে, তাহা কৃষক মাত্রেই অবগত আছেন। কার্ত্তিক মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত এদেশে রবি শস্য উৎপাদনের প্রকৃত সময়। কারণ ঐ সময় প্রায়ই অধিক বৃষ্টি হয় না। রবি শস্য অনাবৃষ্টি বা অল্প বৃষ্টিতেই ভাল জন্মিয়া থাকে। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ ও রবিশস্য সহ্য করিতে পারে না। কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত বৃষ্টি প্রায়ই হয় না; যদি দৈবাৎ কোন বৎসর হয় তাহা ও খুব সামান্য এবং তখন সূর্য্যের উত্তাপ ও খুব মৃদু, তজ্জন্য ঐ সময়ই রবিশস্য জন্মিবার মুখ্য সময়। যদি কোন বৎসর ঐ সময়ে অতি বৃষ্টি হইয়া মাঠ প্লাবিত হইয়া যায়, তবে রবিশস্যের কিছু মাত্র আশা থাকে না। সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। ধান্য ব্যতীত অন্য কোন শস্যই দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রচুর জলের আবশ্যক করে না এই শস্য জন্মিবার জন্য প্রচুর বৃষ্টির আবশ্যক। ধান্য ব্যতীত বর্ষা কালে শণ, পাট, ইক্ষু, ধঞ্চে, অড়হর প্রভৃতি শস্য অল্প বৃষ্টিতেও প্রচুর জন্মিয়া থাকে। অতি বৃষ্টিতেও ধান্যের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে, স্থান ভেদে অতি বৃষ্টিতেও ধান্যের অপকারিতার তারতম্য বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়। নিম্ন ভূমির ধান্য অতি বৃষ্টিতে একবারে নষ্ট হইয়া যায়। উচ্চ ভূমিস্থিত ধান্যের তাদৃশ ক্ষতি হয় না। অতি বৃষ্টি দ্বারা নিম্ন ভূমিস্থিত ধান্যের গাছ দুই দিন জলমগ্ন থাকিয়া, তৎপরে গাছের অগ্রভাগ জলের উপরি ভাগে দেখা গেলে, সে ধান মরিয়া যায় না; কিছু অনিষ্ট হয় মাত্র। অতি বৃষ্টির দ্বারা

যে ভূমির ধান গাছ ৪৫ দিন জল মগ্ন থাকে, সে গাছ এক বারেই পচিয়া গিয়া নষ্ট হইয়া যায়। নিম্ন ভূমিস্থ ধান গাছই অতি বৃষ্টি দ্বারা দীর্ঘ কাল জলমগ্ন থাকে এবং তদ্দ্বারা গাছ পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। উচ্চভূমিস্থিত ধানগাছ অতিবৃষ্টি দ্বারা প্রায়ই সম্পূর্ণ রূপে জলমগ্ন হয় না, যদি কখনও হয়, তবে সে জল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, ২।১ দিন মধ্যেই গাছের অগ্রভাগ দৃষ্টিগোচর হয়। তজ্জন্য উচ্চভূমির ধানগাছের অতিবৃষ্টি দ্বারা তাদৃশ ক্ষতি হয় না। বরং সময়ে সময়ে উপকারও হইয়া থাকে। পাট, শণ, ইক্ষু প্রভৃতি দীর্ঘকাল জলমগ্ন থাকিলে ইহাদের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে অতিবৃষ্টি দ্বারা সময়ভেদে, স্থান ভেদে ও শস্য ভেদে ক্ষতির ন্যূনাধিক্য ঘটিয়া থাকে।

অনাবৃষ্টি অর্থাৎ মোটেই বৃষ্টি না হইলে কোন শস্যই জন্মিতে পারে না। একারণ অতিবৃষ্টি অপেক্ষা অনাবৃষ্টি অধিক অনিষ্টকর। মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বৃষ্টি হইলে কোন কোন শস্য যে প্রচুর জন্মিতে পারে তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

শলভ অর্থাৎ পঙ্গপাল শস্যের বিশেষ অনিষ্টকর বটে, কিন্তু এদেশীয় লোককে তাহার অনিষ্টকারিতা প্রায়ই সহ্য করিতে হয় না। যে স্থান দিয়া পঙ্গপাল প্রবাহিত হয় সে স্থানের শস্য ও বৃক্ষ পত্রাদি কিছুই থাকে না। শস্যের ও বৃক্ষের সমস্ত পত্র এবং কোমল ডাঁটা পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া ফেলে। আমি অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ২।৩ বার মাত্র পঙ্গপালের উপদ্রব দেখিয়াছি। একবার (অন্যূন ৪০ বৎসর পূর্ব্বে) চৈত্র মাসে পঙ্গপাল আসিতে দেখিয়াছিলাম। হঠাৎ বেলা দুই প্রহরের সময় মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় সমস্ত আকাশ কোটী কোটী পঙ্গপাল দ্বারা আবৃত হইয়া অন্ধকারময় হইয়া উঠে। তৎকালে আমাদের এখানে কোন শস্যই ছিলনা বলিয়া শস্যের কোন অনিষ্ট হয় নাই। তবে কোন বৃক্ষেরই একটীও পত্র ছিল না। সমস্ত পত্রই ভক্ষণ করিয়াছিল। স্থানে স্থানে শসা, কাঁকুড়, তরমুজ, কুমড়া প্রভৃতি গাছের বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছিল। আরও যে দুইবার দেখিয়াছিলাম, তাহাতে পঙ্গপাল অধিক আইসে নাই। তাহাতে শস্যের বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই। এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে তিন বার মাত্র পঙ্গপালের উপদ্রব দেখিয়াছি। কিন্তু এই পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে অনেক বার সময়ে সময়ে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি দেখিয়াছি। তজ্জন্য আমাদের এ প্রদেশে পঙ্গপালের উপদ্রব অপেক্ষা অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি অধিকতর অনিষ্টকর।

মূষিক ও পক্ষী শস্যের অনিষ্টকর বটে, কিন্তু তাহা এত সামান্য যে তাহা ধর্ত্তব্য নহে। সাবধান হইলে ইহাদের অনিষ্ট অনেক পরিমাণে নিবারণ করা যাইতে পারে।

যখন পূর্ব্বে দেশ অরাজক ছিল, অথবা সুশাসন ছিলনা, তখন নিকটস্থ প্রবল শত্রু রাজা অন্য প্রদেশের রাজার রাজ্যে আসিয়া শস্য লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেন। এখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে সে ভয় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া গিয়াছে।

এখন দেখিতে হইবে ঈতি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শস্যের অনিষ্টকারী ছয়টীর মধ্যে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি অধিকতর অনিষ্টকর। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে অজন্মা হইয়া ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত করে। ইহাদের উপদ্রব হইতে শস্য রক্ষা করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। আমাদের এ প্রদেশে অতিবৃষ্টি অপেক্ষা অনাবৃষ্টি অধিক অনিষ্টকর। এ প্রদেশে একবৎসর অনাবৃষ্টি হইলে অজন্মা উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে হাহাকার শব্দ উত্থিত হয়। অতিবৃষ্টির দ্বারা ধান্যাদি শস্যের কিছু কিছু ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু

অনাবৃষ্টির ন্যায় তত অনিষ্টকর নহে। ঈতির মধ্যে অনাবৃষ্টিকেই আমরা অধিকতর অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি।

ঈতি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার অনিষ্টকারী বিষয় ব্যতীত শস্যের অনিষ্টকর বহুপ্রকার কীট পতঙ্গ আছে; কিন্তু ঈতি মধ্যে তাহাদিগকে ধরা হয় নাই। আমাদের বিবেচনায় অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির নিম্নে ঐ সকল শস্য বিঘ্নকারী কীটাদির স্থান সন্নিবেশিত হইতে পারে। কি জন্য যে ঐ সকল কীটকে ঈতির মধ্যে ধরা হয় নাই বলিতে পারি না। বৎসর বৎসর কীট দ্বারা যে কত শস্য নষ্ট হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। উদ্যানে অল্প সংখ্যক বৃক্ষাদিতে কীটের উপদ্রব হইলে মনুষ্য কর্ত্তৃক কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু অসংখ্য শস্যক্ষেত্রে অসংখ্য শস্যের গাছে কীটাদির উপদ্রব হইলে, মনুষ্য কর্ত্তৃক নিবারিত হইবার উপায় নাই। তখন ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কৃষকদিগকে হাহাকার করিতে হয়। সময়ে সময়ে কীট কর্ত্তৃক শস্যের এত অনিষ্ট হয় যে, তজ্জন্য কৃষকদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

ধান্যই বঙ্গদেশের জীবনোপায় শস্য। ধান্য সম্বন্ধে কৃষকে যতই অধিক আলোচনা হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়। এ প্রদেশে ধান্যের চাষই অধিক। এমন কি এখানকার ষোল আনা জমির মধ্যে পৌনে ষোল আনা জমিতে ধান্যের চাষ হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সময়ে সময়ে কীটের উপদ্রবে ধান গাছের এত অনিষ্ট হয় যে, কৃষকদিগকে মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে হয়। আমাদের এ প্রদেশে গত দুই বৎসর অর্থাৎ সন ১৩১৫ ও ১৬ সালে কীটের উপদ্রবে ধান গাছের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল। এ বৎসরও যে হয় নাই, এমন নহে। কোন্ কোন্ কীটাদি দ্বারা ধান গাছের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইতেছে।

ধুলসুঁড়া,—যে বৎসর আষাঢ় মাসে অথবা শ্রাবণ মাসের প্রথমে বর্ষা না লাগে, অর্থাৎ জমিতে আবাদ উপযোগী জল না দাঁড়ায়, সেই বৎসরই ধান গাছে এই পোকার উপদ্রব হয়। ধুলসুঁড়া পোকা এত সূক্ষ্ম যে চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। একারণ কেহ কেহ বলেন ধুলসুঁড়া পোকা নহে, ধান গাছের রোগ বিশেষ। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ধান গাছের গোড়ায় জল দাঁড়াইয়া থাকা আবশ্যক, তাহা না থাকায় গাছের গর্ভস্থ কোমল পত্র (মাইজ) নষ্ট হইয়া যায়। আমরা কিন্তু এ মতের সমর্থন করিতে পারি না। কারণ আধুনিক বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যখন মনুষ্যাদি জন্তুর রোগ কীটজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন ধান গাছেরও যে উহা কীটজ নহে তাহা কে বলিতে পারে। ধুলসুঁড়া লাগিয়া কোমল মাইজ নষ্ট হইয়া গাছটী অকর্ম্মণ্য হইলেও উহা সহজে জানিতে পারা যায় না। অন্যান্য গাছের ন্যায় সমভাবেই থাকে, অথচ গর্ভস্থ মাইজ নষ্ট হইয়া গাছ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। জমিতে জল দাঁড়াইলে বোনা ধানের জমিতে কাড়ান* দিবার ৫।৭ দিন পরে ধুলসুঁড়া লাগা গাছগুলি মরিয়া যায়। ধুলসুঁড়া ধরা গাছ অন্য জমিতে রোপণ করিলেও সে গাছ নষ্ট হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল জমির মৃত্তিকা শুষ্ক (ধুলা) থাকিলে এই কীটে আক্রমণ করে বলিয়া এই কীটকে ধুলসুঁড়া বলে।

---

* বোনা ধানের জমিতে জল দাঁড়াইবার পর প্রথমতঃ মই দেওয়া হয়। তাহার ৫।৭ দিন পরে ধান গাছের মায়া না করিয়া জমিতে চাষ দেওয়া হয়। এই চাষ দেওয়াকেই কাড়ান কহে।

ধান্য বীজ পাইট করা জমিতে উপ্ত হইলে, চারা বাহির হইবার পর প্রথম অবস্থায় বেশ সতেজে নূতন পত্র নির্গত হইয়া গাছ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বীজ বপনের এক মাস পরে ধান গাছের মূলে মূলে সংস্পর্শ হয়। তৎপরে জমিতে জল না দাঁড়াইলে ধান গাছ আর বর্দ্ধিত হয় না এবং তাহা হইতে নূতন পত্রও বাহির হয় না। কেবল পুরাতন পত্রগুলি থাকে মাত্র। এই অবস্থায় জমিতে আশু জল না দাঁড়াইলে ধুলসুঁড়া ধরিয়া ধান গাছের গর্ভস্থ পত্র অর্থাৎ মাইজ ধুলসুঁড়া কর্ত্তৃক নষ্ট হয় ও বাহিরের পুরাতন পত্র, অন্যান্য (ধুলসুঁড়া কর্ত্তৃক মাইজ নষ্ট হয় নাই) গাছের পুরাতন পত্রের ন্যায় সমভাবে থাকে। তজ্জন্য কোন গাছ ধুলসুঁড়া কর্ত্তৃক নষ্ট হইয়াছে, তাহা জানিতে পারা যায় না। উক্ত উভয় প্রকার ধান গাছই সমভাবে থাকে। তজ্জন্য কীটদষ্ট ধান গাছ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে। ঐ গাছ তুলিয়া অন্য জমিতে রোপণ করিলে অথবা বোনা ধানের জমিতে ধান গাছ কীটদষ্ট হইলে, তাহাতে মই অথবা বিড়ান দিলেই দুই চারি দিন মধ্যেই গাছগুলি মরিয়া যায়। যে গাছগুলি কীটদষ্ট হয় নাই, কেবল সেই গুলিই জীবিত থাকে।

বীজতলার (অন্য জমিতে রোপণ করিবার জন্য যে জমিতে ধান্য চারা উৎপন্ন করা হয়) ধান গাছ অপেক্ষা বোনা জমির ধান গাছে এই কীটের অধিক উপদ্রব হয়। বোনা জমির ধান গাছ সমূহ বিরল সন্নিবেশ বশতঃ জল দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই এক এক ঝাড়ে ৫।৭টী করিয়া গাছ হইয়া থাকে। তৎপরে মূলে মূলে সংস্পর্শ বশতঃ গাছ আর তেজস্কর থাকে না এবং নূতন পত্রও আর উদ্ভূত হয় না। এরূপ অবস্থায় যদি জমিতে জল না দাঁড়ায় তবে ধুলসুঁড়া কর্ত্তৃক অনেক ধান গাছের মাইজ নষ্ট হইয়া যায়। বীজতলার ধান্যের চারা খুব ঘন সন্নিবেশিত থাকায় ঝাড় হইতে পায় না। শুষ্ক জমিতে ধান গাছে ঝাড় হইলে ও শীঘ্র জমিতে জল না দাঁড়াইলে এই পোকার উৎপন্ন হয়। বীজতলার ধান গাছ তত ঝাড়ায় না বলিয়া ধুলসুঁড়ার তত উপদ্রব হয় না।

ধানের জমিতে জল দাঁড়াইবার কিছু দিন পরে জমির মৃত্তিকা পচিয়া গিয়া কোমল হয়। তৎপরে ধান গাছের পুরাতন শিকড়ের অনেক অংশ পচিয়া গিয়া নূতন শিকড়ের উদ্ভব হয়। তখন আবার গাছ অপেক্ষাকৃত সতেজ হইয়া উঠে। বীজ তলার ধান্যের চারা তুলিবার সময় অনেক নূতন শিকড় দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বোধ হয় ধান গাছ কিছু দিন এইরূপ নিস্তেজ অবস্থায় থাকিলেই ধুলসুঁড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে।

আষাঢ় মাসের মধ্যে যদি জমিতে জল না দাঁড়ায় এবং জমির মৃত্তিকা শুষ্ক থাকে, তবে ধুলসুঁড়ার উপদ্রব হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এজন্য আষাঢ় মাসে জমিতে জল না দাঁড়াইলে বোনা জমির শুষ্ক মৃত্তিকা শ্রাবণ মাসে ফাঁকে ফাঁকে খুব সাবধানে খনন করিয়া দিলে ধুলসুঁড়ার উপদ্রব নিবারিত হইয়া থাকে। এমন ভাবে গাছের গোড়ার নিকটবর্ত্তী ভূমি পর্য্যন্ত খনন করিতে হইবে, যেন গাছ নষ্ট না হয়। খনন করিয়া দিলে গাছের কতক শিকড় কাটিয়া নষ্ট হইয়া যায়। শ্রাবণ মাসে সামান্য সামান্য বৃষ্টি প্রায়ই হইয়া থাকে। অথচ তাহাতে জমিতে জল দাঁড়ায় না। সামান্য সামান্য বৃষ্টির জল পাইয়া গাছের পুনরায় নূতন শিকড় হয়, জমির মৃত্তিকা খনন করিয়া দেওয়ায় সেই শিকড় অনায়াসে চালিত হইতে পারে। তজ্জন্য গাছ একটু সতেজ হইয়া নূতন পত্র দেখা দেয়। গাছ একটু সতেজ থাকিলে ধুলসুঁড়া ধরিতে পারে না।

মহিষে,—ইহাকে কীট না বলিয়া মক্ষিকা বলা উচিত। ইহারা দেখিতে ঠিক মধুমক্ষিকার ন্যায়, তাহা অপেক্ষা আকারে কিছু ছোট। ইহারা এক ধান গাছের ঝাড় হইতে অন্য ধান গাছের ঝাড়ে অনায়াসে উড়িয়া যাইতে পারে। রোপিত ধান গাছের নূতন কোমল পত্রের রস পান করে। যে জমির মৃত্তিকা খুব তেজস্কর, সেই জমি পাইট করিয়া ধান্য চারা রোপণ করিলে ১০।১৫ দিন মধ্যে ধান গাছের বর্ণ ঘোর হরিৎবর্ণ হইয়া গাছ হইতে কোমল নূতন সুদীর্ঘ মূল পত্র নির্গত হইলে অনেক সময় মহিষে ধরিয়া ঐ কোমল নূতন পত্রের রস পান করিতে থাকে। পুনরায় কোমল পত্র নির্গত হইবার পূর্ব্বেই পূর্ব্বোক্ত কোমল পত্রের সমুদয় রস দুই চারি দিন মধ্যেই পান করিয়া ফেলে। তখন ঐ পত্র শুষ্ক প্রায় হয়। কোমল নূতন পত্র না পাওয়ায় সে জমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। পুনরায় প্রত্যাগমন করে না। সতেজ জমির কোমল পত্রেই মহিষে ধরিয়া থাকে। সতেজ জমির পত্রে মহিষে ধরিলেও, তৎপার্শ্ববর্ত্তী অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ জমির কোমল নূতন পত্রে মহিষে ধরিতে দেখা যায় না। এই সকল কারণে গাছের পত্রে মহিষে ধরিলেও তাদৃশ অনিষ্ট হয় না। বরং কৃষকেরা মনে করে, যে জমির ধান গাছের কোমল নূতন পত্রে মহিষে ধরে, সে বৎসর সে জমিতে প্রচুর ধান্য জন্মিবে। যে জমিতে সুদীর্ঘ স্থূল কোমল পত্র সতেজে নির্গত হয়, তাহাতেই মহিষে ধরিয়া থাকে। পত্রের রস পান করিয়া দুই চারি দিন মধ্যেই চলিয়া যায়, তজ্জন্য বিশেষ অনিষ্ট হয় না। যে জমিতে ধান্য রোপণ করিবার পর যে বৎসর সতেজে ঘোর হরিৎবর্ণের সুকোমল পত্র নির্গত হয়, যদি কোন দুর্ঘটনা না ঘটে, তবে সে বৎসর সে জমিতে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে। তাহাতে মহিষে ধরিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। যদি মহিষে যত নূতন পত্র নির্গত হইত সকলেরই রস পান করিত, তাহা হইলে কখনই সুফলের আশা করা যাইতে পারিত না। কেননা পত্রই বৃক্ষের মুখ ও পাকস্থলীর কার্য্য করে। বৃক্ষমূল দ্বারা মৃত্তিকা হইতে এবং পত্র দ্বারা বায়ু হইতে আপনাদের আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ করে। জন্তুগণ যেমন পাকস্থলীতে আপনাদের আহার্য্য বস্তু পরিপাক করে, উদ্ভিদেরও সেই রূপ সংগৃহীত আহার্য্য বস্তু পত্রে পরিপাক হইয়া রসে পরিণত হইয়া সর্ব্বাবয়বে সঞ্চালিত হইয়া পুষ্টি সাধিত হয়। মহিষে কর্ত্তৃক যদি ধান গাছের পত্র পুনঃ পুনঃ নষ্ট হইয়া যাইত, তাহা হইলে কখনই সুফল পাওয়া যাইত না।

শাঁকী,—এই কীট অতি ক্ষুদ্র, শাঁকের ন্যায় শ্বেতবর্ণ বলিয়া (বোধ হয়) শাঁকী পোকা বলিয়া থাকে। ধানগাছ নড়াইয়া দিলে এক গাছ হইতে আর এক গাছে লাফাইয়া যায়। একবার ধরিলে সহজে ছাড়ে না। ইহারাও ধানগাছের কোমল পত্র ভক্ষণ করে। এই পোকা ধানগাছে ধরিলে বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। একারণ এখানকার কৃষকেরা বলিয়া থাকেন, "ধরলে শাঁকী, হয় ফাঁকি।" শাঁকী পোকা ভাদ্র মাসে ধরিয়া থাকে। এই পোকা শীঘ্র ছাড়িয়া না গেলে গাছ নষ্ট হইয়া যায়। শাঁকীর উপদ্রবে অনেক সময়েই কৃষক দিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এই পোকা ও ধসা পোকা দ্বারা গত পূর্ব্ব (সন ১৩১৫ ও১৬ সাল) দুই বৎসর ধানগাছের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। অনেক ধানগাছ কীট দষ্ট হইয়া আমাদের এখানে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পত্রই বৃক্ষের জীবন স্বরূপ, সেই পত্রের রস উক্ত কীট কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ ভক্ষিত হইলে গাছ নিস্তেজ হইয়া যায় এবং কোন

কোন গাছ একবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পত্রের রসই পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া গাছের সর্ব্ব শরীরে চালিত হইয়া গাছের পুষ্টি সাধন করে। সেই রস কীট কর্ত্তৃক নষ্ট হইলে গাছ কিপ্রকারে সতেজ ও জীবিত থাকিবে। এই কীটের উপদ্রব নিবারণের উপায় এ প্রদেশে মনুষ্য কর্ত্তৃক এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। যদি কৃষক সম্পাদক অথবা কৃষকের কৃষিতত্ত্ববিদ কোন লেখক বা পাঠক এই কীটের উপদ্রব হইতে ধানগাছ রক্ষার কোন উপায় অবগত থাকেন, তাহাহইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক কৃষকে তাহা প্রকাশিত করিলে অনুগৃহীত হইব। ২।১টী স্বাভাবিক উপায়ে এই কীটের উপদ্রব বহু পরিমাণে নিবারিত হইতে দেখা যায়। উপরি উপরি ৫।৭ দিন প্রখর রৌদ্র হইলে সূর্য্যের উত্তাপে অনেক কীট মরিয়া যায়। মুষল ধারায় বৃষ্টি হইলেও এই কীট ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

ধসা পোকা,—এই কীট ধান গাছের সর্ব্বনাশ করে। এই কীট ধানগাছে ধরিলে গাছ পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। গাছের গর্ভস্থ কোমল পত্রে (মাইজ) ধরিয়া, তাহা ভক্ষণ করে। গাছের গর্ভস্থ পত্র ভক্ষিত হইবার কিছু দিন পরেই গাছ পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই কীটের অনিষ্ট-কারিতার বিষয় স্মরণ করিয়া এখানকার কৃষকেরা বলিয়া থাকে, "ধরলে ধসা, থাকেনা আশা।" ধসা পোকার উপদ্রবে অনেক সময়ে কৃষকদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গর্ভস্থ কোমল পত্র নিঃশেষিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহারা গাছ পরিত্যাগ করিয়া যায় না। গর্ভস্থ কোমল পত্র ভক্ষিত হইবার পর আপনা হইতেই গাছ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ঐ পোকা ছাড়িয়া গেলে অনেক সময়েই সেই গাছের মূল হইতে নূতন চারা বাহির হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষতির পূরণ করে। জমির যে দিকে রৌদ্র ও বায়ু পায় সে দিকে এই পোকার উপদ্রব কিছু কম হইয়া থাকে। এই পোকা শাঁকী পোকা অপেক্ষা কিছু ছোট, অল্প কৃষ্ণাভ। ধানের গাছ চিরিলে এই পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ধসা ও শাঁকী পোকার ন্যায় ধান্যের অনিষ্টকারী পোকা দেখা যায় না। এই পোকা কর্ত্তৃক গাছ আক্রান্ত হইলেও চক্ষু দ্বারা, এই পোকা দেখিতে পাওয়া যায় না। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পোকা গুলি গাছের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে। এই পোকায় ধরিলে গাছের ঘোর সবুজ বর্ণের পাতা গুলি দিন কয়েক মধ্যেই তাম্রবর্ণ ধারণ করে। অনেক গাছ পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই পোকাও সচরাচর ভাদ্র মাসে ধরিয়া থাকে।

ভামা,—এই কীটও ক্ষুদ্র এবং কৃষ্ণ বর্ণ। ধান গাছ হইতে শীষ বহির্গত হইবার পর ধান্যের মধ্যে চাউল জন্মিবার পূর্ব্বে দুগ্ধবৎ তরল শ্বেতবর্ণ রস উৎপন্ন হয়, এই পোকা তাহাই ভক্ষণ করে। ঐ দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ রস ভক্ষিত হইলে, ধান্যে আর চাউল উৎপন্ন হয় না, কীটদষ্ট ধান্য গুলি আগড়ায় পরিণত হয়। এই কীটের উপদ্রব অধিক হইলে কৃষকের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এই কীটের উপদ্রব সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই রক্ষা। বহু সংখ্যক হৈমন্তিক ধান্যের ক্ষেত্রের নিকটে যদি ২।১টী ক্ষেত্রে আশু কি কেলেস ধান্যের গাছ থাকে, তাহা হইলে ঐ কীট কর্ত্তৃক ঐ আশু বা কেলেস ধান্যের অধিকাংশ উক্ত দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণের তরল পদার্থ ভক্ষিত হইয়া চাউল শূন্য হয়। যে সকল ধান এক সময়ে পাকে, এরূপ ধানের বহুসংখ্যক জমি যদি এক স্থানে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে এই পোকার অধিক উপদ্রব দেখা যায় না। কোন স্থানে একটী মাত্র হৈমন্তিক

ধান্যের ক্ষেত্র থাকিলে, সে ধানেও উক্ত পোকা লাগিয়া কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষতি করিয়া থাকে। একারণ হৈমন্তিক ধান্যের জমির নিকট উচ্চ জমি হইলেও আশু কি কেলেস ধান্য বপন বা রোপণ করে না। করিলে অধিকাংশ সময়েই ভামা কর্ত্তৃক অনিষ্ট হইয়া থাকে।

ঢেঁপো,—ধান গাছে ঢেঁপো ধরা রোগ কীট কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয় কি স্বভাবতঃ হইয়া থাকে, এপর্য্যন্ত তাহা নিরূপিত হয় নাই। ধান্য চারা রোপণের কিছু দিন পরে ধান গাছের গোড়া হইতে নূতন নূতন চারা উদ্ভূত হইয়া থাকে: তৎপরে ধান গাছের কোন কোন ঝাড়ের ২।১টী গাছের গর্ভ হইতে মাদুর কাটীরন্যায় একটী শীষ বাহির হইয়া থাকে। যে গাছের গর্ভ হইতে ঐ শীষ বাহির হয়, সে গাছে আর ধানের শীষ বাহির হয় না। যে যে গাছে ঢেঁপো ধরে সে গাছটী অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তাহার কিছু-মাত্র ফল পাওয়া যায় না। সকল বৎসরই যে ঢেঁপো কর্ত্তৃক অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহা নহে। যে বৎসর ঢেঁপো ধরে সে বৎসর মাঠের প্রায় সমস্ত জমির ধানেই ধরিয়া থাকে। ভাদ্রমাসেই ঢেঁপো ধরিয়া থাকে। কখন কখন বীজতলার ধানগাছেও ঢেঁপো ধরিতে দেখা যায়। ঢেঁপো ধরা সহজে জানিতে পারা যায় না বিশেষ পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না। যে বৎসর ঢেঁপো ধরে না, সেবৎসর মাঠের কোন জমির ধানেই প্রায় ধরিতে দেখা যায় না। এই ঢেঁপো ধরা রোগ কেহ কেহ বলেন, কীট কর্ত্তৃক গাছের গর্ভস্থিত মাইজ নষ্ট হইয়া যাইলে, মাদুর কাটির ন্যায় অথচ তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র শীষ স্বভাবত বাহির হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, ভাদ্র মাসে যে বৎসর মধ্যে মধ্যে সামান্য সামান্য মেঘ হইয়া গুড় গুড় শব্দে মেঘ গর্জ্জন করে অথচ বৃষ্টি হয় না, সেই বৎসরই ধান গাছের এই অনিষ্ট হইয়া থাকে। কিজন্য এরূপ হইয়া থাকে, কৃষি-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন।

ইহা ব্যতীত আরো কোন কোন কীট পতঙ্গ কর্ত্তৃকও ধান গাছের কখন কখন সামান্য ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা ধর্ত্তব্য মধ্যে নহে।

ধান্য ব্যতীত অন্যান্য গাছ পালারও কীট পতঙ্গ কর্ত্তৃক বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। তাহা কৃষকের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ছাতা ধরা বৃক্ষ মাত্রেরই বিশেষ অনিষ্টকর। ছাতা ধরিলে গাছের আর নিস্তার থাকে না।

ঈতি ও অন্যান্য কীট পতঙ্গের উপদ্রব ব্যতীত গাঁজ ধান গাছের একটী ভয়ানক শত্রু। ধান্য চারা রোপণের পর যদি জমিতে গাঁজ জন্মায়, তবে আর সে বৎসর আশানুরূপ ফল পাইবার কিছু মাত্র আশা থাকে না। পূর্ব্বে "বর্দ্ধমান অঞ্চলের ধান্য চাষ" প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখন এ সম্বন্ধে নিরস্ত হইলাম।

উই,—ধান্য প্রভৃতি অনেক শস্যেরই অনিষ্ট-কারী। গাছে একবার উই ধরিলে আর রক্ষা থাকে না, গাছকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকে। যদি ধান গাছের জমির জল কোন কারণে শুষ্ক হইয়া যায় তবে অনেক সময়েই উই ধরিয়া ধান গাছকে নষ্ট করিয়া ফেলে। জমিতে জল থাকিলে ইহার উপদ্রব থাকে না। উই আখের ও বিশেষ অনিষ্টকর। জমি জলশূন্য হইলে ধান গাছের মূল দেশ উই ধরিয়া নষ্ট হয়। তৎপরে গাছ শুষ্ক হইয়া যায়। ইক্ষু রোপণ করিবার সময় ইক্ষুর অগ্রভাগ কর্ত্তন করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রোপণ করিতে হয়। ঐ অগ্রভাগস্থিত চোক হইতে চারা বাহির হয়। চারা বাহির হইবার পরই (যে সময়ে ঐ চারার মূল নির্গত হইয়া মৃত্তিকা মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়) প্রায় অনেক স্থানেই আখের ঐ ডগাটীতে উই ধরিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং আখের চারাটী ও শুষ্ক হইয়া যায়। অনেক গাছেরই উই ভয়ানক শত্রু। উইয়ের উপদ্রব হইতে ফসল ও বৃক্ষাদি রক্ষা করিবার জন্য কৃষক দিগকে বিশেষ সাবধান হইতে হয়।

নারিকেল।

নারিকেলের শাঁস উপাদেয়, সুমিষ্ট, উপকারী। নারিকেল হইতে সংসারের অনেক আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার শাঁস পুষ্টিকর ও অম্ল-নাশক খাদ্য। অপরিপুষ্ট নারিকেল অর্থাৎ ডাবের জল শীতল ও স্নিগ্ধকারী পানীয়। শাঁস হইতে প্রস্তুত তৈল—রন্ধন কার্য্যে, গাত্রে ও মস্তকে মাখিতে ও আলো জ্বালাইতে ব্যবহৃত হয়। নারিকেল তৈল মস্তিক শীতলরাখে, এবং খাইলে কডলিভার তৈলের (Cod liver oil) কার্য্য করে। সিলোন (Ceylon) অর্থাৎ লঙ্কার অধিবাসীগণ নারিকেল তৈলে রন্ধন কার্য্য করে। নারিকেল তৈলে রন্ধন কার্য্য হয় শুনিলে আমাদিগের মনে কেমন এক প্রকার ঘৃণা উপস্থিত হয়। কোন কারণে ব্যঞ্জনাদি নারিকেল-তৈল-গন্ধযুক্ত হইলে—আমরা তাহা খাইতে পারি না। লেখকের সিলোনবাসী কোন ভদ্র-লোকের সহিত এতৎসম্বন্ধে কথোপকথন হইয়া-ছিল। তিনি নারিকেল তৈলাহারের গুণব্যাখ্যা বিশেষ প্রকারে করিয়াছিলেন। তিনি বলেন খাঁটি নারিকেল তৈল দুর্গন্ধযুক্ত নহে, অনায়াসেই উক্ত তৈলে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যাদি আহার করা যাইতে পারে, এবং একবার অভ্যস্ত হইলে নারিকেল তৈল প্রস্তুত দ্রব্য উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইবে।

নারিকেল খইল উৎকৃষ্ট সার। গাছ হইতে নিঃসৃত সুমিষ্ট রসে মাদকতা শক্তি আছে এবং উহা হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। কাষ্ঠ,—গৃহাদি নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। পাতায় ঘর "ছাওয়া" হয়। শুষ্ক নারিকেল শাখা জ্বালানি কাষ্ঠের কার্য্য করে। শাখার কাটিতে মার্জ্জনী প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারিকেলের খোলে হুঁকা এবং সন্ন্যাসী ও

ফকিরের পানপাত্র প্রস্তুত হয়। "ছোবড়া"র দড়ি ও মাদুর প্রস্তুত হয়। অনেকে আবার "ছোবড়া"র গুটি করিয়া অগ্নিসংযোগে তামাক খাইয়া থাকেন। এইরূপ এক নারিকেল গাছ হইতে সংসারের অসংখ্য আবশ্যকীয় পদার্থ প্রস্তুত হয়।

নারিকেল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপরিপক্ব ফল ও তাহার জল তৃষ্ণা নিবারণ করে ও শরীর শীতল রাখে। ফুল—সঙ্কোচক ও বলকারক। তৈল—কড্‌লিভর তৈলের কার্য্য করে এবং মাখিলে কেশের শ্রী-সম্পাদন হয়। স্ত্রীলোকেরা এই তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মৃত্তিকা।

সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে নারিকেল চাষ হইয়া থাকে। সমুদ্র হইতে বহুদূরস্থিত দেশে নারিকেল গাছ ভাল জন্মে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সরস ও সারযুক্ত জমিতে নারিকেল চাষ হইয়া থাকে।

সমুদ্রের তীরবর্ত্তী নারিকেলের ক্ষেতে সমুদ্রের জল প্রবেশ করিলে উপকার হইয়া থাকে, কিন্তু গাছের গোড়ায় কোন কারণে জল দাঁড়াইয়া না থাকে এরূপভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। সমুদ্র বা বৃষ্টির জল ক্ষেত্রান্তর্গত হইলেই নিকাশ হইয়া যাওয়া আবশ্যক। জল নিকাশ না হইয়া মূলদেশে বদ্ধ হইয়া থাকিলে নারিকেল গাছের অনিষ্ট হইবে।

বীজ বপন।

পাকা ঝুনা নারিকেল হইতে নারিকেল-চারা হইয়া থাকে। পুরাতন গাছ হইতে বীজ নারিকেল সংগ্রহ করিতে হয়। যে গাছে অনেক নারিকেল ফলে—সেই রূপ গাছ হইতে বীজ লওয়া আবশ্যক। গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া এক মাস বা দেড় মাস বপন না করিয়া গরম ও শুষ্ক স্থানে তুলিয়া রাখিতে হয়। চারা প্রস্তুত করিবার নির্দ্দিষ্ট জমি (হাপর) গভীর ভাবে এক বা দেড় হাত পর্য্যন্ত কোপাইয়া সারসংযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। ছাই, চূর্ণ গোবর ও সামান্য লবণ ঐ জমির সহিত মিশ্রিত করা আবশ্যক। হাপরে এক ফুট অন্তর বীজ বসাইতে হয়। বর্ষার অনতিপূর্ব্বেই বপন করা উচিত। সম্মুখে বর্ষা—হাপর অল্প উচ্চ হওয়া আবশ্যক। বীজ বসাইয়া জলসেচন করিতে হইবে। পরে হাপর শুষ্ক হইয়া না যায় এরূপ ভাবে মধ্যে মধ্যে জলসেচন করিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইলে, নবোদগত পত্রকোরক দৈব দুর্ঘটনায় নষ্ট না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

রোপণ প্রণালী।

নারিকেল ছয় মাস কাল হাপরে রাখা হয়। এই ছয়মাস কাল মধ্যে চারা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয় এবং ক্ষেত্রে রোপণ করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। ক্ষেত্রে ১৪ হাত অন্তর নারিকেল চারা রোপণ করা হইয়া থাকে। অতএব ১৪ হাত অন্তর এক একটি গর্ত্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক গর্ত্ত ২ হাত গভীর ২ হাত দীর্ঘ ও ২ হাত প্রস্থ হওয়া চাই। গর্ত্তের মাটির সহিত ছাই, হাড়ের গুঁড়া ও কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। কোন তত্ত্বজ্ঞ ব্যাক্তি বলেন যে, উক্ত তিন পদার্থের পরিবর্ত্তে ধান্যের চিটা (যে ধান্যে শস্য হয় নাই) গর্ত্তের মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে—বেশী উপকার পাওয়া যায়। এবং চারায় উই ধরিতে পারে না।

নারিকেল ক্ষেতে চারা রোপণকালে কলার চাষ করিতে পারিলে ভাল হয়। কলাগাছের

ছায়ায় নারিকেল চারা প্রথমাবস্থায় প্রখর রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা পায়। ক্ষেত্রস্থ নারিকেল চারায় যথারীতি মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিতে হইবে। বোম্বে প্রদেশে বহুল পরিমাণে নারিকেল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদ্দেশবাসীরা প্রথম বৎসর প্রতিদিন বা এক দিবস অন্তর নারিকেলক্ষেত্রে জল সেচন করিয়া থাকে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে দুই বা তিন দিবস অন্তর জল সেচন করে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরেও তিন দিবস অন্তর ক্ষেত্রে জল দিয়া থাকে। পরে আর জল সেচন প্রায়ই আবশ্যক হয় না।

সার।

নারিকেল গাছের পক্ষে কি সার উৎকৃষ্ট—এতৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। বহুদিবস হইতে ছাই ও লবণ সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে ছাইয়ের সহিত মৎস্যচূর্ণ গোবরসার ও মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া, নারিকেল গাছে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। বর্ষার অনতিপূর্ব্বে গোড়া খুঁড়িয়া শিকড় বাহির করিতে হয়। পরে বর্ষাগমনে সার দিয়া গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। নারিকেল গাছে আশুফলদায়ী সারের প্রয়োজন হয় না। নারিকেল গাছ ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয়—কাজেই যে সার শীঘ্র কার্য্য করে—তাহার আবশ্যক হয় না। এবং অনুর্ব্বরা জমিতে নারিকেল গাছ বেশ জন্মে।

এই সব কারণে হাড়ের গুঁড়া নারিকেল গাছের পক্ষে উপযুক্ত সার। হাড়ের গুঁড়া সারের কার্য্য অতি ধীরে ধীরে সম্পন্ন করে। হাড়ের গুঁড়া শীঘ্র শীঘ্র গাছ বর্দ্ধিত করিয়া বহুফল প্রসব করাইয়া গাছের অকাল বার্দ্ধক্য আনয়ন করে না। সিংহল (Ceylon) হইতে প্রকাশিত "ট্রপিকাল এগ্রিকালচারিষ্ট" (Tropical Agriculturist) নামক পত্রে নারিকেলের উপযুক্ত সার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। উক্ত পত্রে উক্ত বিষয়ের প্রবন্ধ লেখকের মতে ছাই অপেক্ষা পশ্বাদির মল মূত্রাদি নারিকেল গাছের পক্ষে উৎকৃষ্টতর সার। বর্ষার পূর্ব্বে গাছের গোড়ায় পশ্বাদি জন্তু বাঁধিয়া দিতে হয়। পরে বর্ষাকালে আমোনিয়া (Ammonia) ক্ষেত্রে পতিতমলমূত্রাদি হইতে ধৌত হইয়া যাইলে—জমি খুঁড়িয়া উহা জমির সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রণালী পরীক্ষা সাপেক্ষ। নারিকেল বেশী পরিমাণে চাষ করিলে এ নিয়মে কার্য্য করা সুবিধা হয়। ক্ষুদ্র নারিকেল-ক্ষেত্রেও এ প্রণালী পরীক্ষা হইতে পারে।

নারিকেলের ফলন।

একটা নারিকেলের গাছ হইতে বৎসরে কত পাওয়া যাইতে পারে তাহার কোন স্থিরতা নাই। সকল বৎসর সমান ফলে না। তবে সাধারণ একটা নারিকেল গাছ হইতে বৎসরে একশত নারিকেল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু জমি ও জলবায়ু গাছের উপযোগী হইলে বৎসরে দুই শত পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়। বড় নারিকেল কম ফলে। ছোট বেশী ফলে।

কুপৌ ফুল।

(ORCHIDS.)

শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ লিখিত।

"অর্কিড বা কুপৌ" ফুল অবিবাহিতা আসামীয়া যুবতীর অতীব আদরের ফুল। তাঁহারা অতিশয় আনন্দের সহিত কুপৌ ফুল দ্বারা বেণীর শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ যে কুপৌ ফুল উঁহারা ব্যবহার করেন উহা দেখিতে সুন্দর। প্রায় ১½ ফুট দীর্ঘ একটী ডাঁটার চারিদিকে (কলা কাঁদির ন্যায়) কুসুম ফুলের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় প্রায় ১৫৯ হইতে ২০০ শত পর্য্যন্ত ফুল হইয়া থাকে। ফুলগুলি ফুটিলে প্রায় হরিতাল ঘুঘুর ন্যায় হয় এই জন্য আসামীয়া উহাকে "কুপৌ" (ঘুঘু) ফুল বলে। ফুলগুলির পাপড়িগুলি গড়ে লাল বর্ণ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ঐ জাতীয় অন্যান্য ফুলকে প্রায় "সরমালা" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। উহার অন্য নাম আসামী ভাষায় বলিতে শুনি নাই।

আসাম পর্ব্বতও অরণ্যময়। খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, নাগা, মিকির, ডফলা, মিশমি, আকা, ভুটীয়া প্রভৃতি পর্ব্বতে নানা জাতীয় orchid অর্কিড পাওয়া যায়। Orchid বনজ লতা জাতীয় ও অমর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ গত বৎসর কতকগুলি বিভিন্ন জাতীয় orchid এখান হইতে কলিকাতায় কোন আত্মীয়কে পাঠাই; সেগুলি সবই জীবিত আছে। পাঠাইবার প্রায় ২০ দিন পূর্ব্বে আনাইয়া রাখি ও তৎপরে পাঠাই কিন্তু কিছুই নষ্ট হয় নাই। আর সেই সময়ে প্রায় প্রত্যেক জাতীয় এক একটী এখানে আম ও পেয়ারা গাছের দোফ্যাকড়া ডালে ডালে রাখিয়া দিয়াছিলাম। সেই গুলি সবই বাঁচিয়া আছে ও গত বৈশাখের শেষে ফুল ফুটিয়াছিল। এ বৎসর আর কয়েকটী নূতন orchid আনাইয়াছি। সেগুলিও বাঁচিয়াছে। অবশ্য উহাদিগকে গাছে রাখা ব্যতীত অন্য কোন যত্ন করি নাই। বাস্তবিক বলিতে কি আমি orchid যে বিশেষ আদরের জিনিস তাহা পূর্ব্বে কখনই মনে করি নাই, তবে এখন উহার ঐ গুণে যেখানে দেখি আনাইয়া রাখি। আর একটী বিষয়ে আমার মন উহাতে আকৃষ্ট হইয়াছে। উহা এই—

Orchidএর পাতা প্রায় একরূপ অথচ ফুল বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। গত বৎসর মহাভৈরবীর পাহাড়ের একটী আম গাছ হইতে দুইটী orchid গাছ আনি। কিন্তু যখন ফুল হইল তখন দেখি কোন ফুলটীর সহিত কোনটীর সাদৃশ্য নাই—সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইউরোপীয় ভাষায় ফুলের গঠন প্রভৃতি দেখিয়া orchidএর বিভিন্ন নাম হইয়াছে। আমাদের বঙ্গভাষায় orchidএর কোন নাম বোধ হয় নাই, থাকিলেও জানি না। তবে আগাছা হিসাবে ধরিলে orchidকে আগাছাই বলিতে পারি, এবং তাহাই যেন ঠিক মনে হয়। কারণ ইহা অন্য একটী গাছকে আশ্রয় না করিয়া হইতে দেখি নাই।

ইউরোপে orchidএর বড়ই আদর। আজ কাল আমাদের দেশের মধ্যেও দুই দশ জনকে orchidএর আদর করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

কুপৌ জাতীয় orchidএর পাতা খেজুর পাতার ন্যায় মধ্যশিরা হইতে দুই পার্শ্বে ঢালু; বর্ণ ঘন সবুজ; ১২ হইতে ১৮ ইঞ্চি দীর্ঘ, ১ হইতে ১½ ইঞ্চি প্রস্থ ও ১ ইঞ্চি বেধ। ইহার গাছ ১ ইঞ্চি ব্যাস পর্য্যন্ত হয় অর্থাৎ কলমী বা হিংচের ডাঁটার ন্যায়

মোটা হয়। ইহা বর্দ্ধনশীল নয়। এক বৈশাখ হইতে আর এক বৈশাখ পর্য্যন্ত—এক ফুল হইতে অন্য ফুল প্রস্ফুটিত হইবার সময় অবধি ৫।৬টার অধিক পাতা হয় না।

ঐ ডাঁটা হইতে যথেচ্ছ শিকড় নির্গত হয়। আবার পাতার কোল হইতেও শিকড় নির্গত হইয়া থাকে। শিকড় হইতে শাখা শিকড়ও বহির্গত হয়। ২।১টী শিকড় দীর্ঘে ৫।৬ ফুটও হইয়া থাকে। শিকড়গুলি গোড়ায় প্রায় সিকি ইঞ্চি মোটা হয়। যত দীর্ঘ হয় তত সরু হইয়া যায়। এই শিকড়গুচ্ছ আশ্রিত বৃক্ষের ছালের সহিত এমন ভাবে লিপ্ত হয় যে, টানিলে গাছটী ছিঁড়িয়া আইসে তথাপি শিকড় সহিত আসে না। গাছের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাছ দীর্ঘ হয় এবং ক্রমে পুরাণ পাতাগুলি শুখাইয়া পড়িয়া যায়। ইহা প্রতি বৎসর ৬ ইঞ্চির অধিক বড় হয় না। ফুল হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে (অর্থাৎ আজকাল) গাছ গুলি বেশ সবল হয়। ফুল হইবার সময় পাতার কোল হইতে ফুলের শীষগুলি বহির্গত হয়। এই শীষের চারিদিকে ছোট ছোট কোরক (কুঁড়ি) হয়। এই কুঁড়িগুলি ক্রমশঃ ফুটিতে থাকে। একবারে সকল গুলি ফুটে না। প্রত্যেক গাছে ১ হইতে ৪টী পর্য্যন্ত ফুল শীষ হইতে দেখিয়াছি। ইহার বেশী হয় কিনা বলিতে পারি না। যখন সমুদয় শীষটীর কুঁড়িগুলি ফুটিয়া উঠে তখন চামরের ন্যায় হয়। এই জন্য বোধ হয় ইহাকে "শিয়াল লেঙ্গী" ফুল বলিতে ও শুনা যায়। ইহার গন্ধ মনোহর।

ঐ জাতীয় আর এক প্রকার orchid আছে। ইহার বর্দ্ধন, বিস্তৃতি, গঠন প্রভৃতি উপরোক্তরূপ; তবে পৃথকত্ব এই যে ইহার পাতার বর্ণ ফিকে সবুজ (Light green,) ৯ ইঞ্চি দীর্ঘে, ৩½ ইঞ্চি বেধে হইয়া থাকে। আর ফুল শীষ ৯।১০ ইঞ্চির অধিক হয় না। এবং ফুলগুলি একটু বড়, পাপড়ি গুলি সাদা ও প্রায় ¼ ইঞ্চি দূরে দূরে হয়। গন্ধ কম, দেখিতে সুন্দর।

"রঘুমালা" বা সরমালা orchid গাছের মূল হইতে পাতা বহির্গত হয়। মূলটিই কাণ্ড। পাতা ১৪ ইঞ্চি হইতে ২০ ইঞ্চি দীর্ঘ; ১⅛ হইতে ১½ ইঞ্চি প্রস্থ (শিরার উভয় পার্শ্বে), প্রায়ই ৩⅛ বেধবিশিষ্ট হয়। পাতার বর্ণ কুপো (orchid) অর্কিডের ন্যায়। কিন্তু উহাপেক্ষা শক্ত। শিকড়ের গঠন ও বিস্তৃতি উপরোক্ত orchidএর ন্যায়! ফুলও বৎসরে একবার মাত্র হয়। তবে ফুলশীষটী ৩ ফুট হইতে ৩½ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়, আর প্রায় ১ইঞ্চি অন্তর এক একটী ফুল হইয়া থাকে। ফুল গুলি দেখিতে সেফালিকার ন্যায়, তবে সাদা নয় গাঢ়, পাটকিলে (Brown) বর্ণ হয়। যে সময় ফুল দেখিয়াছি সে সময় সৌরভ পাই নাই।

ঐ জাতীয় অর্কিডের অন্য প্রকারের পাতা দীর্ঘ, প্রস্থ ও বেধে অনেক হীন, কিন্তু অন্যান্য গঠনাদিতে সমুদয়ই এক। ফুল শীষ ১২।১৩ ইঞ্চির বেশী হয় না। ফুলে লাল ছিটে থাকে। গন্ধ মৃদু।

(ক্রমশঃ)

ফাল্গুন—১৩১৭।

ফল প্রসঙ্গ।

অতি পুরাকাল হইতে ফলের ব্যবহারের কথা শুনা যায়। এমন কি বেদ কিম্বা উপনিষদাদি গ্রন্থেও ফলের গুণ গীত হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রের কথাই বা শুধু বলি কেন বাইবেলেও কল্প বৃক্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কল্প বৃক্ষের ফল আস্বাদন করিয়াই মানুষের জ্ঞান প্রথম উদ্দীপিত হইয়াছিল এবং তাহা হইতেই পাপপুণ্য বিচার এবং সুখ দুঃখের ভোগ আরম্ভ হইয়াছে।

এরূপ যে পুরাণাতীত কালের ফল, সেই ফলের সম্বন্ধে সব কথা বলা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।

কি প্রকারে ফলের বাগান করিতে হয় এবং কি প্রকারে বাগান রচনা করিলে লাভ হয় "কৃষকে" ইতি পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে এবং ফলের ব্যবসা সম্বন্ধেও তাহাতে প্রসঙ্গতঃ কিছু আলোচনা আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখাইতে চাই যে এই সুবিস্তৃত বৃটিস সাম্রাজ্যে কোথায় কি ফল পাওয়া যায়। ইহা জানিয়া রাখায় লাভ আছে। ফল সকল দেশে প্রায় সমান ভাবে আদৃত এবং ইহা মানুষের একটা প্রধান খাদ্য। ইহা নিশ্চিত জানা গিয়াছে যে, যদি ফল বার মাস নিয়মিত ব্যবহার করা যায় তাহা ঔষধ ও পথ্যের কার্য্য করে। এরূপ ফল ব্যবহারে ডাক্তার এবং ঔষধের খরচ বাঁচিয়া যায় উপরন্তু কটু, তিক্ত, কষায় ঔষধ সেবন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

সমগ্র ভূমণ্ডলে ইতর কিম্বা ভদ্র কিম্বা ধনবান সকলেই কিছু কিছু পরিমাণে ফল উৎপাদনে নিযুক্ত। ভারতবর্ষের মধ্যে সিলেট, আপার আসামে, দারজিলিঙে ও নাগপুরে প্রচুর কমলা লেবু উৎপন্ন হয়। এখান হইতে সহস্র সহস্র মুদ্রার লেবু নানা স্থানে বিক্রীত হইতেছে। যাঁহার একটি ছোটখাট ১০ বিঘা পরিমাণও কমলা লেবুর ক্ষেত আছে তিনিও বৎসরে খরচ বাদে ৩০০৲ টাকা মুনফা পাইয়া থাকেন। অন্যস্থানের সহিত তুলনায় ইহা কিন্তু অতি সামান্য মুনফা। বৃটিস সাম্রাজ্যের মধ্যে টাসমানিয়ায় যেমন আপেল উৎপন্ন হয় এমন আর কোথাও হয় না, ধনীগণও তথায় আপেল চাষে নিযুক্ত। রয়েল সোসাইটি অব আর্ট নামক বিলাতের কোন একটি সমিতির বিবরণী পাঠে জানা গেল যে, তথায় এক একর (৩½ বিঘা) আপেল বাগান হইতে ৪০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৬০০৲ টাকা মুনফা পাওয়া যায়; সুতরাং ২৫ একর একটা আপেল বাগান করিতে পারিলে ১৫,০০০ টাকা আয় দাঁড়াইল। ভারতবর্ষেও খুব ভাল আপেল জন্মায়। হিমালয়ের উচ্চ ভূমিভাগে কাশ্মীরের আপেল দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। সেই রকম আপেল কলিকাতার বাজারে অতি কম ৵০ আনা দরে এক একটা বিক্রয় হইতে পারে কিন্তু আমাদের দেশের লোকের ব্যবসা বুদ্ধি তাদৃশ প্রখর নহে। সে আপেল বিদেশে রপ্তানি হওয়া দূরের কথা ভারতের সর্ব্বত্রও বিক্রয়ার্থ যায় না।

ফলের বাগানের একটা সুক্ষ্ম তত্ত্ব সকলে মনে রাখেন না। ফলের বাগানের জন্য খুব ভাল মাটির ততটা আবশ্যকতা দেখা যায় না। যে মাটিতে আলু, কপি, বেগুণ, মটর ভাল হইবে না সে মাটিতে কিন্তু অধিকাংশ ফলের গাছ ভালরূপই জন্মিবে। ফলের বাগান করিয়া ঐ সকল জমির সদ্ব্যবহার না করিলে এমন কতশত বিঘা জমি বৃথা পড়িয়া থাকিত। সুতরাং বলিতে হইবে ফল চাষে, দেশের ধন বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ব্যবসায়ের পসার বাড়িয়াছে।

ফলচাষ দ্বারা যে কিরূপে বাণিজ্যের পসার বাড়ে তাহা ঐ টাসমানিয়ার কথা লইয়াই বুঝান যাইতে পারে। টাস্‌মানিয়ায় ৫ লক্ষ বুসেল্ আপেল জন্মায়। এই আপেলের লোভে, আমেরিকার যুক্তরাজ্য এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে ডাক জাহাজ গুলি টাস্‌মানিয়ায় হবার্ট বন্দরে আসিয়া থাকে। এই সকল জাহাজে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ আসা যাওয়া করেন, অতএব তাঁহাদের গতিবিধি হেতু তথাকার উৎপন্ন অন্যান্য দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়ের খুবই সম্ভাবনা। রয়েল সোসাইটি অব আর্ট নামক সমিতির বিবরণী খানি সম্মুখে পাইয়াই আমরা কেবল টাস্‌মানিয়ার কথা উল্লেখ করিলাম। টাস্‌মানিয়ার কথা হইতে বুঝিতে হইবে যে, যাহা টাস্‌মানিয়ার মত সামান্য স্থানের পক্ষে সম্ভবপর তাহা অপরাপর বৃহৎ হইতে বৃহত্তর স্থানের পক্ষে কেন না সম্ভব হইবে? সামান্য ফলের ব্যবসা হইতে অপর সাধারণ নানাবিধ বাণিজ্যের পসার বৃদ্ধি করা কত সহজ কার্য্য তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই ফলের বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গেই গম ও পশমের বাণিজ্য আরম্ভ হইতে দেখা যায়। সদ্য প্রসূত ফলের যোগানের সঙ্গে নানা প্রকারে প্রস্তুত ফল, যেমন শীত প্রধান দেশে চিনির রসে পাক করা ফল, এবং গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শুখান ফল, কিম্বা সুরাসারে প্রস্তুত ফলের বাণিজ্য অবশ্যম্ভাবী আনুসঙ্গিক ব্যাপার।

প্রায় সকল রকম ফলই বৃটিসরাজ্যে পাওয়া যায় এবং বৃটিসরাজ্যে ফলসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবসা প্রচলিত আছে।

বরফে ফল সংরক্ষণ করা যায় বলিয়া, কিম্বা শুখান ফল ইতস্ততঃ প্রেরণ করার সুবিধা আছে বলিয়া, সাম্রাজ্যের এক প্রান্তের লোকগণ অপর প্রান্তের ফলসমুহের রসাস্বাদনে সমর্থ! যদিও দুর দেশ হইতে আনিত ফল গুলি স্বাদে গন্ধে কিছু বিকৃত দশা প্রাপ্ত হয় তথাপি ইহা সুখাদ্য এবং স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। বিদেশে ফল পাঠাইবার সুবন্দোবস্ত করাই ফলের ব্যবসায়ের সুক্ষ্ম সূত্র। অনেক স্থানে এত অধিক ফল উৎপন্ন হয় যে, সে গুলি অন্যত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কত ফলই বৃথা নষ্ট হইয়া যাইত। এই অতিরিক্ত ফলগুলি কাজে লাগাইবার চিন্তা স্বতঃই মানুষের মনে উদিত হইয়াছে এবং মানুষ এক্ষণে নানা উপায়ে ফল সংরক্ষণ করিতে ও তাহা বিদেশে পাঠাইতে শিখিয়াছে।

টাস্‌মানিয়ায় উৎপন্ন আপেলের পরিমাণ ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয় এবং আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে এবং অন্যান্য দেশে সেই আপেলের আদর দেখিলে প্রাণে নুতন ভাব উদ্দীপিত হইয়া উঠে। ভারতবর্ষে অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর কত পতিত জমি রহিয়াছে তাহাতে সেচন জলের সুবিধা করিতে পারিলে সুন্দর ফলের বাগান রচনা করা যাইতে পারে, এবং এই রূপে ভারতে এত ফল উৎপন্ন হইতে পারে যে তাহা সমগ্র দেশ কিম্বা বিদেশের লোকও খাইয়া ফুরাইতে পারে না।

অধিকন্তু ফলের মিঠাই মোরব্বা তৈয়ারি হইয়া সময়ে অসময়ে মানুষের ঘরে একটা ভাল খাদ্যের যোগাড় বার মাসই রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আবার আঙ্গুর প্রভৃতি ফল হইতে সুরাসার প্রস্তুত করিয়া ফলের ব্যবসায় সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন করা বিচিত্র নহে। ব্রিটিস সাম্রাজ্যে এত প্রকার ফল এবং তাহা এত পরিমাণ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব যে, তাহা হইতে সমগ্র ভূমণ্ডলের একটা প্রধান আহার্য্য ও ঔষধের যোগাড় হওয়া কোন ক্রমেই দুঃসাধ্য নহে।

ফলের মিঠাই, মোরব্বা বা ফল হইতে সুরাসার প্রস্তুত ব্যতীত আর দুই একটা ছোট খাট ব্যবসা ফলের বাগানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে ;—দূর দেশে ফল পাঠাইবার জন্য বাক্স কিম্বা ঝুড়ী, মিঠাই, মোরব্বা, জারক ফল রক্ষার জন্য বোতল বা টিন বাক্স, সুরাসার বা ফলসংক্রান্ত অন্যান্য দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য কাঠের বা কাঁচের পিপা এই আনুসঙ্গিক দ্রব্যগুলির আবশ্যক হইয়া থাকে। ফলের বাগান সম্বন্ধে আধুনিক আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা আছে। অনেকে অবগত আছেন যে, মধুমক্ষিকাগণ দ্বারা ফুল হইতে ফুলান্তরে ফুলের রেণু আনীত হইয়া বৃক্ষগণ ফলবান হয়, এবং সাধারণতঃ এই রকমে বৃক্ষগণ অধিক ফল প্রসবে সমর্থ হয় এবং তাহাদের ফলও অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়া থাকে। সুতরাং ফলের বাগানের সঙ্গে মধুমক্ষিকা পালন মন্দ কথা নহে। তাহাতে লাভ যথেষ্ট, উপরন্তু লাভের উপর লাভ মধু সংগ্রহ। আমাদের দেশে ফলের বাগানে কেহ আজ পর্য্যন্ত মৌমাছি পালন করেন নাই, এখানে বনে জঙ্গলে যে মৌচাক হয় তাহার এক একটা চাক হইতে দুই কিম্বা আড়াই মণ মধু সংগ্রহ হওয়া অসম্ভব নহে। লোকালয়ে গৃহস্থের বাটীতে যে সকল চাক হয় তাহা প্রায়ই ছোট হয় তাহা হইতে গড়ে আট বিম্বা দশ সেরের অধিক মধু মেলা ভার। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক বাগানে মৌচাক আছে। ঐ সকল বাগানে প্রত্যেক চাক হইতে নূতন প্রণালীতে ২০০ পাউণ্ড(১) পর্য্যন্ত মধু সংগ্রহ হইতেছে। ফলের বাগান হইতে এই উপরি মধু প্রাপ্তি মন্দ কথা নহে।

ফল সম্বন্ধে বিবিধ বিবরণী হইতে কোথায় কত ফল উৎপন্ন হয় তাহার একটা মোটামুটি তালিকা দেওয়া যাইতে পারে।

		একর (৩১/২ বিঘা)
ভারতবর্ষ (১৯০৬-৭) সব্জী বাগান সমেত		৪,০২০,১৩৬
যুক্তরাজ্য (১৯০৭-৮)	...	৩৩৫,১১৭
উত্তমাশা অন্তরীপ (১৯০৮)	...	৭২,৫৯০
কুইবেক (১৯০৮)	...	৭৭,৪১৬
ভিক্‌টোরিয়া (অষ্ট্রেলিয়া) (১৯০৮-০৯)		৭৫,১০৫
নভাস্কোসিয়া (১৯০৭)	...	৫৪,০৫১
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স (১৯০৮-০৯)	...	৫১,৮৬৮
দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া (১৯০৭-৮)	...	৪১,৮৬১
নিউ জিলাণ্ড (১৯০৮-৯)	...	২৯,২১৭
কুইন্স ল্যাণ্ড (১৯০৮-৯)	...	২৫,৩৩৪
টাসমানিয়া (১৯০৮-৯)	...	২৫,১৪৬
ব্রিটিস কলম্বিয়া (১৯০৫)	...	২২,০০০
পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া (১৯০৮-৯)	...	১৮,০৪৯
নাটাল (১৯০৫)	...	৩৭,৫৯০
সিংহল	...	১,০১৬,১৩৮
জামেকা	...	৬৩,০২৩
		৬,৩০২,৯১৭

১ পাউণ্ড প্রায় অর্দ্ধ সের।

আমেরিকার কানাডা রাজ্যে প্রচুর ফলের বাগান আছে। ১৯০১ সালের একটি বিবরণী পাঠে জানা যায় তথায় উক্ত বৎসরে নিম্নলিখিত পরিমাণ ফল উৎপন্ন হইয়াছে ;—

আপেল	...	১৮,৬২৬,১৮৬ বুসেল(১)
পিচ	...	৫৪৫,৪১৫ ,,
পিয়ারা	...	৫২১,৮৩৭ ,,
কুল	...	৫৫৭,৮৭৫ ,,
চেরি	...	৩১৬,৭৫১ ,,
আঙ্গুর	...	২৪,৩০২,৬৩৪ পাউণ্ড
অন্য ক্ষুদ্র ফল	...	২১,৭০৭,৭৯১ কোয়ার্ট
অন্য বাজে ফল	...	৭০,৩৯৬ বুসেল

কানাডা রাজ্যে অন্যান্য ফল ভালরূপ জন্মিলেও আপেলের জন্য কানাডা প্রসিদ্ধ। ১৯০১ সালের পর হইতে তথায় ফলের বাগান সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমেরিকা হইতে ইউরোপে ফল পাঠান সহজ বলিয়া এখানে ফলের বাগান হু হু বাড়িতেছে। আমেরিকা হইতে ইউরোপে ফল পাঠাইতে হইলে বরফ গুদামের আবশ্যক হয় না বা অন্য কোন প্রকারে ফল সংরক্ষণের আবশ্যক নাই।

ভারতবর্ষ অশেষ প্রকার ফলপ্রসূ। এখানে যে কি পরিমাণ জমি ঠিক ফলের বাগানে আবদ্ধ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। পূর্ব্ব তালিকায় ফলের বাগানের যে পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত সব্জী বাগানও যুক্ত আছে। ভারতের কোন প্রদেশে কত ফল উৎপন্ন হয়, তাহা জানা নাই। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামেই ফলের বাগান অধিক, পরিমাণ প্রায় ১০,০০০০০ লক্ষ একরেরও অধিক ; মাদ্রাজে কিছু কম ১০,০০০০০ লক্ষ একর, যুক্তপ্রদেশে ৫,০০০০০ লক্ষ, বঙ্গদেশে ৩,৫০০০০ লক্ষ, ব্রহ্মদেশে ৪০০০ হাজার একর। বাকী অন্যান্য প্রদেশের সহিত মোট ৪,০২০,১৩৬ একর হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহাতে সব্জী বাগানও জড়ান আছে। বিলাতি সব্জীর চাষ এদেশে বড় হইত না। ইউরোপীয়গণের আগমনের সঙ্গে এদেশে বিলাতী সব্জীর চাষ আরম্ভ হইয়াছে এবং উৎকৃষ্ট বিলাতী সব্জী এখানে জন্মিতেছে। এখানকার উৎপন্ন কপি, আলু, সালগম, বীট বাস্তবিকই প্রশংসা যোগ্য। ভারতের এত বিবিধ প্রকার জমি আছে, এত পাহাড়, পর্ব্বত, উচ্চ, নীচ ভূমি আছে, স্থানভেদে ঋতুর এত বিভিন্নতা আছে যে, মনে করিলে পৃথিবীর যাবতীয় ফল এদেশে উৎপাদন করা যাইতে পারে। শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে আপেল, পিয়ারা, আপ্রিকট, পিচ প্রভৃতি সুন্দর জন্মিতেছে। কাশ্মীর হইতে এই সকল ফলের রপ্তানি দেখিলেই উক্ত বাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে।

অপেক্ষাকৃত উচ্চ দেশে বাদাম, লেবু, কমলা জন্মে; তারপর সমতল গ্রীষ্মপ্রদেশে কলা, নারিকেল, আনারস, পেয়ারা অনায়াসে বহু পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। উষ্ণ ও নাতি উষ্ণ অনেক জায়গায় আম জন্মে এবং আমের সময় এদেশের লোক কেবল আম খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। ইহা বহুকালাবধি মনুষ্যের একটি সুখাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে।

সিংহলে অনেক প্রকার ফল উৎপন্ন হয়, কিন্তু নারিকেল উৎপাদনেই সিংহলের প্রাধান্য। এখানে ৭১০,৩৭৩ একর পরিমাণ জমিতে নারিকেলের আবাদ আছে। ১৯০৭ সালের রপ্তানির তালিকায় ১,৭৩৮,৫২৩ পাউণ্ড মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এক পাউণ্ডের মূল্য ১৫৲ টাকা ধরিয়া লইলে ২৬,০৭৭,৮৪৫৲ টাকার নারিকেল রপ্তানি হইয়াছে।

১ বুসেল=৮ গ্যালন=৮০ পাউণ্ড ; ১ পাউণ্ড প্রায় অর্দ্ধ সের।

আমরা অত্র প্রবন্ধে ভারতের উৎপন্ন ফলের কথা বিশেষ করিয়া বলিলাম. বারান্তরে বৃটিস অধিকৃত স্থান সমূহে কোথায় কত ফল উৎপন্ন হইতেছে বা কিরূপ ফলের ব্যবসা চলিতেছে তাহা জানাইবার চেষ্টা করিব।

বিগত বজেট অর্থাৎ আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় আন্দোলনের সময় কৃষি সম্বন্ধীয় নিম্ন প্রকাশিত কয়েকটী ব্যয় ধার্য্য হইয়াছে।

সাবুরের কৃষি কলেজের গোশালার জন্য ১২৯১, গ্যাস ও জল তোলা কলের তৈলের জন্য ১৬০০, ডাক্তারের জন্য ৩৩৭১, কেরাণী ও ভৃত্যের জন্য ৪৫৬০০, ওভারসিয়ারের বেতন বাবত ৬০০ টাকা ব্যয় হইবে।

পশু চিকিৎসার জন্য ৭ জন অতিরিক্ত ডাক্তারের বেতন ২৫২০ ও একজন ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বেতন ১৮০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।

ঢাকা, কুমিল্লা ও গৌহাটীতে মৎস্য পোষণ ও শ্রীহট্টে লোণা মাছের ব্যবসায় শিক্ষা দানের জন্য ১৫ হাজার টাকা খরচ করা হইবে।

কৃষি পরীক্ষা।—১৯০৫ সালে ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতের বিভিন্ন স্থানে নূতন নূতন কৃষি পরীক্ষাদির জন্য বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন; অতঃপর প্রতি বৎসর এই ভাবে ত্রিশ লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় হইতেছে; কৃষি বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীগণ এই সব কৃষি পরীক্ষার কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন। গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সাধু,—ইহা বলিতে হইবে। কিন্তু এদেশের কয়জন সাধারণ ও গভর্ণমেণ্টের এই সাধু উদ্দেশের কথা জানিতে পারিতেছে? এইরূপ উদ্যোগ আয়োজনের যে পরিণাম কি তাহা এখনও ঠিক করিয়া বলা যায় না। গভর্ণমেণ্টের মহৎ উদ্দেশ্যের ফলে ভবিষ্যতে হয়ত সাধারণ চাষীগণের প্রভূত কল্যাণ হইবে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরে।

এলাহাবাদে শিল্পপ্রদর্শনী।

এলাহাবাদ শিল্পপ্রদর্শনীতে প্রথম অপেক্ষা শেষ সময়েই লোক সমাগম অধিক হইয়াছিল। আমরা Agriculture বা কৃষিপ্রদর্শনী বিভাগ সম্বন্ধে পাঠকগণকে কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানাইয়াছি।

এক্ষণে কয়েকটি কৃষিযন্ত্র সম্বন্ধে কিছু বলিব। এই বিভাগের ১ নং ষ্টাণ্ডে মেসার্স বরণ কোম্পানী কৃষি সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রকার যন্ত্রাদি প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধানভানা কল, চপ্ কটিং মেশিন, লাঙ্গল প্রভৃতি দেখিবার জিনিস। মেসার্স ইউয়িং এণ্ড কোম্পানী, রিয়া, পাট, মুজা প্রভৃতি হইতে কেমন করিয়া আঁস বাহির করিতে হয়, তাহার বিবিধ যন্ত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এদেশের সাধারণ কৃষকগণের এ সকল যন্ত্র ব্যবহারেরই ক্ষমতা নাই, তাহাদের কেবল দেখাই সার!

৯ নং ষ্টলে কতকগুলি কৃষিবিষয়ক আমেরিকান যন্ত্রাদি ইণ্টার ন্যাশান্যাল হারভেষ্টার কোম্পানী দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে. কেমন করিয়া কলে ভূমি কর্ষণ হয়, কলে বীজ বপন, মই দেওয়া, নিড়ান প্রভৃতি অনায়াসে কলের সাহায্যে হইতে পারে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে. এগুলি বাস্তবিক চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ। তাহার পর বিবিধ প্রকার জলসেচনের যন্ত্র, ফসল ঝাড়াইয়ের যন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। এগুলি দেখিয়া পাশ্চাত্য জগত কৃষিবিজ্ঞানে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে, বুঝিয়া দেখিলে আনন্দ হয়। তাহার পর কৃষিজাত বিবিধ শস্য, লতা, ফল, ফুল, বীজ কেমন করিয়া পাশ্চাত্যদেশে ইলেক্‌ট্রিক্ মটর সাহায্যে স্থানান্তরে নীত হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

তাহার পর ক্রস ফ্যাক্টরী, সুগার ফ্যাক্টরী বা চিনির কারখানা, তাহার বিবিধ কল কারখানা গবাদির খাদ্য, তুলার চাষ, তুলা হইতে বিবিধ প্রকার দ্রব্য উৎপাদনের যন্ত্রাদি, এড়ি রেশম কেমন বাহির করা হয়, তাহার যন্ত্রাদি। তাহার পর দুগ্ধের কারখানা, গরুর দুগ্ধ হইতে মাখন প্রস্তুতাদি যন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, এগুলি যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি কৌতুহলোদ্দীপক। ঘোড়া, মুরগী, ছাগলাদি পালন, তাহার বিবিধ যন্ত্রাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এ সমস্তই পাশ্চাত্য দেশের শিল্পী এবং পণ্ডিতগণের উদ্ভাবন শক্তির ফল। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট এদেশের কৃষকগণকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ যন্ত্রাদি কৃষি প্রদর্শনীতে স্থান দিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশের কৃষকগণের অবস্থা অতি শোচনীয়, তাহারা দুবেলা দুমুঠা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। তাহাদের এ সকল দেখাই সার হয় মাত্র। ভারতের ন্যায় স্বর্ণপ্রসূ দেশে যদি কৃষকের অবস্থা উন্নত হইত তাহা হইলে ভারতের অন্নকষ্ট ঘুচিয়া যাইত। এদেশের লোকের উদ্ভাবনীশক্তি থাকিলেও তাহার উৎসাহদাতা নাই, দেশের ধনীসম্প্রদায় কৃষির ন্যায় অর্থকরী কার্য্যে এক পয়সা ন্যস্ত করিতে নারাজ ও কুণ্ঠিত। সুতরাং এদেশের দীন কৃষকের দ্বারা আর কত উন্নতি সম্ভব? তাহারা অর্দ্ধাশনে জীর্ণ শীর্ণ বুভুক্ষু শরীরে হস্ত পদ দ্বারা যাহা যতটুকু সম্ভব, তাহাই করে। দেশের ধনবান লোকগণের অর্থ যদি আজ দেশের কৃষির উন্নতিকল্পে নিয়োজিত হয়, উন্নত প্রণালীর কলকারখানা স্থাপন করিয়া দেশের শ্রমজীবিগণকে তাহাতে নিয়োজিত করা হয়, তাহা হইলে ভারতের অন্নকষ্ট বিদূরিত হইতে পারে। এত বড় প্রদর্শনী কৃষকগণ দেখিয়াছে, এবং দেশের ধনকুবেরগণও দেখিয়াছেন।

কৃষকগণ অসমর্থ, সমর্থ ধনীগণের হৃদয়ে যদি কৃষি উন্নতি কামনা জাগিয়া উঠে, তবেই বিপুল অর্থ ব্যয়ে এই প্রকার প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

কৃষির অনিষ্টকারী বিবিধ প্রকার পোকা মাকড়ও প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারা কেমন করিয়া কৃষকের শ্রমজাত শস্য নষ্ট করে, তাহাদের আকৃতি চিত্রাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাদের সহিত কৃষির বিশেষ সম্বন্ধ সুতরাং এগুলিও কৃষকগণের পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

মাছের কথা।—বাঙ্গালার নদী বিলে মাছের অবনতি ঘটিয়াছে; অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় বাঙ্গালার নদী বিলে আর তেমন প্রচুর মৎস্যোৎপত্তি ঘটিতেছে না। ইহার তথ্য নির্ণয় এবং প্রতিকার ব্যবস্থার জন্য ১৯০৬ সালে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট মিঃ কে, জি, গুপ্তকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; ইনি একদফা দেখা শুনা করিয়া ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন। অতঃপর গুপ্ত মহাশয় ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে মৎস্যতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য আমেরিকা এবং ইউরোপের নানা স্থান পরিদর্শনের আদেশ পাইয়াছিলেন। ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারীই ইহাঁকে এই আদেশ করিয়াছিলেন। ইনি ইউনাইটেড ষ্টেটস, কানাডা, বাভেরিয়া, অষ্ট্রীয়া এবং ফ্রান্স প্রভৃতি নানা স্থানে মৎস্যসম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া,—বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিয়া ১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসে আর এক রিপোর্ট লিখিলেন। ইহাঁরই প্রস্তা[illegible] বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে এক [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইল। মিঃ এ, আমাদ[illegible] এখানে ভার পাইলেন; ১৯১০ সালের মার্চ্চ [illegible] পর্য্যন্ত ইনি এই কর্ম্মেই রহিলেন; অনন্তর ইউরোপ হইতে আনীত,—জেঙ্কিন্স সাহেব এই বিভাগে কর্ম্ম পাইলেন, এই বিভাগে বি, দাস এবং অন্য এক ব্যক্তি কর্ম্ম করিতেছেন। সম্প্রতি ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী জানাইয়াছেন,—বাঙ্গালার এই

মৎস্যবিভাগে একজন "ডেপুটী ডিরেক্টর' বা সহকারী তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিতে হইবে। সম্ভবতঃ ইনি ইংলণ্ড হইতেই নির্ব্বাচিত হইয়া আসিবেন। প্রায় পাঁচ বৎসরকাল ধরিয়া বাঙ্গালার মৎস্যোন্নতির উদ্যোগ হইতেছে, বহু ব্যয়ে একটা পৃথক বিভাগই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—এই উদ্যোগের এবং এই বিভাগ প্রতিষ্ঠার বিশেষ কোন ফল আজিও ফলে নাই। মিঃ কে, জি, গুপ্তর প্রথম রিপোর্টের আলোচনা কালেই আমরা বলিয়াছিলাম,—বাঙ্গালার নদী, বিল বা পুকুরে, তড়াগে প্রচুর জল সংস্থানের ব্যবস্থা না করিলে, বা দেশের বদ্ধ জলের নিকাশ ব্যবস্থা না করিলে, মাছের উন্নতি হওয়া অত্যন্ত অসম্ভব। নব প্রতিষ্ঠিত মৎস্যবিভাগ বোধ হয় জল সংস্থানের কথা সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করিবেন।

পত্রাদি।

সাল্‌ফেট অফ অ্যামোনিয়া সার।

কতিপয় পত্র লেখক জানিতে চান যে সল্‌ফেট অফ অ্যামোনিয়া (Sulphate of Ammonia) কি প্রকার সার, ইহা ইক্ষুক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না ?

[সুপরিষ্কৃত সল্‌ফেট অফ অ্যামোনিয়ার দাম অত্যন্ত অধিক তাহা সাররূপে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অসম্ভব। গ্যাস তৈয়ারি করিবার সময় যে এক প্রকার তরল সার নির্গত হয়, তাহাতে সল্‌ফেট অ্যামোনিয়া যথেষ্ট থাকে, উক্ত তরল পদার্থ জলে মি[illegible] ক্ষেত্রে দেওয়া যাইতে পারে। মনুষ্য ও গত[illegible] মূত্রে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। মূত্রের সহিত[illegible] মিশাইয়া কিম্বা কাঠের গুঁড়া মূত্রে ভিজাইয়া লইয়া ক্ষেত্রে ছড়ান যাইতে পারে। ইক্ষুর পক্ষে হাড়জাত সারের সহিত ইহার ব্যবহার অতীব প্রয়োজনীয়। গোলাপের ক্ষেত্রে ফুল হইবার সমধিক কাল পূর্ব্বে এই সার ব্যবহার করা উচিত।] কৃঃ সঃ।

জমি—দর মৌরুসী চকদারি বিলি।

আমাদের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু এবং কৃষকের পৃষ্ঠপোষক একখণ্ড জমি বিলি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ দিতেছেন :—

১২৭ নং লাটে (বসন্তি আবাদের নিকট) মাতলা নদীর ধারে এক হাজার বিঘা জমি বিলি হইবে। ক্রশ বাঁধ দিয়া জমিটী তিন খণ্ডে বিভক্ত। কাছারীবাটী, শুইবার ঘর, গোশালা, গোলাঘর, পুষ্করিণী অতি পরিপাটী। জল লবণাক্ত নহে। হাল লাঙ্গলে অতি সুন্দররূপ চাষ আবাদ হইতেছে। যাতায়াতের সুন্দর পথ আছে, নৌকা বা ষ্টীমার দ্বারাও যাতায়াত চলে। জমিদারকে বিঘা প্রতি ১।০ টাকা খাজনা দিতে হয়। খাজনা ২৵০ বা ২।০ ও সেলামী ৭৲ বা ৬৲ টাকা হারে দর মৌরুসী বিলি করা যাইবে।

গ্রহণেচ্ছুকগণ ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানে অনুসন্ধান লইবেন।

শ্রীবসন্তকুমার বসু ও শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসু,
২৪ পং আলিপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিস,
২৪ পং রাজপুর, সোণারপুর—পোঃ অঃ।
মার্চ্চ ১৯১১।

জলোত্তোলন যন্ত্র।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ, মেদিনীপুর
মুন্সেফী আদালত।

জল তুলিবার সহজ উপায় জানিতে চান। ৯৲ টাকা মূল্যের যে জলোত্তোলন যন্ত্র তাহা পিচকারী বিশেষ বলিলেই হয়। তাহার এক মুখ বালতি বা অন্য কোন জলাধারে রাখিয়া অন্য মুখ ধরিয়া গাছে পিচকারী দেওয়া যায়। ইহাতে ক্ষেত্রে জল সেচনের সুবিধা হইবে না। অধিক নিম্ন স্থান হইতে জল তুলিতে হইলে পম্প ব্যতীত

উপায় নাই। সিউনি দ্বারা চলিতে পারে কিন্তু হয়ত একবারে ক্ষেত্রের উপর জল উঠিবে না। দুই কিম্বা ততোধিক বারে ক্ষেত্রে জল উঠাইতে হইলে খরচ অনেক অধিক হয়। সেখানে পম্পই ভাল! কিন্তু একটা ছোটখাট পম্প বসাইতে যত ক্রমই হউক ১৫০ টাকার কম খরচ হয় না। কৃঃ সঃ।

সুলভে চাষের উর্ব্বরা জমি বিক্রয়।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, সোলান ব্রুয়ারি, এক খণ্ড চাষের জমি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ দিতেছেন। তিনি ঐ জমি বিক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক।

পূর্ণিয়া জেলার উত্তর যোগবাণী রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে ১৫ মিনিটের রাস্তা, নেপালরাজ্যের শেষ সীমায় ২২৫ বিঘা জমি একটানে বিক্রয় আছে। জমির একদিকে উৎকৃষ্ট ধান্যের আবাদ ও অপর দিকে পাট, তামাক, সরিষা ইত্যাদি ফসল হইতেছে। জমির আইল ইত্যাদি সমস্ত ঠিক ও জলের বন্দোবস্ত আছে, অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া এই জমি প্রস্তত হইয়াছে। স্বত্বাধিকারী কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে থাকায় এই জমি অতি অল্পমূল্যে ২৫০০৲ টাকায় বিক্রয় করিবেন। এই বৎসরের পাটের জন্য অনেক জমি চাষ দেওয়া হইয়াছে। ছয় মাসের মধ্যে পাটেতেই ১০০০৲ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। যিনি খরিদ করিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রাদি লিখুন অথবা গিয়া দেখিয়া আসুন। একটানে একত্রে এত জমি পাওয়া দুর্ল্লভ।

জমির খাজনা বাৎসরিক ২২৪৷৶০ চার কিস্তিতে দিতে হয়।

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়,
C/o ভূষণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
ফরবসগঞ্জ।

প্রাদেশিক কৃষি-সংবাদ।

পঞ্জাবে কৃষি।—গবাদি পশুর রোগ নিবারণার্থ রোগানুসন্ধান জন্য এখানে আরও তিন জন গবাদি পশু পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছেন।

সম্প্রতি লায়েলপুরে যে কৃষি প্রদর্শনী হইয়াছিল, তথায় ৩৪ খানি "রাজা" লাঙ্গলের পরীক্ষা হয়। উক্ত "রাজা" লাঙ্গল নির্ম্মাণকারী মেঃ ভোলকার্ট ব্রাদার্স এই জন্য কয়েকটি পুরস্কার নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। ৩৪ খানি লাঙ্গল লইয়া চাষীগণ যখন স্ব স্ব বলদ যুড়িয়া জমিতে চাষ দিতে আরম্ভ করিল, তখন সে দৃশ্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চাষীগণকে শস্য আহরণ যন্ত্রের ব্যবহার শিখাইবার জন্য আগামী এপ্রিল মাস হইতে বন্দোবস্ত করা হইবে।

এখানে সময়মত বৃষ্টি হওয়ায় ক্ষেত্রস্থ শস্যের উপকার হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের দাম কিছু কিছু কমিয়াছে।

বঙ্গে তুলার আবাদ। ১৯১০-১১।—আলোচ্য বর্ষে তুলা চাষের এই শেষ বিবরণী। ইহাতে প্রকাশ যে, ৩৪,৯৯৮ একর জমিতে জলদী জাতীয় তুলার আবাদ হইয়াছে এবং নাবী তুলার জমির পরিমাণ ৩৩,৩৮৮ একর নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উভয় প্রকার তুলার চাষই এ বৎসর কিঞ্চিৎ অধিক।

জলদী তুলার পরিমাণ ৭,৩০৬ বেল এবং নাবী ১০,৪২৬ বেল। বিগত বর্ষে জলদী তুলা ৬,৯৯২ বেল এবং নাবী তুলা ৯,৫৫৮ বেল বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। মোটের উপর জলদী ও নাবী দুই একত্রে ১৮৬১৮ বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া আশা করা যায় এবং প্রকৃত তাহাই হইলে ১২৪১ বেল অধিক তুলা পাওয়া যাইবে।

বঙ্গে হৈমন্তিক ধান্য। ১৯১০-১১।—শেষ বিবরণী। বিগত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বর্ষে কিছু কম পরিমাণ জমিতে ধান্যের আবাদ হইয়াছে। বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ২১,২৩২,৯০০ একর ছিল। বর্ত্তমান বর্ষের ধানের জমির পরিমাণ ২০,৯৩৭,৭০০ একর মাত্র। সাধারণতঃ কিন্তু ধানের আবাদী জমির পরিমাণ ২০,৮৮৮,২০০ একর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

ধান্য রোপণের সময় বর্ষা ভালরূপ হয় নাই এবং শ্রাবণ ভাদ্র মাসে অতিবৃষ্টি হেতু জলপ্লাবনেই ধান্যের আবাদী জমির পরিমাণ হ্রাস হইবার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তথাপি কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, অধিকাংশ জেলায় ষোল আনার উপর ফসল জন্মিয়াছে, এমন কি বালেশ্বর, সাঁওতাল পরগণা ও রাঁচি কিম্বা কটকে আঠার আনা ফসল হইয়াছে। আবার বাঁকুড়া, যশোহর ও নদীয়ায় মোটে দশ আনার অধিক ধান জন্মে নাই।

সকল স্থানের গড় ধরিয়া মোটের উপর সতের আনা ফসল জন্মিয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়া লইলে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ২৫৮,৫৫৪,৫০০ হন্দর বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। বিগত বর্ষের চাউলের পরিমাণ অনুমান ২৫৭,৩৯৪,৭০০ হন্দর ছিল।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে হৈমন্তিক ধান্যের আবাদ। ১৯১০-১১।—বর্ত্তমান বর্ষে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ১১,৮০০,৯০০ একর পরিমাণ জমিতে ধান চাষ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। বিগত বর্ষ অপেক্ষা ধানের পরিমাণ ১২৬,০০০ কম। সিলেট, গোয়ালপাড়া এবং কামরূপেই ধানের কম চাষ হইয়াছে।

ধান বুনানের সময় আবহাওয়া বেশ ভাল ছিল, কিন্তু শ্রাবণ ভাদ্র মাসে অতিবর্ষা হেতু জলপ্লাবনে বোনা ধানের ক্ষেত অনেক নষ্ট হইয়াছিল, রোপা-ধানেরও ক্ষতি হয় নাই এমন নহে, কিন্তু জল শীঘ্র মরিয়া যাওয়ায় তথায় পুনরায় ধান্য রোপণের সুবিধা হইয়াছিল। এমন কি যে জমিতে অন্য বৎসর ধান রোপণ সম্ভব নহে তথায়ও ধান জন্মান গিয়াছিল।

বিশেষ অনুসন্ধানে জানা যায় যে প্রায় সাড়ে ষোল আনা ফসল জন্মিয়াছে। একর প্রতি উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৯॥০ হন্দর ধরিয়া লইলে সর্ব্ব সমেত ১১৭,৭১৪,০০০ হন্দর চাউল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায়।

পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে ইক্ষু। ১৯১০-১১।—এখানে এই বৎসর ইহার চাষ কিছু অধিক বলিয়া অনুমান হইতেছে। বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ১৭০,৩০০ একর মাত্র ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে ১৭৭,৪০০ একর জমিতে আখের আবাদ হইয়াছে। সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের মধ্যে দিনাজপুরেই আখের চাষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে, বগুড়াতেও আখের চাষের পরিমাণ অধিক।

জলপ্লাবনে নীচু জমির আখ কিছু নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু অন্য বৎসর অপেক্ষা এতদঞ্চলে আখে পোকার উপদ্রব কিছু কম। গড়ে প্রায় ষোল আনা ফসল হইবে বলিয়াই অনুমান হয় এবং উৎপন্ন গুড়ের পরিমাণ ৩,৮৩১,৮০০ হন্দর হইবে।

এতদঞ্চলের খেজুর রস হইতেও প্রচুর গুড় উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমান বর্ষে খর্জ্জুর গুড় ১,০৭৫,৮৯৫ হন্দর পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

সার-সংগ্রহ।

বোম্বাইয়ে চর্ম্ম-ব্যবসায়।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে নানাস্থানে নানাপ্রকার চর্ম্ম-শিল্পালয় স্থাপিত ও পরিচালিত হইতেছে। এই সকল শিল্পালয়ের কার্য্যাবলী লক্ষ্য ও উন্নত করিবার জন্য বোম্বাইয়ের লাট দরবারে এক প্রস্তাব হইয়াছিল। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য গত জানুয়ারী মাসে বোম্বাই গভর্ণর এক কমিটি গঠিত করেন। মেসার্স কুপার, অ্যালেন এণ্ড কোম্পানীর রসায়ন-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত এ, গাথরী উক্ত কার্য্যে সম্পূর্ণ দক্ষ বলিয়া তাঁহাকে উক্ত কমিটির কর্ত্তারূপে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

চর্ম্ম শিল্প বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে কতদূর উন্নতি ও সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং কোন্ কোন্ বিশেষ কার্য্যে শিল্পীগণ পশ্চাৎপদ, তৎসমুদয় উল্লেখ করিয়া একটি বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবার জন্যই শ্রীযুত গাথরীর নিয়োগ হইয়াছিল। সম্প্রতি সেই বিবরণী সাধারণে প্রচারিত হইতেছে। আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করিলাম।

সার্ভের বিবরণী।

শ্রীযুত গাথরী সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সী সার্ভে করিয়া এক বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বিবরণীর সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদে 'ট্যানিং' ও 'চর্ম্ম প্রস্তুতকরণ' সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। শিল্পীগণের আর্থিক অবস্থা পরিদর্শন করিয়া তিনি বলিতেছেন,—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর চর্ম্মকার ও চর্ম্ম-শিল্পীগণের সকলের অবস্থা সমান নহে। ইহারা প্রায়ই মদ্যপায়ী। তবে কতিপয় স্থানে 'কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি' স্থাপিত হইয়াছে। যে যে স্থানে উক্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথাকার ট্যানিং-শিল্পীদিগের অবস্থা কিঞ্চিৎ উন্নত ও সচ্ছল। এইরূপ শিল্পালয়ের সংখ্যা যত অধিক হইবে, দেশ তত সমৃদ্ধ হইবে, এবং গভর্ণমেণ্টের সুনামও তত চারিদিকে প্রসারিত হইবে। যে ব্যক্তি "কো অপারেটিভ সোসাইটির নাম রেজিষ্ট্রী করেন, তাঁহাকে এইরূপ পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। শুনা যাইতেছে, যাহাতে অধিক সংখ্যক উক্ত প্রকার সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য রেজিষ্ট্রারকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

চামড়ার অভাব।

কাঁচা চামড়ার অভাব সর্ব্বত্রই অনুভূত হইয়া থাকে। শ্রীযুত গাথরী বলিতেছেন, যদি কাঁচা চামড়া সময়মত সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে এই শিশু শিল্পের উন্নতি সুদূর পরাহত হইবে। কসাইখানা প্রভৃতি হইতে যে সকল চামড়া পাওয়া যায়, তাহা অতি সামান্য। এবং এক স্থান হইতেও প্রয়োজনীয় সমস্ত চর্ম্ম পাওয়া যায় না। এই উভয়বিধ কারণে চর্ম্মশিল্পের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে, চর্ম্মশিল্পের উন্নতি বাধা পাইতেছে।

স্থানীয় 'ট্যানার'গণ তাহাদের এজেণ্টদিগকে সময়মত চামড়া যোগাইতে পারে না। অভাব—আবশ্যক চর্ম্মের ও আবশ্যক অর্থের। অর্থ সাহায্য পাইলে তাহারা লোক নিযুক্ত করিয়া মৃত পশুর চামড়া সংগ্রহ করিতে পারিত; কিন্তু অর্থাভাবে তাহারা তাহা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

অভাব দূর করিবার উপায়।

প্রথমতঃ যাহা অভাব বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহা প্রকৃত অভাব নহে। কারণ, পানভেল্ নামক

স্থানে যে 'কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিলাম, স্থানীয় চর্ম্মকারগণ নিজ নিজ ক্ষুদ্র শক্তি এক স্থানে সম্মিলিত করিয়া পূর্ব্ব কথিত অভাব দূর করিয়াছে।

বিদেশ হইতে চামড়া ট্যানিং করিয়া আনিবার ব্যয় অত্যন্ত অধিক পড়ে বলিয়া স্থানীয় চর্ম্মকারগণ সামান্য দ্রব্যাদি ও মাল মশলার সাহায্যে চামড়ার 'ট্যানিং' করিয়া থাকে।

যাহারা বড় রকমের ব্যবসায় চালাইতেছে, তাহারা এই শিল্প দ্বারা বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহারাও বিদেশানীত 'ট্যানিং' করা চামড়া যথাসময়ে, সুবিধামত ও উপযুক্ত মূল্যে পাইতেছে না। ইউরোপীয় প্যাটার্ণের সস্তা চামড়া আমদানী হইতেছে। কিন্তু তথাপি সমস্ত অভাব এখনও পূর্ণ হয় নাই। 'ট্যান' করিবার দ্রব্য-সম্ভার যদি সময়মত ও সুবিধা দরে বোম্বাই অঞ্চলে আনীত হয়, তাহা হইলে, বোধ হয়, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ঐ সমস্ত ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইলে, সম্ভবতঃ, 'ট্যানিং' করা চামড়ার অভাব বোম্বাই অঞ্চলে আর অনুভূত হইবে না।

ব্যবসায়ের অবস্থা।

বই-বাঁধাইয়ের চামড়া প্রস্তুত করিবার জন্য স্থানীয় চর্ম্মকারদিগের যে সকল দোকান প্রতিষ্ঠিত ছিল, তৎসমুদয় এখন উপযুক্ত লোকের ও কার্য্যের অভাবে উঠিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে এই বই-বাঁধাইয়ের চামড়া সুন্দররূপে 'ট্যান' করা হইত। কিন্তু সম্প্রতি 'ট্যান' করিবার দ্রব্যাদির অভাব ঘটিয়াছে। তাই সব দোকানপাট বন্ধ হইয়াছে ও হইতেছে।

এই 'ট্যানিং' করিবার মসলা প্রস্তুতকরণ প্রসঙ্গে বোম্বাই লাট দেশের ধনীবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, আপাততঃ যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, সকল উন্নতি-কামী ব্যবসায়ী এই নূতন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশের ও দশের মহৎ কল্যাণ সাধন করিবেন।

শ্রীযুক্ত গাথরী বলিতেছেন, ভূমিতে জল-সেচনাদির জন্য ট্যান করা ক্রোম চামড়ার প্রবর্ত্তন এ প্রদেশে লাভজনক হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গভর্ণমেণ্টের মন্তব্য।

শুনিতেছি, আপাততঃ বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট প্রভূত অর্থাদি খরচ করিয়া কোনও রূপ নূতন কার্য্য আরম্ভ করিবেন না। বোম্বাই প্রদেশে ক্রোম চর্ম্মের প্রবর্ত্তন বা এইরূপ উপায়ে প্রস্তুত চর্ম্ম নানা কার্য্যে অধিক মাত্রায় ব্যবহার, এই দুয়ের কোনও-টাই এখন কার্য্যে পরিণত হইবে না। এ সব এখন স্থগিত রহিল।

শ্রীযুত গাথরী আর একটি বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিতেছেন, চর্ম্ম প্রস্তুত-করণের জন্য বালকদিগকে শিক্ষা প্রদান করা উচিত। নতুবা কোনও রূপ স্থায়ী উন্নতির আশা করা বাতুলতা মাত্র। এই উদ্দেশ্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে, বোধ হয়, বেশ উপকার দর্শে। বোম্বাই লাট কিন্তু বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে দেশে এইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা উচিত ও প্রয়োজনীয় বলিয়া আমার মনে হয় না। 'ট্যানিং' করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।

চর্ম্মকারদিগের স্বাস্থ্য।

শ্রীযুত গাথরী তাঁহার বিবরণীর নানা স্থানে চর্ম্মকারদিগের স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—স্থানীয় চর্ম্মকার-

দিগের পল্লীতে স্বাস্থ্যহানিকর নানা দুর্গন্ধ দ্রব্য পড়িয়া থাকে। তাহারা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। কিন্তু সময়ে সময়ে পীড়িত হইয়া যথেষ্ট কষ্ট ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। বোম্বাই ও করাচীর চর্ম্মকার-পল্লিতে স্বাস্থ্যনীতি অনুসরণ করা হয়, এ কথা উক্ত পল্লী পরিদর্শন করিলে কাহারও মনে উদয় হয় না। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট চর্ম্মকারদিগের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

কাঁচা চামড়ার উপর 'অক্ট্রয়' শুল্ক ধার্য্য আছে, বোম্বাই ও করাচীর চর্ম্মকারগণের—যাহারা চামড়া 'ট্যান' ও প্রস্তুত করে—নিকট হইতে উক্ত শুল্ক অতি সামান্যই আদায় হইয়া থাকে।

'অক্ট্রয়' শুল্ক উপলক্ষে করাচীর মিউনিসিপ্যালটির মনোযোগ আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে সিন্ধের কমিশনার বাহাদুর কি করেন, তাহাই দ্রষ্টব্য।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

চৈত্র মাস।

সব্জী বাগান।—উচ্ছে, ঝিঙ্গে, করলা, শসা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি দেশী সব্জী চাষের এই সময়। ফাল্গুন মাসের জল পড়িলেই ঐ সকল সব্জী চাষের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতির চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। সেই গুলিতে জল সেচন এখন একটী প্রধান কার্য্য। ঢেঁড়স ও স্কোয়াস বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। ভুট্টা দানা মাসের শেষ করিয়া বসাইলে ভাল হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য অনেক সময় গাজর ও বীটের চাষ করা হইয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্র মাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। আশু বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। কেহ কেহ জলদি ফলাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বেগুন বীজ বুনিয়া থাকে।

কৃষিক্ষেত্র। এই মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে এবং আউশ ধানের ক্ষেত্রে সার ও বাঁশ ঝাড়ে, কলা গাছে ও কোন কোন ফল গাছে এই সময় পাঁকমাটী ও সার দিতে হয়। এখানে বাঁশের পাইট সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাক্য মনে পড়িয়া গেল। "ফাল্গুনে আগুন, চৈতে মাটী, বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।" বাঁশের পতিত পাতায় ফাল্গুন মাসে আগুন দিতে হয়, চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটী দিতে হয় এবং পাকা বাঁশ না হইলে কাটিতে নাই।

এই মাসেই ধঞ্চে, পাট, অরহর, আউশ ধান বুনিতে হয়।—চৈত্রের শেষে ও বৈশাখ মাসের প্রথমে তুলা বীজ বপন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসেই আলু তোলা শেষ হইয়াছে, কিন্তু নাবী ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান।—বিলাতী মরশুমি ফুলের মরশুম শেষ হইয়া আসিল। শীতেরও শেষ হইল, গোলাপেরও ক্রমে ফুল কমিয়া আসিতেছে; এখন বেল, মল্লিকা, জুঁই ফুটিতেছে। এই ফুলের ক্ষেত্রে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে মিগ্নোনেট, ক্যাণ্ডিটাফ্ট পপি, আষ্টারসম, ফ্লক্স প্রভৃতি ফুলবীজ এই সময় বপন করা চলে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই সময় সালগম, গাজর, ওলকপি প্রভৃতি বীজ বপন করা হইতেছে, আলু বসান হইতেছে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত এখন অন্য কোন বিশেষ কার্য্য নাই। জলদি লিচু যাগ এই সময় পাকিতে পারে, সেই লিচু গাছে জাল দ্বারা ঘিরিতে হইবে।

REGISTERED No. C. 152.

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

চৈত্র, ১৩১৭।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

একাদশ খণ্ড,—১২শ সংখ্যা।



সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

চৈত্র, ১৩১৭।

কলিকাতা: ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।



সুরমা ও সুকেশ।

সুকেশ না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। বস্তুতঃ কেশই কামিনীগণের প্রধান সৌন্দর্য্য। নিখুঁৎ সুন্দরীকেও কেশের অভাবে বড় কদর্য্য দেখায়। অতএব কেশের শ্রীবৃদ্ধি জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। উপায় থাকিতে তাহাতে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? শুনেন নাই কি? —আমাদের "সুরমা" তৈল কেশের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে অদ্বিতীয়! "সুরমা" ব্যবহারে অতি শীঘ্র কেশ ঘন, দীর্ঘ, কাল ও কুঞ্চিত হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। সন্দেহ করিবেন না, শুধু ইহাই নহে,—"সুরমা" মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মাথাধরা, মাথা ঘোরা, মাথাজ্বালা, অনিদ্রা প্রভৃতি যন্ত্রণারও সত্বর উপশম করে। কোন ঔষধে যে টাক ভাল করিতে পারেন নাই, একবার সুরমা ব্যবহার না করিয়া, তাহাতেও হতাশ হইবেন না। বিশ্বাস রাখিবেন—সুরমার সদ্‌গন্ধ—জগতে অতুলনীয়। বড় একশিশির মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা। একত্র বড় তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, মাশুলাদি ৸৶০ তের আনা। ৶০ দুই আনার টিকিট পাঠাইয়া নমুনা লউন।

জ্বরাশনি।

"জ্বরাশনি" জ্বরের অমোঘ বজ্রস্বরূপ। নূতন, পুরাতন, জীর্ণ, বিষম, যেমনই জ্বর হউক, তিন চারি দিন মাত্র জ্বরাশনি সেবন করিলেই তাহা নিশ্চয় বন্ধ হইয়া যায়। অথচ কুইনাইন-আটকান জ্বরের মত সে জ্বর বারম্বার ঘুরিয়া ফিরিয়া আক্রমণ করে না। "কুইনাইন ব্যতীত ম্যালেরিয়ার ঔষধ নাই" যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে একবার এই জ্বরাশনি সেবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। কম্পজ্বর, পালাজ্বর, পাক্ষিক জ্বর, যকৃৎপ্লীহাদি উপদ্রব সংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার যে কোন অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিয়া দেখুন—ইহা কেমন সহজে ও স্বল্প দিনে দেহ রোগমুক্ত করিয়া, সুস্থ-সবল করিয়া দিবে। পেটেন্ট ঔষধ খাইয়া খাইয়া যাঁহারা তিক্ত-বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও একবার এই ঔষধ না খাইয়া হতাশ হইবেন না। ইহার এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর

সৌরভ-সার।

বঙ্গমাতা।—বাঙ্গালীর "বঙ্গমাতা" সমস্ত বাঙ্গালার গৌরবস্বরূপ।

মল্লিকা।—বেলা-যুথিকাদির সহিত মল্লিকা চিরদিনই একাসন অধিকার করে।



বকুল।—আমাদের বকুলের সৌরভ টাট্‌কা বকুল ফুলের মতই অটুট সুন্দর।

দিল্ অব্ রোজ্।—ইহার সৌরভ কেমন, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। বস্তুতঃ ইহা একটী অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় সামগ্রী।

গোলাপসার।—নামমাত্রেই ইহার গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

খস্‌খস্।—প্রখর গ্রীষ্মের দিনে খস্‌খসের মত এমন আরামপ্রদ এসেন্স আর নাই।

পারিজাত।—ইহাতে সত্য সত্যই যেন স্বর্গীয় সৌরভ!

মস্ক্-জেসমিন।—মিলিত নামই ইহার মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸০ বার আনা। ছোট ॥০ আট আনা। মাশুলাদি ।৴০ পাঁচ আনা। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸০ বার আনা, ডাক-মাশুল ।৶০ সাত আনা। অডিকলোন এক শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৴০ পাঁচ আনা। আমাদের অটো-ডি-রোজ, অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া, অটো অব্ খস্‌খস্, এটো-ডি-হেনা অতি উপাদেয় পদার্থ। এক শিশি ১৲ এক টাকা, ডজন ১০৲ দশ টাকা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভে বিক্রয় করিতেছি।

রোগীগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কৃষক।

সূচী পত্র।

চৈত্র, ১৩১৭ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

'কৃষকে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ প্লিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ খণ্ড। | চৈত্র, ১৩১৭ সাল। | ১২শ সংখ্যা।

সব্জীর বাগান।

আজ কাল এই কলিকাতা মহানগরীতে তরকারীর কত কষ্ট, তাহা কাহাকেও বলিতে হইবে না। বাজারে খরিদ্দার অনেক, কিন্তু জিনিষ অল্প; যখন প্রত্যহই এই প্রকার ঘটিতেছে, তখন কোনও বিচক্ষণ লোকের মাথায় কি এমন ভাবের উদয় হয় না যে, কেন ঘরের পয়সা দিয়া পসারিদের কটু বোল শুনিয়া তরকারি আনি? চেষ্টার অসাধ্য কোন কাজ নাই, কেনই বা দুই কিম্বা চারি বিঘা জমি লইয়া একটা মালী রাখিয়া তরকারীর বাগান না করি? আর ইহাও যে একটী নূতন বিষয় তাহা নহে; কারণ প্রায়ই দেখিতেছেন, অমুক বাবু অমুক স্থানে বাগান করিয়াছেন ও প্রত্যহ মালী তাঁহাকে তরকারী, ফলমূলাদি আনিয়া দিতেছে। বাজারে মাল কম, খরিদ্দার অধিক, সেই জন্য এত টানাটানি। বাগান করিতে পারিলে নির্ব্বিঘ্নে খাওয়া চলে, উপরন্তু উদ্বৃত্ত দ্রব্য বেচিয়া পয়সা হয়।

অনেকে টাকা লোহার সিন্দুকে বা বাক্সে জমা রাখিয়াছেন, বা সুদের লোভে কোন কারবারীর নিকট দিয়াছেন, বা চাকুরি পাইবার সময় দু পাঁচ হাজার টাকা আমানত রাখিয়া ৪০৲।৫০৲ টাকার চাকুরি পাইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছেন। যে টাকা আমানত রাখিয়া চাকুরি করিতেছেন, সেই টাকায় বাগান ও চাষ বা অতি সামান্য চাউল, ধান্য বা বিচালীর ব্যবসা করিতেন, তবে ঐ ৪০৲ টাকা কি স্বাধীনভাবে পাইতে পারিতেন না? যাঁহাদের বেশী টাকা আছে, ও সংসার চালাইবার উপযুক্ত আয় আছে, তাঁহারা তো বাজার খরচের জন্য তত ব্যস্ত হইবেন না; ৵০ আনার জায়গায় ।০ আনা গেলে তাঁহাদের কি যায় আসে? তাঁহাদের এই সামান্য বিষয় লইয়া আন্দোলন বা চিন্তা করিয়া মাথা ব্যথা করা ভাল নয়, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই মনে হয় আমরা প্রত্যেকে অথবা না হয় দুই চারি জন বন্ধু মিলিয়া বা জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী খুলিয়া, তরকারি, ফল ফুলাদির বাগান করি, তাহা দ্বারা যে কেবল সব্জী বা ফল পাইব, এমন নহে, আপাততঃ দৈনিক বাজার খরচ বাঁচিয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতের একটা উপায় হইয়া দাঁড়াইবে। ইহাতে আমোদও আছে, এবং বিশেষ লাভ এই যে, আর সব্জীর জন্য অন্যের মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না বা শুক্‌না তরকারি খাইয়া মরিতে হইবে না।

যাঁহারা একাকী বা চার কিম্বা পাঁচ জন বন্ধু মিলিয়া সজ্জীর বাগান করিতে চাহেন, তাঁহারা পাঁচ ছয় বিঘা জমি লইয়া সজ্জীক্ষেত আরম্ভ করিলে সময় মত সর্ব্বরকম দ্রব্য পাইতে পারিবেন। ইহাতে যে বেশী টাকা ফেলিতে হইবে তাহা নহে : প্রতি মাসে তরকারি ক্রয় করিতে যত টাকা লাগে তাহার ছয় গুণ দিয়া একটী যৌথ বাগান করিতে পারিলে তরকারির জন্য দুই তিন মাস অপেক্ষা করিয়া, পরে ক্রমাগত তরকারি উৎপন্ন করিতে পারিলে তরকারির কষ্ট দুর হইবে এবং ভবিষ্যতের জন্য বাগান বাড়াইয়া ক্রমশঃ এই সঙ্গে একটা ফলের বাগান প্রস্তুত করা চলিবে।

কলিকাতা বা কলিকাতার খুব সন্নিকটে সাধারণ চাষের জমি মেলা ভার। জমি পাইতে হইলে, কলিকাতার বাহিরে চারি বা পাঁচ ক্রোশ দুরে বা আরও দুরে চেষ্টা করিলে পাইতে পারেন। কিন্তু এইটী বিশেষরূপ দেখিতে হইবে, যেন তাহা রেল বা ষ্টীমারের নিকটবর্ত্তী হয়। তাহা হইলে যখন ইচ্ছা তখনই সবান্ধবে যাইয়া তাহার পরিদর্শন করিতে পারিবেন ও প্রত্যহ মালী উৎপন্ন দ্রব্যাদি আনিয়া দিতে পারিবে, হাটে বাজারেও মাল পাঠাইবার সুবিধা হইবে।

যে কয় বিঘা জমি লওয়া হইবে, তাহাতে সজ্জীক্ষেত রচনা করিতে হইলে, তাহার চারিদিকে দুই বা তিন হাত চওড়া ও দুই হাত গভীর খাদ খনন করিয়া বাগান রক্ষার উপায়ও করিতে হইবে। তোলা মাটির উপর শাক, সজ্জী যাহা লাগান যাইবে তাহা অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে। মধ্যে মধ্যে ক্ষেতে মাটি উঠাইবার জন্যও এইরূপ পগারের আবশ্যক।

সজ্জীক্ষেতের নিকট কিম্বা ঐ বাগানের মধ্যস্থলে একটী জলাশয় খনন করা আবশ্যক ; কারণ গ্রীষ্মকালে শাক সজ্জীতে জল সেচন করিতে হইবে। পুষ্করিণী গভীর করা তত আবশ্যক নহে, কিন্তু বড় হওয়া চাই। পুষ্করিণী খনন করিয়া যে মৃত্তিকা পাওয়া যাইবে, তাহাতে অন্যান্য জমি অপেক্ষা বাগান উচ্চ হওয়াতে জলমগ্ন হইবার ভয় থাকিবে না : অধিকন্তু তোলা মাটিতেই গাছ পালা শীঘ্র বৃদ্ধি পাইবে বাগানের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী খাদের ধারে ধারে আতা, লেবু ও পীচের চারা ঘন ঘন করিয়া বসাইলে বেড়ার সাহায্য হইবে ও সময়ে বেড়ার গাছ হইতে ফলও পাইবেন। খাদের উপরিভাগে উচ্চ জমিতে ১০ হাত অন্তর একটী করিয়া কলা গাছ ও প্রত্যেক কলা গাছের মধ্যে দুইটী করিয়া পেঁপে গাছ লাগাইলে ও পেঁপে গাছের মধ্যে দুই কিম্বা একটী ঢেঁড়স গাছ (রামতরুই) লাগাইতে পারিলে একটা বাঁধা আয়ের বাগান হইয়া উঠে। খাদের ধারে জমি একটু ঢালু হওয়া আবশ্যক, আর সেই ঢালু জায়গায় লতানে গাছ ২০ হাত লম্বা স্থানে এক এক প্রকার যথা—লাউ, কুমড়া, পুঁই লাগাইতে হয়। সীম, বরবটী ধারে ধারে পালায় উঠাইয়া দেওয়া যায়। পুষ্করিণী ও খাদের মধ্যবর্ত্তী জমি সমান করিয়া কেয়ারা করিয়া প্রত্যেক প্রকার শাক সজ্জীর জন্য অন্ততঃ ২০ হাত দীর্ঘ ১২ হাত প্রস্থ স্থান রাখিবেন, যখন যে শাক সজ্জী লাগাইতে হইবে, তাহার বীজ একবারে বপন করিতে নাই, দুই ভাগ করিয়া, এক ভাগ বপন করা কর্ত্তব্য। যখন দেখিবেন যে, গাছ বাহির হইয়াছে, তখন অবশিষ্ট বীজ আর দুই স্থানে বপন করিবেন। ফসল পাকিলে যখন দেখিবেন যে, বীজ হইতেছে, তখন এক কেয়ারী বীজের জন্য রক্ষা করিয়া অন্য সকল স্থান পরিষ্কার করিয়া দুই চারি দিন পরে অন্য শাকের বীজ বপন করুন।

সস্তা বীজ বালিগঞ্জের ও বৈঠকখানার হাটে পাওয়া যায়, বিদেশীয় শাক সজ্জীর বীজের প্রাপ্তি-

স্থানের বা নর্সারির অভাব নাই। বীজ কিন্তু জানাশুনা ভাল জায়গা হইতে সংগ্রহ করাই বিধেয়। বাগান প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমেই মালী রাখার আবশ্যক হয় না, কুলী (ধাঙ্গড়) বা দেশী মজুর দ্বারা ভূমি খনন করাইলে কম খরচ পড়িবে। পরে ভূমি সমান করা হইলে পর কেবলমাত্র একটী মালী রাখা কর্ত্তব্য। কারণ সে কেবল মাত্র কেয়ারী প্রস্তুত, বীজ বপন ও আবশ্যকমত জল সেচন করিবে। এস্থলে ছোট বাগানের কথা ধরা হইতেছে। জমি খনন বা সমান করিবার ভার মালীর উপর দিলে ঠিক সময়ে শাক সব্জীর বীজ সকল স্থানে বপন করা হইবে না। বাগানের পরিসর অনুযায়ী সংখ্যা কিম্বা মজুরের কম বেশী করিতে হয়। প্রত্যহ মালীকে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া যাইতে হইবে ও তৎপর দিবস সেই কাজ হইয়াছে কি না, তাহা দেখিতে হইবে ও করাইয়া লইতে হইবে। মালী অলস হইয়া বসিয়া বা ঘুমাইয়া বেতন লইলে চলিবে না। ফলের বাগান করার ইচ্ছা থাকিলে প্রত্যেক কলা গাছের এক হাত দূরে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বিলাতী আমড়া, জামরুল, গোলাপ জামের চারা বা কলম লাগাইতে হয়। এক একজাতীয় গাছ এক লাইনে লাগাইলে দেখিতে সুন্দর হইবে। পুষ্করিণীর চারিধারে ৮ হাত অন্তর নারিকেল চারা ও তাহাদের মধ্যে মধ্যে এক একটা সুপারি চারা লাগান চলে। পথের দুই ধারে (৩ হাত চওড়া পথ রাখা আবশ্যক) দুই হাত অন্তর সুপারির চারা লাগাইলে বাগান সুদৃশ্য হয়। সৌন্দর্য্যের জন্য গোলাপ, বেল, মল্লিকা ফুলের কলম মাঝে মাঝে লাগাইতে পারা যায়। সংখ্যায় অধিক হইলে ফুল গাছ হইতে আয় হওয়া অসম্ভব নহে। পুষ্করিণীতে বর্ষাকালে মৎস্যের ডিম্ব বা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য পাঁচ ছয় টাকার ফেলিলেও লাভ আছে। যদি পুষ্করিণীতে বার মাস জল থাকে ও চৈত্র বৈশাখে ৩।৪ হাত জল থাকে, তবে চালা মাছ (যেমন ডিম হইতে বড় মাছ ছয় মাস মধ্যে হইয়াছে, সেই প্রকার) ১০৲।১৫৲ টাকার ক্রয় করিয়া তাহাতে ছাড়িয়া দিতে পারা যায়। দ্বিতীয় বৎসরে প্রত্যেকটী প্রায় এক সের ওজনের মাছ হইবে এবং মাছ হইতেও একটা আয় দাঁড়াইতে পারে।

বাগানের জমির অভাব নাই। যদি ই, বি, এস, রেলের ধারে, এদিকে সোদপুর, আগড়পাড়া কিম্বা দক্ষিণে গড়িয়া, সোণারপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে চেষ্টা করেন, তবে পাইতে পারিবেন। বিশেষতঃ গড়িয়ার খাল ধারে গভর্ণমেণ্টের ও অন্যান্য জমিদারের অনেক জমি পতিতাবস্থায় আছে; অল্প খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া লইলেই পাইতে পারেন। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের নিকটেও ৬।৮ ক্রোশ দূরে অনেক জমি পাওয়া যায়।

বাগান প্রস্তুত হইলে, এক বা দেড় বৎসর কাল পরে আর নিজেদের আবশ্যকমত তরকারী ও ফলের কষ্ট পাইতে হইবে না। কিন্তু যখন দেখিবেন যে, ঐ বাগান হইতে উৎপন্ন দ্রব্য হইতে জমির খাজনা, চাকরের বেতন ছাড়া আরও লাভ দাঁড়াইয়াছে, তখন আরও নিকটস্থ জমি লইয়া বাগান বড় করিতে চেষ্টা করা উচিত। এরূপ চেষ্টা থাকিলে দেখিবেন আপনার বন্ধুবান্ধবেরা সর্ব্বদাই অনুরোধ করিবেন, যেন তাঁহাদের জমি লইয়া বাগান করা হয়। প্রথমে কিছু সকলেই এই কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইবেন না, ভয় করিবেন, পাছে টাকা মাটী হয় বা ঠকেন। কিন্তু একবার ভাল লোকের পরামর্শ মতে ২।৪ জন কার্য্য আরম্ভ করিলে ক্রমশঃ জমিরও অনাটন হইবে এবং জমির মূল্য বৃদ্ধি

হইবে। তখন সকলকেই সস্তার জমির জন্য দূরে যাইতে হইবে। যদি জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী খুলিতে চাহেন, তবে অন্ততঃ ২০ জন অংশীদার লইয়া কার্য্যারম্ভ করা বিধেয়।

সকলে বর্ত্তমানে ৫০৲ টাকা করিয়া দিউন, ৬ মাস পরে আর ৫০৲ টাকা করিয়া দিবেন। অন্ততঃ ৮০ বিঘা জমি লইয়া এক সঙ্গে বাগান করুন। যে প্রকার ছোট ছোট বাগানের নিয়ম দেওয়া হইয়াছে, সেই মত বড় বাগানের জন্যও আবশ্যক মত খাত ও জলাশয় খনন করা আবশ্যক। জলাশয় একটা একটু বৃহৎ বা চারি পাঁচটি ছোট ছোট হওয়া আবশ্যক। এই বাগান যদি খালের বা নদীর ধারে হয়, বা যথায় জোয়ারের জল উঠে, তবে, ঐ সকল জলাশয়ের দুই মুখ খোলা রাখিয়া বাড় বা আবশ্যক মত দ্বারবদ্ধ করিবার জন্য যদি কবাট থাকে, তাহা হইলে মাছের যোগাড় সহজে হয়। ইহাতে বর্ষার জলের মাছ অমনি পাইবেন, যে মাছ ছাড়া হইয়াছে তাহা পলাইবে না এবং তথায় মাছ বাড়িবে। ৫।৬ বিঘা জমিতে একজন মালী (দেশীয় বা উড়ে) রাখিলে এবং মাঝে মাঝে নগদ মজুর ধরিলে ভাল কাজ চলিবে। বাগানের অতি সন্নিকটে বা গ্রামে এক বিঘা জমি লইয়া মালীদের থাকিবার ঘর ও বৈঠকখানা এবং গরু বা মহিষ রাখিবার জন্য গোয়ালঘর করিতে হইবে।

বাগানের জমি প্রস্তুত হইলে প্রত্যেক প্রকার সব্জীর জন্য অন্ততঃ ২।৩ বিঘা জমি পৃথক রাখিতে হইবে ও সপ্তাহ অন্তর ১০ কাঠা জমিতে বীজ বপন ও চারা রোপণ করিলে, পরে পরে ও ক্রমান্বয়ে সব্জী পাওয়া যাইবে ও ইচ্ছা মত দরে বিক্রয় করিতে পারা যাইবে। একখানা গরু বা মহিষের গাড়ি রাখিতে হইবে। ঐ গাড়িতে রেলওয়ে মাল বহিবার জন্য লুইস এণ্ড কোং যে প্রকার গাড়ী ব্যবহার করিতেছেন, সেই মত হওয়া আবশ্যক। তন্মধ্যে দুই তিন থাক বা সেল্‌ফ থাকা চাই। ঐ সকল সেল্‌ফে বাজার সপ্লাই (তরকারীর ডালা বা চুপড়ী) থাকিবে। ২।৩ প্রকার দরের বাজার রাখা আবশ্যক। ~~৴০~~ আনার, ~~৶০~~ আনার ও ।০ আনার, ভালমন্দ অনুসারে দর হইবে। যে সময় যে ফসল উৎপন্ন হইতেছে, সেই মত কিছু কিছু করিয়া প্রত্যেক প্রকার দ্রব্য সাজাইয়া ডালাতে রাখিতে হইবে। ক্রমশঃ সস্তায় ভাল জিনিষ দিতে চেষ্টা করিতে হইবে এবং অধিক জিনিষের যাহাতে আমদানী হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। গাড়ীতে ঐ প্রকার বৈকালে ডালা সাজাইয়া গাড়ী মধ্যে বন্ধ করিয়া ১০।১১টা রাত্রে গাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতায় অতি প্রাতে আসিবে। যখন গাড়ী লইয়া বড় রাস্তা দিয়া বিউগল বাজাইয়া দুইটী লোক (চাকর) প্রত্যেক গৃহস্থকে জানাইয়া দিবে যে, বাজার সপ্লাইয়ের গাড়ী আসিয়াছে ; তখন যাঁহার দরকার তিনি তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া লইবেন, বা কত দরের ডালা আবশ্যক জানাইলে চাকরেরা বাটীতে পৌঁছিয়া দিয়া মূল্য আদায় বা ধারে হইলে ভাউচার স্বাক্ষর করাইয়া গাড়িতে বাবু থাকিলে, তাঁহার হাতে দিবে নতুবা বাগানে লইয়া যাইবে। সুপক্ক ফল তরকারী আবশ্যক হইলে গাড়ীর নিকট আসিয়া দর করিয়া লইয়া যাওয়ার বিধিই ভাল। পূজা পার্ব্বণে অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদির আবশ্যক থাকিলে, পূর্ব্ব দিবস অর্ডার লিখিয়া দিলে, উপযুক্ত সময়ে তাহা দেওয়া সম্ভব হইবে। যাঁহারা ধারে বাজার লইবেন, তাঁহাদের নিকট কিছু অগ্রিম লইয়া পরিশেষে প্রত্যেক সপ্তাহের বা মাসের শেষে হিসাব দাখিল করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইবেন।

তরকারীর গাড়ী যেন ৭॥০টার পর কলিকাতায় না থাকে; কারণ মহিষ বা বলদ দুই প্রহরের মধ্যে বাগানে ফিরিয়া আহারান্তে ২।৩ ঘণ্টা বাগানে চাষ দিতে পারে। শীতকালে বিদেশীয় শাক সব্জী ও গোল আলু পুষ্করিণীর ধারে লাগান আবশ্যক, যেন সহজে জল সেচন করা যাইতে পারে।

এই প্রকারে যদি কার্য্যারম্ভ করেন, তখন এক বৎসর পরে দেখিবেন যে, আর ৪০৲ টাকার চাকুরীর জন্য ২।৪ হাজার টাকা জমা রাখিয়া, ভয়ে ভয়ে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে চাকুরি করিতে যাইতে হইবে না; ১০০০৲ টাকা খরচ করিয়া ঘরে বসিয়া স্বাধীন উপায় অবলম্বন করিয়া ৩০৲ ৪০৲ টাকা পাইবেন। আর যদি ইচ্ছা হয়, তবে ঐ জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী স্থাপন করিয়া আর কিছু মূলধন লইয়া ইহার সহিত ধান্য, চাউল, বিচালীর কারবার করিয়া কলিকাতায় চালান দিলে আরও নিশ্চয় লাভ হইবে। এই রকমের আরম্ভ দেখিলে আমরা আনন্দিত হই।

আর্য্য কৃষিরীতি।*

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার জ্যোতিরত্ন লিখিত পুঁথি হইতে সংগৃহিত।

হল কথন।

ঈশা যুগো হলস্থাণু নির্য্যোলস্তস্য পাশিকা।
অড্ডচল্লশ্চ শৌলশ্চ পচ্চনী চ হলাষ্টকম্ ॥
পঞ্চহস্তা ভবেদীশা স্থাণু পঞ্চবিতাস্তিকঃ।
সার্দ্ধ হস্তস্তু নির্য্যোলা যুগঃ কর্ণ সমানকঃ ॥
লাঙ্গল পাশিকা চৈব অড্ডচল্লস্তথৈবচ।
দ্বাদশাঙ্গুলমানো হি শৌলোঽরত্নি প্রমাণকঃ ॥
পঞ্চ মুষ্টি পচ্চনিকা অগ্রস্থিবংশসম্ভবা।
দৃঢ়া শ্লক্ষ্ণা পরিজ্ঞেয়া পরাশরেণ ভাষিতা ॥†
যোক্ত্রং হস্ত চতুষ্কঞ্চ রজ্জুঃ পঞ্চকরাত্মিকা।
পঞ্চাঙ্গুলোধিকোঽহস্তো হস্তো বা ফালকঃ স্মৃতঃ ॥
অর্কপত্রসদৃশী পাশিকা চ নবাঙ্গুলা।
একবিংশক শল্যস্তু বিদ্ধকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
নবহস্তাতু মদিকা প্রশস্তা শুষি কর্ম্মসু।
ইয়ং হি হলসামগ্রী পরাশর মুনের্ম্মতা ॥
সুদৃঢ়া কর্ষকৈঃ কার্য্যা শুভদা কৃষিকর্ম্মণি।
অদৃঢ়া যুজ্যমানা সা সামগ্রী বাহনস্য চ।
বিঘ্নঃ পদে পদে কুর্য্যাৎ কর্ষকালে ন সংশয়ঃ ॥
(কৃষি পরাশরে)

ঈশা, যুগ, স্থাণু, নির্য্যোল, পাশিকা, অড্ডচল্ল, শৌল ও পচ্চনী এই আটটী হলের অঙ্গ।

---

* ইঁহার লিখিত প্রবন্ধ সমূহ বহুপূর্ব্বে 'কৃষকে' প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধগুলি সে গুলির পুনরাবৃত্তি নহে। অনেকগুলি আমুল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

† সার্দ্ধদ্বাদশ মুষ্টি বা কার্য্যা বা নব মুষ্টিকা ইত্যাদি পাঠান্তর।

ঈশা (ঈশ) পরিমাণ পাঁচ হস্ত, স্থাণু (মুড়ো ও বোঁটা সমেত লাঙ্গল) পাঁচ বিতস্তি অর্থাৎ সওয়া দুই হস্তের উপর, নির্যোল (আঁকড়া) দেড় হস্ত, যুগ (যোয়াল) কর্ণ সোমান অর্থাৎ সওয়া তিন হস্ত, পাশিকা (ফাল) ও অড্ডচল্ল (আড়চাল) দ্বাদশ আঙ্গুল, শোল (শোঁয়ালী) প্রায় এক হস্ত পরিমাণে গাঁইট শূন্য দৃঢ় এবং সুডৌল ও বংশ খণ্ড হইতে নির্ম্মিত। পাঠান্তরে দুই ও দেড় হস্ত পরিমাণেরও উল্লেখ আছে। (বিদা দেওয়া কার্য্যের সময় ঐ পরিমাণের ব্যবহার দেখা যায়।)

যোক্ত্র (যোঁত) চারি হস্ত পরিমাণ, (আঁয়োতের পরিমাণ ঐরূপ) রজ্জু (লাঙ্গল দড়ি) পাঁচ হস্ত, ফাল এক হস্ত বা এক হস্ত পঞ্চাঙ্গুল প্রমাণে ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফালের আকার অর্কপত্র সদৃশ এবং বিস্তার নয় আঙ্গুল ও বিদ্ধক (বিদা) একবিংশতি শল্য (লৌহ নির্ম্মিত এবং মাদিকা (মই) নয় হস্ত পরিমিত হইবে।

এই সকল পরাশর কথিত হল সামগ্রী সুদৃঢ় হইলে কৃষি কার্য্যে সুভদা হয়। অদৃঢ় সামগ্রী দ্বারা কার্য্যে নিযুক্ত হইলে বাহনের কার্য্যকালে পদে পদে বিঘ্ন হয়।

দ্বাপরে পরাশর কৃষি-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তখনও যে ভাবের কৃষি যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত এখনও প্রায় সেইরূপ যন্ত্রাদিই আছে। আমাদের যেমন দেশ তদুপযুক্ত যন্ত্রই সৃষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই। উহার অনাদর দ্বারা সুবিধাও নাই শ্রেয়ঃও নাই।

কিন্তু যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সুতরাং সেই সঙ্গে কৃষিযন্ত্রাদিরও আবশ্যকানুযায়ী সংস্কার হওয়া নিতান্তই উচিত।

হল চালনের শুভ সময়।

অনিলোত্তর রোহিণ্যাং মৃগমূল পুনর্ব্বসৌ।
পুষ্য শ্রবণহস্তেষু কুর্য্যাদ্ধলি প্রসারণম্॥
হল প্রসারণং কার্য্যং কর্ষকৈঃ শস্য বৃদ্ধয়ে।
শুক্রেন্দু বীজবাসরেষু শশি যস্য বিশেষতঃ॥

স্বাতী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, মৃগশিরা, মূলা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, শ্রবণা ও হস্তা নক্ষত্রে হল প্রবাহণ করিবে। এই সময়ে হল প্রসারণ করিলে বিশেষতঃ শুক্র, সোম, বৃহস্পতি ও বুধবার হইলে কৃষকের শস্য বৃদ্ধি হয়।

তিথি ও বারাদি বিশেষে পৃথিবীর স্বতন্ত্র ভাবান্তর সমুপস্থিত হয়। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্র ও বারের ভাব কৃষির পক্ষে শস্য বৃদ্ধিরই কারণ।

তিথি বিশেষে হল চালনের ফলাফল।

সুখদা প্রতিপচ্চৈব দ্বিতীয়া কার্য্যসাধিনী।
আরোগ্যদা তৃতীয়াচ চতুর্থী কীটকৃৎ সদা॥
পঞ্চমী শ্রীপদা নূনং ষষ্ঠী চ কলহপ্রিয়া।
সপ্তমী স্থানদা ভোগ্যা বৃষং হন্তি তথাষ্টমী॥
নবমী শস্যনাশায় দশমী ভূতিদা সদা।
একাদশী তথা কুর্য্যাদ্ধনং ধান্যং মনোরথম্॥
দ্বাদশী প্রাণসহো সর্ব্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী।
চতুর্দ্দশী পতিং হন্তি পঞ্চদশ্যেব নিষ্ফলাম্॥

(কৃত্য চিন্তামণি বলভদ্রে)

প্রতিপদে হল চালন করিলে সুখদায়ক, দ্বিতীয়ায় কার্য্য সাধন, তৃতীয়ায় আরোগ্যদায়ক, চতুর্থীতে কীট কারক, পঞ্চমীতে নিশ্চিতই শ্রী প্রদায়ক, ষষ্ঠীতে কলহ প্রিয়তা, সপ্তমীতে স্থান ও ভোগদায়ক, অষ্টমীতে বৃষ নাশ, নবমীতে শস্য নাশ, দশমীতে সর্ব্বদা সম্পদদায়ক, একাদশীতে ঐরূপ ধন ধান্য এবং মনোরথ সিদ্ধি, দ্বাদশীতে প্রাণসংশয়, ত্রয়োদশী সর্ব্বসিদ্ধি, চতুর্দ্দশীতে স্বামী

(কর্ত্তা) নাশ এবং অমা পূর্ণিমায় নিস্ফলা হইয়া থাকে।

যে স্থানে কৃষির সমাদর আছে তথায় শুভ দিনে হল প্রবাহ আরম্ভ করিয়া অমা পূর্ণিমার দিন ব্যতীত যে সে দিনে চাষ দেওয়া রীতি আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অশুভ দিনে হল চালনা না করিলে নিশ্চিতই শুভ হইয়া থাকে। তিথিবিশেষে পৃথিবীর ভাবান্তর হয়, যখন যেমন ভাব হয় তাহা সূক্ষ্মদর্শী আর্য্য মনীষিগণ বিশেষ অবগত ছিলেন। যে যে ভাবোদয়ে হল চালনা করিলে তাহা মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিহিত হইয়া প্রভূত ইষ্টজনক হয় তাঁহারা সেই সেই দিনেই চাষ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন; এই সূক্ষ্মতত্ত্বের বিশেষ আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য।

"অমা পূর্ণে বহে হাল। তার দুঃখ চির কাল॥"
(খনা।)

অমাবস্যা পূর্ণিমায় হাল বহন করিলে তাহার চির কালই দুঃখ থাকে।

অনেকে আপত্তি করিতে পারেন এদেশীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের চাষ বিষয়ে উন্নতি দেখা যায়, তাহারা অমা পূর্ণিমাদি মানে না। আমরা উহাকে প্রকৃত উন্নতি বলিতে প্রস্তুত নহি। শাস্ত্র যে পরিমাণ উন্নতিকে উদ্দেশ্য করিয়াছেন, তাহার নিকট উহা দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে অন্য শ্রেণী অপেক্ষা তাহাদের কৃষি বিষয়ে যে টুকু উন্নতি বলিয়া বোধ হয় তাহা পরিশ্রমের ফল মাত্র। আর্য্যগণ যদি শাস্ত্র মানিয়া ঐরূপ পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হন অত্যল্প দিনেই দেখিতে পাইবেন, মুসলমানদিগের সে উন্নতি কত অধোদেশে রহিয়াছে। আবার অনেক ভাল মুসলমান চাষীগণকে বার তিথি মানিতে দেখা যায়।

সৌরিভৌম রবিশ্চৈব কৃষ্যারম্ভে ধনক্ষয়ঃ।
শনি, মঙ্গল ও রবিবারে হলারম্ভে ধনক্ষয় হয়।

বারে শশিজ শুক্রে চ জীবে শীতকরে তথা।
লগ্নে স্ত্রী গো মীন যুগ্মে চ কৃষ্যারম্ভং শুভং বিদুঃ॥
(কৃত্য চিন্তামণি)

সোম বুধ বৃহস্পতি ও শুক্রবারে এবং বৃষ মিথুন কন্যা ও মীন লগ্নে কৃষ্যারম্ভে শুভ জানিবে।

মেষ লগ্নে পশুং হন্যাৎ কর্কটে জলজাড্যম্।
সিংহে চৌরভয়ঞ্চৈব কুম্ভে সর্প ভয়ং তথা॥
মকরে শস্যনাশঃ স্যাৎ তুলায়াং প্রাণসংশয়ঃ।
তস্মাল্লগ্নং প্রযত্নেন কৃষ্যারম্ভে বিচারয়েৎ॥
(কৃষি পরাশরে)

মেষলগ্নে হলচালনা করিলে পশু নষ্ট, কর্কটে জলজাড্য, সিংহে চৌরভয়, কুম্ভে সর্পভয়, মকরে শস্য নাশ ও তুলায় প্রাণসংশয় হয়, সেই জন্য যত্নপূর্ব্বক লগ্ন বিচার করিয়া হলারম্ভ করিবে।

দিবসের প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর এক একটী লগ্ন উদিত হয়। এই রূপ দিবারাত্রে মেষ বৃষাদি দ্বাদশটী লগ্ন সমুদিত জানিবে। যিনি বিশেষ জানিতে চান তিনি মৎপ্রণীত (পবনবিজয় স্বরোদয়ের) দীপিকা দেখিবেন। পঞ্জিকার মতেও যখন যে লগ্ন হয় তাহাও দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা করিয়া শুভলগ্নে হল চালন করাই ব্যবস্থেয়। দুই মত স্থলে,—যিনি যে মতাবলম্বী তিনি তাহা অবলম্বনে নিশ্চিতই শুভ প্রাপ্ত হইবেন।

চৈত্র—১৩১৭।

উদ্ভিদের আহার।

মনুষ্য ও জীব জন্তুর যেমন আহারের প্রয়োজন হয়, উদ্ভিদেরও তদ্রূপ আহারের আবশ্যক। মূল, কাণ্ড, পত্র ও পুষ্প এই চারিটি উদ্ভিদের অঙ্গ। মূল মৃত্তিকা হইতে আহার সংগ্রহ করে। উদ্ভিদের মূলই তাহার মুখ। মূল মৃত্তিকা হইতে আহার আহরণ করে, কাণ্ড তাহা বহন করিয়া পত্রে লইয়া যায়, পত্রে সেই আহরিত পদার্থের পরিপাক কার্য্য সম্পন্ন হয়।

মৃত্তিকায় উদ্ভিদের আহার সঞ্চিত থাকে। উদ্ভিদের আহারোপযোগী সার বিশেষতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যেমন নাইট্রোজেন প্রধান, ফস্ফারাস প্রধান, পটাস প্রধান ও চূণ প্রধান সার। পোটাসিয়ম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড প্রভৃতি ধাতব পদার্থ, মৎস্য, রক্ত প্রভৃতি জান্তব পদার্থ, খৈলাদি উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে উদ্ভিদের আহারোপযুক্ত নাইট্রোজেন সংগ্রহ হয়।

হাড়চূর্ণ, হাড়ভষ্ম অথবা এপেটাইট ও সুপার প্রভৃতি ধাতব পদার্থ কিম্বা গুয়ানো হইতে ফস্ফরাস সংগ্রহ হয়। গোময়, কাষ্ঠ কিম্বা চারা গাছ ভষ্ম অথবা কাইনাইট, পোটাসিম সালফেট বা মিউরিয়েট প্রভৃতি ধাতব পদার্থই পটাস প্রাপ্তির উপায়। এতদ্দেশীয় মৃত্তিকায় চূণও অল্প বিস্তর বিদ্যমান আছে। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ তাহাদের নিজ প্রয়োজন অনুরূপ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করে। অনাহার বা অল্পাহারে মানুষের যেমন কষ্ট হয় উদ্ভিদেরও তদ্রূপ কষ্ট হয়। অল্পাহারে তাহারা ক্ষীণ হয় এবং অধিককাল অনাহারে তাহারা বিনষ্ট হয়।

কিন্তু কি প্রকারে উদ্ভিদ তাহাদের আহার সংগ্রহ করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তাহারা মূলদ্বারা আহার করে। মনুষ্য ও অধিকাংশ জন্তু যেমন মুখদ্বারা তাহাদের খাদ্য ভাল করিয়া চর্ব্বণ করে ও লালা প্রভৃতি রস মিশ্রিত করিয়া তাহাদের খাদ্যবস্তু পোষণোযোগী করিয়া লয়, উদ্ভিদ তাহা পারে না। উদ্ভিদ মূলদ্বারা কেবল মাত্র মৃত্তিকা-স্থিত রসাকর্ষণ করিতে সক্ষম। সুতরাং উদ্ভিদের পোষণোপযোগী সমুদয় খাদ্য এই রসে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। জলই উদ্ভিদের খাদ্য সমূহ দ্রব করে। জলদ্বারা দ্রব না হইলে উদ্ভিদ তাহা কখনই গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং জল যে উদ্ভিদের আহারের এক প্রধান সামগ্রী তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। যথোপযুক্ত আহার বিদ্যমান থাকিলেও উদ্ভিদ জল বিনা অনাহারে মরিতে পারে। জল উদ্ভিদের আহারের প্রধান উপাদান। মৃত্তিকা নিহিত কঠিন পদার্থ সমূহ সহজ অবস্থায় উদ্ভিদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রথমে সে গুলি জলের সাহায্যে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তৎপরে উদ্ভিদ মূলদ্বারা নিজাভ্যন্তরে টানিয়া লয়, সুতরাং জলই উদ্ভিদের কেবল মাত্র আহার নহে, উদ্ভিদের আহার বহন করিবার আধার। এই জন্য প্রায়ই দেখা যায়, জল না পাইলে উদ্ভিদ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং অবশেষে মরিয়া যায়। ধান, যব প্রভৃতি গুচ্ছ মূলধারী শস্যের

মূল মৃত্তিকার নিম্নে অতি দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাদের ভাসা শিকড় জল না পাইলে শীঘ্র মরিয়া যায়। বড় লম্বা মূলধারী উদ্ভিদ মৃত্তিকার অধিক নিম্নদেশ ভেদ করিয়া জল সংগ্রহ করে, সেই জন্য অতি রৌদ্রের সময়েও তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হয় না। সুতরাং বেশ বুঝা যায় যে, উদ্ভিদ মূলদ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করে। মৃত্তিকাস্থিত রস মূলাণু কোষের প্রাচীর ভেদ করিয়া কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মূল এবং কাণ্ড অসংখ্য কোষে গঠিত। মূল এবং কাণ্ড কোষ সমষ্টি মাত্র। রস মূলাণুকোষে প্রবেশ লাভ করিয়া কোষ হইতে কোষান্তরে নীত হয়, অবশেষে কাণ্ডের নবজাত অংশপথ বাহিয়া পত্রে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মনুষ্য শরীরে যেমন শোণিত প্রবাহ উদ্ভিদ শরীরে জল প্রবাহও প্রায় তদনুরূপ।

উদ্ভিদ মানুষের ন্যায় যেমন মূলদ্বারা আহার গ্রহণ করে, পত্রের দ্বারা তেমনি তাহার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সংসাধিত হইয়া থাকে। বায়ুস্থিত অক্সিজেন শ্বাস, প্রশ্বাসে গ্রহণ না করিলে কোন প্রাণীই জীবিত থাকিতে পারে না। প্রচুর আহার সত্ত্বেও জলাভাবে যেমন প্রাণী বাঁচে না, বায়ু অভাবেও কোন প্রাণী বাঁচিতে পারে না। বিশুদ্ধ অক্সিজেন কিন্তু আমাদের শ্বাস, প্রশ্বাস গ্রহণের উপযোগী নহে,। অক্সিজেন সকল বস্তুকে দগ্ধ করে, কিন্তু অক্সিজেন বাষ্প, বায়ুমণ্ডলস্থিত নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের সহিত মিশ্রিত থাকায় উহা প্রাণী মাত্রেরই গ্রহণোপযোগী। পত্রান্তর্গত রস ও পত্রাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট অক্সিজেন বাষ্প এতদুভয়ের মিলনে উদ্ভিদের দেহ নির্ম্মাণের উপাকরণ সমূহ উৎপন্ন হয়। জলও বায়ুর ন্যায় উদ্ভিদজীবনে আর একটি অত্যাবশ্যক পদার্থের প্রয়োজন—সেটি সূর্য্যালোক। সূর্য্যালোক দ্বারাই উদ্ভিদের পরিপাক ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হয়। উদ্ভিদের পত্রকোষে একপ্রকার হরিদ্বর্ণ পদার্থ দৃষ্ট হয়। এই হরিদ্বর্ণ খণ্ডগুলি দ্বারা উদ্ভিদের পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই হরিদ্বর্ণ খণ্ডগুলির অভাব হইলে পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। সূর্য্যালোকের অভাব হইলে হরিদ্বর্ণ খণ্ড শাদা হইয়া যায়, তখন আর সেগুলি পরিপাক কার্য্যে সহায়তা করিতে পারে না। সূর্য্যালোকেই হরিদ্বর্ণ খণ্ডগুলির জন্ম এবং সূর্য্যালোকেই তাহার কার্য্যকারিতা।

প্রাণী মাত্রেই যেমন জীবিত থাকিয়া সন্তুষ্ট নহে, নূতন জীবন উৎপাদনে তাহারা ব্যগ্র। উদ্ভিদেও সে প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে। সেই জন্য তাহারা তাহাদের অঙ্গ বিশেষে পুষ্টিকর পদার্থ সমূহ সঞ্চিত করিয়া রাখে। ধান, যব, গম, মটর, মসুর প্রভৃতি ও অধিকাংশ ফলের গাছের বীজে এই পুষ্টিকর পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং সেই সকল বীজ হইতে পুনরায় আবার গাছ হয়। কতকগুলি মূলজ খন্দের, যথা—গোল আলু, লাল আলু, মূলা, সালগম, বীট, গাজর প্রভৃতির পুষ্টিকর পদার্থ মূল কিম্বা কাণ্ডে সঞ্চিত হয়। এই জন্য এই জাতীয় কয়েকটির যেমন গোল আলুর মূল কিম্বা কাণ্ড হইতে ফসল জন্মিয়া থাকে।

উদ্ভিদের আহার ও পরিপাক ক্রিয়ার বিষয় অবগত হইলে আমাদের এই সুবিধা হয় যে, আমরা মৃত্তিকায় উদ্ভিদের আহারোপযোগী কি কি পদার্থ আছে, তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব। কোন উদ্ভিদের কি আহার আবশ্যক তাহার বিচার করিব। জমিতে রসাভাব না হয় তাহার ব্যবস্থা করিব এবং অবস্থা বুঝিয়া জল সেচনের ব্যবস্থা করিব, ক্ষেতে বা বাগানে কখন বায়ু চলাচলের পথ রোধ না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিব এবং

উদ্ভিদ কখন সূর্য্যালোকের অভাব অনুভব না করে, তাহার যথাসম্ভব বন্দোবস্ত করিব, কিম্বা ছোট কচি গাছগুলিকেও প্রচণ্ড সূর্য্যাতপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ছায়া প্রদান করিব। তবেই উদ্ভিদের পরিপাক ও পোষণ সম্পূর্ণ হইবে, তবেই উদ্ভিদ পরিপুষ্ট হইবে এবং যথোপযুক্ত ফল ফুল প্রদান করিবে।

নেপালে বাণিজ্য।—নেপাল হইতে প্রধানতঃ ভারতের নানাস্থানে চাউল রপ্তানি হয়। চাউল ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য যথা--ঘৃত, টাটু ঘোড়া, গরু, ভেড়াও আসিয়া থাকে। শিকারী পক্ষী ও অন্যান্য পক্ষীও আমদানী হইয়া থাকে। নেপালী শাল, সেগুণকাষ্ঠ প্রসিদ্ধ, তাহাও ভারতে আমদানী হইয়া থাকে। অনেক খুচরা জিনিষ, যেমন আফিং, মৃগনাভি, মোম, তারপিন তৈল, খদির, পাট, চামড়া, পশম, শুঁঠ, লঙ্কা ও হলুদ প্রভৃতি বিবিধ পণ্যজাত দ্রব্য নেপাল হইতে ভারতের কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরে আমদানী হয়।

এখন দেখা যাউক, নেপালে কি কি দ্রব্য রপ্তানি হয়। ভারতের নানা সহর হইতে নেপালে যে সমস্ত দ্রব্য রপ্তানি হয়—তাহার মধ্যে তুলা, বস্ত্রবয়নের জন্য সুতা, সুতার বস্ত্র, পশমী বস্ত্র, তোয়ালে, গামছা, জরি, মশলা, নীল, তামাক, সুপারি, সিন্দুর, তৈল, চাউল, তামা, পিতলের দ্রব্য, আরসি, বন্দুক, বারুদ এবং চা রপ্তানি হইয়া থাকে। ভারতের সহিত নেপালের বাণিজ্যের পসার বৃদ্ধির মাল গমনাগমনের বেশ ভাল রাস্তা আছে।

নেপালীদিগের মধ্যে নেওয়ারি জাত খুব পরিশ্রমী। নেওয়ারি স্ত্রীলোকগণ বস্ত্র বয়নে সুনিপুণ। তাহারা স্বদেশবাসীর ব্যবহারের জন্য সুন্দর সূত্রবস্ত্র বয়ন করে। তাঁহাদের হাতের ছাগল ও ছাগল ছানার পশমে তৈয়ারি কম্বল বিশেষ মূল্যবান।

কলিকাতায় ক্ষুদ্র শিল্প।

শ্রীযুক্ত নলিনানন্দ চট্টোপাধ্যায় অমৃতবাজার পত্রিকায় কাঁচের বাসন ও দেশী পেরেক এই দুইটি ক্ষুদ্র শিল্পের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, এই দুইটী শিল্পের সমধিক উন্নতি করা যাইতে পারে এবং ইহাদের উন্নতি হওয়াও নিতান্ত আবশ্যক।

সকলেই দেখিয়াছেন যে হ্যারিসন রোডে কয়েকটি খোলার ঘরে ফুঁকা শিশি প্রভৃতি কাঁচের বাসন প্রস্তুত হয়। এই সকল দোকানের সাজ সরঞ্জম সবই সামান্য। মাটির উনান সাধারণ মাটিতেই প্রস্তুত, এইরূপ উনান তৈয়ারি করিতে কুত্রাপি দশ পাঁচ খানা অগ্নির উত্তাপ সহিষ্ণু ইট ব্যবহার করা হয় মাত্র। লাল, নীল, সবুজ, হলদে ও শাদা নানা রঙের ভাঙ্গা কাঁচের বাসন কিনিয়া আনিয়া সামান্য কাঠের মুগুর দ্বারা গুঁড়া করা হয়। সেই গুঁড়াগুলি কাঠের জ্বালে গলান হয়। বাবলা কাঠের আগুনের একটু তেজ বেশী—সেই কারণে বাবলা কাঠই প্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটা সছিদ্র লম্বা নলের মুখে সেই গলিত কাঁচ সংলগ্ন করিয়া লইয়া তাহাতে ফুৎকার দিয়া মধ্যস্থল শূন্যগর্ভ করিয়া লইতে হয়, অবশেষে ছাঁচে ফেলিয়া শিশি, দোয়াত, গদাধার প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোলার ঘরে এই সকল কারখানা অবস্থিত এবং নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণ এই কার্য্যে লিপ্ত। তাহাদের তোড়জোড় কোন রকমে কাজ চালাইবার মত। সৌখিন, টেকসই জিনিষ তাহাদের দ্বারা প্রস্তুত সম্ভব নহে—অথচ তাহারা যে জিনিষগুলি তৈয়ার করে সে গুলি অকাজের নহে, সে গুলি তৈয়ারির বিশেষ আবশ্যক আছে।

নলিনানন্দ বাবুর এই কথার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যখন ১॥ হইতে ২ ক্রোর টাকার কাঁচের দ্রব্য প্রতি বৎসর ভারতে আমদানী হইয়া থাকে তখন কাঁচের কারখানার উন্নতির বিশেষ চেষ্টা হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, ইউরোপীয় কারখানার অনুকরণে এখানে কাঁচের দ্রব্য নির্ম্মাণের কয়েকটি কারখানা স্থাপিত হইল, কিন্তু কোনটিই চলিল না। ইহার সঠিক কারণ যে কি তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে এই সকল সামান্য অবস্থার মুসলমানগণ সামান্য মাত্র সাজসরঞ্জমে এই সকল কারখানা চালাইতেছে তখন উন্নত কল কব্জা লইয়া উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত উনানে এই প্রকার কাঁচের দ্রব্য প্রস্তুতের প্রয়াস বৃথা হইবে কেন, অপিচ ইহাতে আশানুরূপ কার্য্য হওয়াই সম্পূর্ণ সম্ভব এবং ইহা সম্ভব হইলে দেশের কত পয়সা দেশে রাখিতে পারা যাইবে।

যাহা কাঁচের কারখানার পক্ষে সম্ভবপর, তাহা পেরেক প্রস্তুতের কারখানার পক্ষে অধিকতর সম্ভব। হাওড়ায় কোন একটি অপ্রশস্ত গলির ভিতর পশ্চিম দেশীয় সামান্য ব্যক্তিগণ পরিচালিত একটি পেরেকের কারখানা দেখিলে একথা স্বতঃই মনে আসে। তাহারা সরু, মোটা নানা মাপের লোহার তার ক্রয় করিয়া, তাহা আবশ্যক মত ছোট করিয়া কাটিয়া পুড়াইয়া পেরেক তৈয়ারি করিতেছে। এক অগ্রভাগ পুড়াইয়া লাল করিয়া হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়া মাথা প্রস্তুত করিয়া লইতেছে। অপর ভাগ সুচাল করিয়া কাটিয়া লইতেছে। নলিনবাবু বলিতেছেন যে ইহা দেখিয়া জার্ম্মানির পিন তৈয়ারির কথা মনে পড়ে। তথায় লোকে কত শ্রেণীতে বিভক্ত কেমন সুন্দর এবং ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর পিন প্রস্তুত করিতেছে, অথচ সেই পিনগুলি কত সস্তা। কেমন বিভিন্নপ্রকার যন্ত্রদ্বারা ইহা প্রস্তুত হইতেছে এখানেও এই প্রকারের কার্য্য হওয়া অসম্ভব নহে। নিশ্চয়ই সম্ভব হইতে পারে কিন্তু তথায় প্রকৃত শিল্পী আছে, ব্যবসাদার আছে, আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এদিকে নজর নাই বলিয়া এ সকল শিল্পের এত দুর্দ্দশা। কিন্তু এই সকল দ্রব্যের কাট্‌তি ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

নেপালে গাছের ছালে কাগজ।—নেপালে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মায়, তাহার ছালে উহারা কাগজ তৈয়ারি করে। ছাল মাটির পাত্রে সিদ্ধ করিয়া লয়, সুসিদ্ধ ছাল হামানদিস্তায় গুঁড়া করে। অবশেষে উহাতে জল মিশাইয়া লেয়াইবৎ তৈয়ারি করিয়া, পরে শুখাইয়া কাগজ প্রস্তুত করে। নেপালে এই কাগজের দাম এক টাকা এক আনায় তিন সের। কাগজ খুব মোটা এবং শক্ত হয়। পুস্তকাদির মলাট হইবার সম্ভাবনা।

পত্রাদি।

নারিকেল ছোবড়া।

শ্রীমহাম্মাদ খাজা বক্স খান, ইয়ারপুর,
পোঃ রঙ্গিলাবাদ, জেলা ২৪ পরগণা।

মহাশয়,

এ অঞ্চলে বহুল পরিমাণে নারিকেলের ছোবড়া পাওয়া যায়, সেই কারণ আমি একটি নারিকেল দড়ির কারখানা করিবার ইচ্ছা করিতেছি। নারিকেলের ছোবড়া হইতে আঁশ (সূত্র) বাহির করিবার এবং তাহা হইতে দড়ি, কাছি প্রস্তুত করিবার কোন প্রকার যন্ত্র আছে কি না এবং তাহার মূল্য ও প্রাপ্তি স্থান প্রভৃতি সমুদয় স্পষ্টরূপে জানাইলে আমি চিরবাধিত হইব। কলিকাতার মধ্যে যদি কোথাও এরূপ কারখানা থাকে তাহাও জানিতে ইচ্ছা করি, যেহেতু একবার দেখিলেও অনেকটা জ্ঞান হইতে পারে।

[উত্তর। নারিকেল ছোবড়ায় দড়ির কারখানা স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ কোন যন্ত্রাদির প্রয়োজন নাই। দুই চারি খানা দাঁতওয়ালা চাকা বিশিষ্ট ঘূর্ণীযন্ত্র এবং পেরেক, কয়েক খানি কাষ্ঠ দড়ির কারখানার সাজ সরঞ্জম। কতকগুলি খুঁটি, তেকাটা চাই। সমুদয় সাজ সরঞ্জমের মূল্য ২৫০৲ টাকার অধিক নহে। কলিকাতায় দুই চারিটি কারখানা আছে। আপনি দেখিতে চাহিলে দেখিবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।] কৃঃ সঃ।

ধানভানা কল।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী,
বহরমপুর, মুর্শীদাবাদ।

[সুরেন্দ্র বাবু প্রমুখ প্রায় পনর ষোল জন ব্যক্তি সুরপতি ঘটকের ধান ভানা কল সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছেন। আমরা তাঁহার ধান ভানা ও চাউল ছাঁটা কল দেখিয়াছি। হস্ত কিম্বা বলদ চালিত ৬০৲ টাকা দামের কল হইতে এঞ্জিন চালিত ২০০৲ কিম্বা ৪০০৲ টাকার কল এবং কলের কার্য্য আমরা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি। সকল গুলিই কার্য্যোপযোগী। ইহার বিশেষ বিবরণ বারান্তরে কৃষকে প্রকাশ করা যাইবে।] কৃঃ সঃ।

হরিতকী।

শ্রীরমেশচন্দ্র গুহ, পোঃ বিনাফেয়ার, টাঙ্গাইল।

মহাশয়,

ভারত-আদর্শ "কৃষকের" কোন এক সংখ্যাতে "হরিতকী" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ দেখিয়াছিলাম। প্রবন্ধটী পড়িয়া পুলকিত হইয়াছি।

এতদঞ্চলে বহু হরিতকী বৃক্ষ গৃহস্থের বাড়ীতে দেখা যায়। এগুলি পাটনাই হরিতকী হইতে আকারে ছোট হইলেও ফলন বেশী। এই প্রকারের হরিতকী বিক্রয় হইবে কি? হরিতকী কি দরে বিক্রয় হয়? কি মাসে বা কি প্রকারে হরিতকী সংগ্রহ পূর্ব্বক বিক্রয়ের উপযুক্ত করা যায়?

[উত্তর। বড়বাজারের কতিপয় আড়তদার হরিতকী, আমলকী, বয়ড়া প্রভৃতি বনজাত ফলের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। তাঁহারা এই সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকেন। আপনি তাঁহাদের নিকট হরিতকীর নমুনা পাঠাইতে পারেন, অথবা আমাদের নিকট নমুনা পাঠাইলে আমরা অনুসন্ধান লইতে পারি।

মধ্য প্রদেশের জঙ্গলে যে হরিতকী জন্মায় তাহা মাঘ ফাল্গুন মাসে সংগ্রহ করিতে হয়। হরিতকী পাকিলেই সংগ্রহ করা উচিত। আপনাদের ঐ খানে হরিতকী কখন পাকে তাহা আপনা-

রাই স্থির করিতে পারেন। হরিতকী আহরণ করা হইলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া বস্তাবন্দী করা ছাড়া ইহার আর অন্য কোন পাইট নাই। হরিতকী বৎসরে একগাছে দুই বার হয়। দোফলা হরিতকী আষাঢ় শ্রাবণ মাসে সংগ্রহ করিতে হয়।

চুবড়ী আলু।

শ্রীশিবাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বীরভূম।

চুবড়ী আলু কি এবং তাহার চাষ কিরূপে হয় জানিতে চান।

[চুবড়ী আলু এক প্রকার কন্দ বিশেষ ইংরাজিতে ইহাকে (Yam)—য়াম বলে। বর্ষার অনতিপূর্ব্বে কন্দটি খান খান করিয়া কাটিয়া কিছু কাল ভিজা পোয়াল ও মাটি চাপা দিয়া রাখিতে হয়, পরে ঐ খণ্ডগুলি হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইলে সে গুলি চারি হাত অন্তর একটি গর্ত্তে রোপণ বিধি। গর্ত্তটি সারমাটি ও কুটি দিয়া পূর্ণ করিয়া দিতে হয়।] কৃঃ সঃ।

শিয়ারা রবারের বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হইতে কত সময় লাগে?

এম, ডি, ফুকন লেটিকুজান, আসাম।

[শিয়ারা রবারের বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হইতে ১৫ হইতে ২০ দিনের অধিক সময় লাগে না। ১০০ শত বীজ হইতে ৭০টী চারা উৎপন্ন হওয়া খুব সম্ভব। রবার বীজের অনেক ভুয়া হয়। ভাল বীজ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।] কৃঃ সঃ।

তরমুজ, খরমুজ, কাঁকড়ী,—বৈশাখে ফলে কি না?

শ্রীআতর আলি জোয়ারদার উক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন।

[তরমুজ, খরমুজ, কাঁকড়ী নিম্ন বাঙ্লায় ঠিক বৈশাখেই ফলে না, একটু বিলম্ব হয়। এখানকার আর্দ্র মৃত্তিকা, ঠিক চাষের উপযুক্ত হইতে বিলম্ব ঘটে, বলিয়া ফসলও একটু নাবী হয়। উত্তর বঙ্গ ও পশ্চিম প্রদেশ হইতে বৈশাখের পূর্ব্বেই খরমুজ, তরমুজ প্রভৃতি আমদানী হয়।] কৃঃ সঃ।

মটর—শুঁটি না ধরিবার কারণ।

শ্রীযুত আতর আলি জোয়ারদার জমিদার, চুয়াডাঙ্গা—বলিতেছেনঃ—"মটর বুনিয়াছিলাম, তাহাতে প্রথমে মটর হইল, কিন্তু তারপর গাছ সতেজ ও বড় হইল, শুঁটি ধরিল না, কেবল গাছ ও পাতা বড় হইয়া গেল।

[অতিরিক্ত সারের গুণে এরূপ হওয়া সম্ভব। প্রথমে যে শুঁটি হইয়াছিল তাহার কারণ বোধ হয় তখন সার মাটির রসের সহিত মিশ্রিত হয় নাই এবং তাহাতে তত গাছের জোর না হইয়া বরং ফল ধরিয়াছিল কিন্তু এক্ষণে হয়ত জল পাইয়া বা কোন রূপে সার গলিয়া গাছ পাতার বৃদ্ধির অনুকূল হইয়াছে, গাছ খুব তেজাল হইলে ফল ভাল হয় না। প্রকৃত কারণ আপনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন।

প্রাদেশিক কৃষি-সংবাদ।

সুন্দরবনের সন্নিকটে আলুর চাষ।—দক্ষিণ মগরার নিকটবর্ত্তী স্থানে আলু চাষ করিয়া কোন লোক দেখিয়াছেন, কিন্তু তথায় বিশেষ চেষ্টা সত্বেও আলু ভাল ফলিল না। বারুইপুর এবং সন্নিহিত স্থানে এবং গোবিন্দপুর কৃষিক্ষেত্রে আলু বেশ জন্মিতেছে, কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, লোণা জলই আলুর ফলন কমাইবার একমাত্র কারণ। মগরার জল অপেক্ষাকৃত লোণা। মিঠেন জলে চাষ করিতে পারিলে ফলন নিশ্চয় বাড়িবে।

বেলগাঁও কৃষিক্ষেত্র।—আলুর চাষে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আলু কাটিয়া বসাইলে ফসলের হার বৃদ্ধি হইয়াছে। কি ছোট কি বড় সব রকম আলুই কাটিয়া বসান হইয়াছিল। আস্ত আলু বসাইলে গাছ শীঘ্র বাড়ে এবং গাছ শীঘ্র তেজস্কর হইয়া উঠে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত গাছ বৃদ্ধি ও গোড়া মোটা হওয়ার কারণ আলু কম ফলে। আরও বিশেষ লক্ষ করা হইয়াছে যে, বড় আলু যদি কাটিয়া বসান যায়, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফলে।

এই আলুর পরীক্ষায় আর একটি বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়ঃ—আলুর অঙ্কুর বাহির হইলে, তবে আলু জমিতে বসান কর্ত্তব্য এবং অঙ্কুরিত আলু বসাইয়া ফলনের হার ২০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধিকন্ত ফসলও বেশ ভালরকম জন্মায়, আলু শীঘ্র তৈয়ারি হইয়া যায় এবং জলদি আলু উঠিলে বাজারে অধিক দরে বিক্রয় হয়।

সুরাট কৃষি-ক্ষেত্র।—তুলা, জোয়ার এবং তিল খন্দে সুপার ফস্‌ফেট ব্যবহার করিয়া ফলন অধিক হইয়াছিল। তুলার ফলন শতকরা ৩০ ভাগ, জোয়ারের শতকরা ১৯ ভাগ এবং তিল শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িয়াছে। এতটা ফলন বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু খরচ খতাইলে বিশেষ কিছু লাভ দেখা যায় না, বরং গোয়ালের সার ব্যবহার করিলে ফলনেও বাড়ে এবং লাভও হয়। সুপার ফস্‌ফেট সারের ক্ষমতা গোয়ালের সার অপেক্ষা অধিক হইলেও খরচের অনুপাতে গোয়ালের সারই ভাল। গোয়ালের সার ব্যবহারে উক্ত তিনটি ফসলের নিম্নলিখিতানুরূপ ফলন দাঁড়াইয়াছে।

তুলা	শতকরা ১৯ ভাগ।
জোয়ার	,, ১৯ ,,
তিল	,, ৫০ ,,

কৃষি পরীক্ষা প্রদর্শন।—বোম্বাই কৃষি-বিভাগের অধীন পুনা, সুরাট, দোহাদ, নাদাইয়াদ, ধুলিয়া, গোকাক্‌, বেলগাঁও, ধারওয়ার ও গড়াকে কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে এই সমস্ত কৃষি-ক্ষেত্রের পরীক্ষিত বিষয়গুলিও ক্ষেত্রস্থিত শস্য সাধারণকে দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই দর্শকগণের মধ্যে উন্নত প্রণালীর চাষে মনোযোগী কৃষকগণও স্থান পাইয়াছিল। পুনা কলেজ-ক্ষেত্রে দুইবার এবং অন্যত্র একবার একুনে দশবার এই প্রদর্শনী হইয়াছিল। এক একবার দর্শকের সংখ্যা ৬০০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। দর্শকদিগকে কোন একটি পরীক্ষার ফল, কি প্রণালীতে চাষ আবাদ করা হইয়াছে, চাষের জন্য কি প্রকারের কৃষি-যন্ত্রাদি ব্যবহার করা হইয়াছে ইত্যাদি সকল বিষয়ই তন্ন তন্ন করিয়া দেখান হইয়াছিল। এমন কি দর্শকগণের সুবিধার জন্য

তাহাদিগকে প্রাতে যথা সম্ভব দ্রষ্টব্য দেখাইয়া মধ্যাহ্নে তথায় তাহাদিগকে আহার দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আহারের পর দর্শকবৃন্দ প্রদর্শিত বিষয়গুলি লইয়া স্থানীয় কর্ম্মচারীগণের সহিত আন্দোলন আলোচনা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন, অবশেষে যাহা বাকী ছিল, তাহা দেখিয়া সকলে ঘরে ফিরিয়াছিলেন। বস্তুতঃ নূতন জিনিষ বুঝাইবার ও দেখাইবার ইহা অপেক্ষা ভাল বন্দোবস্ত আর কি হইতে পারে? ইহাদ্বারা স্থানীয় চাষীগণের সহিত ক্ষেত্র-কর্ত্তাগণের একটা সৌহৃদ্য স্থাপিত হইতে পারে, তাহাতে কৃষির উন্নতিকামী চাষীগণের বিশেষ লাভ আছে।

করাচী গম।—করাচি হইতে ৩রা এপ্রিল পর্য্যন্ত ১৪০,৯০২ হন্দর গম বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১লা জানুয়ারি নাগাইদ ৩,৮৪৩ হন্দর গম বিদেশে রপ্তানি হইল। অন্য বৎসর আমদানী রপ্তানির মাত্রা অধিক। অন্য বৎসর এ সময় পর্য্যন্ত মোটের উপর ২,২৯২,৮২২ হন্দর মাত্র রপ্তানি হইয়াছিল।

সার-সংগ্রহ।

চিনির ব্যবসায়।

ভারতে অল্পমূল্যের বৈদেশিক চিনির আমদানী হইবার পর হইতেই ধীরে ধীরে আমাদিগের কৃষকগণ ইক্ষুর চাষ পরিত্যাগ করিতেছে। সমগ্র ভারতে প্রতিবৎসর সামান্য চিনির কাটতি হয় না। ভারতের ভূমিও ইক্ষু চাষের সম্পূর্ণ উপযোগী। এ অবস্থায় আমাদিগের যত্ন ও চেষ্টার অভাবে আমরা চিনির জন্য ক্রমশঃ বৈদেশিক ব্যবসায়ীদিগের হস্তে আত্ম বিক্রয় করিতেছি। ইহা একদিকে যেমন আমাদিগের শ্লাঘা ও গৌরবের পরিচায়ক নহে, অন্যদিকে তেমনই দেশের দুর্দ্দশা সূচক। চিনি উৎপাদন ভারতের একটি প্রাচীন শিল্প। এই শিল্প বৈদেশিক ব্যবসায়ীদিগের প্রতিযোগীতায় ক্রমশঃ এদেশ হইতে কিরূপে বিলুপ্ত হইতেছে, তাহা স্বদেশহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই বিবেচনায় বিষয়। যে ভাবে এদেশে বৈদেশিক চিনির আমদানী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতজাত চিনির পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে বিশেষ ভাবে চেষ্টা না করিলে আর কয়েক বৎসর পরে চিনির দুর্দ্দশা আমাদিগের বয়ন শিল্পের ন্যায় হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিগত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সরকারী রিপোর্টের সংবাদ সংগ্রহ বিভাগের কর্ত্তা মিঃ শোয়েম শের ভারতের চিনি সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রচার করিয়াছিলেন। সংপ্রতি তিনি এই পুস্তকের এক নূতন সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আমরা দেখিয়াছিলাম বৈদেশিক চিনির আমদানী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু

ভারতজাত চিনির পরিমাণ আদৌ বৃদ্ধি পায় নাই, বরং কিছু কম হইয়াছে। নূতন সংস্করণের পুস্তকে যে হিসাব উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে পরিদৃষ্ট হয় যে, বিগত পাঁচ বৎসরে বৈদেশিক আমদানী চিনির পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশী চিনির পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৮-০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরের হিসাবে দেখা যায় যে, মোটের উপর শতকরা ৮ একর (এক একর প্রায় তিন বিঘা) ভূমিতে ইক্ষুর চাষ কম হইয়াছে এবং প্রায় সেই পরিমাণ অধিক ভূমিতে অন্যান্য শস্যের চাষ হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কৃষকগণ ইক্ষুর চাষে লাভ অল্প দেখিয়া এই চাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যান্য শস্যের চাষে মনোনিবেশ করিতেছে। এক হিসাবে, ইহাতে হতাশ হইবার কোন কারণ নাই বটে, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই আমাদিগের ক্ষতি বুঝিতে পারা যাইবে। দশ বৎসরের হিসাবে দেখা যায় যে, মোটের উপর আমাদিগের আবাদি ভূমির পরিমাণ সমান আছে, এ বিষয়ে আমরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারি নাই—অধিকন্তু দেশের অন্যতম একটী প্রধান শিল্প ধীরে ধীরে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইতেছে।

বিগত পনর বৎসর হইতে এদেশে বৈদেশিক চিনির আমদানী অধিক পরিমাণে হইতেছে। ১৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে মোটের উপর প্রতি বৎসর ২ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকার বৈদেশিক চিনি এদেশে আসিয়াছিল। কিন্তু ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে যে চিনি আসিয়াছে, তাহার মূল্য ১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ১৫ বৎসর কালে আমদানী চিনির পরিমাণ চারি গুণের অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই আমদানী চিনির ভিতর বিট চিনি ও ইক্ষুর চিনি উভয় প্রকারই আছে; কিন্তু ইক্ষুর চিনির পরিমাণ বিট চিনির পরিমাণ অপেক্ষা প্রায় তের গুণ অধিক। যবদ্বীপ হইতে ১৮৮৪ ৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৮ ৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর ৮২১ টন ইক্ষুর চিনি আসিয়াছে, কিন্তু গত বৎসর ঐ চিনির পরিমাণ ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০৩ টন হইয়াছে। ইহা হইতেই পাঠক যবদ্বীপে ইক্ষুর চাষের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিবেন। যুক্তবঙ্গেই ইক্ষুর চাষের হ্রাস অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যে পরিমাণ ভূমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল, গত বৎসর তাহার অর্দ্ধেকেরও কম জমিতে ঐ চাষ হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন যে, বঙ্গদেশ সমুদ্রের তীরবর্ত্তী, বৈদেশিক বাণিজ্যে বঙ্গদেশেরই অধিক ক্ষতি হইয়াছে। এ কথা আংশিক সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগের মনে হয় যে অন্য অঞ্চলের লোক বৈদেশিক চিনি সহজে খাইতে চাহে না, কিন্তু বঙ্গবাসীর সে বিষয়ে আপত্তি নাই, তাই বঙ্গদেশের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। কৃষকগণ দেখিতেছে যে, বৈদেশিক চিনির প্রতিযোগিতার জন্য ইক্ষুর চাষ অপেক্ষা ধান, পাট, সর্ষপ প্রভৃতির চাষে লাভ অধিক হয়। সুতরাং তাহারা ইক্ষুর চাষ পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল দ্রব্যেরই চাষ অধিক পরিমাণে করিতেছে।

এদেশে যে ব্যয়ে যে পরিমাণে চিনি উৎপাদিত হইত, সেই ব্যয়ে যে পাট, ধান বা আলু উৎপন্ন হয়, তাহার বিনিময়ে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ চিনি পাওয়া যাইতেছে, এ কথা সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশের একটী প্রধান শিল্প বিধ্বস্ত হইতেছে, আমরা ক্রমশঃ পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি, ইহাই বিড়ম্বনার বিষয়। আর এক কথা, বাজারে

চিনির মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে বটে, কিন্তু গুড়ের মূল্য এখন বাড়িতেছে। এদেশের সাধারণ লোক চিনি অপেক্ষা গুড়ই অধিক পছন্দ করে এবং গুড়ের ব্যবহারই অধিক পরিমাণে করিয়া থাকে। সুতরাং ইক্ষুর চাষের অল্পতা নিবন্ধন অল্প গুড় উৎপন্ন হওয়ায় গুড় ক্রয় করিয়া লোকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। অন্যান্য খাদ্য শস্যের মূল্য যে হিসাবে বাড়িয়াছে গুড়ের মূল্য সে হিসাবে বাড়ে নাই বটে, কিন্তু যাহা বাড়িয়াছে, তাহাই অত্যধিক। মোটের উপর বৈদেশিক ব্যবসায়ীরা অপকৃষ্ট চিনি এদেশে যে মূল্যে বিক্রয় করিতেছে, আমাদিগের দেশজাত গুড়ও আমাদিগের পক্ষে সে দরে বিক্রয় করা কঠিন হইয়াছে।

ইহার কারণ কি? কেন আমরা ইক্ষুর চাষে যবদ্বীপ বা জার্ম্মানির সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইতেছি না? এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান অতি সহজ। যে কারণে ভারতের বস্ত্র শিল্পের দুর্দ্দশা হইয়াছে, যে কারণে অন্য বহু শিল্প এদেশ হইতে বিলুপ্ত হইতেছে, ভারতের শর্করাও সেই কারণেই ভারতের বাজার হইতে অন্তর্হিত হইতেছে, অর্থাৎ বিদেশীরা উন্নত প্রণালীতে চাষ ও উৎকৃষ্ট প্রণালী দ্বারা যে ব্যয়ে যে পরিমাণ চিনির উৎপাদন করিতে পারেন, আমরা তাহা পারি না। কাজেই অবাধ বাণিজ্যের ব্যবস্থা আছে বলিয়া প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে আমরা ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিকদিগের ব্যবসায়ের উন্নতি হইতেছে। বিদেশের ভূমি আমাদিগের ভূমি অপেক্ষা সম্ভবতঃ অধিক উর্ব্বর নহে, তবে চেষ্টা দ্বারা অনুর্ব্বর ভূমিকেও উর্ব্বর করা যায়। বৈদেশিকদিগের সে চেষ্টা আছে। তাঁহারা ব্যবসায়সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়া যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায়ে খাটাইতে পারেন। টাকায় অসাধ্য সাধন করা যায়। ব্যবসায়ে অধিক টাকা খাটিলে উন্নত প্রণালীর যন্ত্রাদির সংগ্রহে বিলম্ব হয় না এবং অন্য বহুবিষয়ে সুবিধা হওয়ায় অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে যথেষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারা যায়। কাজেই বিদেশীয়া চিনির ব্যবসায়ে উন্নতি করিতেছেন।

এ অবস্থার প্রতীকার না হইলে আমাদিগকে বিদেশী ব্যবসায়ীদিগের অনুকরণ করিতে হইবে। ব্যবসায়-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া চিনির ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থ প্রয়োগ করিতে হইবে। কৃষকদিগকে উন্নত প্রণালীতে চাষ করিবার পদ্ধতি শিখাইতে হইবে। যখন এ সকল সম্পন্ন হইবে, তখন বৈদেশিকগণ আমাদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় কখনই সমর্থ হইবেন না। বর্ত্তমান সময়ে বৈদেশিকগণ আমাদিগের বাজার অধিকার করিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা উন্নত যন্ত্রাদি, শিক্ষা ও নৈপুণ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই বহুদূর পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং এক্ষণে অবাধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বৈদেশিকদিগকে পরাভূত করা আমাদিগের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়াছে। রাজার আনুকূল্য ব্যতীত আপাততঃ আমাদিগের সাফল্য লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। যদি বৈদেশিক চিনির উপর কিঞ্চিৎ উচ্চ হারে মাশুল প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে ভারতের বাজারে ঐ চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। তখন সেই বর্দ্ধিত মূল্যের চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করা তত কঠিন হইবে না। এইরূপে যখন আমরা ক্রমশঃ সকল বিষয়ে বৈদেশিকদিগের সমকক্ষ হইব—অর্থাৎ স্বল্প ব্যয়ে অধিক চিনি উৎপাদন করিবার উন্নত প্রণালীতে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত হইব, তখন এই মাশুল তুলিয়া দিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। নচেৎ বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার সময় নিষ্ফলতা অনিবার্য্য জানিয়া কেহ চিনির ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ করিতে উদ্যত হইবেন না।

কাগজ প্রস্তুত করা হইত এবং গুরুতর ঘটনা ও শাসন সংক্রান্ত নিয়মাবলী তদুপরি লিপিবদ্ধ হইত। 'অতি উৎকৃষ্ট ও পাতলা পার্চমেণ্টকে ভেলাম্ (Vellum) বলিত।

রেশমী বস্ত্র।

সভ্যতার বিস্তৃতির সহিত যখন রেশমী ও অন্য প্রকার বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল, তখন নানাবিধ বস্ত্রখণ্ড লিখনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতে লাগিল। উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্রের উপর বহু প্রাচীন-কালের লিখন আজি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্লিনির সময়ে রেশমী বস্ত্র লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

বল্কল।

বৃক্ষ-বল্কল কতদিন লিপিরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। প্রাচীন কল্‌ডিয়াবাসিগণ বৃক্ষ-বল্কল লিখিবার জন্য ব্যবহার করিত, এরূপ বল্কলকে তাহারা 'লেবার' (Leber) বলিত। লেবার অর্থে এক্ষণে আমরা পুস্তক বুঝি। অতি প্রাচীনকালে মিশরদেশে লিখনের নিমিত্ত পেপিরি নামক যে পদার্থ ব্যবহৃত হইত, তাহা পেপিয়ন্ নামক একপ্রকার বৃক্ষের বল্কল মাত্র। এই বল্কলের আয়তন বিস্তৃত এবং ইহার গঠন অতি সূক্ষ্ম ছিল। কয়েকখণ্ড বল্কল একত্রে জুড়িয়া লইলেই বহু বিস্তৃত পত্র প্রস্তুত হইত। এই বল্কলে জল লাগাইলেই একপ্রকার আঠাল পদার্থ উহা হইতে নির্গত হইত, সুতরাং জুড়িবার জন্য অন্য কোন আঠার প্রয়োজন হইত না। মিশরীয় পুরোহিতসম্প্রদায় পেপিরি পত্রের উপর তাঁহাদের ধর্ম্মশাসন লিপিবদ্ধ করিতেন। দুই প্রকার পেপিয় পত্র মিশরদেশে ব্যবহৃত হইত, একপ্রকার অধিক পুরু এবং অন্য প্রকার পত্র তদপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম; এই শেষোক্ত পত্রকে হেরেটিকা (Heretica) বলিত। এই পত্রের অত্যন্ত আদর মিশরীয়গণ ইহার প্রস্তুতপ্রণালী বিদেশীয় বণিক-দিগকে কোন মতেই জানিতে দিতেন না। যাহা হউক রোম ও গ্রীসদেশীয় বণিকগণ নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া এই পত্র প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিয়াছিলেন এবং ক্রমে রোমে ও গ্রীসে পেপিরি কাগজ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। কাগজের ইংরাজি নাম 'পেপার' মিশরীয় পেপিরস্ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বল্কলের উপর লিখন কোন্ সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ভূর্জ্জপত্র এদেশে লিখনের জন্য বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এখনও রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও চণ্ডীর অংশ ভূর্জ্জপত্রের উপর লিখিত হইয়া অনেকের অঙ্গে কবচরূপে শোভা পাইতেছে। ভূর্জ্জপত্রে বেশ পরিষ্কার লেখা যায় এবং ঐ লেখা সহজে নষ্ট হয় না, তবে ভূর্জ্জপত্র সহজেই ছিঁড়িয়া যায়। সুমাত্রা ও যবদ্বীপে আজি পর্য্যন্ত এক প্রকার বৃক্ষবল্কল লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বৃক্ষপত্র।

তালপত্র বহুকাল হইতে ভারতবর্ষ ও মিশর দেশে লিখনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন যে, তিনি এদেশে যতগুলি তালপত্রের প্রাচীন পুঁথি দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে যেখানি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতম, তাহা ১১৮৯ সংবতে লিখিত হইয়াছিল। তেরেট পত্রে লিখিত গ্রন্থাদি এদেশে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

তুলট কাগজ।

আধুনিক ইউরোপীয় গ্রন্থকারদিগের মতে গাছের আঁস এবং তুল মণ্ডে পরিণত করিয়া কাগজ

প্রস্তুত করিবার প্রথা প্রথমে চীনদেশে প্রচলিত হয়। তাঁহারা বলেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনে এই প্রণালীতে প্রথমে কাগজ প্রস্তুত হয়। ইহার পূর্ব্বে চীনদেশবাসীগণ বাঁশের ছালের উপর লৌহশলাকা দ্বারা আঁচড় কাটিয়া লিখনকার্য্য সম্পাদন করিত। মহাত্মা কন্‌ফুচি যখন চীন দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন (খ্রীষ্ট জন্মিবার ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে), তখন তথায় বাঁশের ছালের উপর পুস্তকাদি লিখিত হইত। কিন্তু প্রাচীন গ্রীকদিগের লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, খ্রীষ্ট জন্মিবার অন্ততঃ তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে তুলনির্ম্মিত এক প্রকার কাগজ লিখিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। যখন দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডার ৩২৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে পঞ্জাব আক্রমণ করেন, তখন গ্রীকেরা তুলনির্ম্মিত এক প্রকার কাগজ পঞ্জাবে ব্যবহার হইতে দেখিয়াছিলেন। আলেক্‌জাণ্ডারের প্রধান সেনাপতি নিয়ার্কস্ তাঁহার গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তুল কৌশলে জমাট বাঁধাইয়া এই কাগজ প্রস্তুত করা হইত ; বোধ হয় ইহা হইতেই এদেশে "হাতেগড়া" কাগজ তুলট কাগজ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। তুল বৃক্ষজাত এক প্রকার আঁস ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবশ্য তুলকে মণ্ডে পরিণত করিয়া, গ্রীকদিগের বর্ণিত তুলট কাগজ প্রস্তুত হইত কি না, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই ; তবে গাছের আঁস হইতে কাগজ করিবার প্রথা চীন অপেক্ষা যে বহুদিন পূর্ব্বে ভারতে প্রচলিত ছিল, গ্রীকগ্রন্থ হইতে সে বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে মালদহে তুলট কাগজ বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইত। প্রাচীন গৌড়ে শুদ্ধ কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য এক সম্প্রদায় লোক ছিল, তাহাদিগকে "কাগজী" বলিত। চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে গৌড়ে কাগজের ব্যবসায় সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রাজকার্য্য ও সাধারণের ব্যবহারের জন্য তুলট কাগজ গৌড় হইতে দেশ বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। এখনও মালদহের অনেক স্থানে কাগজীরা বাস করে এবং সামান্য পরিমাণে পৈতৃক ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া থাকে। তুলট কাগজে লিখিত সাত শত বৎসরের পুঁথি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। মালদহ ব্যতীত ঢাকা, সাহাবাদ ও মজঃফরপুর জেলায় এখনও অল্পাধিক পরিমাণে দেশীয় কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যে আরঙ্গাবাদ, দৌলতাবাদ, কোলাপুর, সেতারা, ধারওয়ার, আমেদাবাদ, প্রভৃতি স্থানে অল্পাধিক পরিমাণে "হাতেগড়া" কাগজ প্রস্তুত হয়। দৌলতাবাদে স্বর্ণপত্রমণ্ডিত এক প্রকার উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহা দেশীয় নৃপতিগণ রাজকার্য্যের জন্য ব্যবহার করেন। এই কাগজ "আফসানি" কাগজ নামে অভিহিত। হুগলি জেলার আমতা সবডিভিসনের অন্তর্ভূত মৈনান নামক গ্রামে অনেক কাগজী বাস করে। কলিকাতার বড়বাজারে শ্রীবৈদ্যনাথ সাহার দোকানে যে স্বদেশী কাগজ বিক্রীত হয়, তাহা মৈনানে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চীনের কাগজ।

অধুনা চীনদেশে নানাপ্রকার কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এমন কোন আঁসযুক্ত পদার্থ নাই, যাহা হইতে চীনেরা কাগজ প্রস্তুত করে না। খড়, ঘাস, তুলা, গাছের ছাল, শণ, কাঠ, বাঁশ, রেশম, রেশমের গুটী প্রভৃতি আঁসযুক্ত সকল প্রকার পদার্থই চীনদেশে কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "হো-সি" নামক খড়

হইতে এত অধিক পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হয় যে, অহা শবদাহের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তুঁত গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত "পিশ-জে" নামক কাগজ লিণ্ট্ কাপড়ের ন্যায় ক্ষতস্থানে মলম লাগাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "হোরা-সিয়েন" নামক কাগজ ঔষধের পুরিয়া করিবার জন্য এবং "তাসে ও চংসে" নামক কাগজ হিসাব লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। "মাপিয়েন্" ও "লিয়েনসি" নামক কাগজ মুদ্রণ ও চিত্র কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "লাসিয়েন্" নামক এক প্রকার মোমঢাল কাগজ ও লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত "ইণ্ডিয়া পেপার" (India paper) নামক এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট কাগজ চীনদেশে প্রস্তুত হয়; ইহাতে অতি সূক্ষ্ম মুদ্রণ কার্য্য ও চিত্রাঙ্কন সম্পন্ন হইয়া থাকে। চীনেরা মাছের কাঁটা হইতে শিরীষের ন্যায় এক প্রকার আঠাল পদার্থ প্রস্তুত করে, ইহা কাগজে লাগাইলে কাগজ মসৃণ হয় এবং চোপসায় না।

জাপানী কাগজ।

জাপানেও চীনদেশের ন্যায় তুঁতগাছের ছাল হইতে অনেক কাগজ প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত পাপিভেরা সেটাইভা (Papyvera sativa Pulp) নামক এক প্রকার বৃক্ষ জাপানে জন্মে উহার ছাল কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। চীন ও জাপানে ভাতের মাড় লাগাইয়া কাগজকে দৃঢ় ও মসৃণ করা হয়। মণ্ড (Pulp) প্রস্তুত করিবার জন্য জাপানীরা অনেক স্থলে চুণের পরিবর্ত্তে ছাই ব্যবহার করিয়া থাকে। জাপানে ঠিক কাপড়ের ন্যায় নরম ও পাতলা এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হয়; এই কাগজ হইতে তাহারা জামা, রুমাল, তোয়ালিয়া, টুপি প্রভৃতি পরিধানোপযোগী নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা কাগজের খুব মোটা ও কঠিন পেষ্টবোর্ড প্রস্তুত করিয়া উহা দ্বারা গৃহের দেওয়াল, ছাদ, বসিবার আসন, গাড়ির চাকা প্রভৃতি ভারসহ, নানাবিধ কঠিন পদার্থ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কাঠের তক্তার পরিবর্ত্তে এইরূপ কঠিন পেষ্টবোর্ড জাপানে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়।

নেপালি কাগজ।

নেপালে বাঁশ হইতে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানে মহাদেব-কা-ফুল (Duphne Channabina) নামক এক প্রকার বৃক্ষের বল্কল হইতে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়। নেপালিরা ছাই জলে সিদ্ধ করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং কাগজ প্রস্তুত হইলেই উহা কড়ি দিয়া ঘসিয়া মসৃণ করিয়া লয়। এক প্রকার নেপালি কাগজ মোড়ক করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

ভুটানি কাগজ।

ভুটানেও নেপালের ন্যায় একই প্রণালীতে কাগজ প্রস্তুত হয়। এ প্রদেশে 'রীয়া' গাছের আঁস কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাশ্মীরি কাগজ।

অতি প্রাচীনকাল হইতে কাশ্মীরে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকারের মতে মোগল সম্রাট আক-বরের সময়ে কাশ্মীর হইতে ভারতবর্ষে কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এই মত প্রমাণসিদ্ধ নহে।

ব্রহ্মদেশের কাগজ।

ব্রহ্মদেশে বাঁশ ও কতিপয় বৃক্ষের ছাল হইতে "হাতেগড়া" কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ প্রদেশে এক প্রকার কাগজে নির্ম্মিত শ্লেট্ ব্যবহৃত হয়; অনেকগুলি কাগজ উপর্য্যুপরি জুড়িয়া পেষ্ট্ বোর্ডের ন্যায় পুরু ও কঠিন করা হয় এবং তদুপরি এক প্রকার কাল রং লাগাইয়া "হাতেখড়ির" ন্যায় এক প্রকার খড়ির দ্বারা উহার উপর লেখা হয়।

রণা বৃক্ষ।

গত শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসীতে' শ্রীযুত মোজাফ্ফর আহমদ সন্দীপের "পুন্নাল-বৃক্ষ ও পুন্নাল-তৈল" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমাদের বঙ্গদেশের বনে, জঙ্গলে ও বাগানে ঐ প্রকার আয়কর ও প্রয়োজনীয় অনেক রকম বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। রণা বৃক্ষ তাহাদের মধ্যে একটী।

কেরোসিন তৈল প্রচলনের পূর্ব্বে পূর্ব্ব-বঙ্গের (বিশেষতঃ কুমিল্লা ও নোয়াখালির) প্রায় প্রত্যেক পরিবারে রণার তৈলের ব্যবহার ছিল। আজকালও অনেক দুঃস্থ গৃহস্থ কেরোসিন তৈলের পরিবর্ত্তে রণার তৈল ব্যবহার করিয়া থাকে। রণা বৃক্ষ পূর্ব্ব বঙ্গেই অধিক জন্মায়। ইহার পত্র গুলি গাঢ় সবুজ-বর্ণ এবং ৫।৬ ইঞ্চ লম্বা। পত্রের অগ্রভাগ সূচল। এই বৃক্ষ আম, কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষের ন্যায় বহু শাখা বিশিষ্ট এবং উচ্চতায়ও তাহাদেরই মত। এই গাছ জন্মাইতে লোকের অধিক ক্লেশ পাইতে হয় না। ইহা বাগানে আপনা-আপনি হইয়া থাকে। গো, মহিষ প্রভৃতি ইহার পাতা খায় না, কাজেই চারা গাছগুলি নির্ব্বিঘ্নে বাড়িতে থাকে। ৬।৭ বৎসরের মধ্যেই এই গাছে ফুল ফলিতে আরম্ভ করে। ভাদ্র আশ্বিনে ইহার প্রশাখা হইতে সফুল ডাঁটা বাহির হয়, এক একটা ডাঁটা প্রায় এক হস্ত পরিমাণ লম্বা হইয়া থাকে। ফুলগুলি শাদা, দেখিতে অতি সুন্দর। সেই ফুল হইতে ফল হইয়া ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে ফাল্গুন মাসে ফল পাকা আরম্ভ হয়। ফলগুলি দেখিতে বয়ড়ার মত, কিন্তু ইহা বয়ড়া অপেক্ষা বড় হয়। বয়ড়া মেটে বর্ণের, আর রণার বর্ণ পীতাভ শাদা। একটা ফলের মধ্যে সাধারণতঃ ৩ টার বেশী বীচি হয় না। তিনটা আবরণ ভেদ করিয়া তবে উহার সারাংশ পাওয়া যায়। উপরের আবরণটা পুরু, ফল পাকিলে উহা ফাটিয়া যায়। তখনই লালবর্ণের বীচিগুলি দৃষ্ট হয়, ঐ লাল জিনিসটা একটা পাতলা আবরণ। তাহার নীচে কাল রঙ্গের একটা তেলতেলে কঠিন আবরণ আছে, তারপরই সারাংশ, ইহা হুবহু শাদা ছোট মার্‌বলের ন্যায় দেখায়।

তৈল প্রস্তুতের প্রক্রিয়া। ফল পাকিলে উহা ফাটিয়া লাল বীচিগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তখন উহা কুড়াইয়া আনিয়া ২।৩ দিন রৌদ্রে দিবার পর, পায় মাড়াইয়া উপরের লাল খোসা ছাড়াইলে ভিতর হইতে কাল রঙ্গের মসৃণ রণা বাহির হয় তারপর ৩।৪ দিন রৌদ্রে শুকাইয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া লইলে কাল আবরণটা শাঁস হইতে পৃথক হইয়া যায়। এখন কুলায় ঝাড়িয়া, কালো আবরণটা ফেলিয়া দিতে হয়; খুব শুষ্ক হইলে আবার ঢেঁকিতে কুটিয়া গুঁড়া হইলে জল মাখিয়া রৌদ্রে দিতে হয়; খুব শুষ্ক হইলে আবার ঢেঁকিতে কুটিতে হয়; তখন ঐ গুঁড়া জিনিষগুলি ডেলা ডেলা হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উনানে এক হাঁড়ি জল ফুটাইয়া রাখিতে হয়! এই জলে উপর্য্যুক্ত ডেলাগুলি ফেলিয়া কাঠির সাহায্যে নাড়িতে হয়, এইরূপ কিছুক্ষণ নাড়িয়া হাঁড়ির মুখে

সরা ঢাকা দিতে হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে জ্বাল হইতে নামাইয়া হাঁড়িটা নাড়িলে, তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে। এই ভাসমান তৈল নিপুণতার সহিত পাত্রান্তরে ঢালিয়া লইলেই হইল।

এই তৈল রেড়ির তৈলের মত গাঢ় এবং ইহার আলোও তাহারই মত স্নিগ্ধ। বর্ষাকালে চাষীগণ সর্ব্বাঙ্গে এই তৈল মাখিয়া, ধান, পাট প্রভৃতি কাটিতে জলে নামে; ইহাতে মাঠের বিষমিশ্রিত জলের উপদ্রব এবং জলৌকার আক্রমণ হইতে শরীর রক্ষা পায়।

রণাগাছে উৎকৃষ্ট তক্তা প্রস্তুত হয়; এবং এই তক্তা দ্বারা তক্তপোষ, চৌকি, কবাট, জানালা, বাক্স প্রভৃতি তৈয়ার করিলে অনেক দিন স্থায়ী হইতে পারে।—জনৈক পূর্ব্ববঙ্গ বাবুরহাট নিবাসী।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

বৈশাখ মাস।

সব্জীবাগান।—মাখন সীম, বরবটি, লবিয়া প্রভৃতি বীজ এই সময় বপন করা উচিত। টেপারি কেহ কেহ ইতি পূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন, কিন্তু টেপারি বীজ বসাইবার এখন সময় যায় নাই। শসা, বিলাতি কুমড়া, লাউ, স্কোয়াস বা বিলাতী কদু, পালা ঝিঙ্গা, পুঁই, ডেঙ্গো, নটে প্রভৃতি শাক বীজ এখনও বপন করা চলে। কিন্তু বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ সমস্ত বীজবপন কার্য্য শেষ করিতে পারিলে ভাল হয়। ভুট্টা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা বীজ বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বসাইতে পারা যায়। আশু বেগুনের চারা তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাসে ২।১ দিন একটু ভারি বৃষ্টি হইলে উহাদিগকে বীজ-ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া রোপণ করে।

কৃষিক্ষেত্র।—বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে আশুধান্য, ধনিচা, অরহর, পাট প্রভৃতি বীজ বপন করিতে হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও এই সময় রিয়ানা ও গিনি ঘাস প্রভৃতি ঘাসবীজ বপন করিতে হইবে। কিন্তু বলা বাহুল্য বৃষ্টি হইয়া জমিতে "যো" হইলে তবেই ঐ সমস্ত আবাদ চলিতে পারে। ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি বীজ বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত। যদি উক্ত কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তবে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

কিঞ্চিৎ অধিক বারি পতন হইলেই চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমেই উহাদের বীজ বপন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বৈশাখের শেষ ভাগে গাছগুলি বড় হইয়া তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে। চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজ-ইক্ষু বা আখের টাঁক বসাইবার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ইক্ষুক্ষেত্রে বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হইবে। দুই শ্রেণী আখের মধ্যস্থল হইতে মাটি উঠাইয়া আখের গোড়ায় দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

ফুল বাগান।—বৈশাখ মাসে ঝুঞ্ঝকলি, আমারান্থাস্, দোপাটী, গ্লোব আমারান্থাস্, কনভলভিউলাস, আইপোমিয়া, সনফ্লাওয়ার বা রাধাপদ্ম, লজ্জাবতী, মাটিনিয়াডায়াণ্ড্রা, মেরিগোল্ড, সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, ধুতুরা প্রভৃতি দেশী মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হয়। বেল ও যুঁইফুলের ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই। উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে অপরিষ্যাপ্ত ফুল ফুটিবে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি গাছে আবশ্যক মত জল সেচন ও তাহাদের ফল রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কাজ নাই। আনারস গাছগুলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া তাহাতে জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে ও যত্ন পাইলে ফলগুলি বড় হয়।

আদা, হলুদ, আর্টিচোক যদি ইতিপূর্ব্বে বসাইয়া দেওয়া না হইয়া থাকে তবে সেগুলি বসাইতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।
